হিং টিং ছট

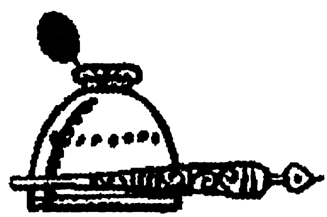
বাবুরাম সাপুড়ে

হিং টিং ছট

হিং টিং ছট

সমগ্র

প্রথম পর্ব



বাবুরাম সাপুড়ে

আজকাল

হিং টিং ছট সমগ্র (১)
Hing Ting Chhat (Vol. 1)
Satires
by Baburam Sapure

প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, জানয়ারি ১৯৬২

প্রচ্ছদ : দেবব্রত ঘোষ

প্রকাশক
জ্যোতিপ্রকাশ খান, আজকাল পাবলিশার্স লিমিটেড
৯৬ রাজা রামমোহন সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৯

বর্ণবিন্যাস : প্রসেসিকা, ৪৮৮ রবীন্দ্র সরণি, কলকাতা ৭০০ ০০৫

মুদ্রণ
ইউনিক প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ৬১এ কেশব সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রাপ্তিস্থান
দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

১৪০ টাকা

উৎসর্গ

সুভাষ ভৌমিককে

প্রকাশকের নিবেদন

বাবুরাম সাপুড়ে ওরফে অশোক দাশগুপ্তর জনপ্রিয় কলম প্রকাশিত হয় খেলা পত্রিকায়। তখন ওই লেখার শিরোনাম থাকত না। পরে আজকাল-এ শিরোনামসহ ছাপা। এই বইটায়ও ব্যাপারটা একইরকম রাখা হল।

হিং টিং ভূমিকা

মজার মেজাজে শুরু। গম্ভীর কাজের মধ্যে বিশ্রামের খোঁজে আরও। কখনও নিতান্ত আবোলতাবোল, কখনও হঠাৎ হয়ে-ওঠা একটু হ য ব র ল। চূড়ান্ত আক্রমণ যখন এমনি লেখায় কুলোচ্ছে না, তখন হিং টিং ছট। সাপ্তাহিক নেপথ্য ভাষণে যখন ক্লান্তির গুরুভার, তখন হিং টিং ছট। বাবুরাম সাপুড়ের অশেষ সৌভাগ্য যে, এডিটর সাহেবের নাম অশোক দাশগুপ্ত, না হলে এত এত 'হিং টিং ছট' ছাপাই হত না। প্রথম খণ্ডে খেলা ঘিরে যত লেখা। কিছু বাদ দিতে বলেছিলাম, নারাজ অকালপক্ককেশ স্পোর্টস এডিটর। বেশ, ছাপো ভাই, আমি সাড়ে সাত কপি কিনব।

বাবুরাম সাপুড়ে

সূচি

১

সূচি

২

১

লেখা-টেখা তেমন আসে না। স্রেফ তেল মেরে লাইনে আছি। এডিটর সাহেবরাও বেছে বেছে এমন সব কাজ আমাকে দেন, যা না করাই কঠিন। যেমন ধরুন, ইডেনে ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টের সময় আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, পাঁচ দিনে মোট ক'টা ওভার বাউন্ডারি হয়, লিখে রাখতে হবে। বথাম আর কপিলের দুটো ওভার বাউন্ডারি নোট করে নিয়েছি। ব্যস, কাজ শেষ। গত বছর মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল লিগ ম্যাচে আমার কাজ ছিল, দর্শকদের মধ্যে আহতের সংখ্যা সংগ্রহ করা। কেউ আহত না হওয়ায়, কিছুই করতে হয়নি।

কিন্তু এবার খেলার এডিটর সাহেব আমার ঘাড়ে এমন কঠিন কাজ চাপিয়ে দিলেন কেন, বুঝছি না। আমার পরম শত্রুও একথা বলতে পারবে না যে সম্প্রতি আমি এমন কোনও ভাল রিপোর্টিং করেছি, যার ফলে এই কঠিন কাজ আমায় দেওয়া হয়েছে। অলস এবং অপদার্থ সাংবাদিক হিসাবে আমার খ্যাতি এতই সুদূর প্রসারিত যে, ভুলেও কোনও ছোট কাগজের সম্পাদক আমাকে কঠিন বিষয়ে লিখতে বলে না। এডিটর সাহেব বললেন, 'শোনো হে, নেহরু গোল্ড কাপ ফুটবল নিয়ে আমাদের সব ভাল রিপোর্টারই ব্যস্ত। এবার কলকাতার কোন ফুটবলার কোন ক্লাবে যাচ্ছে, সেই স্টোরিটা তোমাকে দিয়েই করাতে হচ্ছে।'

প্রথমেই ভাবলাম, বিভিন্ন পত্রিকার সাম্প্রতিক সংখ্যা ঘেঁটে দেখা যাক বাঘা সাংবাদিকেরা এ বিষয়ে কী লিখছেন।

'ক' পত্রিকায় লিখেছে, সুব্রত ভট্টাচার্য এবার ইস্টবেঙ্গলেই যাচ্ছে। 'খ' পত্রিকার বক্তব্য, সুব্রত ভট্টাচার্য যে মোহনবাগানে থাকছেই, সেটা চোখ বুজে বলে দেওয়া যায়। 'গ' পত্রিকার অন্তরঙ্গ প্রতিবেদন : সুব্রত ভট্টাচার্যর এবারে মহমেডান স্পোর্টিং-এ যাবার রাস্তা পাকা।

ঘূর্ণায়মান মাথা নিয়ে এক অভিজ্ঞ দলবদল-বিশেষজ্ঞ সাংবাদিকের শরণাপন্ন হলাম। তিনি বললেন, 'মিঃ সাপুড়ে, এতদিন আপনাকে চালাক লোক বলেই জানতাম। কিছু মনে করবেন না, এখন দেখছি, আপনি ক্লাস ওয়ান গবেট।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলাম, 'না, না, কিছুই মনে করছি না। সত্যি কথাটা বুঝে গেলেন, ভালই হল।'

লম্বা সিগারেটে উপর্যুপরি সাড়ে তিনটি টান দেওয়ার পর তিনি শুরু করলেন, "আপনি শুধু লেখায় সুব্রত সম্পর্কে লাইনটাই পড়েছেন। তারপর যে 'তবে'— 'কিন্তু'— 'অবশ্য' গুলো আছে, খতিয়ে দেখেননি। যথা : সুব্রত ইস্টবেঙ্গলে যাচ্ছেই। 'তবে' ইস্টবেঙ্গলের কিছু ফুটবলার সেটা না চাইলে ব্যাপারটা ঘুরে যেতে পারে।

যথা : সুব্রত মোহনবাগানে থাকছেই। 'কিন্তু' মোহনবাগানের কিছু কর্মকর্তার আচরণে উত্ত্যক্ত হয়ে সুব্রত দল বদল করলে বিস্মিত হবেন না।

যথা : সুব্রতর মহমেডানে আসার রাস্তা পাকা। 'অবশ্য' মহমেডান কর্মকর্তারা মজিদ-জামশিদকে নিলে পাকা ঘুঁটি কেঁচে যেতে পারে।

এই রকম আর কি!

কিছুটা বোধগম্য হওয়ায় গলা ঝেড়ে প্রশ্ন করলাম, 'কিন্তু একই কাগজে যে দু-তিন রকম লিখেছে?'

তিনি হাসলেন : 'তা তো লিখতেই হবে। যে-কোনও একটা মিলে গেলেই হল।'

তারপর তিনি আমায় একটা ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে একটি বিশাল চার্ট। বড় বড় রেলওয়ে বুকিং কাউন্টারে যেমন থাকে। তাতে বাঁ দিক দিয়ে কলকাতার সব বিখ্যাত ফুটবলারের নাম। তারপর ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ পর্যন্ত তারিখ লেখা, প্রত্যেক তারিখের জন্য একটা করে খোপ। তাতে তিনি লিখে রাখছেন, ই বি, এম বি, এম এস। আমি গিয়েছিলাম ৭ ফেব্রুয়ারি। ১ তারিখে সুব্রতর মোহনবাগানে থাকার সম্ভাবনা, ভাস্করের ইস্টবেঙ্গলে যাওয়ার কথা, মইদুলের মহমেডানেই থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা।

তিনি বললেন, '১৫ মার্চ দলবদল শুরু। আশা করছি ওই দিন সকালে শেষ খবর দিতে পারব। না হলে, চার্ট এক্সটেন্ড করতে হবে।'

লেখাটা তৈরি করার মুখে এডিটর সাহেব বললেন, 'একটা কথা মনে রেখ, লেখার হেডিংটা যেন সত্যি হয়। মাঝে যা খুশি লেখ ক্ষতি নেই।'

অনেক ভেবেচিন্তে লেখার হেডিং দিলাম : 'সুব্রত হাওড়া ইউনিয়নে যাচ্ছে না।' বললাম, 'এটা ভুল প্রমাণিত হওয়ার কোনও চান্স নেই।'

এডিটর সাহেব লেখাটি সশব্দে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে ফেলে উচ্চারণ করলেন, 'অপদার্থ!'

-বাঁচা গেল।

২

'ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্ট' বলতে যা বোঝায়, তা আমাকে কখনই দেওয়া হয় না। যদি বা একবার দেওয়া হল, রাখতে পারলাম না। গত সংখ্যায় আমার সেই দুঃখ ও দুর্গতির কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছি। জানতাম না, এই কারণে এডিটর সাহেব এত ক্ষেপে যাবেন। আমার হাতের লেখা এত খারাপ যে, পড়ার ধৈর্য থাকে না। সরাসরি প্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এডিটর সাহেব লেখাটা প্রথম পড়লেন ছাপার অক্ষরেই।

অফিসে ঢুকেই টেবিলে ছোট্ট নোট পেলাম : 'এক্ষুনি আমার সঙ্গে দেখা করুন।'

এমনিতে এডিটরের গাম্ভীর্যকে আমি ডরাই না, কারণ আমার চশমা আছে, এডিটরের নেই। তবে, এডিটরের লম্বা সিগারেট আছে। তাতে আলতো টান মেরে, একটা পেপার ওয়েট টেবিলের ওপর বিপজ্জনকভাবে রেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি যে নিরেট গবেট, এটা কি পাবলিককে না জানালে চলছিল না?'

— 'সত্যি কথা লোকে জানলে ক্ষতি কী?'

— 'তার মানে? ট্রেড সিক্রেট বলে কিছু থাকবে না? আপনার মত একজন আকাট মূর্খ নিয়ে যে আমরা কাজ করছি, সেই সত্যটা নিজেদের মধ্যে থাকলেই ভাল ছিল না?'

'মানুষ কি সেই ধূলি চেয়ে হীন সহিবে সে অপমান?' যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিখ্যাত লাইনগুলো মাথার মধ্যে কিলবিলিয়ে উঠল। জীবনে প্রথম, বিশ্বাস করুন, জীবনে প্রথম বার প্রতিবাদ করলাম। এডিটরের মুখের ওপর বলে ফেললাম, 'এই লাইনের প্রায় সবাই আকাট মূর্খ। আমি, আপ— থাকগে, প্রায় সবাই মূর্খ। আমি শুধু নিজের মুখে স্বীকার করি, এই তফাত। অন্য রিপোর্টারদের আপনি বেছে বেছে ভাল অ্যাসাইনমেন্ট দেন। আমার বেলায় বড় জোর ক্যারম ফাইনাল, বা লক্ষ্মীবিলাস শিল্ডের সেকেন্ড রাউন্ড ম্যাচ। খবরগুলো অ্যাট অল ছাপাই হয় না। দিতেন তেমন অ্যাসাইনমেন্ট, দেখিয়ে দিতাম।'

আমার উঁচু গলা শুনে থমকে গেলেন এডিটর। একেবারেই অপ্রত্যাশিত ঘটনা। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সামলে নিয়ে বললেন, "কী ভাল অ্যাসাইনমেন্ট দেব। গতবার

ফুটবলের দলবদল নিয়ে স্টোরি করতে বললাম, বিরাট খবর আনলেন, 'সুব্রত হাওড়া ইউনিয়নে যাচ্ছে না!' তার ওপর 'ক' 'খ' 'গ'-এর কঠিন অঙ্ক দিয়ে রিডারদের বিরক্ত করলেন।"

বললাম, 'বেশ এখন থেকে কিছু ক্রিকেট অ্যাসাইনমেন্ট দিন।'

এডিটর সাহেব শান্তভাবে আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে, যথাযথ কায়দায় চোখ কপালে তুলে উচ্চারণ করলেন, 'ক্রি...কে...ট! মশাই, আপনি ক্রিকেটের কিছু বোঝেন? কোনও খবর রাখেন?'

তারপর, কথা না বাড়িয়ে, তিনি ক্রিকেট-সংক্রান্ত পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সোজা হয়ে বসলেন। প্রশ্ন : "'খেলা'র গত সংখ্যায় সুনীল গাভাসকার বিশ্ব ক্রিকেট একাদশ গড়েছেন। আপনি কি তাঁর সঙ্গে একমত?"

— 'মোটেই না, আমি ঘোর দেশপ্রেমিক লোক। সানি টিমে রেখেছেন ভারতের বিশ্বনাথ, কিরমানি আর দোশিকে। আমার মতে, প্রণব রায়, বেঙ্গসরকার, যশপাল শর্মা, অশোক মালহোত্রা, রবিশাস্ত্রী, কপিলদেব আর মদনলালকেও নেওয়া উচিত ছিল।'

— 'আপনি ক্রিকেটের কচু বোঝেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের চার ফাস্ট বোলার— রবার্টস -হোল্ডিং-ক্রফট-গার্নারকে সানি বাদ দিয়ে দিলেন, এটাই বললেন না?'

— 'এটা সানি ঠিক কাজই করেছেন। ভদ্রতার খাতিরে নিজেকে বিশ্ব একাদশে রাখেননি। সেক্ষেত্রে, অবশিষ্ট দলের হয়ে তো তাঁকে খেলতেই হবে। সানি ওয়েস্ট ইন্ডিজের চার ফাস্ট বোলারের সামনে পড়তে চান না। তাই ওদের নিজের টিমে, মানে অবশিষ্ট দলে রাখতে চান।'

এডিটর সাহেব তৃতীয় সিগারেট ধরালেন। কলম খুললেন। কাগজপত্র গোছালেন। তারপর, যথাসম্ভব নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'যে গবেট, সে সব বিষয়েই গবেট। তবু ক্রিকেট তো অতি সূক্ষ্ম খেলা। সুতরাং, আপনি অন্য কিছু বাছুন। ধরুন, লুডো বা......'

অপমানিত হওয়ার অভ্যাস বহুদিন আগেই ত্যাগ করেছি। তার ওপর চাকরির ব্যাপার। শুধু মনে মনে ভাবলাম, 'লুডো কম্পিটিশন ঠিক কোথায় কোথায় হয়? কখন?'

৩

মিটিংয়ে পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। এই একটিমাত্র নামকরা ক্লাবেরই আমি মেম্বার। নাইনটিন এইট্টি ওয়ানে সল্টলেক ফুটবল ক্যাম্প থেকে ফুটবলাররা চলে আসার পর ময়দানে যে এক্সক্লুসিভ দেশপ্রেমিক ক্লাব স্থাপিত হয়েছিল, তাতে এই পত্রিকার একমাত্র আমিই আছি। আর কাউকে নেওয়া হয়নি, কারণ এরা সকলেই ক্যাম্প-ডেজার্টারদের সমর্থন করেছিল।

দয়া করে জানতে চাইবেন না, মিটিংটা কোথায় বসেছিল। এদেশের পাবলিক হুইমজিকাল, আজ দেশদ্রোহীদের মারে, পরদিন দেশপ্রেমিকদের পেটায়। অফ লেট, মানে নেহরু গোল্ড কাপের পর, আমাদের, মানে ময়দানী দেশপ্রেমিকদের সময় একটু খারাপ যাচ্ছে। মারের ভয় তো আছেই, অন্য ফ্যাকড়াও কম নয়।

গত বছর তা-ও সময় তখন দারুণ ভাল, একটা মিটিং করে বেরতে গিয়ে দেখি, গেটে পাঁচটি অকালপক্ক ছেলে। বিশ্বাস করুন, আমাদের, আই মিন দেশপ্রেমিক ক্লাবের মেম্বারদের ওরা ইন্টারভিউ নিয়েছিল। প্রথম প্রশ্ন ছুঁড়েছিল বড় ক্লাবের দেশপ্রেমিক সম্পাদকের দিকে।

প্রশ্ন : আপনি তো ভারতীয় ফুটবলের বিরাট প্রেমিক। বলুন তো, নাইনটিন সেভেন্টি এইটের ব্যাঙ্কক এশিয়ান গেমসে ভারতের ক্যাপ্টেন কে ছিলেন?

দ্বিতীয় প্রশ্নের টার্গেট এক বাঘা দেশপ্রেমিক সাংবাদিক। প্রশ্ন : নাইনটিন এইট্টির প্রি-অলিম্পিক ফুটবলে (সিঙ্গাপুর) চীন-ভারত খেলার ফল কী হয়েছিল?

তিন নম্বর প্রশ্নের মুখে পড়লেন একটি মার্চেন্ট ফার্মের ওভারটাইম-বিশেষজ্ঞ দেশপ্রেমিক। প্রশ্ন : নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনের কিংস কাপে (সিওল) ভারতের গোলকিপার কে ছিলেন?

লাস্ট মিটিংটা হল ৮ ফেব্রুয়ারি। সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ সহসভাপতি, গট আপ-বিশেষজ্ঞ ছোট ক্লাবের কর্মকর্তা। সুগন্ধী রুমালসহ বড় ক্লাবের দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা একটু লেটে পৌঁছানোয় সভাপতির চেয়ার হাতছাড়া হয়ে যায়। তাঁর গোমড়া মুখ ঠিক হতে অন্তত সাড়ে এগার মিনিট সময় লাগল।

যাই হোক, মিটিংয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল : দেশদ্রোহী সাবস্ট্যান্ডার্ড ফুটবলাররা নেহরু গোল্ড কাপে কী করে এত ভাল খেলে ফেলল? এই ব্যাপারে বেশ কয়েকটি ব্যাখ্যা পাওয়া গেল।

ব্যাখ্যা ১ : ভারত দেশের মাটিতে খেলেছে। দেশের মাটিতে খেলার সুবিধা না পেলে এমন রেজাল্ট হত না।

ব্যাখ্যা ২ : সাউথ কোরিয়া আর চীনকে ফার্স্ট ম্যাচ খেলতে হয়েছে ভারতের সঙ্গে। চীন তো কলকাতার মাঠ আর আবহাওয়া বোঝার সময়ই পায়নি। হোস্ট কান্ট্রি হিসাবে এত অ্যাডভান্টেজ নিলে কিছুটা ভাল রেজাল্ট তো হবেই।

ব্যাখ্যা ৩ : টিমে বেশির ভাগ প্লেয়ারই কলকাতার। বাইরে খেলা হলে, কলকাতার দর্শকদের পাওয়া যেত না। কলকাতার দর্শকদের দুর্দান্ত গালাগালি না শুনলে কলকাতার ফুটবলাররা ভাল খেলে না।

ব্যাখ্যা ৪ : প্রথম ম্যাচটা স্রেফ পলিটিকাল চালে পার পেয়ে গেল ইন্ডিয়া। চীনের সঙ্গে খেলায় রেফারি করা হল অ্যান্টি কমিউনিস্ট সাউথ কোরিয়ার লোকটিকে। বুদ্ধি আছে আমাদের অফিসিয়ালদের ঘটে।

ব্যাখ্যা ৫ : যুগোস্লাভিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ম্যাচের আগে কলকাতার ঝানু গট আপ স্পেশালিস্টদের কাজে নামানো হয়েছিল। ম্যাচটা তো ওরাই ম্যানেজ করে দিল। হোম গ্রাউন্ডেও একটা ম্যাচ না জিতলে কর্মকর্তাদের গদি ছাড়তে হত না?

ব্যাখ্যা ৬ : বিশ্বস্তসূত্রের খবর, ভারতীয় ফুটবলারদের 'ডোপ' করা হয়েছিল। না হলে, এরা খেলবে এমন ফুটবল?

ব্যাখ্যা ৭ : এমন খবরও আছে, বেশি গোল না খাওয়ার কথা ভেবে, এ আই এফ এফ-ই বিভিন্ন দেশের ফুটবল সংস্থার কাছে তদ্বির করেছিল, যেন বেশি ভাল টিম না পাঠানো হয়।

মিটিংয়ের শেষদিকে সভাপতি মশাই একটা ভাল কথা বললেন, 'সি আই এ বা কে জি বি-র মতো অর্গানাইজেশনগুলোর কাজ শুধু ঘটনা জানা নয়, ঘটনা ঘটানো। আমাদেরও এখন থেকে চেষ্টা করতে হবে, দিল্লি এশিয়ান গেমসে ভারত যেন ভাল রেজাল্ট না করতে পারে।'

এজন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জেনে সুখী হবেন, কমিটিতে এই অধমকেও নেওয়া হয়েছে।

৪

সেই মিটিংটার কথা মনে পড়ল। আমাদের এডিটর সাহেব ডেকেছিলেন, 'খেলা' প্রকাশিত হওয়ার আগে। নতুন ধরা পাইপ নিয়ে হিমশিম (এবং মাঝে মধ্যে ধোঁয়া) খেতে খেতে তিনি বলেছিলেন, 'মনে রাখতে হবে, ফলো-আপটাই আসল জিনিস। সেনসেশনাল খবর অনেক সময় ভাগ্যের জোরেও পাওয়া যায়। কিন্তু সেই প্রথম খবরের ফলো-আপ করার জন্য পরিশ্রম আর ধৈর্য দরকার। আর হ্যাঁ, সব সময় এডিটরের পরামর্শ নেওয়ারও সুযোগ থাকে না, চটপট ডিসিশন নিতেই হয়।'

নিতেই হল। চটপট ডিসিশন। বুদ্ধিমান পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকারা বিলক্ষণ জানেন, এই অধমের ওপর এডিটর সাহেবের এক দানাও আস্থা নেই। কোন সংখ্যায় কী বেরবে, তা-ও আমাকে জানতে দেওয়া হয় না। তাঁর ধারণা, আমার পেটে কথা থাকে না, রাইভাল পেপারের লোকেদের কাছে সব বলে ফেলতে পারি। হায়, রাইভাল পেপারের লোকেরাও আমাকে পাত্তা দেয় না।

মোদ্দা কথা হল, পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার পর আমি সব লেখা পড়ি, নিজের আধ পৃষ্ঠা ছাড়া। আমাদের ডেঁপো রিপোর্টার আমার নাম দিয়েছে 'এ পি এম'— আধ পৃষ্ঠার মনসবদার!

তৃতীয় সংখ্যার এডিটোরিয়ালে দেখলাম, বাংলার এক প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক নাকি এখনকার অধিনায়ক দিলীপ দোশির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছেন। কিন্তু, কে?

এডিটর সাহেব বোম্বে গেছেন। তাঁর পরামর্শ নেওয়ার সুযোগ নেই। মিটিংটার কথা মনে পড়ে গেল। ফলো-আপটাই আসল জিনিস। ডিসিশন নিতে হবে, চটপট।

কাজে নেমে গেলাম। সেই প্রাক্তন অধিনায়কের নাম জানতেই হবে এবং তাঁর একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউও নিতে হবে।

প্র্যাকটিসে বিজয় মঞ্জরেকর এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে 'সেকেন্ড ইনিংস হিরো' হিসাবে খ্যাত এক প্রাক্তন নির্বাচকের কাছে গেলাম, যিনি বাংলার ক্যাপ্টেনও ছিলেন।

নিজের পরিচয় দিয়ে জানতে চাইলাম, 'আপনিই কি...?' প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, 'আরে না না, আমি না। একবার দিলীপকে বেঙ্গল টিম থেকেই বাদ দেবার আলোচনায় সক্রিয় হয়েছিলাম। তাছাড়া, দিলীপ দোশির বিরুদ্ধে আমি কখনও

কিছু করিনি।'

এবং শেষ পর্যন্ত আসল লোকটিকে পেয়ে গেলাম। এডিটর সাহেব বলেছিলেন, দরকার পরিশ্রম আর ধৈর্য। হুঁ হুঁ, কে বলে এগুলো আমার নেই?

ধারাল চোখ দুটি সেভেন্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার দিকে রেখে এক্স-ক্যাপ্টেন বললেন, 'হ্যাঁ, আমি মনে করি, দিলীপের দোষেই বোম্বের কাছে বেঙ্গল এত বাজে ভাবে হেরেছে।'

আট নম্বরের একসারসাইজ বুক খুলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কারণগুলো জানাবেন, প্লিজ?'

— 'ওহ্ সিওর। ফার্স্ট অফ অল দিলীপের টসে জেতা উচিত হয়নি। গাভাসকার টসে জিতলে ব্যাটিং নিত। সবই স্টার আর টাইমিং-এর ব্যাপার। আগে ব্যাট করলে বোম্বে হয়ত ৬৫২ করতে পারত না। আর পরে ব্যাট করলে বেঙ্গল হয়ত ২৫২ রানে শেষ হয়ে যেত না।'

— 'ফাইন। তারপর?'

— 'সেকেন্ডলি টিম যখন গভীর বিপর্যয়ে, ক্যাপ্টেন হিসাবে দিলীপের অনেক বেশি রান করা উচিত ছিল। প্রচণ্ড ক্রুশিয়াল মোমেন্ট আমি একবার নাইনটি নাইন করেছিলুম।'

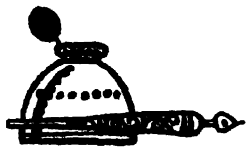
'মনে আছে। আর কিছু!'

— 'সিওর। এমন একটা ভাইটাল ম্যাচে দিলীপের আঙুলে চোট পাওয়া উচিত হয়নি। চোট থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখাও ক্রিকেটারের কাজ। বিশেষ করে ক্যাপ্টেনের। আমি তো ব্যাপারটা সব সময়ে মাথায় রাখতাম।'

— 'ফ্যানটাসটিক। এমন অন্তরঙ্গ ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ।'

— 'দাঁড়ান, আরও একটা পয়েন্ট বাকি আছে। ক্যাপ্টেনের প্রথম এবং প্রধান কাজ আম্পায়ারদের গুড হিউমারে রাখা, প্রয়োজনে ম্যানেজ করা। সবাই তো গাভাসকার নয় যে কঠিন চোখে তাকালেই আম্পায়ার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। দিলীপ আম্পায়ার ম্যানেজের ব্যাপারে নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। অথচ মনে করে দেখুন, আমি ক্যাপ্টেন থাকার সময় একবার ইস্ট জোনের একটা উইক সাইডকে বেঙ্গল হারিয়েছিল স্রেফ আম্পায়ারের সাহায্যে।'

৫



খেলায় একটি নতুন বিভাগ চালু করার প্রস্তাব রাখতেই, বদমেজাজি এডিটর সাহেব বললেন, 'আপনার মাথায় দারুণ আইডিয়া এসেছে মনে হচ্ছে।'

— 'দারুণ আইডিয়া আমার মাথায় আকছারই আসে। আপনারা নেন না, এই যা।'

এডিটর সাহেব খসখস লিখে চলেছেন। কী সাবজেক্ট, জানি না। ঐ হাতের লেখা উনি নিজেই পড়তে পারেন না। এক পৃষ্ঠা থেকে অন্য পৃষ্ঠায় যাওয়ার ফাঁকে বললেন, 'বলে ফেলুন, বলে ফেলুন।' বলার ভঙ্গিতে মনে হল— 'কেটে পড়ুন! কেটে পড়ুন!'

আমার প্রস্তাব সত্যিই দারুণ। খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত যে কোনও বিষয়ে পাঠক-পাঠিকা প্রশ্ন পাঠাবেন। জবাব দেবেন সেই বিশেষ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। ফিচারটা জমতে বাধ্য।

এডিটর সাহেব পাইপ বার করতে করতে বললেন, 'স্কিম দিন।'

স্কিম! স্কিম! প্রায় উড়ে নিজের সিটে এলাম। এই প্রথম আমার কোনও প্রস্তাব সিরিয়াসলি নেওয়া হল।

কিছু প্রশ্ন এবং জবাব এডিটর সাহেবের কাছে পেশ করলাম!

প্রশ্ন ১ ।। কাঁচরাপাড়া থেকে মোহন ও রতন চট্টরাজ। টেলিভিশনে ক্রীড়া ভাষ্যকার হতে গেলে কী করা দরকার?

উত্তর দিচ্ছেন এক বিখ্যাত ভাষ্যকার : সবার আগে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভের সঙ্গে লাইন করা দরকার। টালিগঞ্জে যাওয়া সহজ কাজ নয়। তবু সপ্তাহে অন্তত দু'বার যেতে হবে। সঙ্গে অন্তত তিন লিটারের একটা তেলের টিন থাকা দরকার। প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ যে সবার চেয়ে বেশি খেলা বোঝেন, সেটা প্রথমেই বলে নিতে হবে; তারপর যে যার নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈলনিষেক করবেন। সপ্তাহে তিনদিন টেলিফোনও করতে হবে। তখন, অন্তত এগারবার 'হেঁ হেঁ' করতে হবে। একটু বিজ্ঞ ভঙ্গিতে 'হুঁ হুঁ'ও করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ২ ।। শিলিগুড়ি থেকে মৌটুসী হাজরা। আমি আকাশবাণীর ধারাভাষ্যকার হতে

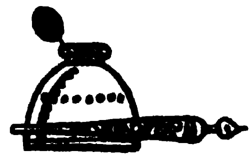
চাই; কী করতে হবে?

উত্তর দিচ্ছেন এক অতিশ্রুত ধারাভাষ্যকার : একটু জিভের দোষ থাকা জরুরি। উচ্চারণে কিঞ্চিৎ ব্যথা থাকা চাই। খেলা সম্পর্কে জ্ঞান যৎসামান্য থাকাই ভাল। না থাকলে, আরও ভাল। এখানেও প্রোগ্রাম একজিকিউটিভকে তৈলদান করতে হবে, তবে একটু হালকা ভাবে। এক লিটারের টিন নিলেই চলবে।

প্রশ্ন ৩ ।। পাইকপাড়া থেকে অবধূত বড়াল। এখন খেলার পত্রিকার খুব কাটতি। আমার হাতে কিছু পয়সা এবং একটা প্রেস আছে। সম্পাদক হতে চাই। কী কী করতে হবে?

উত্তর দিচ্ছেন এক উদ্যমী সম্পাদক : চেয়ার টেবিল কালি কলম কাঁচি গঁদ নিয়ে প্রেসেই বসে যান। তিন বড় ক্লাবের ক্যান্টিনের সামনে রোজ বিকেলে আধঘণ্টা করে দাঁড়ান। প্রচুর এক্সক্লুসিভ স্টোরি পাবেন। যার যার বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত রাগ আছে, মিটিয়ে নিন, কাগজ উঠে গেলে আর চান্স পাবেন না। যার তার নামে, বিশেষ করে অবাঙালি প্লেয়ারদের নামে মিথ্যা লেখা ছেপে দিন। ওরা জানতেও পারবে না। আর হ্যাঁ, রাতারাতি একটু গম্ভীর হয়ে যেতে হবে।

৬



আমাদের পত্রিকার সবজান্তা রিপোর্টাররা আমাকে পাত্তা দেয় না। এবং এ ব্যাপারে তাদের মদত দেন স্বয়ং এডিটর সাহেব। আমি অবশ্য বলতে চাই না যে এর একমাত্র কারণ— তিনি নিজেই সবচেয়ে বড় সবজান্তা। ওসব কথা থাক। নিজের ভাল পাগলেও বোঝে, চাকরির মায়া আমারও আছে।

নিজের অফিসে বন্ধু না থাকায় আমাকে অন্য পত্রিকার লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হয়েছে। সেজন্য, মানে, সেই বন্ধুত্বের চাষ করার জন্য আমাকে যদি রোজ বাড়তি দেড় প্যাকেট সিগারেট কিনতে হয়, কী করা যাবে?

রিপোর্টার বন্ধুদের কাছ থেকে আমি নানা বিষয়ে তালিমও নিয়ে রাখছি। পরে যদি সুযোগ পাই, নামকরা জার্নালিস্ট হতে হবে তো!

গত রবিবার সকালে এইরকমই এক নামকরা রিপোর্টার বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ছুটির দিন সকালে আমাকে দেখে তিনি, কী আশ্চর্য, খুশি হলেন। আসলে, আমার মতো অনুগত শ্রোতা সবারই পছন্দ।

দেখলাম, লেখার প্যাডে তিনি এক দুই তিন চার করে কীসব যেন লিখছেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি খুব ব্যস্ত নাকি, ফ্রেন্ড?'

ফ্রেন্ড মুখে প্রায় ভিলেনের হাসি ফুটিয়ে বলল, 'না, মানে ইয়ে, একটু অ্যাডভান্স রিপোর্টিং করে রাখছি।'

— 'তার মানে?'

— 'মানে, ফুটবলের প্রায় সব ম্যাচইতো আমাকে কভার করতে হবে। পাড়ার রবারের বলের টুর্নামেন্টে একবার টপ স্কোরার হয়েছিলাম; সেই সূত্রে আমিই আমাদের কাগজের এক নম্বর ফুটবল করেসপন্ডেন্ট!'

'কিন্তু ঐ অ্যাডভান্স রিপোর্টিং ব্যাপারটা কীরকম?'

রিপোর্টার বন্ধু এবার করুণার হাসি হাসল। মনে মনে তৈরি হয়ে নিল একটি দীর্ঘ ভাষণের জন্য। আমিও প্রস্তুত।

— 'আজ মোহনবাগান ম্যাচগুলোর খসড়া করে রাখছি। কয়েকরকম লিখে রাখছি,

এক-একদিন এক-একটা লাগাব। টিম আর গোলগেটারদের নাম অবশ্য ম্যাচের পরই লিখতে হবে।'

'ম্যাচের আগেই ম্যাচ রিপোর্ট?'

'একজাক্টলি সো। এইতো বেশ বুদ্ধি খুলছে। কীরকম লিখে রাখছি, শোনো।

নমুনা ১ : মোহনবাগান গোল খেয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্যর দোষে। সুব্রতর একটি ব্যাকপাস মোহনবাগানের একজন ডিফেন্ডার ঠিকমত ধরতে না পারায় ছিটকে প্রতিপক্ষ লেফট স্ট্রাইকারের কাছে যায়। মোহনবাগানকে অতঃপর অপ্রত্যাশিত গোলটি হজম করতে হল।

নমুনা ২ : মোহনবাগান গোল খেয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্যর দোষে। এক পয়েন্ট নষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে, মরিয়া সুব্রত শেষ দশ মিনিট আক্রমণে উঠে আসে। ওর দুর্বল শট পোস্টে লেগে মাঝমাঠে ফিরে আসে এবং সেই বল ধরে প্রতিপক্ষ দলের রাইট স্ট্রাইকার গোল করে।

নমুনা ৩ : মোহনবাগান গোল খেয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্যর দোষে। পেনাল্টি বক্সের সামান্য বাইরে প্রতিপক্ষ দলের রাইট উইঙ্গারকে সুব্রত দু'দিকে অনবদ্য ডজ করে। এই ঘটনার একুশ মিনিট পর রাইট উইঙ্গার প্রচণ্ড শটে মোহনবাগানের জালে বল ঢোকায়। এমনিতে এই রাইট উইঙ্গারের পায়ে ভাল শট নেই। সুব্রতর ঔদ্ধত্যই ওকে ক্রুদ্ধ করে। ফলে এই শট, এবং অপ্রত্যাশিত গোল।

নমুনা ৪ : মোহনবাগান গোল খেয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্যর দোষে। প্রথমার্ধে প্রতিপক্ষ দলের দুই স্ট্রাইকারকে সুব্রত নড়তেই দেয়নি। তাই, ওদের কোচ হাফটাইমে নতুন দুজন স্ট্রাইকার নামান। ওদেরই একজনের পাস থেকে আর একজন গোল করে। গোলের ক্ষেত্রে সুব্রতর প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ছিল না। কিন্তু প্রথমার্ধে সুব্রত আগের দুই স্ট্রাইকারকে সম্পূর্ণ রুখে না দিলে, নতুন দুজন আসত না, মোহনবাগানকে গোলও খেতে হত না।

— 'দারুণ, দারুণ! ঐ প্রতিপক্ষ দলের জায়গায় ক্লাবের নামগুলো বসিয়ে নিলেই হবে। লেফট স্ট্রাইকার বা রাইট উইঙ্গার ইত্যাদির জায়গায় নামগুলো বসিয়ে দিলেই হবে। কিন্তু একটা কথা। সুব্রত যদি কোনও দিন না খেলে, সেদিনের রিপোর্টে ওর নাম দেওয়া যাবে না।'

— 'কেন যাবে না। তাহলে এই নাও, নমুনা ৫ : মোহনবাগান গোল খেয়েছে সুব্রত ভট্টাচার্যর দোষে। আজ সুব্রত খেলেনি। ওর এমন কিছু চোট নেই, তবু খেলেনি। গোল হয়েছে উঁচু লব থেকে। সুব্রত থাকলে হেড করে বার করে দিত।'

৭

আমাদের এডিটর আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'সুরু নায়েক নামে একজন ক্রিকেটার আছেন, তা জানেন?'

আমি জবাব দিলাম, 'না জানলে কী ক্ষতি? আপনি কি জানেন যে মজিদ নামে একজন অসাধারণ ফুটবলার আছেন?'

এডিটর সাহেব কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে তামাক ছাড়াই মুখে পাইপ লাগিয়ে আগুন ধরাতে গেলেন। আমি বললাম, 'না না, আমি এত বুদ্ধু নই যে আপনাকে মজিদ বাসকারের কথা জিজ্ঞেস করব। তাছাড়া মজিদ তো ভারতীয় ফুটবলার নয়।'

— 'তবে কার কথা?

— 'জম্মু ও কাশ্মীরের স্ট্রাইকার মজিদ। জানেন, এই মজিদ ভারতের ২৯ জন জাতীয় ফুটবলারের একজন, এখন বাঙ্গালোরে ক্যাম্পে আছেন। ভাবছি, সুযোগ পেলে মজিদের একটা ইন্টারভিউ নেব। এর আগে কোনও কাগজে বেরয়নি।'

এডিটর সাহেব এবার খোলে তামাক ভরলেন। সপ্তম দেশলাই কাঠিটিও ব্যর্থ হবার পর, একটু জিরিয়ে নিয়ে বললেন: 'আপনাকে বাঙ্গালোরে পাঠানোর কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের মজিদ ছাড়া অন্য একজনকেও ইন্টারভিউ করতে হবে। ক্রিকেটার।'

— 'সুরু নায়েক।'

— 'না না। সুনীল গাভাসকার। আমাদের একজন রিপোর্টার ছুটিতে আছেন। আর এক জন রিপোর্টার ফেডারেশন কাপ কভার করতে কোজিকোড় গেছেন। তৃতীয় জন, মানে যিনি আমাদের কাগজের হাঙ্গামা বিশেষজ্ঞ, কলকাতার হকি লিগ কভার করছেন। চতুর্থ জন—

সুনীল গাভাসকারের সঙ্গে আলাপ ছিল না। নার্ভাস হয়ে গিয়ে সাত নম্বর প্রশ্নটা প্রথমে করে ফেললাম: 'সুরু নায়েককে ইন্ডিয়া টিমে নেওয়া হল কেন?'

স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে দিয়ে গাভাসকার জবাব দিলেন, 'এ প্রসঙ্গে গোলাম পার্কার আর রণধীর সিংয়ের নামও করে ফেলতে পারতেন। এই তিনজনকে নেওয়া হয়েছে আমার

আর ভিশির মানসিক অবস্থা ঠিক রাখার জন্য। ট্যুর সিলেকশন কমিটিতে আছি আমি, ভিশি আর ম্যানেজার রাজ সিং। ষোলজনের মধ্যে কোন পাঁচজনকে টেস্টে টিম থেকে বাদ দেব, এই চিন্তায় আমার আর ভিশির কনসেনট্রেশন নষ্ট হতে পারত। কিন্তু যেহেতু এই তিনজনের এবং যাদবের টেস্টে খেলার কোনও চান্স নেই, আমাদের মাত্র একজনকে বাদ দেওয়ার ডিসিশন নিতে হবে। মানে চিন্তা একেবারে কম হয়ে গেল।'

— 'শিবলাল যাদবকে কেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?'

— 'এই প্রশ্নের জবাব দিচ্ছি, কিন্তু প্লিজ, এর সঙ্গে লেজুড় প্রশ্নটা করবেন না। শিবলাল ইংল্যান্ড যাচ্ছে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। আর কতকাল শিবলাল শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের স্টেজে থাকবেন— এই লেজুড় প্রশ্নটা করবেন না, প্লিজ।'

— 'একজনকে তো বাদ দিতেই হবে। কাকে বাদ দেবেন?'

— 'সন্দীপ আর অশোকের মধ্যে অন্তত একজন জঘন্য ফর্মে থাকবে, এই বিশ্বাস আমাদের আছে।'

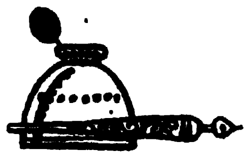
— 'এই সিরিজে কোনওরকম পরীক্ষানিরীক্ষার ইচ্ছাই আপনার নেই?'

— 'নিশ্চয় আছে। খোদ লর্ডসে ঘণ্টায় পাঁচ ওভার বোলিং করানোর চেষ্টা করব। স্কোয়ার লেগ থেকে কপিলকে দিয়ে লেগ বিফোর উইকেটের অ্যাপীল করাব। আর বিষে বিষে বিষক্ষয়, মানে ক্রিস ট্যাভারের বিরুদ্ধে মদনকে দিয়ে নেগেটিভ বোলিং করাব।'

— 'আপনি কি টসে হারার বিশ্বরেকর্ড গড়তে চান?'

— 'টসে হারা খুবই স্বাস্থ্যকর জিনিস। অনেক প্র্যাকটিস করতে হয়েছে এজন্য। টসে জিতলেই ডিসিশন নিতে হয়। চমৎকার পিচে প্রথমে ব্যাট করে অল্প রানে আউট হলেও রয়টারের ডিকি রত্নাগর আমাকে দায়ী করবেন। ভিজে পিচে ইংল্যান্ডকে ব্যাট করতে দেওয়ার পর ওরা কোনওরকমে ভাল রান করে দিলেই রাজন বালা আমাকে গালাগালি দেওয়ার জন্য ডেকান হেরাল্ডের অন্তত একুশ লাইন খরচ করবেন। টসে হারার জন্য সমালোচনা এখনও করা হয় না। কে জানে, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের কে আর ভাদোয়ানি এবার সেটাও শুরু করে দিতে পারেন।'

৮



হুঁ বাবা, 'কঠিন শ্রমের এই তো পুরস্কার!' খুব ছোটবেলায় পড়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত গোলমেলে এডিটর সাহেবেরও মন গলল। লাস্ট ইস্যু সাড়ে তিন হাজার কপি বেশি বিক্রি হওয়ায় তাঁর মেজাজ কী আশ্চর্য, প্রসন্ন ছিল। খেলার বিশ্বস্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমন অ্যাবনরমাল মেজাজ তাঁর থাকে বছরে মাত্র আড়াই বার।

ঘরে ঢুকে দেখি তিনি সাড়ম্বরে পাইপে আগুন দেওয়ার চেষ্টা করছেন। খুবই দুর্বল মুহূর্ত, যাকে বলে সাইকোলজিকাল মোমেন্ট। বসতে বসতেই জিজ্ঞেস করে ফেললাম, 'কোনও নতুন অ্যাসাইনমেন্ট দেবেন নাকি?'

কী আশ্চর্য, পাইপটা স্মুথ্‌লি ধরে গেল। ঠোঁটের এক কোণে জ্বলন্ত পাইপ এবং অন্য কোণে মৃদু হাসি রেখে পাল্টা জিজ্ঞেস করলেন, 'আর একবার বাঙ্গালোর যাবেন?'

যেন জ্যৈষ্ঠের ঠা ঠা রোদ্দুরে কাউকে প্রশ্ন করা হল, 'র‍্যালির শরবত খাবেন?' অথবা যেন অচ্যুত ব্যানার্জিকে জিজ্ঞেস করা হল ইন্ডিয়ার কোচ হবেন?'

বললেন, ব্যাপারটা বুঝে নিন। ডেটমার ফিফার বাঙ্গালোর পৌঁছে গেছেন। ফেডারেশন কাপ শেষ হওয়ার পর ইন্ডিয়া টিম সম্পর্কে তাঁর কী মনে হচ্ছে প্রথম ডেসপ্যাচে সেটাই পাঠাবেন। দ্বিতীয় ডেসপ্যাচে জানাবেন— না থাক। আপনি আবার একে ওকে বলে ফেলবেন। যাওয়ার ঠিক আগে আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন।'

প্রথম ডেসপ্যাচ

বাঃ সাঃ : ফিফার সাহেব, আপনি কলকাতায় নেহরু গোল্ড কাপে ভারতের খেলা দেখেছেন। ফেডারেশন কাপে অনেকের খেলা দেখলেন। ভারতীয় দলের কম্পোজিশন নিয়ে আপনার মতামত এখন জানতে পারি?

ফিফার : ঝেড়ে কাশুন। আই মিন, ডেফিনিট প্রশ্ন করুন।

বাঃ সাঃ : একথা নিশ্চয় আপনি স্বীকার করেন যে ভারতীয় দলের গোলকিপার হিসাবে ভাস্কর গাঙ্গুলি ছাড়া আর কারও কথাই চিন্তা করা যায় না?

ফিফার : কেন চিন্তা করা যাবে না? ফেডারেশন কাপে ব্রহ্মানন্দর খেলা দেখেছেন? শুনেছি গোয়া দারুণ জায়গা। ব্রহ্মানন্দও দারুণ গোলকিপার। আমার তো মনে হয়, ওকেই

ইন্ডিয়া টিমের এক নম্বর গোলকিপার করা উচিত। মডার্ন ফুটবলে হাইট....যাক গে, নেক্সট কোয়েশ্চেন।

বাঃ সাঃ : অন্যতম স্টপার হিসাবে সুব্রত ভট্টাচার্যকে কি আপনি সত্যিই চাইছিলেন?

ফিফার : নাহলে লিস্টে নাম রাখতে যাব কেন? ইন ফ্যাক্ট সুব্রত আর গোয়ার রেবেলোকেই এখন ইন্ডিয়ার সেরা স্টপার মনে হচ্ছে। রেবেলোও এবার ফেডারেশন কাপে ফ্যান্টাস্টিক খেলল, তাই না?

বাঃ সাঃ : আমি দেখিনি। সাইড ব্যাক হিসেবে শ্যামল-অলোক (ব. কম্পটন) ছাড়া অন্য কারও কথা নিশ্চয় ভাবছেন না?

ফিফার : মোহনবাগানের ইয়ং সাইড ব্যাক দুটো বেশ খেলল কোজিকোড়ে। ওদের মধ্যে একজনের বেশি অবশ্য টিমে আসবে না, কারণ পেম দোরজিঁকে ডেফিনিটলি টিমে রাখা উচিত।

বাঃ সাঃ : মাঝপথে প্রসূন-প্রশান্ত-মিহিরের খেলায় আমরা মুগ্ধ। আপনি?

ফিফার : আমার তো মনে হয়, রঞ্জিত থাপাই ইন্ডিয়ার বেস্ট মিডফিল্ডার। শুনেছি গৌতম সরকার প্রচণ্ড ফাইটার। ওকেও ফার্স্ট টিমে চাই। জে সি টি-র পারমিন্দারের খেলাও বেশ লাগল। এই তিনজন মাঝমাঠে থাকলে ভাল হয়।

বাঃ সাঃ : ফরোয়ার্ড লাইনে কাদের উপযুক্ত মনে করছেন?

ফিফার : দুই উইঙ্গার সুরজিৎ সেনগুপ্ত আর নরেন্দ্র গুরুং। এখনও বুঝলেন কি না স্কিমের বিকল্প নেই। স্ট্রাইকার হিসাবে ফ্রান্সিস ডিসুজা ছাড়া আর কারও কথা ভাবতেই পারছি না।

বাঃ সাঃ : মিঃ ফিফার, আপনি যে ফার্স্ট টিমের নাম বললেন, তার মধ্যে একজনও নেহরু গোল্ড কাপে ভারতের হয়ে খেলেনি। তাহলে কি আপনি...

ফিফার : আর প্রশ্ন নয়। জানেনই তো, এ আই এফ এফ-এর সঙ্গে আমার চুক্তি আছে, টিম সিলেকশন নিয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারব না।

৯

চারপাশে দেখছি তো, স্পোর্টস জার্নালিস্টদেরও এখন প্রচুর গ্ল্যামার। আমাদের এডিটর সাহেবের মতো তারপরই একটু ভারিক্কি চালে চলতে পারলে তো কথাই নেই। প্রেসিডেন্ট বা চিফ গেস্ট হওয়ার অনুরোধ সপ্তাহে তাঁর কাছে আসে অন্তত সাড়ে এগার বার। এবং প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই আগে তারিখ জেনে নিয়ে তিনি দুঃখ দুঃখ মুখ করে বলেন, 'ইস! ঐ তারিখে তো আমি দুর্গাপুর যাচ্ছি (বা দিল্লি বা মাদ্রাজ বা জলপাইগুড়ি বা যা খুশি) না হলে নিশ্চয় যেতাম।'

— 'ইয়ে, মানে, আপনার কাছে নিশ্চয় বেশি আমতা আমতা করে কাজ করতে হবে না। আপনাকে একটু প্রেসিডেন্ট হতে হবে।'

এডিটর সাহেবের কায়দায় আগেভাগেই তারিখটা জেনে নেওয়ার জন্য আলতোভাবে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে?'

— 'এই রোববার।'

— 'এই রোববার তো আমি'— না, সেন্টেন্সটা শেষ করলাম না। এডিটরের কাজ এডিটর করেছে.... তাই বলে প্রেসিডেন্ট হতে রিফিউজ করা কি আমার শোভা পায়?

জিজ্ঞেস করলাম, 'কীসের প্রেসিডেন্ট? কী ব্যাপার?'

পাড়ার ক্রিকেটার বলল, 'আপনি খবর রাখেন কিনা জানি না। আমি কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনের ক্লাব ক্রিকেটার, লাস্ট ইয়ার সিজনে একত্রিশটা উইকেট পেয়েছিলাম। সি এ বি সামার ক্রিকেট করছে। তার আগে আমাদের একুশ জনকে একই ভাষায় চিঠি দিয়ে জানিয়েছে, 'আপনার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে তিনজন প্রাক্তন তারকাকে নিয়ে একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়েছে, যে কমিটি ছোঁড়া বোলারদের অ্যাকশন স্টাডি করে রিপোর্ট দেবে। এই খবরটির গোপনীয়তা আশা করি রক্ষা করবেন।'

মিটিং বিকেল পাঁচটায়। সোওয়া দুটোয় নির্দিষ্ট টেন্টে পৌঁছে দেখি, কেউ আসেনি। চাকাররা যে এত ইনসিনসিয়ার তা জানতাম না। অবশ্য পৌনে পাঁচটার মধ্যে সবাই এসে গেল। সবাই নয়। একজন সিনিয়র চাকার নর্থ ক্যালকাটায় প্রত্যেক রোববার বিকেলে বাচ্চাদের কারেক্ট চাকিং শেখানোর ক্যাম্প খুলেছে, তাই আসতে পারেনি।

এক নম্বর চাকার মুখ খুলল : 'চাকিং নিয়ে কমিটি করে আমাদের অপমান করা হচ্ছে। এত বছর ধরে ছুঁড়ছি, কমিটি করে আমাদের ছোঁড়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করার অধিকার সি এ বি-কে কে দিল?'

অতঃপর দুই নম্বর চাকার : 'আমি স্রেফ ছুঁড়েই বেঙ্গল টিমে ঢোকার মতো পারফরমেন্স করে ফেলেছি। স্বভাবতই আমাকে বেঙ্গল টিমে নেওয়া হয়নি। তবু আমি কোনও বাংলা স্পোর্টস ম্যাগাজিনে বিক্ষুব্ধ-মার্কা ইন্টারভিউ দিইনি। তবু আমাকে নিয়ে সি এ বি টানাটানি করবে কেন?'

তৃতীয় চাকার : 'আমাকে প্রতি বছরই প্রচুর 'নো' ডাকা হয়। ডাক, যত পারিস ডাক। কায়দা আছে না? এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি কলকাতার আম্পায়াররা পর পর দুটো বলে 'নো' ডাকে না। তাই একটা ছোঁড়া বল নো ডাকলেই পরেরটা ইনভেরিয়েবলি ছুঁড়ি। হ্যাঁ, বলটা উইকেটে রাখলেই উইকেট চলে আসে। বেঙ্গলের বাছা বাছা ব্যাটসম্যানদের ঘোল খাইয়ে ছেড়েছি। কিন্তু সি এ বি হঠাৎ চাকিং নিয়ে ব্যস্ত হল কেন? আমাদের কিছু একটা করা দরকার।'

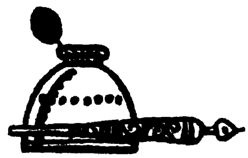
চতুর্থ চাকার : 'বন্ধুগণ, সি এ বি আমাদের মারতে চায় না। তাই আগেভাগেই আমরা জেনে গেছি, চাকিং বোঝার জন্য কমিটি হয়েছে। এই সামার ক্রিকেটে, সুতরাং, আমরা কেউই ছুঁড়ব না। এ তো কোনও ট্রফি নয়। এখানে উইকেট না পেলেও ক্ষতি নেই।

পঞ্চম চাকার : 'বন্ধুগণ, আপনারা কেউই আসল সমস্যাটা বুঝতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের মধ্যে কার কতটা ক্ষতি হল সেটা বড় কথা নয়। আসল কথা, বাংলা থেকে চাকিং নামে বিরাট আর্টটিকে নির্মূল করার একটা অপচক্রান্ত চলছে।'

আমি এই একবারই মুখ খুললাম : 'অপচক্রান্ত?'

পঞ্চম চাকার বলে চললেন, হ্যাঁ, চক্রান্তের ডেপ্থ বোঝানোর জন্য 'অপ' লাগিয়ে দিলাম। প্রেসিডেন্ট হওয়ার চান্স দেওয়া হয়েছে বলে ডিসটার্ব করার চেষ্টা করবেন না। এই অপচক্রান্তর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। বাংলার ঘরে ঘরে চাকার গড়ে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। চাকারের চাকা গড়িয়ে চলুক।

১০



দু-বার বাঙ্গালোর ট্যুর করে এবং একটি সভায় সভাপতিত্ব করে আমার পায়া যে সম্প্রতি কিছু ভারি হয়েছে, তা অস্বীকার করলে মিথ্যাচার করা হবে, যা আমি আকছারই করে থাকি।

সোমবার এডিটর সাহেব ডাকতেই তাই বেশ গটমট করে হেঁটে গেলাম। বাংলা চটিতে যতখানি গটমট সম্ভব আর কি। প্রচণ্ড কাশি, তাই পাইপ আপাতত বন্ধ। তাই দুই ঠোঁটের ফাঁকে ডট-পেন চেপে ধরে উচ্চারণে অভিজাত কায়দায় যথাসম্ভব অস্পষ্ট হলেন : 'আপনার বাঙ্গালোরের দুটো ডেসপ্যাচই রাবিশ।' বলেই, কেন যেন, আমার পায়ের দিকে তাকালেন। পায়ার ওজনটা তাঁর কথা শুনেই দরকারমত কমে গেল কিনা সেটাই দেখতে চাইলেন হয়ত! বললেন, 'তবু, কী দুঃখ, আপনাকেই আর-একবার বাইরে পাঠাতে হচ্ছে। দিল্লি গিয়ে একজন সেন্ট্রাল মিনিস্টারকে মিট করতে হবে। সেজন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। সেজন্য ধৈর্য চাই। বুদ্ধিমানদের ধৈর্য থাকে না। আপনার ধৈর্য আছে। সেজনা আপনাকেই......।'

বাউন্সারে হুক করার লোক আমি নই। ন্যাস্টি বাউন্সারটি কানের পাশ দিয়ে পাস করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে? কোন মন্ত্রীকে?'

পাইপে, মানে ডট-পেনে আলতো কামড় মেরে এডিটর সাহেব বললেন, 'গত আড়াই মাসের রেকর্ড ঘেঁটে দেখা গেল বিবৃতি দেওয়ার ব্যাপারে এখন তিন সিং টপ যাচ্ছেন— ইংল্যান্ড সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার রাজ সিং, এশিয়ান গেমস সংগঠন কমিটির চেয়ারম্যান বুটা সিং এবং ভারতীয় হকি দলের কোচ বলবীর সিং। হিসেব কষে দেখা গেল, বুটা সিংই সবার ওপরে। আনফরচুনেটলি বুটা সিং ইজ আ সেন্ট্রাল মিনিস্টার। তাই বুদ্ধি নয়, ধৈর্য চাই। আপনি পারবেন। শুধু জেনে আসতে হবে, রোজ একটা করে বিবৃতি বুটা সিং কী করে ম্যানেজ করছেন?'

ঈশ্বর নিশ্চয় মূর্খদের ভালবাসেন। নাহলে দিল্লিতে কাজটা এত সহজ হয়ে যাবে কেন? আমার এক বন্ধু ইলেকশন কমিশনে কাজ করে। ঐ বন্ধুর এক বন্ধুর কনট প্লেসে কিউরিও শপ আছে। এবং আমার বন্ধুর ঐ বন্ধুর এক বন্ধু, বুটা সিংয়ের কনফিডেনশিয়াল

ক্লার্কের বন্ধু। খোদ কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক সাহেবের দেখা পেয়ে গেলাম সাড়ে পাঁচ দিনের মাথায়। আমার প্রশ্ন শুনে একটা বার-বাই-দশ মাপের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'এইখানেই সব আছে, দেখে নিন। আমি ততক্ষণে অন্য কাজ করছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা এই যে নাইনটিষ্থ নভেম্বর, মানে এশিয়ান গেমস শুরুর দিন পর্যন্ত ডেট বাই ডেট একটা করে প্রেস স্টেটমেন্ট তৈরি করা আছে। আমরা রোজ দুপুরে ডেট মিলিয়ে এজেন্সি অফিসে পাঠিয়ে দিই।'

কনফিডেনশিয়াল ক্লার্ক সাহেব এ জি-সাতশ চুয়ান্ন নম্বর ফাইলে ডুবে গেলেন। আমি ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য ডেট বাই ডেট প্রেস স্টেটমেন্টগুলো পড়ে গেলাম।

আমাকে বেশি জায়গা দেওয়া হয় না, তাই কয়েকটা স্যাম্পলই শোনাতে পারি।

৭ জুলাই, : 'মেইন স্টেডিয়ামের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সুইমিং পুলের কাজও শেষ। কিছু ছোটখাটো কাজ বাকি।'

৫ আগস্ট, : 'মেইন স্টেডিয়ামের কাজ শেষ। সুইমিং পুলের ইলেকট্রিক্যাল কাজও হয়ে গেছে। সিন্ডার ট্রাকের কোয়ালিটি দেখে রাশিয়ান এক্সপার্টরা খুশি হয়েছেন।'

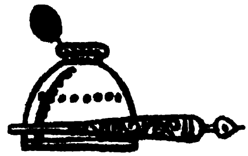
২৯ আগস্ট, : 'সুরিন্দর সিং সোধিকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করি। ক্যাম্পের শৃঙ্খলারক্ষার জন্য এটা জরুরি ছিল। নতুন অধিনায়ক গুরমেল সিংয়ের জন্য দেশবাসীর শুভেচ্ছা থাকা উচিত।'

৫ সেপ্টেম্বর, : 'দিল্লি এশিয়াডে ৩৪৫৭ জন সাংবাদিক এবং ১৯৬৫ জন ফটোগ্রাফার আসছেন। সবার জন্যই থাকার উত্তম ব্যবস্থা হয়েছে। মানে, হোটেলওয়ালারা করে রেখেছেন। টেলেক্সের ব্যবস্থা কতখানি ভাল করা যাবে বলা যাচ্ছে না। আর সবই ঠিক আছে।'

১১ অক্টোবর, : 'গুরমেল সিংকে বাদ দেবার সিদ্ধান্ত আমি সমর্থন করি। শৃঙ্খলারক্ষার জন্য এটা জরুরি ছিল। নতুন অধিনায়ক রাজিন্দার সিংকে দেশবাসী নিশ্চয় শুভেচ্ছা জানাবেন।'

১ নভেম্বর, : 'এশিয়াড শুরু হওয়ার আঠার দিন আগে আমাকে চলে যেতে হচ্ছে। এজন্য কোনও দুঃখ নেই। আমাদের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি আমার সম্পূর্ণ আনুগত্য আছে। উদীয়মান সূর্য নতুন চেয়ারম্যান রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে এশিয়াড নিশ্চয় সাফল্যমণ্ডিত হবে।'

১১



আমার বহুদিনের ইচ্ছা ডেইলি নিউজপেপারে কাজ করব। এই যে আমি একটা পিরিয়ডিকালে কাজ করি, এজন্য আমাকে কম অপমান সহ্য করতে হয় না। কিছু খরচপত্র করে কিছু স্পোর্টস রিপোর্টার বন্ধু জোগাড় করেছি। আমার পয়সায় টোস্ট-চা-সিগারেট খেয়ে তারা সকলেই সন্ধের ঝোঁকে বলে ওঠে, 'এবার তাহলে উঠি, তোমার কী মজা, সন্ধেবেলায় কাজ নেই।'

ঐভাবে বলা হলেও, কথাগুলোর মধ্যে একটা খোঁচা থাকে— সন্ধেবেলায় কাজ না থাকলে, ডেইলি পেপারে কাজ না করলে, সে আবার রিপোর্টার! বিভিন্ন ডেইলি পেপারে যে কী বিপুল ট্যাঁড়সের প্রদর্শনী, সেকথা কে মুখের ওপর বলে?

গতকাল একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম। তাতে দেখা গেল, আমি একটা ডেইলি পেপারের স্পোর্টস রিপোর্টার হয়েছি। স্পোর্টস এডিটরের চেয়ারে যাঁকে দেখলাম, তাঁর মুখটা হাফ-চেনা। ঘুমের মধ্যে দেখেছি তো ঠিক মিলিয়ে নিতে পারিনি।

বেশ ঠোঁট বেঁকিয়ে তিনি বললেন, 'দেখুন বাবুবাবু, আমরা একেবারে ঘোড়ার মুখের সব খবর দেব। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থেই। এপসম ডার্বি রেসের আগে ফেবারিট ঘোড়াদের এবং পরে সাক্সেসফুল ঘোড়াদের ইন্টারভিউ ছাপা হবে।

এক্সপার্টের ব্যাপারে আমরা ডেফিনিটলি সব কাগজকে টেক্কা মারব। এতদিন এই পথে টোটালি আসার ব্যাপারে ডিসাইড করতে পারিনি। দিনকাল পাল্টে গেছে। এখন সব লাইনের বেস্ট এক্সপার্ট চাই। দেখুন, কিছু ডামি করে রেখেছি। এক্সপার্টের ছড়াছড়ি দেখে চমকে যাবেন। এই চমকটাই রোজ সকালে পাঠকদের উপহার দিতে চাই।

ডামি এক : উইম্বলডনের সেন্টার কোর্ট থেকে লিখছেন জন ম্যাকেনরো : 'ভাল লাগছে না। আমার ভাল লাগছে না। বিয়র্ন বর্গ ছাড়া উইম্বলডন খেলার কোনও মানে হয় না। হারলে লোকে ছি ছি করবে, জিতলে বলবে, এবারের ফর্মে আর বর্গকে হারাতে হত না। ... (এইভাবে আরও ৪৩৩ শব্দ)।'

ডামি দুই : সেভিল থেকে পেলে : 'আজ নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে জিকো অনবদ্য

সিজারিয়ান ভলিতে গোল করল। এমন সিজারিয়ান ভলি আমি মারতে পারতাম না। জিকো দ্বিতীয় গোল করে দশ গজ দূর থেকে মাথা ঠাণ্ডা রেখে। আমার মাথা এত ঠাণ্ডা ছিল না। ব্রাজিলের চতুর্থ গোল করে সেরগিনহো, জিকোর নিখুঁত ব্যাকপাস থেকে। এমন নিখুঁত ব্যাকপাস আমি ...... না, এটা বোধহয় পারতাম। ......'(এর পর আরও ৩৯২ শব্দ)।'

ডামি তিন : 'এডিলেডের কমিটি রুম থেকে ডন ব্র্যাডম্যান : এখন আর সারা দিন ধরে খেলা দেখতে পারি না। তাই গাওয়ারের ইনিংস মাত্র পনের মিনিট দেখেছি। আহা, এমন সেঞ্চুরি এডিলেডে দেখেছি বড় জোর সাতষট্টিবার। টমসনের ওয়াইড বলটাকে গাওয়ার যেভাবে কভারড্রাইভ করল, তেমনটি আমি জীবনে দেখিনি।...... (এরপর আরও ৫২১ শব্দ)।'

গ্যারি সোবার্সের সংযোজন : 'ডেভিড গাওয়ার ওর জীবনের এবং সম্ভবত টেস্ট ক্রিকেটের নিকৃষ্ট শতরানটি করল আজ এডিলেডে। অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ডাররা অন্তত পাঁচবার ওকে জীবন দিয়েছে। শেষের ৩৫ রান গাওয়ার অবশ্য নির্ভুলভাবেই পেয়েছে। ...... (এরপর আরও ১০৬ শব্দ)।'

রিচি বেনোর সংযোজন : 'আমি ডনের সঙ্গে একমত।'

লেন হাটনের সংযোজন : 'আমি গ্যারির সঙ্গে একমত।'

নিল হার্ভের সংযোজন : 'আমি রিচির সঙ্গে একমত।'

টনি গ্রেগের সংযোজন : 'আমি লেনের সঙ্গে একমত।'

ইয়ান চ্যাপেলের সংযোজন : 'আমি হার্ভের সঙ্গে একমত।'

ববি সিম্পসনের সংযোজন : 'আমি টনির সঙ্গে একমত।'

জিম লেকারের সংযোজন : 'আমি ইয়ানের সঙ্গে একমত।'

কিথ স্ট্যাকপোলের সংযোজন : 'আমি ববির সঙ্গে একমত।'

স্পোর্টস এডিটর দম নিচ্ছিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'এত একমত-মার্কা সংযোজন কেন?'

প্রশ্রয়ের হাসি হেসে তিনি জবাব দিলেন, 'জানেনই তো, বিজ্ঞাপনের চাপে জায়গা কত কম। এদিকে যত বেশি পারা যায়, এক্সপার্টের নামও দিতে হবে। আইডিয়াটা কেমন?'

বোকার মতো হেসে, চালাকের মতো মুখ করে বললাম— 'দারুণ।'

১২

অবশেষে ফল পাওয়া গেল। অবশেষে সাড়া পাওয়া গেল। বছরের পর বছর বাংলা ধারাবর্ণনার বিরুদ্ধে আমাদের মতো কিছু হিংসুটে লোক ঘ্যানর ঘ্যানর করার পর, সম্প্রতি নড়েচড়ে বসলেন আকাশবাণীর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, কিছু আনকোরা নতুন তরতাজা কমেন্টেটর তৈরি করা হবে। আকাশবাণীর তরফ থেকে এজন্য একটি কোর্স চালু করা হয়েছে। এক-একদিন এক এক জন অভিজ্ঞ কমেন্টেটর ক্লাস নিচ্ছেন। প্রথম পাঁচদিনের ক্লাসের প্রথম কয়েক মিনিট আমি গিয়ে শুনেছি। কমেন্টেটর হওয়ার জন্য নয়, আকাশবাণীর একটা ভাল কাজের রিপোর্ট করার জন্য।

প্রথম দিনের কমেন্টেটর-টিউটর (ছাত্রছাত্রীদের) প্রতি : তোমরা বোধহয় জানো, আমরা মানে অভিজ্ঞ কমেন্টেটররা এক একজন তোমাদের এক একটা জিনিস শেখাব। আমারটা সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট— অয়েলিং। একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে ঠিকমত অয়েলিং না করতে পারলে বাংলা ধারাভাষ্যকার হওয়া যায় না।

হ্যাঁ, কেউ কেউ হয়ত নিজের যোগ্যতায় চান্স পেয়ে গেল। কিন্তু তাতে কী, ভাল ম্যাচ পেতে হবে না? সো, অয়েলিং ছাড়া গতি নেই। ইন ফ্যাক্ট, আমি বহুদিন অফিসের টিফিন আওয়ারে খিদের মুখে ঝালমুড়ি খেয়েও সন্ধের সময় প্রোগ্রাম একজিকিউটিভকে বিয়ার খাইয়েছি। প্রথম দিকে এসব একটু করতে হয়। পরে ড্রাই অয়েল চালালেও চলে। একটু আমড়াগাছি, মাঝেমাঝে অকারণ টেলিফোনে প্রোগ্রাম একজিকিউটিভের স্বাস্থ্যের খবর নেওয়া— এইসব আর কি। সব শেখাব। ছয় মাসের কোর্স, চিন্তার কিছু নেই।

দ্বিতীয় দিন, দ্বিতীয় কমেন্টেটর : আমি আপনাদের উচ্চারণ শেখাব। এর পরে আমাকে সাহায্য করার জন্য একজন তরুণ ভাষ্যকারও থাকবে। ফুটবলারদের নাম বিকৃতভাবে উচ্চারণ করার ব্যাপারে আমি বহুদিনের স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ। তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত ছোটবেলাতেই নির্ভুল বাংলা উচ্চারণ শিখে নিয়েছ, সেসব ভোলাতে আমাকে একটু বেশি খাটতে হবে। যাকগে, খাটব। কঠোর পরিশ্রমের কোনও বিকল্প নেই।

ভুল উচ্চারণটা খুবই জরুরি। গত তিন বছরে আমি যত ইম্পর্ট্যান্ট ম্যাচের

অ্যাসাইনমেন্ট পেয়েছি, তার লিস্ট দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাপারটা কত ইম্পর্ট্যান্ট। প্রথম দিনই তোমাদের একটা হোম-টাস্ক দিয়ে রাখছি। পরদিন ক্লাসে এসে বলতে হবে— মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল এই দুটো ক্লাবের নাম কত রকমভাবে ভুল উচ্চারণ করা যায়। 'ইস্‌বেঙ্গল' আর 'মোন্‌বাগান' বাদ দিয়ে। ওগুলো অলরেডি চালু আছে।

তৃতীয় দিন তৃতীয় কমেন্টেটর : ভুল টার্ম ইউজ করায় বাংলা কমেন্টারির একটা আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। সবাই জানে পেনাল্টি কিক মানে, স্পট কিক। আমরা কেউ কেউ সব ফ্রিকিককেই 'স্পট কিক' বলি। উইং ব্যাক বল নিয়ে উঠে এলেও বলি 'ওভারল্যাপ' করছেন। এমনিতে বাংলা ভাষার স্ট্রেংথ একটু কম। তাই ধারাভাষ্যকে ইন্টারেস্টিং করে তোলার জন্য এইরকম ভুল টার্ম ইউজ করার একটা বড় ভূমিকা আছে। 'ক্যাটেনোসিও'-কে ক্যাসেনোসিও বারবার বলেও একজন কমেন্টেটর বেশ নতুনত্ব এনেছিলেন। এই রকম ব্যাপার প্রতিনিয়ত ঘটিয়ে যেতে হবে, নাহলে বাংলা ধারাভাষ্যের খ্যাতি ধরে রাখা যাবে না।

চতুর্থ দিন চতুর্থ কমেন্টেটর : আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ চাইছেন বাংলা ধারাভাষ্যে যথাসম্ভব আঞ্চলিকতা আনতে। ভাষা এবং উচ্চারণ দুই দিক দিয়েই ভাবতে হবে।

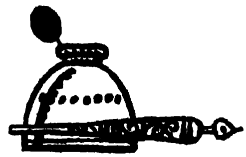
আমি কলকাতার ঘটিদের কিছু নিজস্ব জিনিস ধারাভাষ্যে এনে ফেলেছি। যথা, 'এসেছেন'-কে বলি 'এয়েছেন'। এবার থেকে প্রত্যেককেই নিজের পছন্দমত আঞ্চলিকতা আনতে হবে। ধর, তোমাদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয় কেউ থাকলে 'এসেছেন'-এর বদলে বলবে— 'আইতাসেন'।

আমাদের একজন সম্প্রতি ধারাভাষ্য শেষ করার পর বললেন, অবশ্য এটা স্বীকার যেতেই হবে যে রেলওয়ে এফ সি আজ দারুণ খেলেছে। 'স্বীকার যাওয়া' এটা কোন অঞ্চলের ভাষা তা অবশ্য আমি জানি না।

পঞ্চম দিন পঞ্চম কমেন্টেটর : বছরের পর বছর বড় টিম গোল দিলেই (বিশেষ করে প্রিয় বড় দল) আমরা তারস্বরে চেঁচাই— গো-ও-ল গো-ও-ল। (একজন অল্পবয়সী কমেন্টেটর ইদানীং নাটকীয়ভাবে বলে উঠছে— 'গোল্‌ল!' ব্যাপারটা যে গোলাকার, শ্রোতারা বুঝতে পারছেন) আমাদের 'গো-ও-ল' চিৎকার শুনে গিন্নিরা বাড়িতে ডাকাত পড়েছে ভেবে পাশের বাড়ি থেকে রেডিওর কাছে ছুটে আসেন। ব্লাইন্ড সাপোর্টাররাও এত জোরে 'গোল' বলে না। আরও বলতে হবে। এত জোরে, যেন বেতারের সাহায্য না নিয়েই আওয়াজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া যায়। স্কাই ইজ দ্য লিমিট।

ধারাভাষ্য দিতে দিতে মাস্টারি করা, সহযোগীর পিছনে লাগা, গুরুত্বহীন স্ট্যাটিস্টিকস দেওয়া অসংখ্য ইংরেজি শব্দে বাংলা ধারাভাষ্য কণ্টকিত করা, পরস্পরের পিঠ চুলকানো— এইসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েও ক্লাস হওয়ার কথা হচ্ছে নিশ্চয়ই।

১৩



বলতে যে একটু লজ্জা-লজ্জা করছে না, তা নয়। তবু লজ্জার মাথা খেয়ে (সি এ বি-র প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বনাথ দত্ত একবার আমায় বলেছিলেন, লজ্জা জিনিসটার কোনও মাথাই নেই) বলেই ফেলি, ইদানীং আমার কিছু নামডাক হয়েছে। এখনও আমাকে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা 'মাথামোটা' বলেই জানেন। তবে পরিবর্তনটা এই যে সম্প্রতি আমাকে কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। খেলার 'জ্যাক অফ অল ট্রেডস' এডিটর সাহেব আমাকে পরপর দু-তিনটি আউটস্টেশন অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছেন, এটা বোধহয় সবার নোটিসেই এসেছে। গত সপ্তাহে একটি রবারের বলের টুর্নামেন্টের ফাইনালে আমাকে রিজার্ভ চিফ গেস্ট রাখা হয়েছিল। অরিজিনাল চিফ গেস্ট এক প্রাক্তন ফুটবল তারকা যথারীতি এসে যাওয়ায় আমি জাস্ট সিঙ্গাড়া-মিষ্টি খেয়ে চলে এসেছি। কিন্তু, এইরূপে ক্রমে ক্রমে একদিন চিফ গেস্টের চেয়ার পেয়ে যাব নিশ্চয়। ইদানীং বাড়তি একজনের জন্য 'বিশেষ অতিথি'র একটা পোস্টও ক্রিয়েট করা হয়েছে। দেখা যাক।

যে কথা বলছিলাম, কিছু নামডাক হয়েছে। তাতে একটা অসুবিধা হয়েছে এই যে, আগের মতো ঘোড়ার মুখের খবর আর পাচ্ছি না। ময়দানের নামকরা লোকেরা আগে আমাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই না এনে আমার সামনেই নিজেদের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলে যেতেন। এখন আর বলেন না।

গত রবিবার, পয়লা আগস্ট দুপুরে গোপন মিটিংটা ছিল একটা বিশেষ ক্লাবটেন্টে। রবিবার এমনিতে টেন্ট বন্ধ, গোপন মিটিংয়ের উপযুক্ত দিন। মালিকে এক প্যাকেট লাল সুতোর স্পেশাল বিড়ি এবং নগদ পাঁচ টাকা দিয়ে একটা স্ট্র্যাটেজিক পজিশন পেয়ে গেলাম। আমি সবাইকে দেখতে পাচ্ছি (মানে, সবার পা), কিন্তু আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি সবার কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আমার কথা কেউ শুনতে পাচ্ছে না। (কারণ আমি কোনও কথাই বলছিলাম না)।

ফর্মালি ঠিক করা হল না, তবে একজন মোটাসোটা কর্মকর্তা সভাপতির মতো হাবভাব দেখাতে লাগলেন। অন্যরাও ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিলেন। ফর্মালি ঠিক-না-হওয়া

সভাপতি মশাই হুঙ্কার ছাড়লেন : 'তাহলে কি এই প্রথম আমাদের সিন্ডিকেটের টার্গেট রেলিগেশন করবে না? এমন উল্টো-পাল্টা ব্যাপার....'

রোগা চেহারার কিন্তু মোটা গলার এক ছোট ক্লাব-কর্মকর্তা বললেন, 'টার্গেটটা ঠিক করতেই এবার একটু দেরি হয়ে গেছে। তবু, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। মাথা ঠাণ্ডা করে আমাদের এগতে হবে।'

মোটা চেহারার কিন্তু মিষ্টি গলার এক কর্মকর্তা বললেন, 'ক্যাঁচাল পাকাচ্ছে আজকালের দুটো ফক্কর রিপোর্টার। ওদের রিপোর্ট পড়ে পরদিন আমাদের প্লেয়ারদের বন্ধুবান্ধব আর বাড়ির লোকজন খারাপ খারাপ কথা বলছে। প্লেয়াররাও তো মানুষ, মোর অর লেস। ওরা নেক্সট ম্যাচ গট-আপ খেলতে চাইছে না। তার চেয়েও বড় ঝামেলা, রিপোর্টাররা জিজ্ঞেস করলেই স্ট্রেট বলে দিচ্ছে, 'হ্যাঁ, আমরা গট-আপ ম্যাচ খেলেছি। যান, অফিশিয়ালদের গিয়ে ধরুন।'

'নেক্সট ইয়ার থেকে, যেখান থেকে পারি টিমে অন্তত চল্লিশ জন প্লেয়ারের রেজিস্ট্রেশন করিয়ে রাখব। এগারজনকে স্রেফ গট-আপ ম্যাচ খেলার জন্য স্পেশালি বলে কয়ে নেব। তবে, গট-আপ ম্যাচ খেলার জন্য খুব ট্রেইন্ড ফুটবলার দরকার, সেটাও একটা প্রবলেম।'

হঠাৎ, লাফাতে লাফাতে টেন্টে ঢুকে ডিগবাজি খেয়ে এক যুবক বললেন, 'আজ মিনিবাস অ্যাক্সিডেন্টে সোনালি শিবিরের অচিন্ত্য পাল মরে গেছে, বাকি সব প্লেয়ার জবর জখম।'

মোটা চেহারার কিন্তু মিহি গলার কর্মকর্তাটি বললেন, 'ইস্, এই খবরে তুমি ডিগবাজি খাচ্ছ!'

যুবকটির মুরুব্বি, ফর্মালি-না-হওয়া সভাপতি মশাই বললেন, 'ব্যাপারটা বুঝলে না, এই অবস্থায় সোনালি শিবির আর কোনও ম্যাচ খেলতে পারবে না। তার মানে, আমরা সবাই বেঁচে গেলাম, কেউ নামছি না, আমাদের টার্গেটও অবশ্য বেঁচে গেল।'

পাঠক, এই পত্রিকায় আমার ভূমিকা নিতান্তই বিদূষকের। সেজন্য আধ পৃষ্ঠা বরাদ্দ। এডিটর সাহেব হয়ত অনধিকার চর্চায় ক্রুদ্ধ হবেন, তবু বলি, এই সব কর্মকর্তাদের ময়দানে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে চাই। অন্তত এই একটি ক্ষেত্রে আমাকে সিরিয়াসলি নিতে পারেন না?

১৪

বিলিভ মি অর নট, এডিটর সাহেব আমাকে বোম্বে পাঠিয়েছিলেন সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টেই বিলাতফেরত সুনীল গাভাসকারের একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য।

একথা অস্বীকার করা উচিত হবে না যে আমি বেশ নিশ্চিন্তেই কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। বোম্বের তাবৎ বাঘা সাংবাদিকেরা (এমনকি ঘাঘু আদালত-প্রতিবেদকরাও) অমিতাভ বচ্চনের খবর কুড়াতে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে অ্যাটেনডেন্স দেওয়ায়, সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে রিপোর্টার বলতে আমি একাই ছিলাম।

কাস্টমস কাউন্টার থেকে সানি বেরলেন ছেলে রোহনের কাঁধে হাত রেখে। ওদের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'এক্সকিউজ মি, একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।'

পাঁচ বছর বয়সী রোহন বলল, 'অল রাইট, কাল সকাল আটটায় বাড়িতে আসুন— ফর্টি বাই এ, স্যার ভালচন্দ্র রোড, দাদার। ড্যাডি তখন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে আপনাকে ইন্টারভিউ দেবেন।'

পরদিন সকাল সাতটা সাতান্ন মিনিটে কড়া নাড়তেই মিসেস মার্শেনিল গাভাসকার দরজা খুলে জানালেন, 'আপনাকে মিনিট তিনেক অপেক্ষা করতে হবে।'

সাতটা সোয়া উনষাট মিনিটে এক গোছা খবরের কাগজ নিয়ে ঘরে ঢুকল— রোহন গাভাসকার। গাভাসকার অবশ্য একটু দেরিতে এলেন, আটটা বাজার সাড়ে সতের সেকেন্ড পরে।

বাঃ সাঃ : 'ইন্ডিয়া টু ডে'-তে বেদি আপনার বিরুদ্ধে অনেক কথা লিখেছেন। পড়েছেন?

গাভাসকার (হিন্দুস্থান টাইমস ভাঁজ করে রেখে) : এসব ক্ষেত্রে নর্মালি উত্তর দেওয়া হয়, পড়িনি। আমি মিথ্যা কথা বলি না। পড়েছি। বাজে লেখা। ভাল স্পিনার হলেই ভাল লেখা যাবে, এমন কথা কোথায় লেখা আছে?

বাঃ সাঃ : দিলীপ দোশির চেয়ে রবি শাস্ত্রীকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন কেন? একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে দিলীপ বাদ, রবি খেলল এবং প্রচুর মার খেল। লর্ডস টেস্টে শাস্ত্রীকেই ঢালু দিকের সুবিধা দেওয়া হল। ব্যাপারটা একটু ব্যাখ্যা করবেন?

গাভাসকার (মহারাষ্ট্র টাইমস-এর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে) : ভবিষ্যতের কথা ভেবে এটা করা হয়েছে। ইংল্যান্ডের মাটিতে ইংল্যান্ডকে হারাতে পারব না, জানাই ছিল। তাই চেষ্টা করেছি, ভবিষ্যতের কথা ভাবার। দিলীপ এখন দুনিয়ার নাম্বার ওয়ান লেফট আর্ম স্পিনার উইদাউট আর্মার। রবি সবে উঠতি লেফট আর্ম স্পিনার উইথ আর্মার। তাই রবিকে নানারকম অবস্থায় ফাইট করার সুযোগ দিয়েছি।

বাঃ সাঃ : সুরু নায়েককে নিয়ে যাওয়া হল কেন?

গাভাসকার (হিন্দুর খেলার পাতা খুঁজতে খুঁজতে) : ভবিষ্যতের কথা ভেবে। দশ বছরের মধ্যে সুরু একজন ভাল অলরাউন্ডার হয়ে উঠবে, এটা লিখে নিতে পারেন।

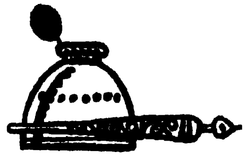
বাঃ সাঃ : গুলাম পার্কারকে দ্বিতীয় উইকেটরক্ষক করা হল— এটাও কি ভবিষ্যতের কথা ভেবে? ভবিষ্যতের কথা ভাবলে তো কিরির উত্তরাধিকারী হিসাবে একজন তরুণ উইকেটকিপারকে তৈরি হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে?

গাভাসকার (ডেকান হেরাল্ড হাতে তুলে নিয়ে) : এই প্রশ্নটা টেপ থেকে মুছে ফেলুন। আমি মিথ্যা কথা বলি না। ইন ফ্যাক্ট, এই প্রশ্নের জবাব আমার কাছে নেই। এটা মোটেই ছাপবেন না। জানেন তো সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যানও আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন। এটা ছাপবেন না।

বাঃ সাঃ : লাস্ট কোয়েশ্চেন। কপিলদেবকে এত বেশি বল করিয়ে ক্লান্ত এবং ভোঁতা করে দিলেন কেন?

গাভাসকার (স্টেটসম্যানের খেলার পাতা থেকে চোখ তুলে) : ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে। এই সিরিজে জেতার আশা ছিল না, আগেই বলেছি। কপিলদেবকে বড্ড বেশি বল করিয়ে একজস্টেড করে দিলাম যাতে এবার কাউন্টি ক্রিকেটে নর্দাম্পটনশায়ারের হয়ে দু-চার ওভারের বেশি বল করার ক্ষমতা না থাকে। তার মানেই রেস্ট। এবং তারপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ও বাঘের মতো বল করবে। আপনারা একটু লেটে বোঝেন, এই হচ্ছে মুশকিল!

১৫



প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা নিশ্চয় ইন্টারভিউগুলো পড়ছেন। এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি নিয়ে পত্রপত্রিকায় বিশেষজ্ঞরা গুরুত্বপূর্ণ মত প্রকাশ করছেন। এইসব আলোচনা পড়ে আমার অবশ্য প্রথমেই মনে হয়েছে যে অন্য সব বিভাগে ভারতের সোনা পাওয়া নিয়ে আর সংশয় নেই।

ঐনি-ওয়ে, ব্যাক টু ফুটবল। সম্প্রতি কিছু বিশিষ্ট সার্জেনও মূল্যবান ইন্টারভিউ দেওয়ার পর আমার মাথায় একটা দারুণ আইডিয়া এল। সম্প্রতি আমার নার্ভ প্রচুর স্ট্রং হয়েছে। তাই সোজা এডিটর সাহেবের টেবিলের সামনে দাঁড়ালাম। এবং বসলাম। মন দিয়ে একটা লেখা পড়ছিলেন। কাশলাম। তারপর আর-একটু জোরে কাশলাম। অবশেষে সেই বিরাট ঘটনাটি ঘটল। তিনি তাকালেন।

— 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি ও সম্ভাবনা নিয়ে কিছু বিশেষ ব্যক্তির ইন্টারভিউ করতে চাই। ধরুন, একজন আইনজীবী, ধরুন একজন....'

— 'আমার ধরাধরির কিছু নেই। আপনি এঁদের ধরে ফেলে লেখা জমা দিন। ভাল হলে ছাপব, নয়ত ফেলে দেব। এখন আসুন।'

এই জাতীয় উৎকৃষ্ট ভদ্রতার নিদর্শন আমাদের এডিটর সাহেব প্রতিদিনই রাখেন। সুতরাং প্রবল উৎসাহে কাজে লেগে গেলাম।

প্রথম ইন্টারভিউয়ের অংশবিশেষ : (এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার অন্ত নেই। মাত্র আড়াই মাস বাকি। ভারত কি দিল্লি এশিয়াডে কিছু করতে পারবে? সাফল্যের জন্য নতুন কোনও প্রস্তাব আছে কি? এইসব প্রশ্ন নিয়ে খেলার মাঠের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, বিশিষ্ট আইনজীবী বটবৃক্ষ বটব্যালের একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। গত ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন খেলার প্রতিনিধি বাবুরাম সাপুড়ে।)

খেলা : এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের প্রস্তুতি নিয়ে নিশ্চয় আপনার অনেক কিছু বলার আছে?

বঃ বঃ : অনেক। ইন ফ্যাক্ট এই ইন্টারভিউটা নিয়ে আপনি দেশের প্রভূত উপকার

করলেন।

খেলা : আমাদের প্রস্তুতিতে কি কোনও ত্রুটি আছে?

বঃ বঃ : ন্যাশনাল কোচকে দিয়েই শুরু করছি। এ আই এফ এফ এগ্রিমেন্ট করেছিল, ক্যাম্পের কোচ বা ফুটবলাররা ভারতীয় দল নিয়ে কোনও স্টেটমেন্ট বা ইন্টারভিউ দিতে পারবেন না। কিন্তু চিফ-কাম-ন্যাশনাল কোচ রেডিওয় সাতাশ, টিভিতে একাত্তর এবং খবরের কাগজে একশ বত্রিশটি ইন্টারভিউ দিয়েছেন। জয়েন্ট কোচ ইন্টারভিউ দেননি, তার বদলে ইন্ডিয়ার খেলার ম্যাচ রিপোর্ট করে গেছেন। এই ব্যাপারগুলো সম্পূর্ণ বেআইনি। এশিয়াড চলার সময় যদি প্লেয়াররাও স্টেটমেন্ট দিতে থাকে, ইন্ডিয়ার কিছু করার কোনও চান্স নেই। বিশেষত ন্যাশনাল কোচের মুখ বন্ধ রাখার উপায় খোঁজার জন্য এ আই এফ এফ-এর উচিত ছিল আইনজীবীদের পরামর্শ নেওয়া।

খেলা : মারদেকায় ইন্ডিয়া যথাসম্ভব চুনকালি মেখে এল। এখন কী করা যায়?

বঃ বঃ : আমাদের দেশের মাটি থেকে অন্য দেশ ফুটবলে গোল্ড-সিলভার-ব্রোঞ্জ নিয়ে যাবে এটা খুবই লজ্জার কথা। বইপত্র ঘেঁটে দেখছি, অ্যাটলিস্ট এশিয়াডের ফুটবলটার ওপর ইনজাংশন করে দেওয়া যায় কিনা। যা করার তা অবশ্য শেষ মুহূর্তেই করতে হবে।

দ্বিতীয় ইন্টারভিউয়ের অংশবিশেষ (বিশিষ্ট আইনজীবীর বদলে এবার বিশিষ্ট গট-আপ বিশেষজ্ঞ ঘনশ্যাম ঘোষ)।

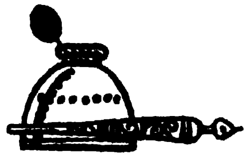
খেলা : আশা করি, এশিয়াড ফুটবল নিয়ে আপনিও—

ঘঃ ঘোঃ : ভাবছি, ভাবছি। এই তো সবে পুলিসকে নামিয়ে একটু জিরিয়ে নিচ্ছি। কী জানতে চান বলুন।

খেলা : আড়াই মাস বাদে এশিয়াড। টিমের হাল তো মারদেকায় বুঝলেন। এখন কী করা যায়?

ঘঃ ঘোঃ : এর চেয়ে অনেক ডিফিকাল্ট কেস আমরা বাঁচিয়ে দিতে পারি। এটুকু কথা দিতে পারি, আমাদের ঠিকমত কাজ করতে দিলে, ইন্ডিয়া কিছুতেই লাস্ট হবে না। বুঝতেই পারছেন, আমরা শুধু রেলিগেশন নিয়ে কাজ করি। বাংলাদেশ বা অন্য কোনও টিমকে টার্গেট করব। রেলিগেশনের ব্যাপার নেই, তবে ওই টিমটা লাস্ট হবেই। ভারতের জন্য এটুকু নিশ্চয় করতে পারব।

১৬



ম্যাগসাইসাই পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রখ্যাত সাংবাদিক গৌরকিশোর ঘোষ একবার আমাকে বলেছিলেন যে, তেমন তেমন দশটা ইন্টারভিউ করতে পারলেই আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করা যায়। সেই থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে একের পর এক ইন্টারভিউ করে যাচ্ছি। গৌরদা বলেছিলেন, 'তুই শুরু করে দে, যখন বুঝব তেমন ইন্টারভিউ সত্যিই হল, একটা পোস্টকার্ড ড্রপ করে দেব। এইরকম দশটা পোস্টকার্ড জমলেই বুঝবি তুই আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সাংবাদিক হয়ে গেছিস।' সেই থেকে ওয়েট করছি, নিশ্চয় পোস্টাল গণ্ডগোল, নাহলে এখনও একটাও পোস্টকার্ড পেলাম না কেন? এই ইন্টারভিউটা ছাপা হবার পর গৌরদার বাড়ি যাব। হাতে হাতেই পোস্টকার্ডটা নিয়ে আসব।

পাইপখোর বদমেজাজি এডিটর সাহেবের পারমিশন না নিয়েই কানপুর গিয়েছিলাম এশিয়াডের ম্যাসকট কিশোরী হস্তিনী আপ্পুর ইন্টারভিউ নেওয়ার জন্য। সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য অফিসে কাউকে কিছু বলে যাইনি।

অ্যাপোলো সার্কাসের ম্যানেজার সাহেবের রঙ ঘোর কৃষ্ণ, কিন্তু ভদ্রলোকের মেজাজ খাঁটি সাহেবি। তেমন পাত্তা দিলেন না, কিন্তু আপ্পুর কাছে পৌঁছে দিলেন। আপ্পু তখন ওয়ার্ম-আপ শেষ করে ব্রেকফাস্ট শেষ করতে করতে স্পোর্টস উইক পড়ছিল। ইন্টারভিউ-এর কথা শুনে যথারীতি বলল, 'এশিয়ান গেমস কমিটি কনট্রাক্টে সই করিয়ে নিয়েছে, ইন্টারভিউ দেওয়া যাবে না।' তারপর ইন্টারভিউ দিল। আপ্পু নিতান্তই অনভিজ্ঞ, একবারও 'নো কমেন্টস' বলতে পারল না।

বাঃ সাঃ : ১৯ নভেম্বর নেহরু স্টেডিয়ামে আপনাকে.... তোমাকে একপায়ে দাঁড়িয়ে 'নমস্তে' জানাতে হবে একসঙ্গে পঁচাত্তর হাজার দর্শককে। প্র্যাকটিস কেমন চলছে?

আপ্পু : ভালই। তবে খাওয়াদাওয়া খুব ভাল পাচ্ছি না। কলা সবসময়ে মর্তমান থাকছে না, চাপাটি শক্ত, ঘি খাঁটি নয়। এই খেয়ে সোনা জেতা.... আই মিন একপায়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করা যায়?

বাঃ সাঃ : আর কোনও অসুবিধা?

আপ্পু : কোনও রকম রিক্রিয়েশনের ব্যবস্থা নেই। এই বয়সে সন্ধের সময় চুপচাপ শুয়ে থাকতে ভাল লাগে?

বাঃ সাঃ : এশিয়াডে সোনা পাওয়ার.... আই মিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক পায়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে পারার সম্ভাবনা কতটা?

আপ্পু : আপনারা উৎসাহ না দিলে কিছুই হবে না। শুনেছি অন্য দেশে সাত গোল খেলেও.... আই মিন দুই পায়ে দাঁড়াতে না পারলেও জার্নালিস্টরা প্রশংসা করে লেখেন।

বাঃ সাঃ : আর কিছু?

আপ্পু : এখনও সিওর নই, এশিয়াডে আমাকে খেলানো.... আই মিন এক পায়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করতে দেওয়া হবে কিনা। এদেশের সিলেক্টর আর অফিসিয়ালদের তো জানেন, হয়ত লাস্ট মোমেন্টে বাদ দিয়ে দেবে। অলটারনেটিভ আপ্পুকেও ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে, এখানেই।

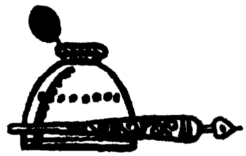
আপ্পুকে ধন্যবাদ জানিয়ে ট্রেনারবাবু নায়ারকে ধরলাম। বললেন, 'আর ইন্টারভিউ দেব না। কনট্রাক্টে সই করার পর গত পৌনে দুই বছরে টেলিভিশনে একাত্তর এবং খবরের কাগজে একশ বত্রিশটা ইন্টারভিউ দিয়েছি। আর দেব না। দিলেই আপনারা মিসকোট করেন। নানারকম ভুল বোঝাবুঝি হয়। শেষ সময়ে আর আপ্পুর মনোবল নষ্ট করতে চাই না।' ফরেন ট্রেনার রোমার সাহেবও কিছু বলতে চাইলেন না।

ফলো-আপ করার জন্য যেতে হল জব্বলপুর। ওখানকার চিড়িয়াখানাতেই সেই অতিবৃদ্ধা হস্তিনীটিকে পাওয়া গেল, যিনি ম্যাসকট না হয়েও একান্নর দিল্লি এশিয়াডের শুরুতে বিস্তর সার্কাস দেখিয়েছিলেন। বৃদ্ধা হস্তিনী অবশ্য কোনওরকম কনট্রাক্টের কথা তুললেন না।

বাঃ সাঃ : আসন্ন দিল্লি এশিয়াডের জন্য আপ্পুর প্রস্তুতি এবং সাফল্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

বৃঃ হঃ : এত লম্বা ট্রেনিং ক্যাম্প করার দরকার ছিল না। এভাবে এতদিন সার্কাসের তাঁবুর মধ্যে বদ্ধ হয়ে থেকে এবং জঙ্গলের ন্যাচারাল লাইফ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় আপ্পুর কম্পিটিটিভ এজ চলে যাচ্ছে। ট্রেনিংয়ের জন্য ইস্ট জার্মানি থেকে রোমার সাহেবকে আনার কোনও দরকারই ছিল না। অপ্রিয় হলেও সত্যি কথা বলছি, আপ্পুর এক পায়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার করার কোনও চান্সই নেই।

১৭



আমি সাহিত্যের ধারকাছ দিয়ে কখনও গেছি, একথা আমার নিন্দুকেরাও বলতে পারবে না। আমার পড়া সবচেয়ে সিরিয়াস লেখা 'পাগলা দাশু'। সে তেইশ বছর আগের কথা। সুতরাং, পুজোর মধ্যে আমাকে যখন বিখ্যাত সাহিত্যিকের ইন্টারভিউ নিতে বলা হল, ঘাবড়ে গেলাম। প্রথম কথা, সাহিত্যিকেরা ঠিক কেমন ভাষায় কথা বলেন আমি জানি না। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকেরা কখন কীরকম মুডে থাকেন তাও জানি না। আমাদের এডিটর সাহেব অভিজ্ঞ লোক। বললেন, 'দুপুর সাড়ে এগারটা নাগাদ ওঁর বাড়ি যাবেন। হ্যাং ওভারটা ততক্ষণে কেটে যায়, নর্মালি।'

এগারটা সাতাশ মিনিটে বেল টিপলাম। পাজামা-পাঞ্জাবি গায়ে তিনি দরজা খুলে বসতে বললেন। পাঞ্জাবিটা নিশ্চয় ঘণ্টা বাজার পর চড়িয়েছেন, তাড়াহুড়োয় উল্টো হয়ে গেছে। চমৎকার বসার ঘর। সাহিত্যিকরা আজকাল প্রচুর পয়সা পান, এদেশেও, এমন একটা গুজব শুনেছিলাম বটে।

সাহিত্যিক : আমি একটু ব্যস্ত আছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ইন্টারভিউ শেষ করলে ভাল হয়।

বাঃ সাঃ : দুঃখিত স্যার। ঘণ্টাখানেক সময় আমি নিতে পারছি না। আমার ইন্টারভিউ পনের মিনিটেই শেষ হয়ে যাবে।

সাহিত্যিক : অ!

বাঃ সাঃ : এই ইন্টারভিউ-এর অ্যাসাইনমেন্ট না পেলে আমি জানতেই পারতাম না যে, সেরা বেঙ্গলি উইকলির এডিটোরিয়াল এখন আপনিই লেখেন। রিসেন্ট একটা ইস্যুতে আপনি এশিয়াড ফুটবলে ইন্ডিয়ার সম্ভাবনা ইত্যাদি নিয়ে যে মাল ছেড়েছেন, তাতে আমরা একটা গভীর সঙ্কটে পড়ে গেছি।

সাহিত্যিক : (পাকা জুলফি দেড়বার পাকিয়ে নিয়ে) কী লিখেছি মনে নেই ভাই। বিলিভ ইট অর নট, আমি রোজ ফুলস্কেপ কাগজের আড়াইশ পৃষ্ঠা লিখি, অন অ্যান অ্যাভারেজ। রাইট ফ্রম এডিটোরিয়াল টু অরণ্যদেবের বাংলা টেক্সট।

বাঃ সাঃ : আপনি বলেছেন, রিসেন্টলি মারডেকা টুর্নামেন্টে ইন্ডিয়ার ফুটবল টিম হেরে

যাওয়ার পর কিছু পত্রপত্রিকা ক্ষতিকর সমালোচনা করছে। আগে থেকেই এসব লেখাটেখা পি কে এবং ফুটবলারদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। এখন সবার উচিত প্লেয়ারদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করা। প্রথম প্রশ্ন, আপনি কি জানেন, মারডেকায় ভারত ক'টা ম্যাচে কীভাবে হেরেছে? জানেন কি, এটাই ছিল এশিয়াডের আগে শেষ টুর্নামেন্ট? জানেন কি, পি কে প্লেনে ওঠার আগে বলে গিয়েছিলেন ইন্ডিয়া সেমিফাইনালে উঠবে? জানেন কি, ইন্ডিয়া গোটা টুর্নামেন্টে একটাও গোল করতে পারেনি?

সাহিত্যিক : বিশ্বাস করুন ভাই, আমি একটা প্রশ্নেরও উত্তর জানি না।

বাঃ সাঃ : যেসব পত্রপত্রিকায় সমালোচনা করা হয়েছে তারা কিন্তু গত দু-বছর ধরেই ফুটবলারদের হয়ে লড়ে গিয়ে তাদের মনোবল বাড়ানোর চেষ্টা করছে। বরং আপনাদের ডেইলিতে ওদের 'দেশদ্রোহী' বানিয়ে মারধর খাওয়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। এটাও নিশ্চয় জানেন না?

সাহিত্যিক : বিশ্বাস করুন—

বাঃ সাঃ : ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনি কি ফুটবল মাঠে যান?

সাহিত্যিক : কলকাতার ফুটবল সম্পর্কে আমার খুব অভিজ্ঞতা আছে। একবার দুপুর থেকে বিয়ার খাচ্ছিলাম এলফিনে বসে। সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ইন্টারভ্যাল দিয়ে একটু হাওয়া খেতে বেরিয়েছিলাম। গড়ের মাঠে ঢোকার মুখেই একটা আধলা ইট আমার মাথায় লেগেছিল। মাথা ফেটে গেল। জ্ঞান ফেরার পর শুনেছিলাম, একটা বড় টিম হেরে যাওয়ায় ময়দানে গণ্ডগোল। পাবলিক ক্ষেপে গিয়েছিল।

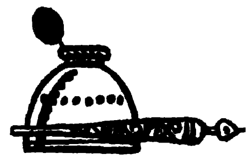
বাঃ সাঃ : আপনি খেলাটেলা দেখেন কিনা জিজ্ঞাসা করেছিলাম।

সাহিত্যিক : (আড়াই মিনিট ভাবার পর সোল্লাসে) দেখেছি, দেখেছি! তখন ক্লাস সিক্সে পড়ি, আমাদের স্কুল একটা টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছিল, হেডস্যার মাঠে যাওয়ার অর্ডার দিয়েছিলেন।

বাঃ সাঃ : সম্প্রতি, মানে ময়দানে, কিংবা ইন্ডিয়া টিমের খেলা নেহরু গোল্ড কাপে, মানে—

সাহিত্যিক : বিশ্বাস করুন ভাই, আমি কখনই....!

১৮



আমার মতো সাবস্টিটিউট প্লেয়ার আর কোথায় পাওয়া যাবে? এক টিপ নস্যি-পরিমাণ বুদ্ধি থাকলেও বুঝে যাবেন, এমনিতে আমার এশিয়াডে আসার কথা নয়। পুজোর আগেই এডিটর সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, দিল্লি এশিয়াড কভার করার চান্স আছে কিনা। জবাবে এমন হাসি উপহার পাওয়া গিয়েছিল, যাতে দিন তিনেক আহারে রুচি ছিল না। এশিয়াড শুরুর তিনদিন আগে অফিসে নিজের চেয়ারে বসে ভাত-ঘুমটা সবে স্টার্ট করেছি, এডিটর সাহেবের ডাক এল। আমি যা মাইনে পাই, তাতে ভাত-ঘুম দেওয়ার রাইট আমার আছে। কাঁচা ঘুম ভেঙে যাওয়ায় আমার রাগ হল। পাক্কা সতের সেকেন্ড সময় লাগল রাগটা সামলাতে। তারপর ঃ—

— 'মাসখানেক ভাত-ঘুম বন্ধ রাখুন, আপনাকে দিল্লি যেতে হবে, এশিয়াড কভার করতে।'

— 'কেন, কারও হঠাৎ অসুখ?'

— 'জিজ্ঞেস করে দুঃখ পান কেন? ব্যাপারটা ঠিক তাই। আপনার যদি তেমন যোগ্যতা....'। থামিয়ে দিলাম। কথা যে কোথা থেকে কোন দিকে যাবে কে জানে!

এডিটর সাহেব ফাইভ ফিফটি ফাইভের প্যাকেটটা খুলতে খুলতে (আপাতত পাইপ নেই, যত্ন করার টাইম পাচ্ছেন না) বলেছিলেন, 'বেশি উত্তেজিত হবেন না। আপনাকে এশিয়াডের একটা ইভেন্টও কভার করতে হবে না। নাইনটিন্থ জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে ওপেনিং সেরিমনি। বাঘা রিপোর্টাররা কভার করবেন। ঐ দিন স্টেডিয়ামে ভি আই পি-দের ইন্টারভিউ করার জন্য একজন চটপটে রিপোর্টার ঠিক করা ছিল। আনফরচুনেটলি, তার গতকাল থেকেই ইনফ্লুয়েঞ্জা। যে কাগজের যেমন ভাগ্য, আপনাকেই পাঠাতে হচ্ছে।'

দিল্লিতে পৌঁছেই ঝামেলা, আমার কার্ড নেই। যার নামে কার্ড, সে তো কলকাতায় ট্যাবলেট গিলছে। শেষ পর্যন্ত ঢোকার ব্যবস্থা হল বুটা সিংয়ের ড্রাইভারের ভাগ্নের এক বন্ধুকে ধরে।

রাষ্ট্রপতি জৈল সিংয়ের দিকে যেতে গিয়ে একটা ধাক্কা খেলাম, দৌড়াতে দৌড়াতে

একজন স্টেডিয়ামের ড্রেসিং-রুমের দিকে আসছিলেন। দুজনেই পড়ে গিয়েছিলাম। সাদা গেঞ্জি থেকে ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে মিলখা সিং জিজ্ঞেস করলেন, 'লাগেনি তো?' কাজের সময় ঝামেলা, তবু ক্ষমা করে দিলাম। মিলখাকে কাটিয়ে জৈল সিংয়ের দিকে গেলাম।

— 'মহামান্য রাষ্ট্রপতি, আজকের এই বিশেষ দিনে জাতির উদ্দেশ্যে কোনও বাণী?'

— 'হাঁ, জরুর। আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জন্মদিন বার বার ফিরে আসুক।' জৈল সিং হয়ত আরও কিছু বলতেন, বুটা সিং তাঁকে জোর করে মাইকের সামনে নিয়ে গেলেন। এশিয়াড উদ্বোধনের ঘোষণা করতে হবে।

নেক্সট্ টার্গেট বুটা সিং। ভিড়-ভাট্টার মধ্যে ফের ধাক্কা খেলাম। আমার হাত ধরে ক্ষমা চেয়ে বলবীর সিং বললেন, 'তিনটে অলিম্পিকে হকি খেলেছি, গোল্ড তো ছিল জলভাত, কিন্তু আজ এশিয়াড শিখা জ্বালিয়ে যে আনন্দ....'। কাজের সময় এই লোকগুলো এত বকবক করে! বলবীরকে সাইডপুশ করে বুটা সিংয়ের দিকে গেলাম। 'আজকের এই বিশেষ দিনে কিছু বলবেন?'

— 'হাঁ, জরুর। এত অল্প সময়ে যে সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গেছে, এজন্য দেশ ও জাতির রাজীব গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। তিনি মাথার ওপর থেকে ছড়ি ঘোরাতে না রাজি হলে....।'

পঁচিশ গজ দূরেই— রাজীব গান্ধী। প্রায় লাফিয়ে সেদিকে যেতে গিয়ে একজনের ঘাড়ে পড়লাম, প্রায়। প্রকাশ পাড়ুকোন এত ভদ্র তা জানতাম না। অল্প হেসে পিঠ চাপড়ে বললেন, 'নেভার মাইন্ড। আমি....'। কথা বাড়াতে দিলাম না। ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাসাইনমেন্টের দিনে এইসব উটকো ঝামেলা কার ভাল লাগে?

আমার প্রশ্নের জবাবে রাজীব গান্ধী বললেন, 'মার জন্মদিন বলেই আজকের তারিখে এশিয়াডের উদ্বোধন হচ্ছে, এটা বিরোধীদের অপপ্রচার। জাস্ট, কো-ইনসিডেন্স, আর কিছু নয়।'

এমন সময় মাইকে ঘোষণা করা হল, 'আপনারা সকলে প্রাইম মিনিস্টারকে বার্থ ডে-র জন্য উইশ করুন। পঁচাত্তর মিটার দূরে তিনি বসেছিলেন। হুড়মুড় করে সেদিকে এগলাম। কিন্তু যা ভিড়! আমার ধাক্কা খেয়ে এক ভদ্রলোক উল্টে পড়লেন। অসামান্য ক্ষিপ্রতায় উঠে দাঁড়িয়ে শ্রীরাম সিং বললেন, 'এশিয়াড থেকে ভারতের হয়ে বার বার গোল্ড এনেছি, কিন্তু আজ যে অভিজ্ঞতা....'। এরপরে আর কী বলেছিলেন ভদ্রলোক, আমি জানি না। প্রাইম মিনিস্টারের কাছে কোনওরকমে পৌঁছে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজকের বিশেষ দিনে....?' শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর জবাব চিৎকারে ডুবে গেল। তাঁর পাশে-বসা অমিতাভ বচ্চন উঠে দাঁড়িয়ে জনগণের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ছেন। স্পষ্ট দেখলাম, বুটা সিংও চেঁচাচ্ছেন।

১৯

এ কথা বলার কোনও রাস্তাই খেলোয়াড়রা খোলা রাখেননি যে, এশিয়াডে হকি ফাইনালে ভারত দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানের কাছে হেরেছে। একে সাত গোল। তার ওপর, অ্যাস্ট্রো টার্ফের চিরন্তন অজুহাতটাও হাতছাড়া হয়েছে হকি-কর্মকর্তাদের অদূরদর্শিতায়। এই এশিয়াডের কয়েক মাস আগে অ্যাস্ট্রো টার্ফ আনার কী দরকার ছিল? যারা এমন মোক্ষম অজুহাতকে এভাবে হেলায় হাতছাড়া করে, তাদের কপাল তো পুড়বেই। খারাপ আম্পায়ারিং-এর অভিযোগ করাও কঠিন, কারণ ওই দুই বিশেষ ব্যক্তি সম্পর্কে পাকিস্তান আগেভাগেই আপত্তি জানিয়ে রেখেছিল। কোথাও কোনও রাস্তা খোলা নেই। অস্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় দল থেকে গোলকিপার নেগিকে বাদ দিয়ে অবশ্য একটা মৃদু কৈফিয়তের আভাস রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই আভাসটা নেবার লোক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

সুতরাং, দৈনিক পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় ক্রিকেট অ্যাশেজ-কাহিনীর অক্ষম অনুকরণ। সুতরাং, জাফর ইকবালের কাছে শাড়ি ও চুড়ি পাঠিয়ে দেওয়া। সুতরাং, ভারতবর্ষ জুড়ে অগুনতি শোকসভা।

এশিয়াডে এডিটর সাহেব দয়া করে আমাকেও পাঠিয়েছিলেন। এত বড় ব্যাপারে কত ফালতু কাজ থাকে। যেমন, রোজ প্রত্যেকটা স্টেডিয়াম থেকে লেটেস্ট রেজাল্ট নিয়ে আসা। খবর পাঠাতে অনেক রাত্রি হয়ে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায়, তাই ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে খাবার নিয়ে আসা। বড় রিপোর্টারদের কাপড়চোপড় লন্ড্রিতে দিয়ে আসা। বিশ্বাস করুন, সিগারেট-টিগারেট আনার কাজটাও আমাকে দিয়েই করানো হয়েছে। তবু, আমাদের এশিয়াড-দল কলকাতায় পৌঁছানোর পর দেখা গেল, আমি ছাড়া আর সকলের অবস্থাই কাহিল। বড় রিপোর্টাররা লিটার‍্যালি শয্যাশায়ী। তিন সপ্তাহ বড্ড ধকল গেল তো। পৌঁছানোর পরদিন অফিসে ঢুকতেই এডিটরের ডাক। ব্যাক-টু-সিগারেট এডিটর সাহেবের মুখে তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'নির্বোধরা পরিশ্রমী হয়, এই নিয়মটা আপনার ক্ষেত্রেও সত্যি হওয়ায় আমার খুব ভাল লাগছে। প্রচণ্ড নির্বোধরা নিশ্চয় প্রচণ্ড পরিশ্রমী হয়। এবং প্রচণ্ড পরিশ্রমী না হলে এই তিন সপ্তাহের ধকলের পরেও আপনি....।'

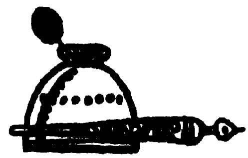
আমাদের এডিটর সাহেবের একটা বড় গুণ এই যে, মেজাজে কথা বলার সময়, যাকে বলা হচ্ছে তার মুখের দিকে কদাচিৎ তাকান। উপরোক্ত সুবচন শেষ করে আমার দিকে সহাস্যে তাকালেন : 'হুঁ, আপনাকে একটা বড় কাজ এখন করতে হবে। জানেন নিশ্চয়, দেশ জুড়ে হকির দুর্দশার জন্য শোকসভা হচ্ছে। অন্তত কয়েকটা মিটিং কভার করতেই হবে। আশা করি এটুকু মাথায় ঢুকছে যে, এই মুহূর্তে পাবলিক হকি নিয়ে গালাগালি, আক্ষেপ, শোক ইত্যাদি দারুণ খাবে। আপনি আজই কাজে নেমে পড়ুন। বিকেলে ময়দানে রেঞ্জার্স টেন্টে একটা মিটিং আছে। রাতের পাঞ্জাব মেলে কলকাতা ছাড়ুন। পরশু বিকেলে লুধিয়ানায় আর একটা মিটিং। খোঁজখবর নিয়ে অন্তত গোটা তিনেক মিটিং অ্যাটেন্ড করুন। দুটোর খবর তো দিয়েই দিলাম। বাকি একটা যাতায়াতের পথে নিশ্চয় পেয়ে যাবেন।

রেঞ্জার্স ক্লাবের সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন ভারতীয় সুইমিং ফেডারেশনের এক দুঁদে কর্মকর্তা। স্বভাবতই শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই সাঁতারু। তিনজন কাবাডি খেলোয়াড় এবং একজন হকি আম্পায়ারকেও অবশ্য দেখা গেল। খুব করুণ মুখে সকলের শোক প্রকাশিত হবার পর আমি মাননীয় সভাপতি মশাইয়ের দিকে এগিয়ে গেলাম : 'হকিতে ইন্ডিয়া রুপো পাওয়ায় আমরা অবশ্যই শোকাহত। কিন্তু, পাঠকরা তো কিছু আনন্দের খবরও চান। আপনার ছেলেমেয়েরা (সুইমাররা) যে সব সোনা পেয়েছে, তার একটা লিস্ট যদি দেন।'

ভদ্রলোক আমার দিকে খুব খারাপভাবে তাকিয়েছিলেন। লুধিয়ানার সভায় তাই একটু সতর্ক ছিলাম। সভাপতিত্ব করছিলেন ভারতীয় দলের এক বিখ্যাত বাস্কেটবলার। চোখের জলে এই শোকসভাটিও ভাসল। অতঃপর সভাপতিকে : 'হকিতে সোনা না পেয়ে আমরা অবশ্যই মর্মাহত। কিন্তু এখন দরকার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আপনারা কীভাবে বাস্কেটবলে সোনা জিতলেন, সেই কাহিনী যদি শোনান, ব্যর্থ হকি খেলোয়াড়রা অনুপ্রাণিত হতে পারে।' বাস্কেটবলার-সভাপতি আমার দিকে তাকিয়ে জঘন্য একটা শব্দ উচ্চারণ করলেন।

ফেরার পথে আর শোকসভা পেলাম না। তবে, এলাহাবাদে একটা বিজয়োৎসব পেয়ে গেলাম। ব্রোঞ্জ-বিজয়ী ভারতীয় ওয়াটারপোলো দলের সংবর্ধনা। কোচ বোঝালেন, কী করে তিনি এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। আমার প্রশ্নের জবাবে জানালেন, 'হকিতে ভারত সিলভার পেয়েছে বলে দুঃখ করবেন না। আমাকে দায়িত্ব দিলে, কথা দিচ্ছি, নেক্সট এশিয়াডে ব্রোঞ্জ পাইয়ে দেব।'

২০



পাঠক-পাঠিকারা শুনে মূর্ছা যেতে পারেন, সম্প্রতি আমি কিঞ্চিৎ বিখ্যাত হয়েছি। বিখ্যাত লোকেদের নাকি রাতে ভাল ঘুম হয় না। আমারও সম্প্রতি ভাল ঘুম হচ্ছে না। অতএব।

ভাল ঘুম না হওয়ায় প্রচুর স্বপ্ন দেখছি। অধিকাংশই খুচরো স্বপ্ন। গতকাল শেষ রাতে একটা লং প্লেইং স্বপ্ন দেখা গেল। নাইনটিন এইটটি ফোরের থার্ড জানুয়ারির খবরের কাগজটা পড়লাম। স্বপ্নের শুরুতেই ফ্রন্ট পেজের ক্লোজ-আপ। ফার্স্ট লিড : 'দিল্লি জমজমাট : শীতোৎসব শুরু হল।' নয়াদিল্লির জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম থেকে অশোক দাশগুপ্ত : নৃত্যে বর্ণে সঙ্গীতে স্মৃতিতে উদ্বেল শীতোৎসব শুরু হল প্রভূত প্রত্যাশা নিয়ে। দক্ষিণ কোরিয়া দলে কোনও পুরুষ নেই। এমন কি লোকাল ম্যানেজার হিসাবেও কোনও পুরুষকে তাঁরা গ্রহণ করলেন না। সংগঠন কমিটির সভাপতি সর্দার লুটা সিং জানান, প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর হস্তক্ষেপ ছাড়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিল না। রাহুল দেব বর্মনের দুর্দান্ত সুরে উৎসব-সঙ্গীত বেজে উঠতেই উৎসবের মেজাজ ঝপ করে স্টেডিয়ামে লাফিয়ে পড়ে। এখন শুধু মেজাজটিকে ধরে রাখা।

নয়াদিল্লির রাজপথ থেকে পল্লব বসুমল্লিক : আঃ কী রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আমি ছুটছি যন্তরমন্তর রোড ধরে কনট সার্কাসের দিকে। আমার সামনেই জাপানের তিনজন নৃত্যশিল্পী। তাঁরা চমৎকার ভঙ্গিতে খোলা গাড়িতে চেপে মার্কেটিং করতে চলেছেন। ঐ যে, মাঝের জন, তোশিকা ওয়াতানাবে, এইমাত্র রুমালে মুখ মুছলেন। স্পেশাল শীতোৎসব রুমাল। তাতে রয়াল বেঙ্গল মশার ছাপ। এই ম্যাসকট ইতোমধ্যেই প্রভূত জনপ্রিয়তা পেয়ে গেছে।

নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ স্টেডিয়াম থেকে ধীমান দত্ত : না, জাপান সোনা পেল না। চীনও না। শীতোৎসবের প্রধান আকর্ষণ বিউটি কনটেস্টে সোনা পেলেন ফিলিপাইনের জুলিয়া রানেজা। নীল পোশাকে তিনি মঞ্চে অবতীর্ণা হন সম্ভাব্য সাফল্যের গন্ধ ছড়িয়ে। প্রধান বিচারক অমিতাভ বচ্চন মঞ্চে ওঠেন প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার সাড়ে তিন মিনিট পরে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আর কবে সচেতন হবেন?

নয়াদিল্লির তালকোটরা স্টেডিয়াম থেকে সুরজিৎ সেনগুপ্ত : গতকাল প্র্যাকটিস দেখে মনে হয়েছিল জাপানই ফেবারিট। তাঁদের নৃত্যে যথার্থই শিল্প ছিল। কিন্তু আজ শীতোৎসবের নৃত্য প্রতিযোগিতায় শিল্প হার মানল শক্তির কাছে। পাওয়ার-ড্যান্সিংয়ের চূড়ান্ত নমুনা পেশ করে সোনা ছিনিয়ে নিয়ে গেল চীন। প্রমাণিত হল, পাওয়ার এবং স্ট্যামিনাই আধুনিক নৃত্যের মূল কথা। কিন্তু, একথা বলতে দ্বিধা নেই, নৃত্য এত বেশি পাওয়ারের দিকে ঝুঁকলে, অদূর ভবিষ্যতে দর্শক পাওয়া কঠিন হবে। আজ একশ আশি মিনিটে যে তিন চারটি সূক্ষ্ম পায়ের কাজ দেখেছি, তার সবই এসেছে জাপানের অসাধারণ শিল্পীদের কাছ থেকে। খেলার পর চীনের কোচ মিং হুয়া বললেন, 'আমাদের মেয়েরা এই জলনৃত্য প্রতিযোগিতার জন্য টানা ছয় মাস হোয়াংহো নদীতে প্র্যাকটিস করেছে।'

নয়াদিল্লির যমুনা ভেলোড্রাম থেকে সুভাষ ভৌমিক : আগেই বলেছিলাম, দক্ষিণ কোরিয়াই ফেবারিট। দড়ির ওপর ছাতা হাতে সাইকেল রেসে সম্প্রতি চীন সবচেয়ে বেশি উন্নতি করেছে, এই প্রচারটা আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, কারণ দেশ বিদেশে অজস্র সার্কাস আমি দেখেছি। হলুদ এবং লাল রঙের ছাতা দিয়ে বিচারকদের বিভ্রান্ত করার করুণ চেষ্টা ব্যর্থ হয়, চীনের উয়ে লিং হঠাৎ পড়ে যাওয়ায়। দক্ষিণ কোরিয়ার লড়ার ক্ষমতা দেখছি নাইনটিন সেভেনটির ব্যাঙ্কক এশিয়াড থেকেই। প্লেন সাদা ছাতা নিয়েই আজ ওরা সোনা তুলে নিল। দক্ষিণ কোরিয়ার ছেলে এবং মেয়েদের গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দেন গ্রেট রোমান সার্কাসের মালিক টি বেণুগোপাল।

নয়াদিল্লির শীতোৎসব ভিলেজ থেকে সরোজ চক্রবর্তী : টিম-বাস থেকে নেমেই হাতের ব্যাগটা রিসেপশন সেন্টারের সামনের উঠোনে ছুঁড়ে ফেললেন জাপানের শেফ-দ্য মিশন ইচিয়ো ওগিমুরা।

রাগে তাঁর মুখ সবুজ দেখাচ্ছিল। আমাকে বললেন, 'এমন জাজমেন্ট হবে জানলে, আসতাম না। ড্যান্সিংয়ে আমাদের সিওর গোল্ডটা হাতছাড়া হল পার্শিয়াল জাজেদের জন্য। কাল ভোকাল মিউজিকেও যদি এমন কিছু দেখি, টিম নিয়ে দেশে চলে যাব।'

আজ শীতোৎসব ভিলেজ পরিদর্শনে এসেছিলেন শ্রীমতী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। সঙ্গে তাঁর তিনটি প্রিয় পুতুলই ছিল। জাপানি দলের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট অতিথিকে এক বাক্স টফি এবং একটি টকিং ডল উপহার দেওয়া হয়।

২১

দেশপ্রেমিক আম্পায়ারদের এই সম্মেলনে আমার হাজির থাকার ব্যাপারটা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, আপনাদের কাছে অবশ্যই অবিশ্বাস্য। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ছিলাম। আমার এক মেসোমশাই একজন টেস্ট আম্পায়ারের খুড়তুতো ভাই। প্রত্যেক দেশের আম্পায়ার সংস্থাই একজন করে সাংবাদিক পাঠানোর সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয় সংস্থা থেকে আমাকে পাঠানোর প্রস্তাব তোলেন আমার মেসোমশাই। অন্য এক আম্পায়ার এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'ভারতবর্ষে এত নামকরা সাংবাদিক থাকতে এই সব সাপুড়ে-বাপুরেদের পাঠানোর কী মানে হয়? বাবুরাম সাপুড়ের মতো সাংবাদিক করাচি কনফারেন্সে যাচ্ছেন, এটা ভাবা যায়?' আমার মেসোমশাইও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 'সুরু নায়েক যদি ইংল্যান্ড ট্যুরে যেতে পারে, বাবুরাম সাপুড়ের করাচি যাওয়া অসম্ভব হবে কেন?' সভাস্থ সকলেই মেসোমশাইয়ের যুক্তি মেনে নেওয়ায় আমি করাচিতে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। জার্নালিস্ট তথা অবজার্ভার হিসাবে ঐ কনফারেন্সে হাজির ছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের টোনি কোজিয়ার, ইংল্যান্ডের হেনরি ব্লোফিল্ড, অস্ট্রেলিয়ার ফিল ট্রেসিভার. নিউজিল্যান্ডের ব্রিটেনডন, শ্রীলঙ্কার হেনরি ফার্নান্ডেজ, পাকিস্তানের সেলিম চিসতি এবং ভারতের হুঁ হুঁ, বাবুরাম সাপুড়ে!

সম্মেলনের উদ্বোধন করে পাকিস্তানের সুবিখ্যাত দেশপ্রেমিক আম্পায়ার ইদ্রিস বেগ বলেন. 'দেশপ্রেমিক আম্পায়ারদের সামনে আজ অস্তিত্বের সঙ্কট। দেশে দেশে নিরপেক্ষ আম্পায়ারের প্রস্তাব, দাবি উঠে গেছে। একথা আমাদের প্রথমেই বুঝে ফেলা দরকার. সেক্ষেত্রে স্পেশালিস্ট পেট্রিয়টিক আম্পায়ারদের আর টেস্টম্যাচে ডাকই পড়বে না। ক্রিকেটের জন্মলগ্ন থেকেই অনেক গালাগালি এবং অত্যাচার সহ্য করে দেশপ্রেমিক আম্পায়ারিংয়ের মহান পতাকা আমরা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছি। সমাগত দেশপ্রেমিক আম্পায়ার বন্ধুগণ, আপনাদের হয়ত মনে আছে, পঞ্চাশের দশকে এম সি সি-র সঙ্গে পাকিস্তানের বেসরকারি টেস্ট সিরিজে আমি দেশপ্রেমিক আম্পায়ারিংয়ের কী অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলাম। ফলে এম সি সি টিমের অধিনায়ক কার এবং অন্য ক্রিকেটাররা আমাকে নেমন্তন্ন করে আকণ্ঠ মদ গিলিয়ে, কনকনে শীতের রাত্রে ঠাণ্ডা জলের চৌবাচ্চায়

চুবিয়েছিল। তবু, আমি দেশপ্রেমের কথা ভুলিনি। অথচ আজকের দেশপ্রেমিকরা সামান্য সমালোচনাতেই গুটিয়ে যান। প্রবীণ আম্পায়ার হিসাবে এই প্রজন্মের জাতীয়তাবাদী আম্পায়ারদের কাছে আমার আবেদন, শক্ত হতে শিখুন। কানে প্রচুর তুলো দিন। পিঠে মজবুত কুলো বাঁধুন। জয় আমাদের অনিবার্য। দেশপ্রেমিক আম্পায়ার ঐক্য জিন্দাবাদ!'

সমাগত আম্পায়ারদের মধ্যে একটি প্রশ্নে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক দলের বক্তব্য, কোনওরকম চক্ষুলজ্জার বালাই না রেখে রাইট অ্যান্ড লেফট দেশপ্রেমিক অর্থাৎ একপেশে ডিসিশন দিতে হবে। অন্যদলের বক্তব্য, এর ফলে জনমত বিরুদ্ধে চলে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, নিরপেক্ষ আম্পায়ার রাখার প্রস্তাবটা পাস হয়ে যেতে পারে। সুতরাং, ভেবেচিন্তে দু-চারটে মোক্ষম ডিসিশান দেশের পক্ষে দেওয়া উচিত। তাতে সাপ তো মরবেই, লাঠি ভাঙারও চান্স কম।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রতিনিধি স্যাং হিউ বলেন, 'আজকালকার দেশপ্রেমিক আম্পায়াররা ভিতু, তাই ভেবেচিন্তে দু-চারটে পার্শিয়াল ডিসিশান দেবার লাইন খাওয়াতে চায়। এসবের মধ্যে আমাদের থাকা উচিত নয়। টেস্ট ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই অ্যাক্টিভ হয়ে যেতে হবে। পাঁচটা মোক্ষম ডিসিশনেই যদি কাজ হয়, দশটা দিলে তো ক্ষতি নেই।'

প্রতিবাদে উঠে দাঁড়ালেন ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি ডেভিড কনস্ট্যান্ট : 'স্যাং হিউ কথিত এই লাইন বিপজ্জনক। এসব করলে এইট্টি থ্রির মধ্যেই নিউট্রাল আম্পায়ার প্রথা চালু হয়ে যাবে। আমি একটি দুটির বেশি পার্শিয়াল ডিসিশান দেবার পক্ষপাতী নই। আমরা ম্যাচ পিছু দুজন ইংরেজ ব্যাটসম্যানকে দুবার করে বাঁচাই। কখনও কখনও একজনকে একবার। ধরুন, প্রচণ্ড ফর্মে থাকা ইয়ান বথাম ৬৩ রানের মাথায় প্লাম্ব লেগ বিফোর উইকেট। আমরা 'নট আউট' বলি। বথাম ১৪৭ করে। ধরুন, ভিভ রিচার্ডস বা সুনীল গাভাসকারের পায়ে বল লাগলেই, প্রথম সুযোগেই আঙুল তুলে দিই। তারপর, দরকার হলে এবং দেশের ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকলে, কিরমানি বা ডেভিড মারের জেনুইন আউট দিই না। ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা প্রতিবাদ করে। আমার ইমেজ বাড়ে।'

স্যাং হিউকে সমর্থন জানান অস্ট্রেলিয়ার মেল জনসন : 'না না না, দুটো-একটার লাইনে আমরা নেই। রিসেন্ট অ্যাশেজ সিরিজের লাস্ট টেস্টে জন ডাইসন প্রথম ওভারেই রান আউট ছিল। উইলিসের থ্রো সোজা উইকেটে লাগে, তখন কোথায় ডাইসন! আমি তো পরে চ্যাপেলকে বাঁচানোর জন্য তখন নিউট্রাল থাকতে পারতাম। কনস্ট্যান্টের মতো আম্পায়াররা হয়ত তাই কবতেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, ডাইসনই ৭৯ করল। রিস্ক নিয়ে কোনও লাভ নেই।'

পাকিস্তানের মেহবুব খান বলেন, 'জনসন সাহেব ঠিকই বলেছেন, রিস্ক নিয়ে কোনও লাভ নেই। রিসেন্ট পাক-ভারত সিরিজে মহিন্দার অমরনাথ প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরি করার পর; পরের চার ইনিংসের তিনটিতে ওকে আগেভাগেই বাজে আউট দিয়েছি। গাভাসকার, বিশ্বনাথ, বেঙ্গসরকার, পাতিল আর কিরমানিকে দুই একবার ডুবিয়েছি। থার্ড টেস্টে জাহির, মিয়াঁদাদ, মালিক আর ইমরানকে পরিষ্কার আউট দিইনি। ওরা চারজনই সেঞ্চুরি

করেছে। স্কাই ইজ দ্য লিমিট।'

শ্রীলঙ্কার প্রতিনিধি আর ডি সিলভা এবং নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধি প্যাট হিউসনের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য : 'যত বেশি সম্ভব পার্শিয়াল ডিসিশান দেওয়াই দেশপ্রেমিক আম্পায়ারের কাজ। যে যত বেশি এমন ডিসিশান দেবে, সে তত বড় দেশপ্রেমিক আম্পাযার, ব্যস।'

শেষ বক্তা ভারতের স্বরূপ কিষেণ বলেন, 'আমি মেল জনসনের বক্তব্য সমর্থন করি। ধরুন ভারত-পাকিস্তান সিরিজে টেস্ট খেলাচ্ছি। আমি গাভাসকারকে দুবার এবং বেঙ্গসরকারকে একবার বাঁচিয়ে দেব। জাহির আর মিয়াঁদাদকে দশের মধ্যেই ফেরত পাঠাব। বাকি সময়ে আমি নিউট্রাল থাকব। এত নিউট্রাল যে, নিউট্রাল আম্পাযাব প্রথা চালু হলেও বেকার হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।'

২২

দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ— পরপর তিনটি টেস্টে পাকিস্তানের কাছে গোহারান হারার পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তা ও নির্বাচকেরা গত ১৯ জানুয়ারি বোম্বাইয়ের ওবেরয় টাওয়ার্সে এক বিশেষ জরুরি সভায় মিলিত হন। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে কেন স্ট্যাটিসটিসিয়ান আনন্দজি দোসাকে রাখা হয়েছে, প্রথমেই অন্যদের কাছে তা বুঝিয়ে বলেন বোর্ডের সেক্রেটারি এ ডব্লু কানমাদিকার।

ক্যাবিনেট মিনিস্টারের পক্ষে যতটা মর্মাহত হওয়া আইনসম্মত, ততখানিই মর্মপীড়া মুখে মেখে কথা শুরু করলেন বোর্ড সভাপতি এন কে পি সালভে। সম্প্রতি অন্ধ্র ও কর্ণাটকে নির্বাচনী বিপর্যয়ের পর একজন ক্যাবিনেট মিনিস্টার এবং দুই মিনিস্টার অফ স্টেট গভীর মর্মাহত হয়ে বিবৃতি দিয়েছিলেন। ম্যাডাম তখন ধমক দিয়ে বলেন, এইরকম মর্মাহত হলে মিনিস্টার রাখা যাবে না। সেই থেকে এন কে পি সালভে আর বেশি মর্মাহত হওয়ার রিস্ক কোনও ব্যাপারেই নিচ্ছেন না।

থামস-আপ-এর বোতলে চুমুক মেরে (বোর্ডের কর্মকর্তাদেরও থামস-আপ পান করতে হবে, অধিনায়ক সুনীল গাভাসকারের এই দাবি এক সপ্তাহ আগেই মেনে নিয়েছেন) এন কে পি সালভে : 'ভারতীয় ক্রিকেট এমন বেকায়দায় বহুকাল পড়েনি। আমি প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেই এমন ফ্যাসাদ— এটা চক্রান্ত ছাড়া আর কী! যাই হোক, ভয়ের কিছু নেই, আমাদের মহান নেত্রীর আশীর্বাদে সব সঙ্কট নিশ্চয় কাটিয়ে উঠব। যাবতীয় চুক্তিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ওরা তিন-তিনটে টেস্টে আমাদের প্রেস্টিজ পাংচার করে দিয়েছে। হয়ত বাকি দুটি টেস্টেও এইরকম হবে। এই অবস্থায়, ভারতীয় ক্রিকেটের ইমেজের জন্য কিছু একটা না করলে, পাবলিক ঝামেলা পাকাবে। বোর্ডে আমি নতুন, যাঁরা বোর্ডে আজীবন আছেন এবং থাকবেন, একটা রাস্তা খুঁজে বার করার দায়িত্ব তাঁদেরকেই নিতে হবে।'

থামস-আপের বোতল শেষ করে বললেন এম এ চিদাম্বরম : 'স্যার, অত উতলা হওয়ার কিছু নেই। আমাদের লং কেরিয়ারে এমন লজ্জায় বহুবার পড়েছি। ইন ফ্যাক্ট, এখন আর লজ্জা-টজ্জা হয় না। বলছিলাম কী, কিস্যু চিন্তা করবেন না। নেক্সট ইয়ার পাকিস্তান

ইন্ডিয়ায় আসছে। দেখে নেবেন স্যার, আমরা থ্রি-নিল-এ সিরিজ জিতব। কপিলদেব 'ম্যান অফ দি সিরিজ' হবে। জাহির আব্বাস থার্ড টেস্টে এসে টিম থেকে বাদ পড়বে। ইমরান গট আপ করে ম্যাচ ছেড়েছে— এই অভিযোগ করবে ট্যুর-এ চান্স না পাওয়া ওয়াসিম রাজ্য। স্যার, বহুকালের এক্সপিরিয়েন্স, মিলিয়ে নেবেন।'

—"ভাল কথা। কিন্তু, হাউ আর ইউ সো সিওর?"

—'স্বরূপ কিষাণ, রামস্বামী, ঘোটসকার এবং মহম্মদ ঘাউসের সঙ্গে কথা হয়েছে। ওরা এখনও ভাল ফর্মে আছে। প্র্যাকটিস চালিয়ে যাচ্ছে রঞ্জি ম্যাচে। এই চারজনকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কাজে লাগালে চিন্তার কিছু নেই। ম্যাচ প্র্যাকটিস ছাড়াও, ওদের অভিজ্ঞতা দরকার। আমার প্রস্তাব, এই চারজনকে শেষ দুটি টেস্ট দেখার জন্য পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হোক। ওদের আম্পায়ারদের কাছে এখনও অনেক কিছু শেখার আছে।'

চিন্নাস্বামী ফেরিনজাইটিসে ভুগছেন, কোল্ড ড্রিঙ্কস বারণ। থামস-আপ-এর বোতল বাঁ হাতে ধরে রেখে তিনি বক্তব্য রাখলেন: 'হোম সিরিজে আমরা জিতবই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপাতত বড় লজ্জা। কানমাদিকার মিটিং শুরু হওয়ার আগে কিছু কথা বলছিলেন। আমরা এখন বিস্তারিতভাবে সেইসব কথাই শুনতে চাই।'

থামস-আপের দ্বিতীয় বোতলে দ্বিতীয় চুমুক দিয়ে কানমাদিকার শুরু করলেন, 'আমি বলছিলাম কি, এত দুঃখ বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। আমরা তো এই লাইনটাও নিতে পারি, সব দেশের সঙ্গে সব টেস্টে হারি ক্ষতি নেই, আমরা প্রচুর রেকর্ড করব। টেস্ট-ক্রিকেটের রেকর্ড বুকে শুধু ইন্ডিয়া আর ইন্ডিয়ার ক্রিকেটারদের নাম ছাপা থাকবে।'

এন কে পি সালভে : 'সেটা কী করে সম্ভব?'

— 'স্যার, এসব বুঝিয়ে বলার জন্যই আমরা ফেমাস স্ট্যাটিসটিসিয়ান আনন্দজি দোসাকে ডেকেছি।'

আনন্দজি দোসা বোর্ডের কর্মকর্তা নন, তাই থামস-আপ ছাড়াই বলতে শুরু করলেন: 'রেকর্ডের কথা ভেবে অনেক দুঃখ ভুলে থাকা যায়। এই যে সানি গাভাসকার ব্র্যাডম্যানের ২৯টা সেঞ্চুরির রেকর্ড ভাঙার দিকে একটু একটু করে এগচ্ছেন, সেই উত্তেজনায় দশ-বিশটা ম্যাচ হারার দুঃখ ভুলতে পাবলিক রাজি।

হায়দরাবাদে ফোর্থ টেস্টেও ইন্ডিয়া ইনিংস ডিফিট খেয়েছে বলে কিছু লোক অসন্তুষ্ট। কিন্তু তিনটে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে আমাদের নাম লেখা হয়ে গেছে, তার খবর রাখেন? প্রথমটা সবাই জানেন, বিশ্বনাথ, টানা ৮৫টা টেস্ট খেলে গ্যারি সোবার্সের রেকর্ড ছুঁলেন। দ্বিতীয়, ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে মুদাস্সর নজর-জাভেদ মিয়াঁদাদ জুটি ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়লেন। কার বিরুদ্ধে? হুঁ হুঁ এখানেও রেকর্ড বুকে ইন্ডিয়ার নাম থাকল। সেকেন্ড ইনিংসে সরফরাজ নওয়াজ কপিলদেবের তিনটে উইকেটই ছিটকে দেয়। ক্রিকেটের ইতিহাসে এমন ঘটনা দু'বার ঘটলেও, টেস্টে এই প্রথম। সরফরাজের সঙ্গে ইন্ডিয়ার কপিলদেবের নামটাও রেকর্ড বুকে থাকবে।'

— 'ফিফথ টেস্টে কী হবে?'

— 'কী আবার হবে? বড় জোর ইনিংস ডিফিট হবে। কিন্তু আমরা আরও রেকর্ড করব, একথাও সত্যি। ফাস্ট অফ অল, ভিশি, আমাদের বিশ্বনাথ টানা ৮৬টা টেস্ট খেলে গ্রেট সোবার্সের রেকর্ড ভেঙে দেবে। এখানে একটা রিকোয়েস্ট রাখি, আগামী দশটা ইনিংসের মধ্যে একটায় ভিশি নিশ্চয় বড় রান করবে, তার বেসিসে ওকে আরও অন্তত ৩৫টা টেস্ট খেলানো দরকার। টানা ১২০টা টেস্ট খেলার রেকর্ড কোনওদিনই কেউ ভাঙতে পারবে না। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড ওভালে করেছিল ৭ উইকেট ৯০৩। কপিলদেব এবং দোশি এবং পাকিস্তানের আম্পায়াররা এখনকার ফর্মে থাকলে এই রানটা জাহির-নজর-জাভেদ-ইমরানরা নিশ্চয় তুলে ফেলবে। সোবার্সের ৩৬৫ নট আউটের রেকর্ডটা জাহির বা জাভেদ ভাঙতে পারে, যদি ইমরান ডিক্লেয়ার না করে বা আমাদের ফিল্ডাররা হঠাৎ ক্যাচ ধরে না ফেলে বা আম্পায়াররা ভুল করে আঙুল তুলে না ফেলে। দুটি রেকর্ডের সঙ্গেই ইন্ডিয়ার নাম থাকবে।'

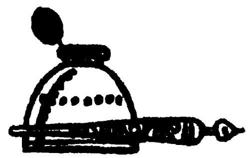
— 'তারপর?'

ক্রিকেটের সব রেকর্ডের সঙ্গে আমাদের নাম থাকতে পারে। লিলির সবচেয়ে বেশি উইকেটের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে কপিলদেব, যদি ওকে আমরা অন্তত ১৫০টি টেস্টম্যাচ খেলাতে রাজি থাকি। দোশিকে দিয়েও রেকর্ডটা করানো যায়, কিন্তু সেক্ষেত্রে ১৮০টা টেস্ট লাগবে। সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ডটা বয়কটের হাত থেকে সানি ছিনিয়ে নেবেই। কিন্তু গ্রেগ চ্যাপেল তাড়া করছে, ভিভ রিচার্ডস পাঁচ বছর টপ-ফর্মে থাকলে তো কথাই নেই। এই রেকর্ডটা আমরা বেঙ্গসরকারের জন্য বরাদ্দ করতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ২২৫টা টেস্টম্যাচ খেলালে দিলীপ দশ হাজার রান করবেই।'

— 'কিরমানির জন্য কোনও রেকর্ড ভাবা যায় না?'

— 'টানা তিন টেস্টে বাই দেয়নি কিরি, সেই রেকর্ড তো আছেই। তবে, রেকর্ডটাকে আরও মজবুত করে রাখা দরকার। আমাদের বোলাররা এখনকার ফর্মে বল করলে ওয়েস্ট ইন্ডিজে টানা ছ'ঘণ্টা টেস্টে কিরি বাই রান দেবে না। কারণ, একটি বলও ব্যাট অতিক্রম করে উইকেটের পিছনে যাবে না।'

২৩



পাকিস্তান সফরে শোচনীয় বিপর্যয়ের পর ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কর্মকর্তারা করাচিতেই এক বিশেষ আলোচনা সভায় বসেন, এই খবরটা যে কোনও দৈনিক পত্রিকা আপনাদের দিতে পারল না, সেজন্য যাবতীয় দৈনিক পত্রিকার রিপোর্টারদের ব্যর্থতাই দায়ী। এবং একমাত্র আমিই যে খবরটা দিতে... সেজন্য... হেঁ হেঁ... নিজের মুখে আর কী বলব!

মিটিংয়ে সবাই একটা কথা বার বার বলেন : 'কিছু একটা করতে হবে।' এবং সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে সবার পছন্দসই টিমই পাঠানো উচিত। যাতে, ভারতের বিরুদ্ধে প্রতি ইনিংসে এক হাজার এবং ভারতের পক্ষে প্রতি ইনিংসে বাহাত্তর রান হলেও কেউ সমালোচনা না করতে পারে। ঠিক হয়, দেশে ফিরেই বোর্ড সম্পাদক ভারতবর্ষের নামকরা সব পত্রিকার স্পোর্টস এডিটরদের কাছে জানতে চাইবেন, তাঁদের মতে কাদের কাদের ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঠানো উচিত। তাঁদের প্রস্তাবিত কাউকেই বাদ দেওয়া হবে না।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের স্পোর্টস এডিটর পাকিস্তানে গিয়েছিলেন। তিনি ফেরার সময় প্লেনে বসেই নিজের মতামত জানিয়ে দেন : 'গাভাসকার থাকলে টিম স্পিরিট আসবে না। কিরমানি গাভাসকারের ইয়েসম্যান, ওকেও সরিয়ে ফেলা উচিত।

শিবরামকৃষ্ণানকে রঞ্জি ট্রফিতে অনেক উইকেট পেয়ে অভিজ্ঞ হওয়ার সুযোগ দেওয়ার জন্য ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া দরকার। শ্রীকান্তকে ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে দশ পনের বছর বাদে ও অশোক মানকড়ের রঞ্জি ট্রফি রেকর্ড ভাঙতে পারে। টেস্ট ক্রিকেট ওর জায়গা নয়। গাভাসকার, কিরমানি, শিবরামকৃষ্ণান এবং শ্রীকান্তর বদলে চেতন চৌহান, সুরিন্দর খান্না, রাকেশ শুক্লা এবং রামন লাম্বাকে নেওয়া হোক। একস্ট্রা উইকেটকিপার হিসাবে বেদরাজ ঠিক আছে।

দি স্টেটসম্যানের স্পোর্টস এডিটরও প্লেনে বসেই মতামত দেন : 'পাকিস্তান ট্যুরের সতের জনের (শেখর-সহ) মধ্যে বিশ্বনাথ, সন্দীপ পাতিল, মনিন্দার সিং এবং শেখরকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। এই চারজনের বদলে অশোক মালহোত্রা, গুরশরণ সিং,

রাজিন্দার সিং হনস্ এবং রাজেশ পিটারকে নিন। সেকেন্ড উইকেটকিপার হিসাবে বেঙ্গলের সম্বরণ ব্যানার্জিকে নিতে পারেন। পাকিস্তান ট্যুরের বাকি তেরজনকে টিমে রাখা উচিত।'

'দি হিন্দু' পত্রিকার স্পোর্টস এডিটর করাচিতেই টেলিফোনে বলেন, 'পাকিস্তান ট্যুরের এই চারজনকে বাদ দেওয়া উচিত— দিলীপ বেঙ্গসরকার, অরুণলাল, দিলীপ দোশি এবং মদনলাল। এই চারজনের বদলে ডাকা হোক সুরিন্দার অমরনাথ, প্রণব রায়, শিবলাল যাদব এবং রণধীর সিংকে। সেকেন্ড উইকেটকিপার হিসাবে ভরত রেড্ডি ছাড়া অন্য কারও কথা ভাবাই উচিত নয়।'

হিন্দুস্থান টাইমস-এর স্পোর্টস এডিটর জানান, 'পাকিস্তান ট্যুরের চারজন— বলবিন্দার সিং সাঁধু, রবি শাস্ত্রী, যশপাল শর্মা এবং কপিলদেবকে ছেঁটে ফেলা উচিত। মানে, কপিলের বিশ্রাম দরকার। ওয়েস্ট ইন্ডিজে তো বিশ্রাম পাওয়ার কোনও চান্স নেই। এই চারজনের বদলে রজার বিনি, গোপাল শর্মা, অশোক মানকড় এবং সুনীল ভালসনকে টিমে নেওয়া হোক। সেকেন্ড উইকেটকিপার হতে পারে এস বিশ্বনাথ।'

ডেকান হেরাল্ডের স্পোর্টস এডিটরের মতামত: 'ফার্স্ট অফ অল গাভাসকারকে রাস্তা দেখানো উচিত। এছাড়া, ল অফ অ্যাভারেজ অনুযায়ী মহিন্দার অমরনাথ ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভাল খেলবে না ধরে নিলে, ওকেও বাদ দেওয়া যায়। দিলীপ দোশি আর সন্দীপ পাতিল টিমের প্যাসেঞ্জার, ওরাও দেশে যাক। টিমে আনা হোক এই চারজনকে— শশীকান্ত খণ্ডকার, পার্থসারথি শর্মা, অংশুমান গায়কোয়াড় এবং নরসীমা রাও। সেকেন্ড উইকেটকিপার হোক জুলফিকার পার্কার।'

অন্যান্য পত্রিকার স্পোর্টস এডিটরদের মতামতও আসছিল। কিন্তু মাঝপথেই হিসাব করে দেখা গেল, পাঁচজন স্পোর্টস এডিটরের পছন্দসই টিম করতে গেলে এই ক্রিকেটারদের ট্যুরে নিতেই হয়— গাভাসকার, কপিলদেব, বিশ্বনাথ, অরুণলাল, শ্রীকান্ত, বেঙ্গসরকার, পাতিল, যশপাল শর্মা, মহিন্দার অমরনাথ, রবি শাস্ত্রী, দিলীপ দোশি, মনিন্দার সিং, শেখর, মদনলাল, বলবিন্দার সিং সাঁধু, শিবরামকৃষ্ণান, কিরমানি, চেতন চৌহান, সুরিন্দর খান্না, রাকেশ শুক্লা, রামন লাম্বা, অশোক মালহোত্রা, গুরশরণ সিং, রাজিন্দার সিং হনস, রাজেশ পিটার, বেদরাজ, সম্বরণ ব্যানার্জি, সুরিন্দার অমরনাথ, প্রণব রায়, শিবলাল যাদব, রণধীর সিং, ভরত রেড্ডি, রজার বিনি, গোপাল শর্মা, অশোক মানকড়, সুনীল ভালসন, এস বিশ্বনাথ, শশীকান্ত খণ্ডকার, পার্থসারথি শর্মা, অংশুমান গায়কোয়াড়, নরসীমা রাও এবং জুলফিকার পার্কার। ৪২ জন। এরপর বেঙ্কটরাঘবনের নাম সুপারিশ করেন দুজন। দাঁড়াল ৪৩!

কিন্তু ভারত সরকার এতজনকে সফরে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি না দেওয়ায় বোর্ডের মহৎ পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত, প্রায় সবাইকে অসন্তুষ্ট করে এবং সমালোচনার সুযোগ দিয়ে সেই সতেরজনকেই নির্বাচিত করা হয়।

২৪

এডিটর সাহেব আমাকে যতই তুচ্ছতাচ্ছিল্য করুন, এত বড় শত্রুতা করবেন, ভাবতে পারিনি। আমি হঠাৎ চান্স পেয়ে সুনীল গাভাসকারের ইন্টারভিউ করেছি, অবিচারের দেশের আম্পুর ইন্টারভিউ নিয়েছি, আরও যত বাঘা বাঘা লোকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি। কিন্তু, এডিটর সাহেবের মুখে নামটা শুনেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। এত কঠিন অ্যাসাইনমেন্ট আমাকে দেওয়া কেন, যখন পত্রিকার নামীদামি রিপোর্টাররা সুস্থ আছে? আসলে, ওই আম্পুর ইন্টারভিউয়ের পর থেকে আমার খুব নাম হয়ে গেছে। মুখে স্বীকার করার লোকই নন, কিন্তু কাজে প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, কঠিন ইন্টারভিউয়ের ব্যাপারে এডিটর সাহেবের সবচেয়ে বড় ভরসা এখন এই বান্দা।

সকাল পৌনে দশটায় মেট্রোপোল হোটেলে পৌঁছে দেখি, পাঞ্জাব ফুটবল টিমের ক্যাপ্টেন গুরচরণ সিং পারমার তখনও ঘুম থেকে ওঠেননি। অপেক্ষা করতে করতে নার্ভাসনেস বেড়ে যাচ্ছিল। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম, এত বড় খেলোয়াড়ের ইন্টারভিউ আমি জীবনে নিইনি। ভাল কাজ করাও মুশকিল, যত কঠিন কাজ ঘাড়ে চেপে যায়।

দশটা তিন মিনিটে একটা মোটা নিমগাছের ডাল দাঁতে ঘষতে ঘষতে আবির্ভূত হলেন পারমার। মাত্র দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হয়ে আমার সামনে বসলেন। নিজে তিন গ্লাস দুধ খেয়ে এবং আমার দিকে এক কাপ চা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বলুন দাদা, কী বলবেন।'

— 'ইন্টারভিউ নেব।'

— 'ইন্টারভিউ দিতে হবে বলে আমি মিলিটারিতে চাকরি নিইনি। খেলতে এসে ইন্টারভিউ দিতে যাব কেন?'

— 'সরি। আমি কিছু কথা জানতে এসেছি। কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি খেলতে এসে কেমন লাগছে?'

— 'ভাল। মোহনবাগান মাঠ ভাল। আনারকলির ফুড ভাল। মেট্রো সিনেমা ভাল। পাবলিকের গালাগালিও ভাল। শুধু—'

পারমার কী যেন বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। তখন আমি : 'বলুন না, শুধু....?'

— 'শুধু রেফারিগুলো খারাপ।'

— 'আমাদের ফার্স্ট ম্যাচের রেফারিং খারাপ হয়েছে, বলছেন? তিনি কিন্তু বাংলার রেফারি নন।'

— 'দূর, আপনি এত কম বোঝেন কেন?'

আমি সত্যিই কম বুঝি, কিন্তু এই কথাটা যে পারমারও বুঝে যাবেন, বুঝতে পারিনি। পারমার বলে চললেন : 'খেলা কলকাতায়, সবই তো আই এফ এ-র হাতে। বাংলা আমাদের ফেস করতে চায় না, তাই প্রথম থেকেই রেফারি দিয়ে আমাদের নাজেহাল করতে চাইছে।'

— 'বেশ, বেশ। একটা ভাল কথা পাওয়া গেল। আমরা আপনার এই বক্তব্য দিয়েই হেডলাইন করব। পাবলিক খবরটা দারুণ খাবে এবং গালাগালি দেবে।'

আমাদের এডিটর সাহেব আমারই মতো একটা ডেইলি পেপারেও কাজ করেন। পরদিনই ওই কাগজে খবরটা বেরিয়ে গেল। এবং সেইদিনই দুপুরে পাঞ্জাবের কোচ এবং কর্মকর্তাদের ডেকে আই এফ এ-র অশোক মিত্র বোঝালেন, ওই বিবৃতি অস্বীকার না করলে খুব মুশকিল হবে। হাসিমুখ অশোক মিত্রর পাশে দাঁড়িয়ে গোমড়ামুখ পারমার সেইদিন বিকালেই মাঠে ঘোষণা করলেন, 'আমি ওই সব কথা বলিনি।' অশোক মিত্র চিমটি কেটে ইশারা করায় পাঞ্জাবের কোচ ভিরক বললেন, 'আমিও কোনও কথা ওই রিপোর্টারকে বলিনি।' পরে ভিরক অশোক মিত্রকে পাল্টা চিমটি কেটে বললেন, 'ওই রিপোর্টে তো কোথাও বলেনি যে আমার সঙ্গে কথা বলেছে।'

পরদিন দুপুরে টেবিলে মাথা রেখে দিবানিদ্রা প্র্যাকটিস করছি, এডিটর সাহেব পিঠে হাত রেখে বললেন, 'মাথা নিচু করে কাঁদার কিছু নেই। এবার আপনি এক কাজ করুন, বক্তব্যের নিচে পারমারের সই নিয়ে আসুন।'

পরদিন সকাল দশটা এগার মিনিটে মেট্রোপোল হোটেলে পৌঁছে দেখি, পারমার একটু আগে উঠে গেছেন, একবাটি দুধ খাওয়াও হয়ে গেছে, একমনে আখরোট খাচ্ছেন।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল আমাকে এমন বিপদে ফেললেন কেন? আপনি ইন্ডিয়া টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন হয়ে মিথ্যা কথা বলতে পারলেন?'

— 'সরি দাদা। কাল মাঠে যা বলেছি, চাপে পড়ে বলেছি। টিমের স্বার্থে বলেছি। আই এফ এ-র সেক্রেটারি সাহেব বললেন, আমি রেফারিদের বিরুদ্ধে বলায় রেফারিরা নাকি ডিসিশন নিচ্ছে, আমাকে পরের ম্যাচেই রেড কার্ড দেখিয়ে দেবে। তাই, ভয়ে বলেছি, 'এসব কথা বলিনি!' কিছু মনে করবেন না। কাল রাত্রে আমার ঘুম হয়নি। মিথ্যা কথা বলার প্র্যাকটিস নেই কিনা! এখন কী করতে হবে বলুন।'

ওপরের কথাগুলো অবিকল লিখে নিয়ে, নিচে পারমারকে সই করতে বললাম। বিশ্বাস করুন, পারমার ইংরেজিতে সই দিলেন।

পরদিন আমাদের কাগজে পারমারের এই বক্তব্য প্রকাশিত হল।

বিকালে মাঠে সাংবাদিকদের ডেকে পারমার বললেন, 'আমি এসব কথা বলিনি।' অশোক মিত্র কোচ ভিরককে চিমটি কাটতেই ভিরক সেই চিমটি ফিরিয়ে দিলেন, এদিন

আর কিছু বললেন না। আমাদের প্রতিনিধি বললেন, 'ওই বক্তব্যের নিচে আপনি সই করে দিয়েছেন যে।' পারমার বললেন, 'ওই সইটা তো? ওটা আমার নয়। আমি বলে ইংরেজিতে সই-ই করতে পারি না।'

— 'ইংরেজিতে সই আছে, জানলেন কী করে?'

অশোক মিত্র সঙ্গে সঙ্গে পারমারকে টেনে নিয়ে গেলেন। রাত্রেই এডিটর সাহেব বললেন, 'জানতাম, পারমার ব্যাপারটা এত সহজ নয়। থাকগে, এবার টেপ রেকর্ডার নিয়ে যান।'

গেলাম। পরদিন সকাল সাড়ে দশটায় মেট্রোপোল হোটেলের দুশো তিন নম্বর ঘরে গিয়ে দেখি, পারমার একমনে দাড়ি কামাচ্ছেন। গোঁফ ছাঁটার পর বললেন, 'সরি দাদা। আমাদের ম্যানেজারের চাপে কাল বিকালে মাঠে ওসব কথা বলতে হল। রেফারিরা সত্যিই জ্বালাচ্ছে। আই এফ এ সব কিছুর পিছনে আছে। আমি আবার সই করে দিচ্ছি, লিখুন।'

— 'না, সইটই দরকার নেই। আপনার কথাগুলো টেপ রেকর্ডারে তোলা থাকল। এটাই যথেষ্ট।'

— 'ঠিক আছে। দাদা এক কাপ চা খান।'

পরদিন সকালের কাগজে পারমারের বক্তব্য ছাপা হল। ক্যাসেট হাতে থাকায় এডিটর সাহেব বুক ফুলিয়ে বড় হেডলাইন দিয়ে ছাপলেন। এবং বিকালে মাঠে আবার অশোক মিত্রর সঙ্গে পারমার এসে সাংবাদিকদের বলেন, 'আমি ওসব বলিনি।' আমাদের রিপোর্টার বললেন, 'সে কি! আপনার কথাগুলো তো এবার টেপ রেকর্ডারে ধরা আছে।'

— অশোক মিত্র বললেন, 'কলকাতায় অনেক ভাল ভাল কমেডিয়ান আছে, তাঁদের মধ্যে কাউকে দিয়ে হয়ত পারমারের গলার স্বর নকল করান হয়েছে।'

পরদিন দুপুরে, টেবিলে মাথা রেখে সত্যিই কাঁদছিলাম। মাথায় হাত রেখে অপ্রত্যাশিত উদার গলায় এডিটর সাহেব বললেন, 'পাবমারকে নিয়ে একেবারে লেজেগোবরে হয়ে গেলেন দেখছি। একটা ভিডিও কেনার চেষ্টা চলছে। ওটা পেয়ে গেলে, পারমারকে ইন্টারভিউ করবেন, তার আগে নয়।'

২৫

এই সেই বিখ্যাত বটগাছতলা। বাঁচালে, এই বটগাছতলাই আমাকে বাঁচাবে। এখনও কেউ আসেনি, কেউ মানে কোনও প্লেয়ার। একজন এলেই আমার কাজ হয়ে যায়। তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে হবে। বলতে হবে, এছাড়া আমার মানসম্মান টিকিয়ে রাখার আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। স্ট্র্যান্ড রোডে স্টেট ব্যাঙ্কের মেইন ব্রাঞ্চের পাশের রাস্তার ধারের বটগাছতলার এক ভাঁড় চা খেতে খেতে এইসব কথাই ভাবছিলাম।

ব্যাপারটা দেখছি খুলেই বলতে হচ্ছে। এই নিয়ে চারবার আমাদের এডিটর সাহেব প্রশ্ন করেছেন, 'একটা স্কুপ তুলে আনতে পারেন না, আপনি মশাই কীসের রিপোর্টার?' মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কাটা ঘায়ে পরিমাণ মতো নুনের ছিটে দিয়ে তিনি বললেন, 'আগে থেকে জেনে শুনে কোথাও গিয়ে ব্যাপারটা কভার করেই ভাবছেন বিরাট জার্নালিস্ট হয়ে গেছেন! ফু! একটা এক্সক্লুসিভ নিউজ আনতেও পারেন না—'

অপমান, অপমান। এমনকি আমিও বেশ অপমানিত বোধ করলাম। এবং ঠিক করে ফেললাম, স্কুপ তুলে আনবই, এক্সক্লুসিভ নিউজ জোগাড় করবই। প্রথমেই ভাস্কর গাঙ্গুলির নাম মনে পড়ল। এখন দলবদলের বাজার। ভাস্কর খুব দয়ালু ছেলে, আমাকে বেশ পাত্তাটাত্তা দেয়। ওকে নিয়েই একটা এক্সক্লুসিভ দলবদল স্টোরি নামাতে হবে। তাই, বটগাছতলায় অপেক্ষা।

ঠিক দশটা সাত মিনিটে ভাস্কর এল। এসেই 'কী ব্যাপার সাপুড়েদা' বলে ডান হাতটা এত সুন্দরভাবে চেপে ধরল যে আমার বাঁ হাতটাও ব্যথা হয়ে গেল। তবু, ভাস্কর বলে কথা। ও আমার হাত ভেঙে দিলেও কিছু বলব না। একে বড় গোলকিপার। তার ওপর আমাকে পাত্তা দেয়।

বললাম, 'ভাস্কর, অফিসে আমার প্রেস্টিজ পাংচার। আমি নাকি একটাও এক্সক্লুসিভ স্টোরি করতে পারি না। এই অপমান থেকে একমাত্র তুমিই বাঁচাতে পার।' ভাস্কর হাসতে হাসতে বলল, 'আরে ঘাবড়াচ্ছেন কেন? আপনাদের এডিটরের সঙ্গে আমার রিলেশন খুব ভাল। লোকটার মাথা একটু মোটা, তবে এমনিতে খুব খারাপ নয়। আমি টেলিফোন করে দিচ্ছি, আর আপনাকে বকাবকি করবে না। আহা, আপনার মনে খুব লেগেছে,

সাপুড়েদা।'

আমি ভাস্করের কথায় রাজি হতে পারলাম না। বললাম, 'দ্যাখ ভাস্কর, তোমার শরীর দয়ার শরীর। এই অপমান থেকে তুমিও যদি না বাঁচাও।'

ভাস্কর গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আমাকে কী করতে হবে, বলুন।'

— 'বেশ। বল ভাস্কর, এটা কিন্তু একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ, তুমি এবার কোন টিমে সই করছ?'

— 'আমি ইস্টবেঙ্গলেই থাকছি।'

— 'এইরকম বললে এক্সক্লুসিভ স্টোরি কী করে হবে? তুমি ইস্টবেঙ্গলে থাকছ, এটা তো অনেকেই লিখে দিয়েছে। আমি নতুন কিছু চাই।'

— 'তার মানে?'

— 'মানে, আমি লিখব, ভাস্কর মোহনবাগানে যাচ্ছে।'

ভাস্কর আঁতকে উঠে বলল, 'সেকি আমি তো মোহনবাগানে যাচ্ছি না!'

— 'জানি। কিন্তু আমি লিখব। এবং এই স্কুপটা আর কেউ পাবে না, গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। এখন বল ভাস্কর, তুমি কেন ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছ? বল ভাই, কিছু বল। লেখাটা একটু সাজাতে গোছাতে বাড়াতে হবে তো, বল।'

— 'দূর মশাই, আমি ইস্টবেঙ্গল ছাড়ছিই না, কেন ছাড়ছি কী করে বলব?'

— 'তোমার শরীরে এত দয়া, আমার মতো ফালতু লোককেও তুমি এত পাত্তা দাও, এটুকু পারবে না? গত এক বছরে কখনও কোনও কর্মকর্তা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি?'

— 'না।'

— 'কী মুশকিল, কোনও কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ কেউও খারাপ ব্যবহার করেনি?'

— 'না।'

— 'কোনও কর্মকর্তা তোমার ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি?'

— 'না।'

''প্লিজ ভাস্কর, একটু ভেবে দ্যাখ, কোনও কর্মকর্তার ঘনিষ্ঠ কেউ তোমার ঘনিষ্ঠ কারও সঙ্গেও খারাপ ব্যবহার করেনি?

— 'না।'

— 'হুম্। যাকগে, তোমার ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার কারণটা আমাকেই একটা বানিয়ে দিতে হবে। এখন চলি।'

ভাস্কর খুব চিন্তিত মুখে বলল, 'কিন্তু সাপুড়েদা, আপনি তো এই স্টোরিটার জন্য আরও বিপদে পড়বেন, আরও অপমানিত হবেন। কারণ, আমার মোহনবাগানে যাওয়ার কোনও চান্সই নেই।'

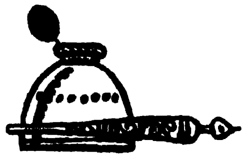
সম্প্রতি, টের পাচ্ছি, আমার কিছু বুদ্ধিশুদ্ধি হয়েছে। বললাম, 'কোনও ক্ষতি নেই। নেক্সট্ উইকে স্টোরি করব, এই এই কারণে ভাস্কর মোহনবাগানে গেল না। এডিটর

সাহেবকে বলব, দুই সপ্তাহের মধ্যে আমি দুটো এক্সক্লুসিভ স্টোরি তুলে এনেছি। এক, ভাস্করের মোহনবাগানে যাওয়ার খবর। দুই, শেষ পর্যন্ত মত পাল্টানোর খবর।'

বেশ উদ্বেগের সঙ্গে ভাস্কর বলল, 'এসব করতে যাবেন না, সাপুড়েদা। আপনার চাকরিটা মাঝ থেকে যাবে। এইভাবে ভুল খবর ছাপাকে এক্সক্লুসিভ স্টোরি বলে নাকি?'

দেশলাই কাঠি দিয়ে কানে সুড়সুড়ি খেতে খেতে বললাম, 'বলে, বলে। যেমন লাস্ট এশিয়াডের সময় একজন রিপোর্টার দিল্লি থেকে স্কুপ করল, নাইনটিন নাইনটি টু-তে দিল্লিতে অলিম্পিক হচ্ছে। দু দিন পর সেই রিপোর্টারই আর-একটা স্টোরি করল : দিল্লিতে অলিম্পিক হচ্ছে না। দুটো খবরই আর কোথাও বেরয়নি!

২৬



নইলে গদি ছাড়তে হবে'— বলার মতো বুকের পাটা আমার নেই। গদি না থাক, আমার জন্য একটা কাঠের চেয়ার আছে, বাড়াবাড়ি করতে গেলে সেটাও চলে যাবে। আমাদের এডিটর সাহেবকে তো চেনেন না।

গত এক বছরে জার্নালিস্ট হিসাবে আমার কম নাম তো হল না। কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ঘুরে বাঘা বাঘা লোকের ইন্টারভিউ করে এনেছি।

অফিসে কোনদিনই তিন ঘণ্টার বেশি ঘুমাইনি। ঘণ্টায় চুয়াল্লিশটা শব্দ লিখতে পারি। হাতের লেখা অন্তত নিজে মোটামুটি পড়তে পারি। প্রুফ দেখলে এক পৃষ্ঠায় আটাশটার বেশি ভুল থাকে না। তবু, শুনে অবাক এবং দুঃখিত হবেন, আমার মাইনে বাড়ে না। সবার উন্নতি হয়, পাখা গজায়, মাইনে বাড়ে। শুধু আমিই এক জায়গায় পড়ে থাকি। মাঝেমাঝে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা হয়। ভাবি, নিজের একটা ম্যাগাজিন বার করে ফেলব নাকি!

শুধুই ভেবেই গেছি। কিন্তু সবাই তো আমার মতো ভীতু আর কুঁড়ে নয়। দিন সাতেক আগে দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক হঠাৎ আমার বাড়িতে হাজির। কী ব্যাপার? তিনি এবং আরও দু-তিনজন মিলে একটা স্পোর্টস ম্যাগাজিন বার করবেন, আমাকে চাই!

প্রথমে চশমার কাচ, তারপর কপালের ঘাম মুছে আর্তনাদ করে উঠলাম : 'আমাকে চাই! সাতসকালে ঠাট্টা করতে এলেন।'

ভদ্রলোক বেশ ভিজিয়ে কথা বলতে জানেন। বললেন, 'ঠাট্টা নয় বাবুরাম বাবু, এটাই ঘটনা। আপনাদের ফালতু এডিটরের কথায় ব্যবহারে আপনার ধারণা হয়েছে, আপনি খুব বাজে লেখেন। আসলে, আপনি এডিটরের চেয়ে ঢের ভাল লেখেন। আমরা আপনার ট্যালেন্টকে ঠিকভাবে ব্যবহার করতে চাই।'

নতুন ম্যাগাজিন নিয়ে মিটিং ছিল ৪ মার্চ, সন্তোষ ট্রফি ফাইনালের আগের দিন সন্ধ্যায়। বেশ সেজেগুজেই গিয়েছিলাম, বুঝলেন। বসেও ছিলাম, বেশ গাম্ভীর্য নিয়ে। চার-পাঁচজন উদীয়মান সাংবাদিককেও দেখলাম। শুধু একজনই কিছুটা বয়স্ক, কে জানে ইনিই হয়ত এডিটর।

'কিছুটা বয়স্ক' ভদ্রলোক বললেন, 'আমরা একটা স্পোর্টস ম্যাগাজিন করতে চাই। বাজারে একটাও ভাল কাগজ নেই। সেই অভাব আমরা হৈ হৈ করে মেটাব। কার কী সাজেশান আছে দিন, কাজে নেমে যাই।'

কাজে নামার কথায় তড়াক করে উঠে দাঁড়ালেন এক তরুণ ক্রীড়া সাংবাদিক। মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সী এই তরুণ বললেন, 'প্রচলিত ধারা থেকে সরে আসার দায়িত্ব আমাদের মত তরুণদেরই নিতে হবে। বন্ধুগণ, এ দায়িত্ব পালন না করলে তো....।' বেশ আবেগদীপ্ত মেঠো বক্তৃতা। কোনও সাজেশন অবশ্য পাওয়া গেল না।

সম্ভাব্য এডিটর সাতান্ন ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার আপনি বলুন।'

দেখিনা কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। আগেভাগে কথা বলে বিপদে পড়ার কী দরকার। মাথায় এক টিপ নস্যি পরিমাণ বুদ্ধি নেই, একথা পাবলিককে যত দেরিতে জানানো যায়, ততই ভাল। গম্ভীর মুখে বললাম, 'আগে অন্যরা বলুন।'

আমার চেয়েও গম্ভীর এক সাংবাদিক বললেন, 'আমাদের কাগজের প্রধান লাইন হওয়া উচিত সবচেয়ে পপুলার স্পোর্টস ম্যাগাজিনের পাল্টা স্টোরি করা।'

সম্ভাব্য এডিটর নড়েচড়ে বসলেন— 'তার মানে?'

— 'মানে, ধরুন, ঐ পত্রিকার কোনও সংখ্যায় লেখা হল, পি কে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হচ্ছেন। পরের সংখ্যায় আমরা ছাপব : 'পি কে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হচ্ছেন না।' ধরুন, ঐ পত্রিকায় লেখা হল, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কপিল অধিনায়ক হবেন।' আমরা লিখব 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কপিল অধিনায়ক হবেন না।' এইরকম আর কি।'

— 'কিন্তু, পি কে ইস্টবেঙ্গলেই চলে গেলে এবং কপিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্যাপ্টেন থেকে গেলে আমাদের দশা কী হবে?'

— 'কিস্যু হবে না। কে অত মনে রাখছে? একটা ভুল খবরের পর আর-একটা আরও গরম ভুল খবর দিলে আগেরটা পাবলিক ভুলে যায়। তাছাড়া, ঐ কাউন্টার স্টোরির লাইনটা, বুঝলেন, এখন ভাল চলছে। এজন্য কোথাও যেতে হবে না। খবর নেই, পরিশ্রম নেই। শুধু পপুলার ম্যাগাজিন খুলে দেখা, কোনবার কোনটা নিয়ে কাউন্টার স্টোরি হবে সেটা বেছে নেওয়া। তারপর ঠিক উল্টে কথা লিখে দেওয়া। এতে দারুণ কিছু কাগজ চলবে না। তবে কোনরকম চলবে।'

— 'কিন্তু ওই ম্যাগাজিনের কোনও সংখ্যায় বিতর্কিত কিছু না থাকলে পরের সংখ্যায় আমরা কী করব?'

— 'কেন, কাউন্টার স্টোরি!'

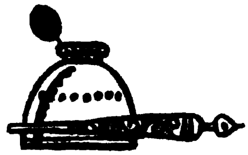
— 'কী মুশকিল! কাউন্টার করার মতো কিছু না থাকলে?'

— 'থাকবে, থাকবে। বিতর্কিত লেখা থাকতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। কিছু একটা থাকলেই হল। ধরুন, কোনও সংখ্যায় থাকল, 'লিগ জমে উঠছে'। আমরা লিখব *'লিগ মোটেই জমছে না।' এই রকম আর কি।'*

পিছনে লাগার এই লাইন সভায় ভাল সমর্থন পেল। আর একজন তরুণ সাংবাদিক বললেন ঐ পপুলার ম্যাগাজিনে কোনও এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ বেরলেই, তার বিরোধিতা করার জন্য আমরা একটা ফিচার রাখতে পারি— 'সাক্ষাৎ না করেই সাক্ষাৎকার।' আমার এক জার্নালিস্টতুতো দাদা এই হেডিংটা মাথা খাটিয়ে বার করেছেন। এই হেডিং দিয়ে আমরা তাদের সব ইন্টারভিউ সম্পর্কে লিখব : 'সাক্ষাৎ না করেই সাক্ষাৎকার।'

হঠাৎ লোডশেডিং। সম্ভাব্য এডিটর আবার অন্ধকারে কানে শোনেন না। মিটিং আবার বসবে আগামী শুক্রবার।

২৭



১১ মার্চ, শুক্রবার নতুন ম্যাগাজিনের জন্য দ্বিতীয় মিটিং বসল। সময় ছিল সন্ধে সাতটা, আমি পৌঁছলাম সাতটা বাইশ মিনিটে। কী আশ্চর্য, অন্যেরা পৌঁছে গেলেও আমার জন্যই মিটিং শুরু করা হয়নি। ইন ফ্যাক্ট, এদের কাছে আমি কতটা ইম্পর্ট্যান্ট, এটা যাচাই করার জন্যই বাইশ মিনিট লেট করেছি। সত্যি, দুনিয়া বড় বিচিত্র জায়গা। বাবুরাম সাপুড়ের জন্যেও লোকে অপেক্ষা করে!

দ্বিতীয় মিটিংয়ে দু-তিনজন নতুন লোককে দেখা গেল। একজনের মুখ বেশ চেনা। একইসঙ্গে দুটি নামে তিনি খেলার লেখকমহলে পরিচিত— কাঁচি এবং আঠা। এই দুটি বস্তুর সাহায্যে তিনি নাকি সপ্তাহে তিনটি করে লেখা নামান। দারুণ দারুণ সব সাবজেক্ট · একটিও বাউন্ডারি না মেরে পঞ্চাশ রান করেছেন কতজন ব্যাটসম্যান, একটিও উইকেট না পেয়ে তিনটি টেস্ট খেলে গেছেন কতজন বোলার, এক ওভারে দুটো ক্যাচ মিস করেছেন কতজন উইকেটকিপার— এইরকম হাজার তথ্য পুঁথিপত্র ঘেঁটে উদ্ধার এবং বিতরণ।

ফস করে একজন তরুণ সাংবাদিক বলে ফেললেন, 'কাঁচি-আঠা দাদাকে লিখতে দিলে ম্যাগাজিন কিস্যু চলবে না। খবর চাই খবর, টাটকা হাতে-গরম খবর।'

সম্ভাব্য সম্পাদক মহাশয় এক সপ্তাহেই আরও অনেকটা রাশভারি হয়ে গেছেন। পাঞ্জাবির রোল্ড গোল্ডের বোতামে হাত রেখে তিনি বললেন, ধীরে বন্ধু, ধীরে। এত উত্তেজিত হবার কিছু নেই। ধরুন, কাগজ যদি বত্রিশ পৃষ্ঠার হয়, তার মধ্যে আট-দশ পৃষ্ঠা ভুষিমাল দিতেই হবে। বত্রিশ পৃষ্ঠা হাতে-গরম চানাচুর ম্যাটার কোথায় পাব? তাই, ঐ কাঁচি-আঠা ভাইটিকেও দরকার। আমরা রোজ যা খাই, তার সবই কি প্রোটিন আর ভিটামিন? পেট ভরাতেও অনেক কিছু লাগে। ইন ফ্যাক্ট, আমাদের আরও দু-একজন কাঁচি-আঠা মার্কা লেখক চাই।'

কাঁচি-আঠা দাদা গর্বিত অথচ লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কিছু ভাববেন না। দরকার হলে আমি প্রত্যেক ইস্যুতে তিন-চার পৃষ্ঠা ভর্তি করে দেব। লং লিভ কাঁচি, লং লিভ আঠা।'

সম্ভাব্য সম্পাদক মহাশয় চশমা হাতে রেখেই প্রায় সময়ে কথা বলছিলেন। মাঝেমধ্যে শুধু চোখে রাখছিলেন। পরে শুনলাম, পাওয়ার নেই। এডিটর-এডিটর ভাব আনার জন্য চশমা নিচ্ছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাবুরামবাবু এবার কিন্তু আপনাকেই বলতে হবে। আপনি নামকরা কাগজ থেকে এসেছেন। আপনার ওপর আমাদের অনেক ভরসা। কিছু সাজেশন দিন।'

এমন মধুর করে আমার কাছে কেউ কখনও কিছু জানতে চায়নি। প্রায় গলে যেতে যেতে শুরু করলাম, 'হেঁ হেঁ, দোব, নিশ্চয় সাজেশন দোব। দেখুন, ইয়ে, বলছিলাম কি, এটা স্পেশালাইজেশনের যুগ। এই তো গতমাসে আমার বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের হাড় ভাঙল, পাড়ার গাড়িবাড়িওয়ালা অর্থোপেডিক সার্জেনের কাছে গেলাম। তিনি অসহায় মুখে বললেন, 'সরি মিঃ সাপুড়ে, কিছু করতে পারছি না। আমি ডান হাতের আঙুল নিয়ে ডিল করি। আপনি বরং ডাঃ সরখেলের কাছে যান, উনি বাঁ হাতের আঙুলের হাড়ের স্পেশালিস্ট।' ডাঃ সরখেল চিকিৎসা করলেন। এবং বললেন, 'এতেই ঘাবড়ে যাচ্ছেন। যা স্পেশালাইজেশনের যুগ আসছে, এরপর বুড়ো আঙুলের জন্য একজন, কড়ে আঙুলের জন্য আর-একজন, অন্য তিন আঙুলের জন্যও আলাদা আলাদা স্পেশালিস্ট থাকবে।' এই হচ্ছে অবস্থা। তাই বলছিলাম, ম্যাগাজিনেও এখন স্পেশালিস্ট দরকার।'

— 'কতজন স্পেশালিস্ট দরকার?'

প্রথমেই অন্তত দুজন। একজনকে হতে হবে দলবদল স্পেশালিস্ট। দলবদলের সময় পনের দিন। এর আগে দু-মাস, পরের দু-মাস— মোট সাড়ে চার মাস এই স্পেশালিস্টকে ব্যস্ত থাকতে হবে। আমাদের ম্যাগাজিনের দলবদল স্পেশালিস্ট অবশ্য ব্যাপারটা চার মাস আগে শুরু করেন, চার মাস পরেও টানেন। ফলে তিনি দলবদল নিয়ে থাকেন সাড়ে আট মাস। বাকি সাড়ে তিন মাস এটা সেটা করে কাটিয়ে দেন।'

— 'দলবদল স্পেশালিস্ট সাড়ে আট মাস ধরে কী লেখেন?'

— 'চার মাস আগে লেখেন, কে কে বিক্ষুব্ধ হয়ে কোন কোন টিম ছাড়তে পারেন। তিন মাস আগে লেখেন, কীভাবে বিক্ষোভ প্রশমিত করে টিমগুলো প্লেয়ারদের রাখার চেষ্টা করছে। দু-মাস আগে লেখেন, তিন বড় টিম নতুন কাকে কাকে পেতে চাইছে। এক মাস আগে লেখেন, কে কোন টিমে যেতে চাইছে। ঠিক দলবদলের মুখে লেখেন, কে কোথায় যেতে পারে? দলবদলের সময় লেখেন, কীভাবে কোন টিম কাকে পেল। দলবদলের পর লেখেন, কোন কোন প্লেয়ার কেন শেষ মুহূর্তে ডিসিশন চেঞ্জ করল। দলবদলের এক থেকে দু-মাস পরের লেখাগুলোয় থাকে, প্লেয়ারদের টিম ছাড়ার কারণ, অভিযোগ, কর্মকর্তাদের আমতা আমতা জবাব। দলবদলের চার মাস পরের লেখার সাবজেক্ট, কে কে দলবদল করে অনুশোচনায় ভুগছে : সামনের বছর ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে...... ইত্যাদি।'

— 'এত লেখার নাম পাওয়াও তো কঠিন?'

— 'ঠিক ধরেছেন। নাম ফুরিয়ে আসছে। একমাত্র স্পেশালিস্টের পক্ষেই নতুন নতুন

নাম জোগাড় করা সম্ভব।

দেখুন, এসব নাম, ব্যবহার করা হয়ে গেছে : দলবদলের ডায়েরী, দলবদলের নাটক, দলবদলের বাজনা, দলবদলের মাদল, দলবদলের নেপথ্যে, দলবদলের কাহিনী, দলবদলের ষষ্ঠী-সপ্তমী-অষ্টমী-নবমী-দশমী। ('দলবদলের একাদশী' এখনও বাকি আছে), দলবদলের খবর, দলবদলের বাজার, দলবদলের পালা, দলবদলের খেলা, দলবদলের মেলা, দলবদলের হাসিকান্না, দলবদলের গল্প, দলবদলের গণ্ডগোল, দলবদলের রিপোর্ট। এরপরেও বছরে অন্তত এক ডজন লেখা দলবদল নিয়ে লিখতে হবে। এত লেখার হেডিং স্পেশালিস্ট ছাড়া কে দিতে পারবে?'

— 'বাবুরামবাবু, আপনি কিন্তু অন্তত দুজন স্পেশালিস্টের কথা বলছিলেন। আর একজন কী করবে?'

— 'কোনও বড় ম্যাচ বা ফাইনালের পর ড্রেসিং রুম স্টোরি করার জন্য আর-একজন ভাল স্পেশালিস্ট দরকার। খুব সোজা কাজ নয়। আগে থেকেই খবর রাখতে হবে, হেরে গেলে কে কে কাঁদবে। সেইমত কাঁদার সময় সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। জেতার পর কাঁদার লোকও আছে। সেটাও স্পট করতে হবে। এক-আধজন প্লেয়ার থাকবেই, যে বলবে, 'প্রমাণ করে দিয়েছি যে......ইত্যাদি ইত্যাদি।'

যে গোল মিস করবে, তার অবস্থা যতই করুণ থাক, গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে, 'গোল মিস করে কেমন লাগছে?' যে গোল করল, সে যতই ক্লান্ত বা আহত থাক, তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে, 'গোল করে কেমন লাগছে?' কে কাকে কতবার কীভাবে জড়িয়ে ধরল সেই হিসেবটাও রাখা দরকার। এতসব কাজ ঠিকভাবে করার জন্য অবশ্যই একজন স্পেশালিস্ট দরকার।'

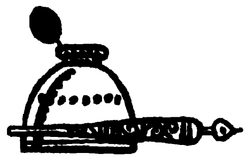
সম্ভাব্য সম্পাদক মহাশয় নড়েচড়ে বসলেন। তারপর বললেন, 'আপনি তো মশাই সবই জানেন। টু-ইন-ওয়ান স্পেশালিস্ট হিসাবে আপনিই বরং আমাদের ম্যাগাজিনে জয়েন করুন। অনেক বেশি মাইনে দেব।'

দূর, কে নতুন কাগজে যায়! হয়ত তিন মাসেই উঠে যাবে। কম মাইনে হোক, এখনকার চাকরিতে সিকিউরিটি আছে। বরং নতুন অফারটার কথা বলে আমাদের পাইপখোর এডিটর সাহেবকে চমকে দেওয়া যেতে পারে।

পরদিন এডিটর সাহেবের ঘরে ঢুকে নতুন কাগজের অফারের কথা বললাম। অফারটা যে রিজেক্ট করছি, তাও জানালাম।

পাইপের বোল থেকে ছাই ফেলতে ফেলতে এডিটর সাহেব বললেন, 'রিজেক্ট করবেন না প্লিজ। হাতে একটা ভাল ছেলে আছে, আপনি চাকরিটা ছাড়লে তাকে নিতে পারি।'

২৮



যেহেতু অলটারনেটিভ একটা অফার স্ট্যান্ডিং ছিল, গত সপ্তাহে আমি অফিসে কিঞ্চিৎ বুক চিতিয়ে বিচরণ করেছি। মানে, আমার একটু সাহস গজিয়েছিল। এডিটর সাহেব এক মনে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস পড়ছিলেন, ঠোটে নিভে-যাওয়া পাইপ। কায়দার ঠাকুরদাদা!

যাই হোক, কোনও ভনিতা-ভূমিকা না করে বললাম, 'আমার একটা প্রশ্ন আছে।'

নিভে-যাওয়া পাইপে মেজাজে টান মেরে এবং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে চোখ না তুলেই তিনি বললেন, 'করে ফেলুন।'

— 'খেলার প্রত্যেক সংখ্যায় প্রসূন-প্রশান্তর দলবদল নিয়ে এত শব্দ আর জায়গা খরচ করার কী মানে হয়?'

— 'পাবলিক এসব চাইছে, তার কী মানে হয়?'

— 'পাবলিক যদি এতই চায় আপনার ডেইলি পেপারে রোজ এই নিয়ে একটা বক্স আইটেম দিচ্ছেন না কেন?'

এডিটর সাহেব নিভে-যাওয়া পাইপ এবং ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস টেবিলে রেখে বললেন, 'দারুণ আইডিয়া! আমাদের সঙ্গে থেকে থেকে দেখছি একটু-আধটু বুদ্ধিশুদ্ধি আপনারও হয়ে গেছে! এক কাজ করুন, রোজ এই নিয়ে বক্স আইটেম করা সম্পর্কে আপনি একটা নোট দিন। কীভাবে করা যায়। এবার না হোক, সামনের বার চালু করা যাবে।

খোঁচা দেওয়ার জন্য কথাটা তুলেছিলাম, কিন্তু উল্টো ফল হয়ে গেল! কিন্তু, অর্ডার যখন হয়ে গেছে, নোট বা স্কিম প্রিপেয়ার করতেই হবে। প্রসূন-প্রশান্তর ব্যাপারটা রোজ এইভাবে দেওয়া যেত। নোট দিয়েছি ৭ মার্চ। কিন্তু ২৬ মার্চ পর্যন্ত স্কিম দিতে হয়েছে। ন্যাচারালি, একটু কল্পনা করতে হয়েছে।

৯ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত এবার একই টিমে খেলবেন, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতীয় দলে খেলার সময়েই এই সিদ্ধান্ত ওঁরা নিয়ে রেখেছেন।

১০ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত এবার ইস্টবেঙ্গলে খেলবেন। ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা

ডুরান্ডের সময়েই অর্ধেক কথা বলে ফেলেছেন, এখন শুধু প্রসূনের চূড়ান্ত সম্মতির অপেক্ষা।

১১ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত বোধহয় ইস্টবেঙ্গলে খেলবেন না। ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা প্রসূনের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন। আসলে তাঁরা প্রশান্তকে রাখতে চান, কিন্তু প্রসূনকে নিতে চান না।

১২ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত মোহনবাগানে যেতে পারেন। গৌতমও থাকলে, মোহনবাগান তিন মিডফিল্ডার নিয়ে খেলবে। শৈলেন মান্না প্রসূনের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

১৩ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত মোহনবাগানে না-ও যেতে পারেন। প্রশান্ত মনে করছেন, ওঁরা দুজন ইস্টবেঙ্গলে খেললেই ভাল হবে।

১৪ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত ইস্টবেঙ্গলে খেলবেন বলে মনে হয় না। ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা বলেছেন, ওঁর এক দাদা নাকি খারাপ ব্যবহার করেন। এর পর ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তারা এলেও কিছু করার নেই।

১৫ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত মোহনবাগানেই খেলতে পারেন। প্রশান্ত মনে করেন, এই বিষয়ে কথাবার্তা বলার জন্য মোহনবাগানের কর্মকর্তাদের এখনই কোচিন যাওয়া উচিত।

১৬ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত ইস্টবেঙ্গলে আসছেন কি? অমলরাজ মহমেডানে সই করায়, ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা একটু কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন। গৌতমের জন্য চেষ্টা অবশ্য চলছে। তবু...।

১৭ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত যাতে মোহনবাগানে খেলেন, সেজন্য শৈলেন মান্না দারুণভাবে চেষ্টা করছেন। গৌতম-প্রসূন-প্রশান্ত মোহনবাগানের মাঝমাঠে থাকলে এবং ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠ শ্মশান হয়ে গেলে মোহনবাগান সব ট্রফি পেতে পারে।

১৮ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্তকে পাওয়ার জন্য ইস্টবেঙ্গল সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আজ গৌতম সরকার মোহনবাগানে থেকে যাওয়ার জন্য সই করায়, প্রসূন-প্রশান্তর দাম ইস্টবেঙ্গলের কাছে বেড়ে গেল।

১৯ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত হয়ত মোহনবাগানেই খেলবেন। ইস্টবেঙ্গল বিশ্বাসঘাতকতা করার পর, প্রসূন নিজের এবং প্রশান্তর হয়ে মোহনবাগানের সঙ্গে কথা বলে ফেলেছেন।

২০ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত সম্ভবত ইস্টবেঙ্গলে খেলবেন। প্রশান্ত ট্রাঙ্ককলে ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁরা প্রসূনের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে রাজি।

২১ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্তর ইস্টবেঙ্গলে খেলার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। স্বয়ং নিশীথ ঘোষ প্রসূনের কাছে এবং প্রসূনের দাদার কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। ইস্টবেঙ্গল দুজনকে এক লক্ষ টাকা করে দিতে রাজি।

২২ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত ইস্টবেঙ্গলেই যাচ্ছেন। প্রসূন শৈলেন মান্নার সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, প্রশান্তর কথা ভেবে তাঁকে ইস্টবেঙ্গলে যেতে হচ্ছে।

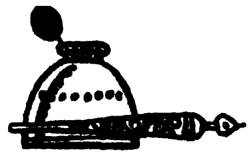
২৩ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত কি মোহনবাগানে যেতে পারেন? শৈলেন মান্না গতকাল গভীর রাতে প্রসূনের বাড়িতে গিয়ে অনেক বুঝিয়েছেন। আজ প্রশান্ত নিশীথ ঘোষকে বলে এসেছেন, প্রসূনের কথা ভেবে তাঁকে মোহনবাগানে যেতে হচ্ছে।

২৪ মার্চ : প্রসূন-প্রশান্ত কি মহমেডানে যাবেন? প্রসূন ইস্টবেঙ্গলে এবং প্রশান্ত মোহনবাগানে খেলার জন্য মনেপ্রাণে প্রস্তুত নন। দুজনেই আগে মহমেডানে খেলেছেন। আজ গোলাম মুস্তাফার সঙ্গে কথা হয়েছে প্রসূনের। কোচিনে প্রশান্তর সঙ্গে কথা বলেছেন ওমর।

২৫ মার্চ : আজ দল বদলের প্রথম ঘণ্টাতেই প্রসূন ব্যানার্জি মোহনবাগানে থেকে যাওয়ার জন্য সই করেছেন।

২৬ মার্চ : আজ দল বদলের প্রথম ঘণ্টায় প্রশান্ত ব্যানার্জি ইস্টবেঙ্গলে থেকে যাওয়ার জন্য সই করেছেন।

২৯



আমি বুদ্ধিমান, কারণ, বুঝতে মাত্র সাড়ে তের মাস সময় লাগল। বুঝে গেছি এই পত্রিকায় উন্নতির বা মাইনে বাড়ানর একটাই রাস্তা। ডিক্টেটর সরি, এডিটর সাহেবকে অবিরাম তেল দিয়ে যাওয়া। আমাদের এডিটর সাহেবের হাবভাব দেখলে মনে হবে, তেলটেল একদম পছন্দ করেন না। কিন্তু, লক্ষ্য করছি, যারা গুড মর্নিং টু গুড নাইট তেল মারছে, তারাই তরতর করে উঠে যাচ্ছে। একটু দেরি করে ফেলেছি। তবু, কাজটা শুরু করে দেওয়া দরকার। মুশকিল হচ্ছে, তেল মারার প্র্যাকটিস একদম নেই। আর চারপাশে, এলাইনে এক্সপার্টেরা আছেন! তবু চেষ্টা করতে হবে। লড়তে হবে। এ লড়াই বাঁচার লড়াই। কারণ এ লড়াই মাইনে বাড়ানোর লড়াই।

এডিটর সাহেব একমনে জিওফ্রে বয়কটের 'পুট টু দি টেস্ট' পড়ছিলেন। তিনি বয়কটের খুব ভক্ত। রতনে রতন চেনে। যদিও তাঁর চোখ ছিল শতকরা তিরানব্বই ভাগ বইয়ের পৃষ্ঠায়, যথাসম্ভব বিগলিত হেসে ঘরে ঢুকলাম। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণে দেড়শ গ্রাম করে মাখন মিশিয়ে বললাম, 'আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।' আমার মুখের ভাব তখন কেমন ছিল, আন্দাজ করে নিতে পারেন। ওই ধরুন, কোনও টুর্নামেন্টের ফাইনালে বা উদ্বোধনের দিনে যখন গভর্নর বা চিফ মিনিস্টার আসেন, তাঁকে মাঠের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় সেক্রেটারির গলে যাওয়া ঢলে পড়া হাসি মুখ দেখেছেন তো?

আমার কথা এডিটর সাহেব শুনতে পেলেন না। মানে, পেলেন, তবু....ওই আর কি! আমি খুব মোলায়েম করে কাশলাম এবং আবার বললাম, 'আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ নিতে চাই।'

তিনি (অসহ্য!) মুখ তুলে তাকালেন, চোখে আলতো প্রশ্ন : আমার ইন্টারভিউ? ব্যস্ত লোকেরা চোখেই প্রশ্ন করেন, জবাব দেন, অবিশ্বাস করেন, বিস্মিত হন, মুখ নাড়ান না। প্রশ্নটা টুকে নিয়ে আমি বললাম, 'আপনি এখন, হেঁ হেঁ, বেঙ্গলের এক নম্বর স্পোর্টস জার্নালিস্ট (বানিয়ে বাজে কথা এত সহজে বলতে পারব ভাবিনি!) পাঠকপাঠিকারা আমাকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করেছেন, আপনার একটা ইন্টারভিউ তাঁরা পেতে চান। (আবার মিথ্যা!)

তিনি বয়কটের বইয়ের আর একটা পৃষ্ঠা এবং নিজের ঠোঁট উল্টে বললেন, 'যান, নিজের টেবিলে গিয়ে কাজ করুন।'

— 'কিন্তু, মানে, এটাই আমার কাজ। গত সাড়ে তের মাসে আমার মতো অযোগ্য লোককেও আপনি প্রচুর সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগটাও দিন। আপনি জানেন না, আপনার কত নাম। আসলে, দিনরাত কাজে ডুবে থাকেন, এসব খবর তো রাখেন না!'

রাজি তিনি প্রথম থেকেই ছিলেন। কিন্তু অফিসিয়ালি রাজি হতে মিনিট দশেক সময় নিলেন। ভালই হল। তেল মারার একটা লম্বা প্র্যাকটিস সেশন পেয়ে গেলাম। ইন্টারভিউ শুরু হল পরদিন দুপুরে। সেদিনই হতে পারত, কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই ইন্টারভিউ দিতে নেই, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হয়, এসব তো আর এডিটর সাহেবকে শেখাতে হবে না!

বাঃ সাঃ : আপনি কী করে ওপরে উঠলেন?

এঃ সাঃ : কখনও সিঁড়ি, কখনও মই, কখনও তেল— খুব সোজা ব্যাপার নয়।

বাঃ সাঃ : তা তো বটেই। আপনি প্রথম কোন খেলার পত্রিকায় লিখেছিলেন? লেখার বিষয় কী ছিল?

এঃ সাঃ : ভুলে গেছি। প্রথম লেখা কেন, কোনও লেখার কথাই আমার মনে নেই। আজ পর্যন্ত মনে রাখার মতো লেখা লিখিনি।

বাঃ সাঃ : তাহলে এত সব হল কী করে?

এঃ সাঃ : মনে রাখার মতো লেখা লিখিনি বলে। আমার সব লেখাই রদ্দি। কিন্তু এমনভাবে লিখি যাতে কারও মনে না থাকে। লেখাগুলো লোকে ভুলে যায়, কিন্তু বড় বড় টাইপে ছাপা নামটা ভুলতে পারে না। তাই এত নাম। ক্লিয়ার?

বাঃ সাঃ : এই ধরনের লেখা লিখতে কার কাছে শিখলেন?

এঃ সাঃ : শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। তিনি সপ্তাহে অন্তত সাতাশটি ভাষণ দেন, কিন্তু একটি ভাষণের একটি কথাও কেউ মনে রাখে না। কিন্তু, তাঁর নাম মনে রাখে।

বাঃ সাঃ : অন্যরকম লেখার চেষ্টা কখনও করেননি?

এঃ সাঃ : মুকুল দত্ত কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন। বছর খানেক পর হাল ছেড়ে দিয়ে তিনি ডিক্লেয়ার করেন : 'পোশাক-টোশাক দেখে তো প্রথমে বোঝা যায় না, তবে, তোমাকে দিয়ে কিস্যু হবে না।'

বাঃ সাঃ : আপনি মনে রাখার মতো লেখা লেখেন না। তবু, পাবলিক এবং এমপ্লয়ারদের বোঝালেন কী করে যে আপনি খুব বড় জার্নালিস্ট।

এঃ সাঃ : প্রথমে ফাইভ ফিফটি ফাইভ সিগারেট, পরে পাইপ টেনে।

বাঃ সাঃ : তার মানে?

এঃ সাঃ : এছাড়া নিজেকে আলাদাভাবে চেনানোর আর বিশেষ কোনও সুযোগ আমার নেই। দামি সিগারেট এবং জামাকাপড়ে একটা কাজ হয়, নিজেকে বেশ কেউকেটা মনে হয়। এই মনে হওয়াটা মুখে ফোটে। এবং তখন, মুখটা বেশ আত্মবিশ্বাসী মনে হয়। এবং, এই আত্মবিশ্বাসটাকে এমপ্লয়াররা খুব পছন্দ করেন। ভাবেন, এ খুব মাতব্বর জার্নালিস্ট।

বাঃ সাঃ : আপনি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গালাগালি দিতে এত লেখেন কেন? কাগজ বেশি বিক্রি করার জন্য?

এঃ সাঃ : ধ্যাত! বোনাস পাই। খুব গালাগালি না খেলে বড় কর্মকর্তা বলে পাবলিক মানে না। লেখায় কোন কর্মকর্তা সম্পর্কে একটা খারাপ কথা লিখলে একশ টাকা পাই। ওই কর্মকর্তাই দেন। গোটা লেখাটাই একজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে লিখলে, দেড় হাজার টাকা। গতকালই এক কর্মকর্তা আমাকে টেলিফোন করে বললেন, 'গত বছর আপনি আমার অনেক উপকার করেছিলেন, দলবদলের মধ্যেই তিন দিনে একান্নটা ঢিল খেয়েছিলাম। কিন্তু, এবার আমার বাজার খুব খারাপ। কেউ আমাকে নিয়ে আলোচনাই করছে না, ঢিল তো দূরের কথা। প্লিজ, কিছু করুন।'

বাঃ সাঃ : ফুটবলারদের বিরুদ্ধে লেখেন না কেন?

এঃ সাঃ : কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে লিখলে কর্মকর্তারা বোনাস দেন। ফুটবলারদের বিরুদ্ধে লিখলে সেটা পাওয়া যায় না। শুধু শুধু বিরুদ্ধে লেখার কষ্ট করতে যাব কেন?

বাঃ সাঃ : আপনি বয়কটের এত ভক্ত কেন?

এঃ সাঃ : বয়কটের মতো আমিও টাকার জ.... হুমম্, অন্য প্রশ্ন করুন।

বাঃ সাঃ : আপনি গাভাসকারের বিরুদ্ধে লেখেন না কেন?

এঃ সাঃ : গাভাসকার আমাদের নিজেদের লোক। নেহাতই আপনার মতো গবেট না হলে, নিজেদের লোকের বিরুদ্ধে আমি কিছু বলি না। আমি জানি, আমি ওয়ার্থলেস। এই অবস্থায় কলিগদের চটালে চলে?

বাঃ সাঃ : ছ' সাত বছর এই লাইনে আছেন? সবরকম অভিজ্ঞতাই নিশ্চয় হয়েছে। সাংবাদিক জীবনে সবচেয়ে বড় সাফল্য কোনটি?

এঃ সাঃ : আসল সাফল্য, কোনও যোগ্যতা ছাড়াই উঠে যাওয়া। তবে কাগজের দিক দিয়ে বড় সাফল্য ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তাদের বাঙালি ফুটবলারদের 'টাইট' দেবার রাস্তা ছাড়তে বাধ্য করা।

বাঃ সাঃ : আপনার সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা?

এঃ সাঃ : বরুণ-সম্বরণকে টেস্ট টিমে ঢোকাতে না পারা।

বাঃ সাঃ : সবচেয়ে বড় ভুল?

এঃ সাঃ : আপনাকে খেলার মতো ভাল কাগজে চাকরি দেওয়া।

৩০

আহা, কী দেখিলাম, জন্ম-জন্মান্তরেও ভুলিব না! আমাদের প্রবল পরাক্রান্ত এডিটর সাহেবের মুখ তাঁর কথাবার্তার চেয়েও শুকনো, পাইপ পরিত্যক্ত। কপালে হাত রেখে কত কী ভাবছেন!

আপনাদের বলতে লজ্জা নেই আমি এই মধুর দিনটার অপেক্ষাতেই ছিলাম। অকালপক্ব রিপোর্টাররা তাঁকে একদিন পথে বসাবে জানতাম। কিন্তু, বসানোর বদলে একেবারে শুইয়ে দিয়ে গেল। দলবদলের সব লেখায় একশ তিয়াত্তর বার বলা হল, প্রসূন-প্রশান্ত এক টিমে খেলবে। আমি জানতাম ওরা এক টিমে খেলবে না। ১ এপ্রিল সংখ্যায় আভাসও দিয়ে গেছি সেইরকম। আমার কথা শুনলে এই হেনস্থাটা হতে হত না।

শুকনো, পাইপহীন এবং দুশ্চিন্তিত এডিটর সাহেবের সামনে বসে বললাম, 'আপনি এত ভেঙে পড়লে কী করে চলবে?' বাবা মারা গেলে বাড়ির বড় ছেলেকে পাবলিক যেভাবে সান্ত্বনা দেয় আর কি!

অন্য সময় হলে খারাপ কিছু শুনতে হত। কিন্তু এখন আর সে বিষ নেই। মাছ-মাছ চোখে আমার দিকে তাকালেন। হাসি চেপে মুখ যথাসম্ভব করুণ করে বললাম, 'নাবালকদের ওপর রিপোর্টিংয়ের কাজটা ছেড়ে না দিলেই পারতেন। তাছাড়া, ফুটবলারদের তো চেনেন। ওরা টাকা ছাড়া কিছুই চেনে না। ওদের বিশ্বাস করে আমাদের কাগজের বদনামের রাস্তা খুলে দেওয়া কি ঠিক হল? বলছিলাম কি, এখনও সময় আছে, লাইনটা পাল্টান।'

এডিটর সাহেব এক সপ্তাহেই সাড়ে আটাত্তর পার্সেন্ট পাল্টে গেছেন। খুব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'নতুন লাইন সম্পর্কে কিছু বলুন। তারপর ভেবে দেখি।'

নিজের অফিসে এই প্রথম 'উইথ কনফিডেন্স' বলতে শুরু করলাম : 'পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান, দলবদল নিয়ে গসিপ পত্রিকায় নিষিদ্ধ করে দেওয়া দরকার। ব্যাপারটা যখন এই রকম যে শেষ পর্যন্ত নিলামে যে ক্লাব সবচেয়ে বেশি দর হাঁকবে, প্রত্যেক প্লেয়ার সেই ক্লাবেই যাবে, এত জল্পনা কল্পনার কী আছে? নিউজপ্রিন্টের দাম আছে, আমার মতো ভাল লেখকরা যথেষ্ট জায়গা পায় না, পাঠক পাঠিকাদের সময়ের দাম আছে। নাবালক

রিপোর্টাররা রাত জাগল না উপোস করল, তা জেনে পাবলিকের কী লাভ? ঠিক খবর দেওয়া যখন নিলামের বাজারে সম্ভব নয়, এই বিষয়ে খবর দেওয়ারই দরকার নেই।'

এডিটর সাহেব আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। না হলে, হঠাৎ আমার চার্মিনারের প্যাকেট থেকে সিগারেট নেবেন কেন? নব্বুই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'দলবদলের ব্যাপারটা আমরা তাহলে কীভাবে কভার করব, সেটা বলুন।'

— 'নো গসিপ। নো ফোরকাস্ট। নো সো কল্ড ইনসাইড স্টোরি। উল্টোপাল্টা বলে কাগজে ছাপার ব্যবস্থা করে প্লেয়াররা অফিসিয়ালদের ভয় খাইয়ে দিয়ে দশ-বিশ হাজার দর বাড়িয়ে নিচ্ছে, বুঝতে পারছেন না? স্টপ অল দিস রাবিশ।'

— 'বুঝলাম। কিন্তু আমরা কীভাবে কভার করব? কী ছাপব?'

— 'এমন খবর ছাপতে হবে, যা কখনই ভুল প্রমাণিত হবে না।'

— 'তেমন খবর কে এনে দেবে?'

— 'যে কেউ আনতে পারে, বিকালে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব টেন্টে বা আই এফ এ অফিসে গেলেই লিস্ট পাওয়া যায়। এক সপ্তাহে যেসব ট্রান্সফার বা উইথড্র হবে, আমরা খেলায় তার সম্পূর্ণ তালিকা ছেপে দেব। ছাপার ভুল ছাড়া অন্য কোন ভুল হবার চান্সই নেই।'

আমার কথায় এডিটর সাহেবের হতাশ মুখ একটুও পাল্টাল না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করলেন, 'পয়েন্ট নাম্বার টু?'

আমিও চার্মিনার ধরালাম। এডিটর সাহেবের কাছ থেকে সামান্য কায়দা ধার করে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললাম, 'পয়েন্ট নাম্বার টু ইজ ইকোয়ালি ইম্পর্ট্যান্ট, ইফ নট মোর।'

ফুটবলারদের বিক্ষুব্ধ-মার্কা স্টোরি বন্ধ করতে হবে। দিনের পর দিন পাবলিক একই ধরনের খবর গিলতে গিলতে বিপর্যস্ত, কোন ফুটবলার কোন ক্লাবের কোন কর্মকর্তার ব্যবহারে বা কথায় ক্ষুব্ধ। লাইন চেঞ্জ করুন। এসব বন্ধ করে দিন। মাঝে মধ্যে যদি দিতেই হয়, স্বাদ পাল্টানোর জন্য কোন কর্মকর্তা কোন ফুটবলারের ব্যবহারে ক্ষুব্ধ, সেই খবর দিন। ফুটবলারদের বিক্ষোভের কাহিনী লিখতে গিয়ে গত কয়েক বছরে বেশ কিছু অখ্যাত কর্মকর্তা বিখ্যাত হয়ে উঠে এসেছেন। দেখবেন, কর্মকর্তাদের বিক্ষোভের কাহিনী প্রকাশ করতে গিয়ে বেশ কিছু অখ্যাত ফুটবলার উঠে আসবে, বিখ্যাত হয়ে যাবে। একটা কাজের কাজ হবে।'

— 'আর?'

— 'পয়েন্ট নাম্বার থ্রি, কভারে বড় টিমের ফুটবলারদের রঙিন ছবি ছাপা বন্ধ করুন। শুনতে পান না, প্রাক্তন অনেক ফুটবলার মাইক পেলেই ফস করে বলে দেন, 'খেলার পত্রিকাগুলো শুধু বড় টিমের প্লেয়ারদের ছবি ছাপে, তাদের কথা লেখে। ছোট ছোট টিমের অখ্যাত প্লেয়ারদের ছবি এবং ইন্টারভিউ ছাপা উচিত।' বলছিলাম কি, আমাদের এখনই কাজটা শুরু করে দেওয়া দরকার।'

— 'কীভাবে?'

— 'প্রথমে থার্ড ডিভিশন ফোর্থ ডিভিশন ক্লাব ধরব। তারপর ফিফথ ডিভিশন। তারপর ধীরে ধীরে গলিতে গলিতে পার্কে পার্কে ঘুরে অখ্যাত ফুটবলারদের রঙিন ছবি তুলে আনব। তাদের ইন্টারভিউ ছাপব। তখন আর ঐ এক্স-প্লেয়াররা আমাদের সমালোচনা করতে পারবে না।'

কেন জানি না, এডিটর সাহেব এক গ্লাস জল খেলেন। তারপর বললেন, 'আপনি বলে যান।'

— 'গাভাসকার সম্পর্কে একটা লেখাও ছাপা চলবে না। ছাব্বিশটা সেঞ্চুরি করে মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? তাছাড়া আপনার একটা আত্মসম্মান বোধ থাকা উচিত। এই যে গাভাসকার 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার' এডিট করছেন, একটা লেখাও আপনাকে নিয়ে লেখা হচ্ছে? ছি ছি, গাভাসকারকে নিয়ে আর লিখবেন না।'

এডিটর সাহেব কী বুঝলেন জানি না। মিহি হেসে বললেন, 'খুব ভাল কথা। কিন্তু এত কিছু বাদ দিলে কাগজ ভরাব কী দিয়ে?'

— 'হিং টিং ছট চার পৃষ্ঠা করে দিন। আমি আরও অনেক সেফ এবং ভাল লেখা দেব। কিছু কাঁচি আর গৎওলা লেখকও এনে দেব। তবে আমাকেই বেশি দায়িত্ব নিতে হবে। আপনার ফেবারিট রিপোর্টারদের বছর খানেকের জন্য উইথ পে ছুটি দিন। আমার লেখার সুবিধার জন্য শুধু একটা জিনিস করতে হবে, খেলাকে সাপ্তাহিকের বদলে মাসিক করে দেওয়া দরকার।'

এডিটর সাহেব উঠে দাঁড়ালেন। উদাস চোখে একবার আমার বাঁ কানের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'সব প্রপোজালই খুব ভাল। ম্যানেজমেন্টের কাছে আমি এর সঙ্গে আর একটা প্রস্তাব পেশ করব। আমার বদলে যেন আপনাকে এডিটর করে দেওয়া হয়।'

মাই ডিয়ার পাঠক ও পাঠিকা, সাহেব কি ঠাট্টা করে গেলেন?

৩১

এ আই এ জি সি-র বিশেষ সভায় যোগ দেবার জন্য গত শুক্রবার আমাকে দিল্লি যেতে হয়েছিল। এই কমিটিতে পার্মানেন্ট সিট পাবার জন্য আমাকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। রীতিমত ইন্টারভিউ দিয়ে প্রমাণ করতে হয়েছে যে আমি...ইস, আপনাদের তো বলাই হয়নি, এ আই এ জি সি-র সম্পূর্ণ নাম হল অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি গাভাসকার কমিটি। ইন্টারভিউতে আমাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'গাভাসকার টেস্টে কটা শূন্য করেছে?' ঠিক জবাব দিয়েছি। 'ওয়েস্ট ইন্ডিজে প্রথম সিরিজে ৭৭৪ রান করার সময় গাভাসকার মোট কটা চান্স দিয়েছিল?' ঠিক জবাব দিয়েছি। গাভাসকার এ পর্যন্ত কতজনকে রানআউট করেছে? এটার কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারিনি। তবু, কর্তারা ক্ষমাঘেন্না করে আমাকে কমিটিতে নিয়েছেন।

গত শুক্রবারের মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করেন ক্রিকেট বোর্ডের এক প্রবীণ সহ-সভাপতি। শুরুতেই কমিটির কনভেনর, দিল্লির এক প্রখ্যাত সাংবাদিক বলেন : 'আজ আমাদের বড় দুঃখের দিন। এই মিটিং যখন ডাকা হয়েছিল, তার আর আগে দুটো টেস্টে চারটে ইনিংসে সুনীল গাভাসকার মোট ৫৩ রান করেছিল। বিষাণ বেদি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, গোটা সিরিজে গাভাসকারের রান দেড়শর কম হলে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে ওকে টিম থেকে বাদ দেওয়া হবেই। কিন্তু কী দুঃখের কথা, লোকটা আবার সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। গোদের ওপর বিষফোড়া, ১৪৭ রানে নট আউট থেকে এক ঝটকায় অ্যাভারেজ পঞ্চাশে নিয়ে গেছে। কথা ছিল, এই মিটিংয়ে আমরা ঠিক করব, গাভাসকারের টেস্ট ক্রিকেট থেকে বিদায়ের উৎসবটা আমরা কীভাবে পালন করব। সব গোলমাল হয়ে গেল। সবচেয়ে বড় চিন্তা, এই সেঞ্চুরিটার কী ব্যাখ্যা আমরা পাবলিকের কাছে দেব। গত কয়েক মাস ধরেই তো আমরা প্রচার করছি, গাভাসকার আর ফর্মে নেই।'

বাঙ্গালোরের এক উঠতি সাংবাদিক বললেন, 'কয়েক মাস কেন বলছেন, ইন ফ্যাক্ট গত পাঁচ বছর ধরেই আমরা বলছি গাভাসকারের ফর্ম নেই। আমরা বরাবরই বলে এসেছি যে বিশ্বনাথ ভদ্রলোক এবং গাভাসকার ঠিক উল্টো। এই বক্তব্য যে নির্ভুল, তা আর একবার প্রমাণিত হয়ে গেল। আমাদের ফোরকাস্ট মেনে বিশ্বনাথ পাকিস্তানে একটাও

বেশি বড় ইনিংস খেলল না। কিন্তু গাভাসকার শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ— সবার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করে বসল। আর এদেশের পাবলিকও এমন, গাভাসকার সেঞ্চুরি করলেই এমন নাচে যেন ইন্ডিয়া ম্যাচ জিতেছে।'

অতঃপর মাদ্রাজের এক মাঝবয়সী জার্নালিস্ট: 'গাভাসকারের আর ফর্ম নেই, এখনও বলছি। গায়ানায় চুয়াল্লিশ রানের মাথায় যে ক্যাচটা দিয়েছিল— এ ললিপপ— গ্রিনিজ ধরতে পারলে সেঞ্চুরি হত না। পরের একশ তিন রান তো ফালতু। চুয়াল্লিশে আউট হলে পাঁচ ইনিংসে রান দাঁড়াত সাতানব্বুই। অ্যাভারেজ - ১৯.৪! সুতরাং, লেট আস স্টিক টু দি লাইন— গাভাসকারের আর ফর্ম নেই।'

কিউ নিলেন বাংলার এক হতাশ ক্রিকেটার: 'তাছাড়া, ঐ ম্যাচের ছিলটা কী? লাস্ট ডে, একটা ইনিংসই শেষ হয়নি। কোনও ইম্পর্ট্যান্স নেই, কোনও টেনশন নেই, তখন সবাই সেঞ্চুরি করতে পারে। আমিও মেলা করেছি— রঞ্জি ট্রফিতে।'

কেরলের এক তরুণ ক্রিকেট লেখক উঠলেন: 'অপোজিশন কেমন সেটাও দেখতে হবে। বাজে বোলিংয়ের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করলেই প্রমাণ হয় না যে, কেউ ফর্মে আছে।'

মিনমিন করে সভাপতি মশাই এতক্ষণে মুখ খুললেন: 'এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ভাই। রবার্টস-হোল্ডিং-মার্শাল-গার্নার বাজে বোলার, এটা কেউ মানবে না।'

তরুণ ক্রিকেট লেখক: 'কেন মানবে না? পাবলিক ওপিনিয়ন তৈরি করতে হবে। ওরা এখন আর ভাল বোলার নেই, এই কথাটা বোঝাতে হবে। অ্যাট লিস্ট এটা বোঝানো যেতে পারে যে, রবার্টস আর হোল্ডিংয়ের চোট আছে, মার্শাল আর গার্নার ক্লান্ত। এই লাইনে চলাই ভাল, কারণ এই ফাস্ট বোলাররাই সামনের প্রুডেনশিয়াল কাপে অন্য সব টিমকে শুইয়ে দিতে পারে। তখন বলা যাবে, হোল্ডিং-রবার্টসের চোট আর মার্শাল-গার্নারের ক্লান্তি চলে গেছে।'

মিটিংয়ের মাঝপথে ঝড়ের বেগে ঢুকলেন বাঙ্গালোরের বিখ্যাত সাংবাদিক: 'এয়ারপোর্ট থেকে সোজা আসছি। একটা বিরাট স্কুপ এনেছি। কালই সমস্ত অল ইন্ডিয়া পেপারে চালাতে পারলে ভাল হয়। আপনারা সবাই জানেন, দ্যাট ম্যান, সানি গাভাসকার ওয়েস্ট ইন্ডিজে ভিভ রিচার্ডসের চেয়েও পপুলার। গায়ানার ফিফটি থ্রি পার্সেন্ট লোকের ইন্ডিয়ান অরিজিন। ওরা গাভাসকারের নামে পাগল (আসলে ছাগল)। গায়ানা টেস্ট শুরু হবার এক সপ্তাহ আগেই ওখানকার বাইশজন একটা গোপন সভায় সিদ্ধান্ত নেয়, গাভাসকারের সেঞ্চুরি বানাতেই হবে। বাইশ জন পঁচিশ হাজার ডলার করে চাঁদা দেওয়ায় মোট সাড়ে পাঁচ লক্ষ ডলার চাঁদা ওঠে। সেই ডলার এগার জন ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ারের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়, পার হেড পঞ্চাশ হাজার ডলার। এ ক্লিয়ার কেস অব ব্রাইবারি। ঘুষ খেয়ে বোলাররা ভাল বল করেনি। গ্রিনিজ ক্যাচ ধরেনি, লয়েড ঠিক লোককে বল করতে দেয়নি বা ঠিক জায়গায় ফিল্ডার রাখেনি। সুতরাং, গাভাসকার ফর্মে আছে, একথা যেন কেউ না ভাবেন।'

আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল: 'কিন্তু ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালে চান্সলেস নব্বুই

রান?'

কনভেনর কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'এসব উল্টোপাল্টা কথা বললে কমিটি থেকে নাম কেটে দেব!'

ঘাবড়ে গিয়ে সেই যে মাথা নিচু করলাম, মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর মুখ তুলিনি। মাথা নিচু করেই শুনলাম, মাদ্রাজের এক জার্নালিস্ট ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললেন, 'বিষাণ বেদিকে বলতে হবে, এর পর আর রিস্ক নেওয়া উচিত নয়। গাভাসকার দুটো টেস্ট ফেল করলেই সিরিজের মাঝপথে হলেও বসিয়ে দিতে হবে। কপিলকেও একটু বলেকয়ে রাখতে হবে। এই লোকটাকে বিশ্বাস নেই, চান্স পেলেই সেঞ্চুরি করে দেবে। এবারই বিষাণকে অনুরোধ করেছিলাম, প্রথম দুটো টেস্ট ফেল করার পর গাভাসকারকে বসিয়ে গায়কোয়াড় আর অরুণলালকে দিয়ে ওপেন করাতে। বিষাণ শুনল না। এখন ঠেলা সামলাও।'

ঠেলা সামলাবার জন্য কমিটির মেম্বারদের এক মাস সময় দেওয়া হল। পরের মিটিং কলকাতায়, মে মাসের আট তারিখে।

৩২

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, বিশ্বাস করুন গত রবিবার আমি এগারটা অনুষ্ঠানে চিফ গেস্ট হয়েছি! সবে নাম হচ্ছে, তাই বড় বড় জায়গায় এখনও ডাকে না, তবু এগারটা! এখন পাড়ায় পাড়ায় এত ফাইনাল আর প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হয় যে মনের মতো চিফ গেস্ট পাওয়া কঠিন। ভাল কাউকে রাজি করানোর পরেও ফ্যাকড়া থাকে। লাস্ট মোমেন্ট উইথড্রয়াল। হয়ত আগের দিন জানা গেল যে, এক্স-প্লেয়ারটিকে অফিসের কাজে দিল্লি যেতে হবে বা ক্যালকাটা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের হয়ে খেলতে বাঁকুড়া। বিখ্যাত কর্মকর্তাকে নিলে একটা যোগাযোগ হয়, পরে কাজে লাগে, কিন্তু তাঁরাও অনেক সময় লাস্ট মোমেন্টে সরে দাঁড়ান, হঠাৎ কোনও কারণে পাবলিক ক্ষেপে আছে বুঝতে পারলে। এই ধরনের ক্ষেত্রে মুশকিল আসান হিসাবে সম্প্রতি যে তিন-চারটি নাম সর্বাধিক বিবেচিত, হেঁ হেঁ, তাঁদের মধ্যে একজন এই উদীয়মান সাংবাদিক। একটা প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন সেরিমনিতে মাইকে 'উদীয়মান সাংবাদিক' বলায় আমি খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। প্রথমত আমার বয়স পঁয়ত্রিশ এবং দ্বিতীয়ত লিখছি বেশ কয়েক বছর, আমি 'উদীয়মান' হতে যাব কেন? অর্গানাইজারদের মধ্যে একজন আমাকে ঠাণ্ডা করার জন্য বলেছিল, 'পঁয়ত্রিশ একটা বয়েস নাকি? আমরা এমন অনেক 'ইয়াং জার্নালিস্ট'কে চিনি যাঁদের বয়স সাঁইত্রিশের বেশি।

গত রবিবারই আমার চিফ গেস্ট-জীবনের ব্যস্ততম দিন ছিল। এর আগে আমার টপ স্কোর ছিল সাত। চেষ্টা করলে মাসে সাড়ে চারশটা অনুষ্ঠানের চিফ গেস্টের সমস্যা আমি মেটাতে পারি। কিন্তু দুটো প্রবলেম আছে। প্রথমত, সবাই ছুটির দিনে ফাংশান করতে চান। এবং প্রবলেম নাম্বার টু, সবাই বিকেল পাঁচটা থেকে রাত সাড়ে আটটা— এই সাড়ে তিন ঘণ্টাকে টার্গেট করেন। অল বেঙ্গল চিফ গেস্টস অ্যাসোসিয়েশনের নেক্সট মিটিংয়ে আমি এব্যাপারে কিছু প্রপোজাল আনব। আমাদের দুটি প্রধান দাবি হবে : উইক ডে-তে বেশিরভাগ ফাংশান করতে হবে এবং কাকভোর, ভরদুপুর ও মাঝরাত্তিরেও কিছু কিছু অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে চিফ গেস্টদের প্রেসার কমাতে হবে।

গত রবিবার অবশ্য আমার ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল দুপুর সাড়ে তিনটেয়,

বারুইপুরে। আমার সঙ্গে কনট্রাক্ট ছিল, ঠিক সাড়ে তিনটেয় আমাকে বলতে দিতে হবে। কারণ, পৌনে পাঁচটায় গড়িয়ায় প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন। বারুইপুরের অর্গানাইজাররা যথার্থ ভদ্রলোক। আমাকে তিনটে বত্রিশ মিনিটে মাইক ছেড়ে দেওয়া হয়। সাড়ে আটমাস আগে ফাইনাল হয়ে গেছে চার ফুট দশ ইঞ্চির আন্ডারহাইট টুর্নামেন্টের, সামনে-বসা প্লেয়ারদের হাইট স্বভাবতই পাঁচ ফুটের বেশি মনে হল।

তিনটে একচল্লিশে ভাষণ শেষ করে চেয়ারে বসার আগেই 'বিজি উইদাউট বিজিনেস'-মার্কা একজন যুবক হাত ধরে স্টেজের পিছনে নিয়ে গিয়ে প্লেট ধরিয়ে দিলেন। সিঙাড়াটা ঠাণ্ডা, কিন্তু এই প্রম্পট অ্যাকশনে আমি মুগ্ধ হলাম। এরা সময়ের দাম বোঝে।

গড়িয়ায় সময়মতই পৌঁছে বুঝলাম, পৌনে পাঁচটায় ভাষণ দেবার কোনও চান্স নেই, ফাইনাল খেলা শেষই হবে পাঁচটা দশ নাগাদ। পরের এনগেজমেন্ট ঠিক ছটায় ঢাকুরিয়ায়। একেবারে রুট দেখে টাইম নিয়েছি, হুঁ হুঁ বাবা। ঢাকুরিয়াটা ফেল করলে চলবে না, একটু বড় মাপের ফাইনাল। এসব জায়গায় না গেলে ভবিষ্যতে ভাল ভাল জায়গায় চান্স পাব কী করে?

গড়িয়ার ক্লাবের সেক্রেটারি জীবনে আমার নাম শোনেননি। তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই, অনেকেই শোনেননি। কিন্তু আমি যে চিফ গেস্ট, এটাও না জানাটা নিশ্চয় অন্যায়। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড স্টেজে দুজন চিফ গেস্ট। শেষ পর্যন্ত আমাকে স্পেশাল গেস্ট করে স্ক্যান্ডাল অ্যাভয়েড করা হল। তিন মিনিট সতের সেকেন্ডে বক্তৃতা এবং এক মিনিট ছত্রিশ সেকেন্ডে রিফ্রেশমেন্ট সেরে যখন ঢাকুরিয়া পৌঁছলাম, দশ মিনিট দেরি হয়ে গেছে। ডায়াসে অবশ্য আমার চেয়ারটা ফাঁকাই ছিল।

একজন এক্স-ফুটবলার বক্তৃতা করছিলেন। জীবনে কখনও বড় টিমে খেলেননি, কিন্তু ভাল খেলতেন। আমাকে দেখেই হঠাৎ বক্তৃতার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে দিলেন: 'আর এখনকার খেলার ম্যাগাজিনগুলোও হয়েছে সেইরকম। আমার জীবনে আমি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল-মহমেডানের বিরুদ্ধে মোট সাতান্নটা ম্যাচ খেলেছি, হেরেছি মাত্র বাহান্নটা ম্যাচে। এখন তো শুধু বড় টিম নিয়ে নাচানাচি। খেলার ম্যাগাজিনে বড় টিমের প্লেয়ারদের ছবির ছড়াছড়ি। এখানে আমাদের একজন সাংবাদিক বন্ধু এসেছেন....।' এরপর দীর্ঘ উপদেশ।

এইরকম উপদেশ আজকাল প্রায়ই হজম করতে হচ্ছে, তা-ই হাসিমুখেই বসে থাকতে অসুবিধা হল না। বক্তৃতার পর কিছু খেলাম না। ভাল জায়গা তো... না খেলে ইমেজ বাড়বে।

চতুর্থ ফাংশান কসবায়, পৌনে সাতটায় আমার যাওয়ার কথা। ছটা বাহান্ন মিনিটে পৌঁছেও 'হ্যালো মাইক টেস্টিং, ওয়ান টু থ্রি ফোর.... ফুঁঃ ফুঁঃ শুনে ঘাবড়ে গেলাম, কারণ রাত দশটার মধ্যে আরও সাত জায়গায় যেতে হবে।

ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের ফাইনাল। মাইক-টাইক ঠিক করে ধুতি পাঞ্জাবি ঘাড়ে পাউডার সেক্রেটারি প্রাথমিক ভাষণ শুরু করতে যাচ্ছেন, তখনই চান্সটা নিলাম। সভাপতি

মহাশয়কে টপকে সোজা মাইকের কাছে গিয়ে সেক্রেটারিকে বললাম, 'আমি একটু বলে নিই, কেমন?'

বললাম, 'ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট দারুণ জিনিস, এতে স্ট্যামিনা বাড়ে। পাড়ায় পাড়ায় ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট চালু হওয়া উচিত।'

পরের ফাংশান মানিকতলায়। এখানে তিন বছর ধরে একবারের টুর্নামেন্ট হয়। শুরুতেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ওয়ান ডে টুর্নামেন্টের হুজুগ থেকে প্লেয়ারদের বাঁচানোর জন্য আমরা এই তিন বছরের টুর্নামেন্ট করছি। প্রত্যেক টিমকে নয় মাসে একটা ম্যাচ খেলতে হয়, রেস্ট পাওয়া যায়। এব্যাপারে আমাদের বিশিষ্ট সাংবাদিক বন্ধুর মতামত জানার ইচ্ছা রইল। 'বিশিষ্ট' বলে দিয়েছেন, সুতরাং বলতেই হল, 'ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট আইন করে বন্ধ করে দেওয়া উচিত। এতে ফুটবলারদের সর্বনাশ হয়।'

ছয় এবং সাত নম্বর এনগেজমেন্ট ছিল উলটোডাঙা এবং বেলঘরিয়ায়। উলটোডাঙায় কবাডি ফাইনালের পর বললাম, 'শুধু ফুটবল ফুটবল করে পাগল, কবাডি, খো খো প্রভৃতি দেশীয় খেলার দিকে নজর দেওয়ার সময় এসেছে।' বেলঘরিয়ায় ফুটবল ফাইনালের পর বললাম, 'বাঙালির প্রাণের খেলা ফুটবল। ফুটবলের জন্য জীবন দিতে পারে বাঙালি। এ আমাদের লজ্জা নয়, গৌরব।'

আটটা আটান্ন থেকে দশটা তের মিনিটের মধ্যে আরও চারটে জায়গা হয়ে রবিবার বাড়ি ফিরেছি রাত সাড়ে এগারটায়। সোমবারটা পেটের গণ্ডগোলে ভুগতে হল।

৩৩

না মশাই, অফিসের টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে এবং ঝিমিয়ে নেবার ফাঁকে এই এক পাতার রাজা-উজির মারার কাজটাই ভাল। সম্প্রতি আমার একটা ভাল শিক্ষা হয়ে গেল। দলবদলের দুই ব্যস্ত-কাম-ব্যর্থ রিপোর্টারের কঠোর সমালোচনা শুনে এডিটর সাহেব আমাকে বললেন, 'বেশ, এবার থেকে বড় কাজগুলো আপনিই করবেন। দলবদল তো এবার শেষ। আসছে বছর আবার হবে! আপাতত সবচেয়ে হট আইটেম এবার ইস্টবেঙ্গল টিমের ক্যাপ্টেন কে? আপনি এই খবরটা তুলে আনুন।'

ইস্টবেঙ্গলের এক আন-অফিসিয়াল কর্মকর্তা আমাকে খুব ভালবাসেন। এডিটরের ঘর থেকে বেরিয়েই তাঁকে টেলিফোন করলাম। একই সঙ্গে তিনটি অঘটন ঘটল। আমাদের অফিসের টেলিফোনে ডায়ালটোন পেলাম। কর্মকর্তার টেলিফোন বাজল। এবং ঐ ব্যস্ত কর্মকর্তাকে পাওয়া গেল। ফালতু কথা না বাড়িয়ে আমার সমস্যার কথা বলে তাঁর সাহায্য চাইলাম। তিনি বললেন: 'দেখুন, নাইনটিন এইট্টি ওয়ানে মনোরঞ্জনকে আমরা ভাল টিম দিতে পারিনি। ও আমাদের সেন্ট পার্সেন্ট ঘরের ছেলে। এবার ভাল টিম করা হয়েছে, ওকেই আবার ক্যাপ্টেন করা হবে। ব্যাপারটা কেমন হবে?'

'খুব ভাল হবে'— বলেই রিসিভার নামিয়ে নিজের টেবিলে ছুটে এলাম। তারপর প্রায় ছুটে এডিটর সাহেবের ঘরে গিয়ে বললাম, 'ইউরেকা! পেয়ে গেছি!' মনোরঞ্জনের ব্যাপারটা বললাম। তিনি বললেন, 'ক্যাপ্টেনের একটা ইন্টারভিউ তাহলে নিয়ে ফেলুন।'

পরদিন দুপুরেই ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার চৌরঙ্গি ব্রাঞ্চে মনোরঞ্জনকে ধরলাম। কিন্তু মনা বলল, 'বিশ্বাস করুন, আমি ক্যাপ্টেন হচ্ছি না।' মনোরঞ্জনের মতো সহজ সরল ছেলেকে বিশ্বাস না করার কারণ নেই। তাই মনের দুঃখে অফিসে ফিরে এলাম।

কিন্তু, ঘণ্টা খানেক পরেই আমার মন ভাল হয়ে গেল। আমাদের এক সাব-এডিটর বললেন, 'লিখে নিন এবং দিন, এবার ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হচ্ছে সি বি থাপা। যাদের কথা উঠছে, মানে মিহির চিন্ময় ইত্যাদি, তাদের সবার আগে সি বি-র ক্যাপ্টেন হবার কথা। কিন্তু সি বি থাপা ইস্টবেঙ্গলে আছে নাইনটিন এইট্টি ওয়ান থেকে।'

এডিটর সাহেবের কাছে একটু দূরপাল্লার টিকিট কাটার অনুমতি চাইলাম। সি বি

থাপাকে ধরে একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নিতে হবে।

অনুমতি এবং তারপর টিকিটও পাওয়া গেল, কিন্তু কোথাও যাওয়া হল না। কারণ দিন তিনেক পর আমাদের আর এক সাব-এডিটর জানালেন, 'সি বি থাপার ক্যাপ্টেন হবার কোনও চান্সই নেই। ও গত বছর ইস্টবেঙ্গলের প্লেয়ার ছিল না। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে একটা ম্যাচও খেলেনি ক্যাম্পে থাকার জন্য। উল্টে এবার ন্যাশনাল সার্ভিসেস টিমের হয়ে সন্তোষ ট্রফিতে খেলে গেল।'

এপ্রিলের দশ তারিখে এক তরুণ কর্মকর্তা বললেন, 'অন্যায়-অবিচার করার ফলেই গত কয়েক বছর আমরা বেশি ট্রফি পাচ্ছি না। আর অন্যায় নয়, এবার চিন্ময় চ্যাটার্জিই টিমের ক্যাপ্টেন। গত বছর অমলরাজের অ্যাবসেন্সে দার্জিলিং গোল্ড কাপে চিন্ময়ই ক্যাপ্টেনশিপ করেছে, জানেন না?' সেদিনই সাড়ে বারটা নাগাদ এফ সি আই অফিসে চিন্ময়কে পেয়ে গেলাম। হাত বাড়িয়ে বললাম, 'কনগ্র্যাচুলেশনস ক্যাপ্টেন।' চিন্ময় আমার হাতের দিকে না তাকিয়ে বলল, 'ঠাট্টা করছেন! জানেন না, ক্লাবের অফিসিয়ালরা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছেন, ক্যাপ্টেন হবার দাবি জানাতে পারব না, এই নিয়ে প্রেসের লোকেদের কাছে কিছু বলতেও পারব না। সুতরাং, বুঝতেই পারছেন, নরেন্দ্র গুরুংও এবার ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন হতে পারে, তবু আমার চান্স নেই।'

ক্যারামের শেষ ঘুঁটির মতো আমি, বুঝলেন, কিছুতেই পকেট খুঁজে পাচ্ছিলাম না। ঠিক খবরটা তাহলে কার কাছে পাওয়া যাবে?

কিন্তু এফ সি আই অফিস থেকে বেরোবার মুখেই আশার আলো দেখা গেল। লাল শার্টে শিবাজী ব্যানার্জিকে দেখাচ্ছিল চমৎকার। বলল, 'ভাস্করকে আমার অভিনন্দন জানাবেন। শুনছি ওকেই এবার ইস্টবেঙ্গল ক্যাপ্টেন করছে। বাবনের (চিন্ময়) জন্য অবশ্য খুব খারাপ লাগছে। তবু, ভাস্করকে অভিনন্দন।'

ভাস্কর, আমার ভাস্কর! সোজা স্টেট ব্যাঙ্কের মেইন ব্রাঞ্চের সামনের বটতলায় গেলাম। ভাস্কর নেই। সাড়ে আঠার মিনিট পর, কোত্থেকে যেন এল, সঙ্গে মনোরঞ্জন। ক্যাপ্টেনের ইন্টারভিউ চাইতেই ভাস্কর বলল, 'সাপুড়েদা আপনাকে কতদিন বলেছি, এটা আপনার লাইন নয়। কেন মিছিমিছি কষ্ট করছেন? শুনুন,, আমি ক্যাপ্টেন হচ্ছি না। অন্য কেউ হবে।'

ভাস্করের তিন বন্ধু সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল। একজন বললেন, 'কার্তিকও গতবার সই করেছে, ও ক্যাপ্টেন হতে পারে।' দ্বিতীয়জন : 'অলোকও হতে পারে, তাই না?' তৃতীয়জন একটু হেসে বললেন, 'তাপসও গতবছর সই করেছে। তার ওপর লিগে এত ভাল খেলল। ওকে ক্যাপ্টেন করলেই বা ক্ষতি কী?'

তারপর, ভাস্করের তৃতীয় বন্ধু আমারও বন্ধু হিসাবে পরামর্শ দিলেন : 'এত রিস্কি সাবজেক্ট না নিলেই পারতেন। জানেন তো, গতবার দার্জিলিং গোল্ড কাপে চিন্ময় ক্যাপ্টেনশিপ করেছে, যখন অমলরাজ ছিল না। এবার নিশীথ ঘোষ বলছেন, এটা অজান্তে ঘটেছে, সুতরাং ব্যাপারটা তিনি মানেন না। নিশীথ ঘোষ যাকে ক্যাপ্টেন করবেন, তার

অবস্থাও করুণ হতে পারে। ধরুন, ডুরান্ড চলার সময় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাঝে মাঝে জেগে-ওঠা প্রেসিডেন্ট সাহেব দিল্লিতে হাজির আছেন। তিনি মাঠে গিয়ে বললেন, 'আমার অজান্তে অমুককে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে, আমি মানি না। আজ আমাদের ক্যাপ্টেন নরেন্দ্র গুরুং।' তখন কী হবে? তাই বলছিলাম, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ক্যাপ্টেনশিপের মতো একটা গোলমেলে সাবজেক্ট নিয়ে স্টোরি করতে যাবেন না। এসব জিনিস সরোজ চক্কোত্তিকেই ছেড়ে দিন, গালাগালি খেলে ও খাবে।'

মুশকিল আসান করতে চাইলেন ইস্টবেঙ্গলের এক পরিশ্রমী অথচ অবহেলিত কর্মকর্তা : 'দেখুন, কে হবে জানি না, তবে ক্যাপ্টেন হওয়া উচিত অরূপ দাসের। অরূপ গত বছর সবার আগে সই করেছে।'

তের এপ্রিল সকালে ইস্টবেঙ্গল টেন্টে অরূপকে ধরলাম। ছেলেটা কেমন যেন! ক্যাপ্টেনশিপের কথাটা তুলতেই বলে ফেলল, 'আপনি ভুল খবর পেয়েছেন। আমি সই করেছি অনেকের পরে।' অ্যাট লিস্ট যদি দাবিটাও তুলত, আমি একটা ছোটখাট স্টোরি নামানোর চান্স পেতাম।

'তের এপ্রিল রাতে, একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায়, নিশীথ ঘোষের শরণাপন্ন হলাম। তিনি খুব সহজ গলায় বললেন, 'ডিসিশন নেওয়া হয়ে গেছে। এবার আমাদের ক্যাপ্টেন মিহির বসু। পরশু, পয়লা বৈশাখ সকালে অফিসিয়ালি অ্যানাউন্স করা হবে।'

পরদিন, চোদ্দ এপ্রিল ভোরেই বেলেঘাটায় মিহিরের দিদির বাড়িতে গিয়ে ওকে ধরলাম। 'কনগ্র্যাচুলেশনস, মিহির। এবার ক্যাপ্টেনের একটা ইন্টারভিউ চাই।' করুণা মেশানো হাসি নিয়ে মিহির আমার দিকে তাকাল : 'সাপুড়েদা আপনাকে দিয়ে কিস্যু হবে না। গতকাল দুপুরেই আমার ইন্টারভিউ নিয়ে গেছে আপনাদের ধীমান দত্ত। আপনি এই খবরটাও রাখেন না।'

৩৪

সান্তাক্রুজ এয়ারপোর্টে ঢুকে খুবই অবাক হলাম। ওয়েস্ট ইন্ডিজে পাঁচটির মধ্যে দুটি টেস্টে পরাজিত গৌরবদীপ্ত ভারতীয় ক্রিকেট দল দেশে ফিরছে, অথচ এয়ারপোর্টে বোর্ডের দেড়জন কর্মকর্তা এবং বোম্বের চারজন ক্রিকেটারের আত্মীয়স্বজন ছাড়া আর কেউই হাজির নেই। কর্মকর্তা এবং আত্মীয়স্বজনদের মুখও বেশ থমথমে। অবাক হয়ে ভাবছিলাম, এই অবস্থায় আমারও দুঃখ-দুঃখ ভাব ফোটানো উচিত কিনা। ভাবতে ভাবতেই সময় এসে গেল। একে একে ক্রিকেটারদের দেখা গেল। না, আমি ভুল করিনি। কারও মুখেই দুঃখের ভাব নেই। পাঁচটির মধ্যে মাত্র দুটি টেস্টে পরাজিত দলের ক্রিকেটারদের যতখানি উৎফুল্ল থাকা উচিত, ওদের তার চেয়ে কম উৎফুল্ল না দেখানোয় স্বস্তি পেলাম। দেড়জন বোর্ড কর্মকর্তার মুখ আগের মতোই থমথমে থেকে গেলেও, ক্রিকেটারদের আত্মীয়স্বজনদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে দেখলাম। ওঁরা বোধহয় ভুল বুঝতে পেরে মুখের দুঃখ-দুঃখ ভাবটা কাটিয়ে ফেলেছেন।

বাঁ হাতে ফুলের তোড়া এবং ডান হাতে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারের প্রথম সংখ্যার এক কপি তুলে দিয়ে বললাম, 'কনগ্র্যাচুলেশনস, স্কিপার।' আশঙ্কা ছিল, কপিল হয়ত বলে বসবেন, 'কীসের কনগ্র্যাচুলেশনস? একটা টেস্টেও জিতিনি, একটা টেস্টেও ফার্স্ট ইনিংস লিড পর্যন্ত নিতে পারিনি, আমার পারফরমেন্সও আহামরি কিছু নয়। ইয়ার্কি মারছেন?'

কিন্তু না, ক্যাপ্টেন হিসাবে অল্প সময়েই 'হরিয়ানা হারিকেন' উপযুক্ত হয়ে উঠেছেন। চমৎকার হেসে ফুলের তোড়া, ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার এবং আমার 'কনগ্র্যাচুলেশনস' রিসিভ করলেন।

'স্কিপার, এই সফরের সাফল্য সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী?'

—'দেখুন, আমি আত্মসন্তুষ্টিতে ভুগতে রাজি নই। ভাল রেজাল্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের সংযত হতে হবে। আমি জানি, এই অভাবিত সাফল্যের পর দেশের সব বড় শহরে আমাদের সংবর্ধনা জানানো হবে, আমি অভদ্রতা করব না, সেইসব সভায় নিশ্চয় হাজির থাকব। কিন্তু উৎসবে খুব বেশি মেতে যাওয়াও ঠিক নয়, কারণ ছ মাসের মধ্যেই দেশের মাটিতে পাকিস্তানকে পাওয়া যাচ্ছে। এইসব সভার

উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ, মালার সাইজ আর ওজন কম রাখবেন। ঘাড়ে ব্যথা, বল করতে অসুবিধা হচ্ছে। ঘাড় ঠিক থাকলে, এবং ইমরান ডিসিশন না পাল্টালে আমি আবার 'থামস আপ ম্যান অফ দি সিরিজ' হব, দেখে নেবেন।'

— 'ফার্স্ট টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেকেন্ড ইনিংসে অমন ক্রুশিয়াল স্টেজে মহিন্দার অমরনাথকে বল করতে দিলেন কেন? না দিলে, ম্যাচটা এত সহজে ওরা জিততে পারত কি?'

— 'দু-একটা ভুল করার রাইট সব ক্যাপ্টেনেরই আছে।'

কিরমানি আগে থেকেই রেডি হয়ে কপিলের পাশে বসেছিলেন। তোড়া ছিল না. ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারের এক কপি বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'কনগ্র্যাচুলেশনস ভাইস ক্যাপ্টেন।'

—'থ্যাঙ্ক য়ু সাপ।'

ক্রিকেটাররা সঙ্গী ক্রিকেটারদের সংক্ষিপ্ত নামে ডাকে : ভিশি, ক্যাপস, কিরি... এইরকম। আমাকেও ছোট্ট নামে ডাকায় বেশ ভাল লাগল। বললাম, 'এই ট্যুরের সাকসেস সম্পর্কে কিছু বলুন।' হাসিখুশি কিরি শুরু করলেন : 'টিমের সাকসেসের কথা নতুন করে কী বলব। সেভেন্টিতে ইন্ডিয়া সিরিজ জিতেছিল ১-০। সেভেন্টি সিক্সে আমরা হেরেছিলাম ১-২। এবার হেরেছি : ০-২। এ ক্লিয়ার কেস অফ ইমপ্রুভমেন্ট। তবে আমার নিজের পারফরমেন্সে আমি খুব খুশি। গত ট্যুরে শুধু ভিভের ক্যাচ ফেলে দেওয়ায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের অন্য ব্যাটসম্যানেরা আমার ওপর রেগে গিয়েছিল। এবার সবার ক্যাচ ফেলেছি। নেহাতই ক্যাচ না উঠলে স্টাম্পিং চান্স মিস করেছি। জেরি আলেকজান্ডারও মেনে নিয়েছেন, এখন আমিই ওয়ার্ল্ডের এক নম্বর উইকেটকিপার—বাই রান না হতে দেওয়ার দিক দিয়ে। বল ব্যাটে লেগে এলে মাঝে মাঝে বল আমার গ্লাভস থেকে পড়ে যায়, কিন্তু ব্যাটে না লাগলে, আমার গ্লাভস চুম্বক। তবে, বয়স হচ্ছে। আর বেশিদিন খেলতে পারব না। ভাবছি, নাইন্টিন নাইন্টি টু-র পর আর টেস্ট ক্রিকেট খেলব না।'

সুনীল গাভাসকারকে খুশি কখনও দেখিনি। এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'কনগ্র্যাচুলেশনস এক্স-স্কিপার।'

— 'থ্যাঙ্ক য়ু। বাট হোয়াই?'

— 'সাতাশটা সেঞ্চুরি করে সোবার্সের রেকর্ডকে ডিঙিয়ে যাওয়ার জন্য।'

'দেখুন, গ্রেট সোবার্সের সঙ্গে আমার তুলনা করবেন না। স্যার গ্যারি ছাব্বিশটা সেঞ্চুরি করেছিলেন তিরানব্বইটা টেস্টে, আর আমি সাতাশটা সেঞ্চুরি করলাম— সরি, গণ্ডগোল হয়ে গেছে। স্যার ডনের বাহান্ন টেস্টে উনত্রিশটা সেঞ্চুরি প্রসঙ্গে এই কথাগুলো বলি। মানে, আমি কত নম্বর সেঞ্চুরি করলাম সেটা বড় কথা নয়, বয়কটের টোটাল টেস্ট রানের চেয়ে আমি এখন মাত্র ৪৮৯ রান দূরে, সেটাও বড় কথা নয়। আসল কথা হল, টিমের পারফরমেন্স, সাকসেস। আমার নিজের দিক থেকে আর একটা কথা বলতে পারি, ওয়েস্ট ইন্ডিয়ানরা আমাকে বড় ভালবাসে। এবার ওদের দুশ্চিন্তায় ফেলিনি বলে বেশ ভাল লাগছে।'

সবাইকে খুব খুশি মনে হল। কেউ গাড়ি, কেউ ট্যাক্সিতে ফেরার জন্য তৈরি। শুধু একজন ক্রিকেটারকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। কাছে গিয়ে বললাম, *'কনগ্র্যাচুলেশনস। কিন্তু আপনাকে এমন দুঃখিত মনে হচ্ছে কেন মহিন্দার?'*

ম্লান মুখে ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে মহিন্দার বললেন, 'ভাল ফিল্ডিং করিনি, বোলিংও খারাপ করেছি। তাই খুব খারাপ লাগছে। ফার্স্ট টেস্টে চোদ্দ বলে চৌত্রিশ রান না দিলে ম্যাচটা হয়ত বেঁচে যেত।'

তারপর ঝাড়া দশ মিনিট তাঁকে অনেক বোঝালাম। মহিন্দার কিছুতেই উৎফুল্ল হতে রাজি হলেন না।

৩৫

এইরকম একটা আবছা ধারণা অনেক দিন ধরেই আমার ছিল যে, স্পোর্টস জার্নালিস্টরা অনেক কপি আগে থেকেই তৈরি করে রাখেন। নাহলে, ঘটনা ঘটার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অত ভাল লেখা কী করে সম্ভব? ধারণাটা গত পরশু সন্ধ্যায় বদ্ধমূল হল। স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব টেন্টের বাইরে বসে পিতলের কলসি থেকে ঢালা দুর্ধর্ষ আদা-চা খাচ্ছিলাম। স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের মেম্বার হবার যোগ্যতা এখনও অর্জন করিনি, তাই টেন্টে ঢুকি না, বাইরে বসে আদা-চা খেতে খেতে নিজেকে হাফ-জার্নালিস্ট ভেবে আনন্দ পাই। বাঘা বাঘা জার্নালিস্টরা ঢোকেন, বেরিয়ে যান, দেখে কৃতার্থ হই। তবে, ঠিক কার পকেট থেকে যে ভাঁজ করা কাগজগুলো বা রিপোর্টটা পড়েছে, বুঝতে পারিনি। কয়েকজন 'ফর এভার ইয়াং জার্নালিস্ট'কে দেখালাম, ওরাও বলতে পারল না, এটা কোন মুরুব্বির হাতের লেখা। উইম্বলডন টেনিস টুর্নামেন্ট শুরু জুনের শেষ সপ্তাহে। কিন্তু চার ভাগে ভাগ করা রিপোর্টের বিষয়বস্তু আসন্ন উইম্বলডনে বিজয় অমৃতরাজের খেলা। বোঝাই যাচ্ছে, রিপোর্ট তৈরি রাখা হয়েছে, ঠিক ঠিক দিনে চালিয়ে দেওয়া হবে, শুধু তারিখটা এবং প্রতিপক্ষের নামটা বসিয়ে নিতে হবে।

রিপোর্ট নাম্বার ওয়ান : কাল থেকে ঐতিহ্যময় উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা শুরু। দুনিয়ার টেনিস রসিকদের দৃষ্টি অবশ্য সবার আগে নিবদ্ধ থাকবে সুবিখ্যাত সেন্টার কোর্টের দিকে, যেখানে ঐতিহ্য অনুসারে গতবারের বিজয়ী জিমি কোনর্স প্রথম ম্যাচ খেলবেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী— ব্রাজিলের কার্লোস কারমায়ার, আড়াই বছর আগে যিনি ভাটসুন ক্লাসিক টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে কোনর্সের কাছ থেকে প্রথম সেটটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন।

ভারতবাসীর দৃষ্টি অবশ্য এই মুহূর্তে সেন্টার কোর্ট বা জিমি কোনর্সের দিকে নয়। প্রথম দিনই অন্য একটি ম্যাচে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্টর আর্মায়ার বিরুদ্ধে খেলবেন ভারতের একমাত্র আশা বিজয় অমৃতরাজ। বিজয় এর আগে একটিবার উইম্বলডন কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন বিভিন্ন টুর্নামেন্টে। হারিয়েছেন দুনিয়ার সমস্ত প্রথম সারির খেলোয়াড়কেই। যদিও তাঁকে বাছাই তালিকায় জায়গা দেওয়া হয়নি, দেওয়ার প্রশ্নও ছিল না, ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ ক্রীড়ানুরাগীর আশা, বিজয় এবার বড় কোনও অঘটন ঘটাবেন।

সদ্য সমাপ্ত ইস্টবোর্ন টুর্নামেন্টের কোয়ার্টার ফাইনালে যেভাবে গিলারমো ভিলাসকে বিধ্বস্ত করে তিনি প্রথম দুটি সেট ছিনিয়ে নেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। পরের তিনটি সেটে অবশ্য দুর্ভাগ্যবশত বিজয় পরাজিত হন। কিন্তু খেলার পর ভিলাস স্বীকার করেন, বিজয় হেরেছেন তাঁর চেয়ে অনেক ভাল খেলেই।

রিপোর্ট নাম্বার টু : ভারতের বিজয় অমৃতরাজ উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিক্টর আর্মায়াকে ৬-৩, ৪-৬, ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে হারিয়ে। একমাত্র দ্বিতীয় সেটেই আর্মায়ার বড় সার্ভিস বিজয়কে অস্বস্তিতে ফেলতে পেরেছে। খেলার পর বিজয় বলেন, 'এবার আমি ভাল ফর্মে আছি। উইম্বলডনে ভাল কিছু করার স্বপ্ন বহু দিনের।.... দেখা যাক।'

রিপোর্ট নাম্বার থ্রি : দুর্ভাগ্য বিজয়ের, দুর্ভাগ্য তাঁর দেশবাসীর, অঘটন ঘটালেন অস্ট্রেলিয়ার জন ফিটজেরাল্ড। উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় রাউন্ডে, বিজয় অমৃতরাজ হার মানলেন ৬-১, ৩-৬, ৪-৬ ও ১-৬ গেমে। প্রথম সেটে চমৎকার আক্রমণাত্মক টেনিস খেলে ফিটজেরাল্ডকে বিজয় দাঁড়াতেই দেননি। এই সেটে বিজয়ের দুটি দুর্দান্ত ব্যাকহ্যান্ড পাসিং শট দেখে দর্শকরা মুগ্ধ হন। পরের তিনটি গেমে হেরে তাঁকে এবারের উইম্বলডন টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হলেও, কোর্ট ছাড়ার সময় বিজয়কে উষ্ণ অভিনন্দন জানান সমবেত দেড় হাজার দর্শক।

সুদর্শন ও কৃষ্ণকায় বিজয় অমৃতরাজ এমনিতেই উইম্বলডনে জনপ্রিয়। আজ তাঁর জনপ্রিয়তা আর-একটু বেড়ে গেল। তৃতীয় সেটের নবম গেমে লড়াই যখন হাড্ডাহাড্ডি, একটি লাইনকল অপ্রত্যাশিতভাবে বিজয়ের পক্ষে যায়। ফিটজেরাল্ড প্রতিবাদ জানালেও আম্পায়ার কর্ণপাত করেন না। কিন্তু বিজয় ছুটে গিয়ে বলেন, তিনি নিজে দেখেছেন, তাঁর শট লাইনের বাইরে পড়েছে, পয়েন্টটা যেন ফিটজেরাল্ডকে দিয়ে দেওয়া হয়। এই পয়েন্টটি পেয়ে গেলে বিজয়ের পক্ষে তৃতীয় সেট জিতে ২-১ সেটে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। বিজয়ের ব্যবহারে মুগ্ধ দর্শকেরা করতালিতে মুখর হন। খেলার পর ফিটজেরাল্ডও বলেন, 'বিজয়ের মতো স্পোর্টসম্যান এখন আর দেখা যায় না। এই অবস্থায় থাকলে, আমি অন্তত এমন ব্যবহার করতাম না।'

বিষণ্ণ বিজয় শান্ত গলায় বলেন, 'দ্বিতীয় সেটের মাঝামাঝি সময় থেকেই 'টেনিস এলবো' কষ্ট দিচ্ছিল। চতুর্থ সেটের শেষদিকে শুরু হয় কাঁধের ব্যথাটাও। অবশ্য, ফিটজেরাল্ডকে ছোট করছি না, ও আমার চেয়ে অনেক ভাল খেলেই জিতেছে।'

রিপোর্ট নাম্বার ফোর : মাত্র সাত দিন আগের অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের প্রতিশোধ নিলেন বিজয় অমৃতরাজ। আজ গ্লাসগো ওপেন টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডে তিনি অতি সহজেই ৬-২, ৬-৪ ও ৬-৩ গেমে অস্ট্রেলিয়ার জন ফিটজেরাল্ডকে পরাজিত করেন। শুরু থেকেই দুরন্ত আক্রমণাত্মক টেনিস খেলে ফিটজেরাল্ডকে বিধ্বস্ত করার পর, হাসিখুশি বিজয় বলেন, 'আজ ফিটজেরাল্ড ভাল খেলেনি। কনুই আর কাঁধের ব্যথা এত তাড়াতাড়ি সেরে যাবে, ভাবতে পারিনি।'

রাত্রে আজকাল অফিসে দৌড়ে গিয়ে স্পোর্টস এডিটরকে রিপোর্টগুলো দেখালাম। তিনি স্বভাবসিদ্ধ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'এসব জিনিস আমাদের কাছেও আছে। তবে বিজয় একটু আনপ্রেডিক্টেবল, মাঝেমধ্যে উল্টোপাল্টা রেজাল্ট করে ফেলে। সবচেয়ে সেফ আমাদের ছোট্ট স্টক কপিটা : 'রমেশ হারলেন।' অমুক টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ডেই ভারতের রমেশ কৃষ্ণান পরাজিত হয়েছেন।... ইত্যাদি।'

৩৬

৯ মে, ১৯৮৩। ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটল। ফুটবলের মক্কা কলকাতার তিন প্রধানের অন্যতম মহমেডান স্পোর্টিং ফুটবল টিম ফেডারেশন কাপ জয় করল। ফাইনালে পরাজিত মোহনবাগান এর আগে মাত্র চারবার এই ট্রফি পেয়েছে, স্বভাবতই কেউ বিশেষ খেয়াল করেননি।

৯ মে, ক্যানানোরে পুনরুনুষ্ঠিত ফাইনালে মজিদ বাসকার অনবদ্য ফুটবল খেলায় এবং দ্বিতীয় গোলটি করায় নিউ মার্কেটের এক বিখ্যাত ফলব্যবসায়ী মজিদকে মজিদেরই সমান ওজনের আপেল-আঙুর উপহার দেবার কথা ঘোষণা করেছেন। দুবাই থেকে পাঠানো টেলিগ্রামে ক্লাব সভাপতি এরফান তাহের আশির দশককে মজিদের দশক নামে চিহ্নিত করেছেন। পুরমন্ত্রী প্রশান্ত শূরের বিশেষ নির্দেশে পার্ক স্ট্রিটকে মজিদ স্ট্রিট নামাঙ্কিত করা হচ্ছে। রিপ্লে ফাইনালের আগে পর্যন্ত কোনও ম্যাচেই মজিদ ভাল খেলেননি, এই সিক্রেট ফাঁস করার অভিযোগে একজন ফুটবল অনুরাগীকে তিরানব্বইটি চড় এবং সতেরটি ঘুষি হজম করতে হয়েছে। মহমেডান টেন্টের লনে মজিদ বাসকারের একটি আবক্ষ মূর্তি স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী কথা দিয়েছেন, মূর্তি স্থাপনের ব্যয়ভার এবং দায়িত্ব রাজ্য সরকারই বহন করবে। পশ্চিমবঙ্গে সংস্কৃতি মন্ত্রী প্রভাস ফাদিকার ঘোষণা করেছেন, মজিদকে নিয়ে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব তরুণ পরিচালক উৎপলেন্দু চক্রবর্তীকে দেওয়া হয়েছে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিশেষ অনুরোধে মাননীয় রেলমন্ত্রী আবু বরকত গনিখান চৌধুরি আলিগড় থেকে মজিদকে কলকাতায় আনার জন্য একটি বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রথমে সামান্য অসুবিধা দেখা দিলেও, শেষ পর্যন্ত খবরের কাগজের তীব্র সমালোচনার চাপে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের অনুমতি পাওয়া গেছে। ওই অনুষ্ঠানে মজিদ বাসকারকে একটি মারুতি গাড়ি এবং অন্য ফুটবলারদের এক প্যাকেট করে 'গুলাবি টী' উপহার দেওয়া হবে।

এমন একটি যুগান্তকারী ঘটনাকে যথাযথভাবে তুলে ধরতে এবং ধরে রাখতে খবরের কাগজগুলো ব্যর্থ হয়নি। প্রথমে জয়ের খবর পেয়েই মহমেডান টেন্টে উল্লাসের ছবি,

তারপর এয়ারপোর্টে কাপ এবং কয়েকজন ফুটবলার পৌঁছনোর ছবি, তারপর কাপ নিয়ে মিছিলের ছবি— তৎসহ দুর্ধর্ষ সব রিপোর্ট। কলকাতা উত্তাল। কলকাতা কল্লোলিত। কলকাতা.... কলকাতা.... কত কী।

৯ মে রাত্রি থেকেই মহমেডানের অফিস সেক্রেটারির কাজ বেড়ে গেছে। রোজ গড়ে সাতশ একান্নটি টেলিগ্রাম আসছে, অভিনন্দন জানিয়ে। দিলীপকুমারের নামই প্রথম শোনা গেল, কারণ বিখ্যাত অভিনেতাদের মধ্যে একমাত্র তিনিই টেলিগ্রাম পাঠাননি। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের সংবর্ধনা সভায় অবশ্য তাঁকে প্রধান অতিথি করার চেষ্টা চলছে। যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অভিনন্দনবার্তা পাঠিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, হাজি মস্তান, রেলমন্ত্রী আবু বরকত গনিখান চৌধুরি, অমিতাভ বচ্চন, রাজীব গান্ধী, প্রিয়তমা গান্ধী, মানেকা গান্ধী, বরুণ ফিরোজ গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, সর্দার বুটা সিং, জেনারেল এরশাদ, খাজা জিয়াউদ্দিন, এইচ এন বহুগুনা এবং জনি ওয়াকার। প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি টেলিগ্রামের ঝাঁকে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেননি, অভিনন্দন জানিয়ে একটি স্বরচিত কবিতা তথা বিবৃতি সব খবরের কাগজের অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

অনেকে একেবারে মহমেডান টেন্টে এসেও অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন। এ আই এফ এফ সম্পাদক অশোক ঘোষ এবং আই এফ এ সম্পাদক একই অ্যাম্বাসাডারে অভিনন্দন জানাতে এলেও, আর একটি ম্যাটাডোর সঙ্গে আনতে হয়, ফুল এবং মালার জন্য। সি এ বি-র সহ-সভাপতি বিশ্বনাথ দত্ত এবং সম্পাদক জগমোহন ডালমিয়া একটু দেরি করে ফেলার কারণ হিসাবে বলেন, বিজলি গ্রিলকে দিয়ে এক হাজার উপহার-প্যাকেট তৈরি করাতে হয়েছে।

ইস্টবেঙ্গলের কোচ পি কে ব্যানার্জি অভিনন্দন জানাতে এলে মহমেডান কর্মকর্তা এবং সমর্থকরা তাঁকে ছেঁকে ধরে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কি কখনও আমাদের ক্লাবের কোচ হবেন না?' রহস্যময় হাসি সহযোগে পি কে অন্য প্রসঙ্গে চলে যান : 'নাইনটিন এইট্টিতে মহমেডান ডি সি এম চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমি আপনাদের টেন্টে এসে অভিনন্দন জানিয়ে গিয়েছিলাম। সেবার অবশ্য এককভাবে মহমেডান আর কোনও ট্রফি জেতেনি। এবারও অভিনন্দন জানিয়ে গেলাম। এককভাবে এবারও আর কোনও ট্রফি না পেলে দুঃখিত হবার কিছু নেই। মহমেডানের ফেডারেশন কাপ জয় একটি যুগান্তকারী ঘটনা।'

বাংলার কোচ শান্ত মিত্র, মোহনবাগানের কোচ অরুণ ঘোষ, ধীরেন দে, নিশীথ ঘোষ, বিখ্যাত বিস্মৃত কর্মকর্তা অরুণ ভট্টাচার্য, চিত্রাভিনেত্রী মুনমুন সেন, পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী, সাউথ পয়েন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ইন্দ্রনাথ গুহ প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিরা মহমেডান টেন্টে এসে অভিনন্দন জানিয়ে গেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দিল্লি থেকে দমদম এয়ারপোর্টে নেমেই সোজা মহমেডান স্পোর্টিং টেন্টে গিয়ে জেনারেল সেক্রেটারি ইব্রাহিম আলি মোল্লাকে বলেন, 'এত বড় একটা ঘটনার খবর এখানে পৌঁছানর সময় আমি কলকাতায় থাকতে পারিনি বলে

দুঃখিত। আগে জানলে প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে মিটিং দিন পনের পিছিয়ে দিতাম। আপনাদের এই জয় পশ্চিমবঙ্গের জনগণের জয়।'

পরদিন সমস্ত খবরের কাগজের অফিসে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির স্বাক্ষরিত একটি বিবৃতি পৌঁছয়। বক্তব্য : জ্যোতিবাবু চুরি করেছেন। কারণ, মহমেডানকে অভিনন্দন জানিয়ে সমস্ত খবরের কাগজে প্রেরিত অথচ অপ্রকাশিত তাঁর কবিতাটির নাম ছিল— 'জনগণের জয়।'

কলকাতা সত্যিই উত্তাল। শুধু কলকাতা কেন, গোটা ভারতবর্ষ। সকালে মহমেডান টেন্টের দিকে যাচ্ছিলাম আরও খবর পাওয়ার জন্য। পিছন থেকে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, এখানে এত হৈ চৈ কীসের?' আমি বললাম, 'জানেন না, আপনি মশাই কলকাতার লোক তো? মহমেডান স্পোর্টিং এবার ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। বেশ দ্রুত পায়ে আমাকে অতিক্রম করে মহমেডান টেন্টের দিকে যেতে যেতে প্রতাপ ঘোষ বলে গেল— 'তাই নাকি!'

৩৭

কোনরকম ভনিতা না করে এডিটর সাহেব জিজ্ঞেস করলেন 'এই যে ইস্টবেঙ্গলের এক্স-ফুটবলারদের ফেন্সিংয়ের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, এ ব্যাপারে আপনার কী মত?' আমিও সাফ সাফ জবাব দিলাম, 'এক্স-ফুটবলাররা অন্যায় করেছেন। তাঁদের ভিতরে ঢোকার রাইট নেই।'

সম্প্রতি আমাদের এডিটরের সামান্য উন্নতি হয়েছে। আগের মতো আর একপেশে কথাবার্তা বলেন না। কয়েক মাস আগে হলেও এই জবাবের জন্য আমার চাকরিতে জবাব হয়ে যেত! আমার মত শুনে তিনি বললেন, 'বেশ, এই নিয়ে একটা লেখা করে ফেলুন।'

আমি বেঙ্গলের দেড় নম্বর ইনভেসটিগেটিভ রিপোর্টার, অফিসে বসেই লেখা তৈরি করতে যাব কেন? তিন দিন মাঠে গিয়ে সব তথ্য সংগ্রহ করে ফেললাম। এই লেখা তারই ফল!

আপনারা আশা করি জানেন, এবার বড় টিমের মোট চল্লিশ জনকে মাঠের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। পঁচিশ জন ফুটবলার, বাকি থাকল পনের জন। মাঠ চষে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যাতে প্রমাণিত হবে, প্রাক্তন ফুটবলারদের বদলে যাঁদের ফেন্সিং-এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তাঁরা অনেক বেশি যোগ্য। এই অল্প সময়ে অল্প কয়েকজন সম্পর্কেই অবশ্য তথ্য সংগ্রহ করা গেল।

যাঁদের প্রবেশ নিষেধ

শান্ত মিত্র : বহু বছর দাপটের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন। সত্তরে লিগ, শিল্ড ও ডুরান্ডজয়ী ইস্টবেঙ্গলের ক্যাপ্টেন ছিলেন। অনেক প্রলোভনেও অন্য বড় টিমে যাননি। পৌনে এক বছর ইস্টবেঙ্গলের কোচও ছিলেন। ইস্টবেঙ্গলের দুর্দিনের বন্ধু। কর্মকর্তারা অদৃশ্য হবার পর যে দু-তিনজন প্রাক্তন ফুটবলারকে সামনে থাকতে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে অগ্রণী।

পরিমল দে : একদা ইস্টবেঙ্গল জনতার চোখের মণি। দীর্ঘদিন ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন। টিমকে অনেক উল্লেখযোগ্য ম্যাচ জিতিয়ে দিয়েছেন। সত্তরের শিল্ড ফাইনালে দু'মিনিটের জন্য মাঠে নেমেই ইরানের পাস ক্লাবের বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটি করেছিলেন। কিছুদিন

পরেই তাঁকে ক্লাব কর্মকর্তারা 'পুরস্কৃত' করেন— একটি সফরে তাঁকে টিমের সঙ্গেই না নিয়ে!

সুকুমার সমাজপতি : ইস্টবেঙ্গলের হয়ে বেশ কয়েক বছর খেলে উইং থেকে প্রচুর গোল করেছেন এবং তার চেয়ে অনেক বেশি গোল করিয়েছেন। একবার অবশ্য উল্টোপাল্টা রটিয়ে তাঁকে ক্লাব ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল। তবে, শেষ পর্যন্ত প্রিয় ক্লাবে ফিরে এসেছিলেন। পঁয়ষট্টিতে শিল্ড-বিজয়ী ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক।

প্রশান্ত সিংহ : অন্য বড় টিম অনেক চেষ্টা করেও এই দুর্ধর্ষ মিডফিল্ডারকে নিতে পারেনি। সাতষট্টিতে রোভার্স ও ডুরান্ডজয়ী ইস্টবেঙ্গল টিমের অধিনায়ক। কখনও কাগজে-কলমে কোচ হননি, কিন্তু অনেকবারই টিমকে তৈরি হতে সাহায্য করেছেন। ইস্টবেঙ্গল হারলে ক্ষুব্ধ জনতার সামনে দাঁড়ানোর মতো ব্যক্তিত্ব যে দু-তিন জনের আছে, তাঁদেরই একজন।

সুনীল ভট্টাচার্য : একাত্তরে অপরাজিত লিগ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গল টিমের ক্যাপ্টেন। প্রচণ্ড দ্রুতগামী এই ডিফেন্ডার ইস্টবেঙ্গলকে অনেক ম্যাচে বাঁচিয়েছেন। গত কয়েক বছর ধরেই মাঠের ধারে থেকে টিমকে অনুপ্রাণিত করছেন।

সুভাষ ভৌমিক : পাঁচ বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলেছেন। তিয়াত্তরে বলতে গেলে একাই ইস্টবেঙ্গলকে সাফল্যের দিকে নিয়ে যান। লিগের টপ স্কোরার, শিল্ড ফাইনালে উত্তর কোরিয়ার পিয়ং ইয়ংয়ের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত গোল করেন। পঁচাত্তরের শিল্ড ফাইনালে (ইস্টবেঙ্গল-৫ : মোহনবাগান-০) অনায়াসে বিপক্ষ ডিফেন্স তছনছ করেছিলেন। গত বছর প্রায় সব ম্যাচেই টিমকে অনুপ্রাণিত করেন।

এই ছয়জনও ঢুকছেন

শ্রীযুক্ত এক্স : সাত বছর গ্যালারি থেকে গালাগালি দেওয়া প্র্যাকটিস করার পর দু'বছর হল সাইডলাইন থেকে গালাগালি দেবার অধিকার অর্জন করেছেন। খাসা গলা, গালাগালির স্টকও দারুণ। এই গালাগালি ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলারদের অনুপ্রাণিত এবং বিপক্ষের ফুটবলারদের সন্ত্রস্ত করছে।

শ্রীযুক্ত ওয়াই : লাইন্সম্যানকে ভয় দেখানোয় স্পেশালিস্ট। সঙ্গে অন্তত কুড়িজন থাকলে যে কোনও ব্যক্তিকে শুধু ভয় নয়, ছুরিও দেখাতে পারেন। ভাইটাল মোমেন্টে লাইন্সম্যান যাতে অফসাইডের ফ্ল্যাগ না তোলেন, তা দেখার মহান দায়িত্ব পালন করেন।

শ্রীযুক্ত জেড : ম্যাচ আটকে গেলে তাঁকেই প্রথম ছুটোছুটি করতে হয়। মওকা বুঝে কোনও কোনও ছোট ক্লাব দর বেশি হাঁকলে, ওই অল্প সময়ের মধ্যেই বোঝাতে হয়। দরদস্তুর করতে হয়। দরকার হলে শ্রীযুক্ত ওয়াইয়ের সাহায্য নিয়ে ছোট টিমের কর্মকর্তা এবং গোলকিপারকে ভয় দেখাতে হয়।

শ্রীযুক্ত ইয়েলো : ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা হয়েও ক্লাবের গোপন খবর ফাঁস করেন এবং কাগজপত্র খবরের কাগজের লোকের হাতে তুলে দেন। টিমের খেলা মন দিয়ে দেখে নোট রাখছেন, সামনের বার ভাল টিম করার জন্য কার কার বদলে পাঞ্জাব থেকে

দুর্ধর্ষ সব ফুটবলার আনা যায়। ভাল মামলাবাজ।

শ্রীযুক্ত ভায়োলেট : মাঠে তেমন কিছুই করেন না, তবে ইলেকশনের সময় দেড়শ ব্যালট পেপার তুলে লিডারের হাতে জমা দেন। দারুণ ইংরেজি লেখেন। একবার একটি চিঠি লেখার চেষ্টায় সাড়ে এগারটি নিব ভেঙেছিল। সেই থেকে লেখেন-টেখেন না, শুধু গম্ভীর হয়ে খেলা দেখেন এবং বিপদ বুঝলে সবার আগে মাঠ ছাড়েন।

শ্রীযুক্ত বটল গ্রিণ : টিমের ফুটবলারদের মাঝেমধ্যে দুরন্ত উপদেশ দেবার চেষ্টা করেন। এককালের বিরাট খেলোয়াড়— পাড়ার গলিতে। এখন আর পায়ে তেমন শট নেই তবে প্রচণ্ড গতি আছে। সাপোর্টাররা তাড়া করলে সবার আগে ছুটে পালাতে পারেন।

বেশি মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। প্রাক্তন ছ-সাতজন ফুটবলারকে স্ক্রেসিংয়ের মধ্যে যাবার তালিকায় রাখলে এই বিশিষ্ট ছয়জন কর্মকর্তা বা হাফ-কর্মকর্তাকে বাইরে রাখতে হয়। ভাবা যায়?

৩৮

একটি ইন্টারভিউ আপনারা সব খবরের কাগজেই পেয়েছেন, কিন্তু অন্যটি পাননি। এমনকি প্রথম ইন্টারভিউয়ের শেষাংশও আপনারা এখনও পাননি। কারণ, দ্বিতীয় ইন্টারভিউটি আমি একাই নিতে পেরেছি এবং প্রথম ইন্টারভিউটি মানে প্রেস কনফারেন্স শেষ করে অন্য রিপোর্টাররা চলে যাবার পর আমি পি আর মানসিংয়ের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা বলেছিলাম। আজ আপনাদের কাছে এই দেড়খানা ইন্টারভিউ পেশ করব।

প্রুডেনশিয়াল কাপের ভারতীয় ক্রিকেট দলের ম্যানেজার পি আর মানসিং সাংবাদিকদের জানান যে তাঁর বিশ্বাস, ভারত সেমিফাইনালে উঠবে। তিনি বলেন, নিউজিল্যান্ড অত্যন্ত খামখেয়ালি দল, ওদের হারানো এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। তিনি আরও বলেন, কপিলদেব এই প্রথম প্রুডেনশিয়াল কাপে অধিনায়কত্ব করলেও চিন্তার কিছু নেই, কারণ এই ধবনের ম্যাচ ইংল্যান্ডের মাটিতেই খেলার অভিজ্ঞতা কপিলের আছে। তাছাড়া, কপিলকে সাহায্য করার জন্য অভিজ্ঞ গাভাসকার আছেন।

এই পর্যন্ত সব কাগজেই বেরিয়েছে। এরপর :

বাঃ সাঃ : আমি কি আরও কিছু প্রশ্ন করতে পারি?

মানসিং : সিওর! এই প্রথম ইন্ডিয়া টিমের ম্যানেজার হয়েছি, আর কখনও হব কিনা ঠিক নেই, এখনই যত বেশি সম্ভব কথা বলে ফেলতে হবে। অন্য রিপোর্টাররা চলে যাওয়ায় আমি রীতিমত দুঃখিত, ক্ষুব্ধ।

বাঃ সাঃ : আমরা যতদূর জানি, একদিনের ক্রিকেটে নিউজিল্যান্ড যথেষ্ট শক্তিশালী। অতি সম্প্রতি ওরা ওভারলিমিট ম্যাচে ইংল্যান্ডকে হারিয়েছে, তার আগে অস্ট্রেলিয়া ওয়ান ডে সিরিজে নিউজিল্যান্ডকে হারিয়েছিল অনেক কষ্টে, শেষ পর্যন্ত গ্রেগ চ্যাপেলের নির্দেশে ছোটভাই ট্রেভর চ্যাপেলকে আন্ডারআর্ম গড়ান বল করতে হয়েছিল। ওদের রিচার্ড হেডলি আছে, গ্লেন টার্নার আছে, জিওফ হাওয়ার্থের মতো দুর্দান্ত ক্যাপ্টেন আছে, সবচেয়ে বড় কথা দুর্ধর্ষ ফিল্ডিং আছে। এই টিমকে ভারত হারাবে, এটা কী করে আশা করছেন?

মানসিং : আশা করতেই হবে। আমাকে এই মর্মে কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করতে হয়েছে। এটা

কিন্তু ছাপবেন না। নিন, একটা সিগারেট ধরান। হ্যাঁ, কথা হল, ওদের হেডলি-টার্নার-হাওয়ার্থ আছে ঠিকই, কিন্তু আমাদের কপিল-মহিন্দার-কপিল আছে।

বাঃ সাঃ : দু'বার কপিলের নাম বললেন যে!

মানসিং : হ্যাঁ, একবার অলরাউন্ডার হিসাবে, একবার ভাল ক্যাপ্টেন হিসাবে। ওদের যা আছে, তা আমাদেরও আছে। কিন্তু আমাদের ভালসন আছে, ওদের নেই।

বাঃ সাঃ : ভালসন খেলবেন নাকি?

মানসিং : আমার তো সেইরকম ইচ্ছাই ছিল, কপিলরা মানবে কিনা জানি না। ভালসনের সবচেয়ে বড় গুণ এই যে কখনও উইকেটে বল রাখে না। অফ স্টাম্পের তিন ফুট বাইরে বল ফেলে আউট স্যুইং করায়। যেহেতু কেউই পাঁচ ফুট লম্বা ব্যাট ব্যবহার করে না, ওই বলের নাগাল পাওয়া কঠিন। সুতরাং রানের খোঁজে ওই বল তাড়া করতে হবে এবং তাড়া করলে ক্যাচ উঠবেই।

বাঃ সাঃ : কিন্তু ক্যাচ ধরবে কে? আপনার টিমের ক্লোজ-ইন ফিল্ডাররা তো....

মানসিং : ধুর মশাই, ল অফ অ্যাভারেজ কাকে বলে জানেন না? ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে সবাই যত খুশি ক্যাচ ফেলেছে, এবার ক্যাচ না ফেলাই স্বাভাবিক। আমরা সেই অঙ্কেই চলছি।

বাঃ সাঃ : এত কথার পর, একটা ছোট্ট প্রশ্ন করছি, হঠাৎ নিউজিল্যান্ড টিম নিয়ে পড়লেন কেন, ওরা তো ইন্ডিয়ার গ্রুপেই নেই।

মানসিং : নেই নাকি? টপে ওঠার পর থেকেই আমার মেমারি... ধুস্, ভাল্লাগেনা।

বাঃ সাঃ : আপনি বলেছেন অভিজ্ঞ গাভাসকার কপিলকে পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করবেন। কিন্তু সানি তো একবারও প্রুডেনশিয়াল কাপে ভারতের অধিনায়কত্ব করেননি। দু'বারই ক্যাপ্টেন ছিলেন বেঙ্কটরাঘবন। তাঁকেই ফের নিয়ে গেলে হত না, পরামর্শ দেবার জন্য?

মানসিং : কিছুই খবর রাখেন না দেখছি! ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুরে বেঙ্কট এত বেশি পরামর্শ দিয়েছে যে ওর নিজের ভোকাল কর্ড এবং কপিলের বাঁ কানের পর্দা ছিঁড়ে গেছে। লাস্ট টেস্টে বাধ্য হয়ে বেঙ্কটকে নির্দেশ দেওয়া হয়, পরামর্শ না দেবার জন্য।

বাঃ সাঃ : আচ্ছা মিঃ মানসিং, আপনি কি দয়া করে বলবেন, কীভাবে সর্বভারতীয় ক্রিকেট জগতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেন?

মানসিং : সবই স্টারের ব্যাপার। হায়দরাবাদের ক্রিকেট নিয়েই পড়ে ছিলাম। হঠাৎ বছর দুয়েক আগে একটা ভাল চান্স পেয়ে গেলাম নিজেকে শো করার। ববজি, আই মিন হায়দরাবাদের ক্যাপ্টেন নরসিমা রাও ট্রাকস্যুট পরে নেট প্র্যাকটিসে এসেছিল। ও খুব পপুলার। জানতাম, ওর বিরুদ্ধে কড়া অ্যাকশন নিলে গণ্ডগোল হবেই। হলও তাই। টিমের এগারজনই বেঁকে বসল। আমরা সেকেন্ড টিম নামালাম রঞ্জি ম্যাচে। সেই নিয়ে গোটা ইন্ডিয়ায় খুব হৈ চৈ হল। আমি রাতারাতি অল ইন্ডিয়া লাইম লাইটে চলে এলাম। বোর্ডের বিখ্যাত কর্মকর্তারা আমাকে চিনে রাখলেন। এতদিনে বড় রিওয়ার্ড পেলাম। চেষ্টা থাকলে বড় হওয়া কে আটকাতে পারে বলুন? এটাই লেটেস্ট ট্রেন্ড যে ইন্টারভিউ করছে, তাকেই

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন করা। আমি অবশ্য ওখানেই ইন্টারভিউ শেষ করে দিই। এবং পরদিন, *বোর্ড সম্পাদক এ ডব্লু কানমাদিকারের কাছে গেলাম। সেমিফাইনালে ওঠার কথা বলে ফেলায়, মানসিংয়ের ওপর তিনি নিশ্চয় বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ। অন্য রিপোর্টাররা কিছু করার আগেই ধরে ফেলা দরকার।*

বাঃ সাঃ : গুড আফটারনুন, মিঃ কানমাদিকার। আপনি নিশ্চয় কাগজে দেখেছেন যে ম্যানেজার পি আর মানসিং বলেছেন যে, ভারত সেমিফাইনালে উঠবে। কিছু বলবেন?

কানমাদিকার : নিশ্চয় বলব। এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন উক্তির জন্য মানসিংকে ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে আসতে হবে, প্রুডেনশিয়াল কাপের পর। ভারত সেমিফাইনালে যাবে একথা বলার কোনও মানে হয়? কন্ট্রাক্ট ফর্মে লেখা আছে, যথাসম্ভব আশাবাদী হতে হবে, সেইরকম কথাবার্তা বলতে হবে। মানসিংয়ের বলা উচিত ছিল, ভারত চ্যাম্পিয়ন হবে। অ্যাট লিস্ট ফাইনালে ওঠার কথাটা বলে রাখলেও মানসিংকে ডিসিপ্লিনারি কমিটির পাল্লায় পড়তে হত না।

বাঃ সাঃ : আচ্ছা! এবার দয়া করে বলবেন কি, কেন ইন্ডিয়া টিমকে নিয়ে এত বড় আশা করছেন?

কানমাদিকার : কেন আশা করব না? আমাদের তিনজন টপ প্লেয়ারই দারুণ খেলবে। কপিলদেব এই প্রথম ওয়ার্ল্ড কাপে ক্যাপ্টেন হবার আনন্দে ভাল খেলবে। মহিন্দার ভাইস ক্যাপ্টেন থেকে ক্যাপ্টেনের পোস্টে প্রমোশন পাওয়ার জন্য ভাল খেলবে। গাভাসকার বেঙ্কটের বদলে চিফ অ্যাডভাইসারের পোস্ট পাওয়ার আনন্দে ভাল খেলবে। তাছাড়া, মাইন্ড ইট, আমাদের টিমের সবাই ব্যাট করতে পারে। পঁচিশ করে করলেই পঁচিশ ইন্টু এগার— দুশো পঁচাত্তর। একদিনের ম্যাচে উইনিং টোটাল। এই টুর্নামেন্টে গ্লাভসে লাগানোর জন্য কিরিকে ইনভিজবল আঠা দেয়া হয়েছে, বল এলেই লেগে যাবে।

বাঃ সাঃ : যদি কেউ কমপ্লেইন করে?

কানমাদিকার : বলছি তো ইনভিজবল আঠা। ওয়েল, কিরি সব ক্যাচ ধরে ফেলছে দেখে কারও যদি সন্দেহ জাগে এবং কমপ্লেইন করে, আগে থেকেই ডিসিশন নেওয়া আছে ও স্টেটমেন্ট দেবে : 'সন্দেহ থাকলে আমার গ্লাভস ল্যাবরেটরিতে পাঠানো হোক। যদি কোনরকম কারচুপি ধরা পড়ে, আমি খেলা ছেড়ে দেব। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলা অবশ্য ওকে এমনিতেই এবার ছেড়ে দিতে হবে। তাছাড়া স্টেটমেন্ট দেবার আগেই গ্লাভস ধোয়া হয়ে যাবে।

৩৯

ইন ফ্যাক্ট, এই অ্যাসাইনমেন্টটা এত কঠিন হবে, বুঝতে পারিনি। বোম্বেতে টাইগার যোগীন্দার সিং আর ডিস্কো বুলের কুস্তির রিপোর্ট করতে গেলেই ভাল হত, এখন বুঝছি। দিল্লিতে দারা সিং আর ম্যান মাউন্টেন জ্যাকের কুস্তির কার্ড অবশ্য পাওয়াই যায়নি। জার্নালিস্টদের— নো অ্যাডমিশন!

ইন ফ্যাক্ট, আমি ভেবেছিলাম এয়ারকন্ডিশন্ড শিশির মঞ্চে ঘণ্টাখানেকের ফাংশান, তারপর ভালমন্দ খেয়ে বাড়ি ফিরব। জুনিয়র স্পোর্টস জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে বছরের সেরাদের পুরস্কার দেবার কথা। প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা এগার মিনিট, চিফ গেস্টের বক্তৃতা সাড়ে সাত মিনিট, অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির, আকস্মিক স্পেশাল গেস্টের জন্য বরাদ্দ সোয়া পাঁচ মিনিট। এই পৌনে চব্বিশ মিনিটের সঙ্গে সেক্রেটারি বা সেক্রেটারি-হতে-চাওয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি বা সেক্রেটারি-না-হতে-পারা ভাইস প্রেসিডেন্টের তিন মিনিট এবং হ্যালো মাইক টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি... আরও সোয়া দুই মিনিট। এই হল আধ ঘণ্টা। প্রাইজ দিতে এবং নিতে নিশ্চয় আধ ঘণ্টার বেশি সময় খরচ হবার কথা নয়।

বক্তৃতা-টক্তৃতা, বিশ্বাস করুন, চুয়াল্লিশ মিনিটেই মিটে গেল। চোদ্দ মিনিট বেশি— ও কিছু নয়।

আটাশ থেকে ঊনপঞ্চাশ বছর বয়সী জুনিয়র জার্নালিস্টরা খেলাধুলোর বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্ভাবনাময় ও সফল জুনিয়ারদেরই পুরস্কৃত করলেন।

ফুটবল, হকি, ক্রিকেট, ভলিবল, বাস্কেটবল, হ্যান্ডবল, কবাডি, খো-খো, অ্যাথলেটিক্স, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেবল টেনিস, লন টেনিস, দাবা, ক্যারাম, নেটবল, গলফ, স্কোয়াশ, ওয়াটারপোলো, পোলো, ফেন্সিং, ইয়টিং, ইকোয়েস্ট্রিয়ান ইভেন্টের সেরাদের প্রাইজ নিতে মোটে ছত্রিশ মিনিট লাগল। এয়ারকন্ডিশন্ড অডিটোরিয়াম, দুপুরে অফিসে ঘুমানর সময় পাইনি, ঢুলতে ঢুলতেও লক্ষ্য করলাম, একজন করে সেরা প্রাইজ নিয়ে চলে যেতেই একটু-একটু করে ভিড় কমে যাচ্ছিল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠর সঙ্গে বন্ধু বা আত্মীয়স্বজন বা অন্য কেউ কেউ এসেছিলেন। সেই হিসাবে, বিভিন্ন খেলার তেইশজন

সেরা প্রাইজ নিয়ে চলে যাওয়ার পর আর লোকই থাকার কথা নয়। তবু, অর্ধেক জায়গা ভর্তি দেখে অবাক হলাম। আহা, কী দারুণ ব্যাপার, এই দর্শকেরা সমাপ্তি ভাষণ বা সমাপ্তি-সঙ্গীত না শুনে যাবেন না।

ফাংশান প্রায় শেষ। এবার একটু খেয়েদেয়ে ভাল রিপোর্ট করার আশ্বাস দিয়ে কেটে পড়তে হবে।

কিন্তু, খাবারের প্লেট বা প্যাকেট নয়, আবার— প্রাইজ! সেরা বেতার ভাষ্যকার, সেরা দূরদর্শন ভাষ্যকার, সেরা রেডিও প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ, সেরা টিভি প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ, সেরা রেফারি, সেরা লাইন্সম্যান, সেরা ফোর্থ রেফারি, সেরা ক্রিকেট আম্পায়ার, সেরা হকি আম্পায়ার, সেরা— বিশ্বাস করুন, এইভাবে আরও বত্রিশজন সেরা প্রাইজ নিয়ে গেলেন। ট্রফি তৈরির কারখানার শ্রমিকরা নিশ্চয় আশাতীত প্রোডাকশন বোনাস পাবেন। সমস্ত ট্রফি মঞ্চের ওপর সারি সারি বসিয়ে রাখা হয়েছিল, এক কোণে প্রেসিডেন্ট, চিফ গেস্ট, স্পেশাল গেস্ট আর মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা। ট্রফি রাখার জন্য ডেকরেটররা দুটো টেবিল এনেছিলেন, আরও দুটো টেবিল চেয়েচিন্তে আনা হল, তবু ধরল না।

নাকে নস্যি দিয়ে ঘুম তাড়িয়ে দেখলাম, ডায়াসের কোনায় আরও কিছু ট্রফি পড়ে আছে। কী ব্যাপার, দর্শকদের দেবে নাকি? ঊনচল্লিশ বছর বয়সী এক ক্লান্ত-কণ্ঠ জুনিয়র জার্নালিস্টের ঘোষণা শোনা গেল : 'প্রমিজিং স্পোর্টস অফিসিয়াল অফ দি ইয়ার....।' প্রমিজিং অফিসিয়াল প্রাইজ নিতে মঞ্চে উঠলেন! বছর দশেকের মধ্যেই নিশ্চয় ইনি দক্ষ কর্মকর্তা হয়ে উঠবেন। এই কাঁচা বয়সেই, ভাবা যায় না, মাত্র তেষট্টি বছর বয়সেই তিনি একাধিক সংগঠনের কর্মকর্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ট্রফি নিয়ে নামতেই জিজ্ঞাসা করলাম : 'কেমন লাগছে?'

তিনি লজ্জা লজ্জা মুখে জবাব দিলেন, 'খুব ভাল। এই পুরস্কার আমাকে ভবিষ্যতে আরও বড় হতে সাহায্য করবে।'

ততক্ষণে মাইক্রোফোনে : 'মোস্ট এফেকটিভ....', খসখস খসখস.... মাইকে স্পষ্ট কিছু শোনা গেল না.... কুঁ.... মাইক ঠিক হয়ে গেল। মোস্ট এফেকটিভ কী যেন প্রাইজ নিতে মঞ্চে উঠলেন। তিনি নিচে নামতেই প্রশ্ন করলাম, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি কীসের জন্য প্রাইজ পেলেন?'

— 'আমাকে চেনেন না। ইন ফ্যাক্ট এই প্রাইজটা আমার আগের পারফরমেন্সের জন্য। এখন আমি ইস্টবেঙ্গলের হাফ-অফিসিয়াল, মাঠের ধারে ঘাসে বসে খেলা দেখি। এইট্টি ওয়ান পর্যন্ত আমার হাতের ভাঁড়কে ভয় পেত না, প্লেয়ার, কোচ, রেফারি, লাইন্সম্যান বা অফিসিয়াল খুঁজে পাবেন না।'

— 'আপনি কি শুধু চায়ের ভাঁড়ই ছুঁড়তেন?'

— 'হ্যাঁ, স্পেশালিস্ট। ইট-পাটকেল ছুঁড়ে মাথা ফাটানো যায়, কিন্তু ওতে আর্ট নেই। ভাঁড়ে একটু চা থাকবে, হাল্কা জিনিসটা একটু ত্যারছাভাবে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিতে হবে,

যাতে এটুকু চা নিয়েই ভাঁড়টা নির্দিষ্ট মাথায় গিয়ে পড়ে এবং ভাঙে। এতে মাথা ফাটে না কিন্তু আদা-চা চুলে লেপ্টে যাওয়ায় এবং হাজার হাজার দর্শকের সামনে ব্যাপারটা ঘটায় রি-অ্যাকশন ভাল হয়। টাক মাথায় চা দিয়ে লাভ নেই, একটু জোরে কম ফ্লাইটে ছুঁড়ি, কাজ হয়। আমাদের সাধনা ছিল। অফ সিজনেও গ্যালারিতে বসে কাল্পনিক মাথা বা টাক টার্গেট করে প্র্যাকটিস করে গেছি। এক-একটা ম্যাচে হাতের কাছে কটা আর ভাঁড় থাকত, বড় জোর সাত কি আট, কিন্তু ওতেই কাজ হয়ে যেত। আমি এখন ইস্টবেঙ্গলের হাফ-অফিসিয়াল। কিন্তু এই পুরস্কার নিশ্চয় উদীয়মানদের অনুপ্রাণিত করবে, আরও ভালভাবে, নিখুঁতভাবে ভাঁড় ছুঁড়তে। তারপর চারজন অফিসিয়ালের মাথায় নিখুঁতভাবে ভাঁড় ফেলতে পেরেই আমি আজ সাইডলাইনের পাশে বসার অধিকার অর্জন করেছি। অথচ সাত বছর ইস্টবেঙ্গলে খেলেও এই অধিকার অর্জন করা যায় না। ফুটবল খেলার চেয়ে ফুটবল মাঠে ঢিল ছোঁড়া বা ভাঁড় ছোঁড়া যে অনেক ভাল কাজ, এরপর আশা করি সব বাচ্চারাই বুঝবে।'

লম্বা ইন্টারভিউ চলার মাঝে আরও কোনও তিনজনকে প্রাইজ দেওয়া হয়েছিল, বুঝিনি। একজনকে ট্রফি নিয়ে স্টেজ থেকে নেমে আসতে দেখেই এগিয়ে গেলাম : 'আপনি?'

— 'বেস্ট গভর্নমেন্ট গ্রাউন্ড স্টাফ। আমি গেটে দাঁড়াই, চেনেন না?'

— 'চিনি না বলে কিছু মনে করবেন না। কারণ আমাকে ফুটবল ম্যাচ কভার করতে পাঠানো হয় না, সেজন্য বড় বড় রিপোর্টাররা আছেন। ভাগ্যিস এই ফাংশানটা কভার করতে এলাম, না হলে আপনার সঙ্গে আলাপই হত না।'

— 'প্রাইজ পেয়ে কেমন লাগছে?'

— 'খুব ভাল। এরপর থেকে গেটে আরও ভালভাবে দাঁড়াব। বীভৎস গরমেও মিষ্টি হাসব। জুনিয়র অভিজ্ঞ জার্নালিস্টদের আরও ভালবাসব।'

— 'আর কিছু বলবেন?'

— 'শুধু একটা কথা। গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু লেখা দরকার। টিকিট নিয়ে বড় বেশি কড়াকড়ি হচ্ছে। বড় ম্যাচের টিকিটের লাইনে পরিশ্রমী মস্তানেরা বেকার হতে চলেছেন। ভাল করে লিখুন। শুধু আমার নামটা দয়া করে দেবেন না!'

— 'কোনও চিন্তা নেই, আপনার নাম দেব না। কারণ, আপনার নাম আমি জানিই না!'

৪০

ওয়ার্ল্ড কাপ ক্রিকেট শুরু হওয়ার পর থেকেই আমি অফিসে বলে গেছি, ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হবে। গ্রুপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে গোহারান হারার পর সবাই যখন ফিউজ, আমি বলেছি, ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হবে। ফাইনালে ইন্ডিয়া ১৮৩ রানে অল আউট, তখনও বলেছি, চ্যাম্পিয়ন হবে, মানে— হব! তিন সপ্তাহ ধরে আজকাল আর খেলার সবজান্তা রিপোর্টাররা আমার কথায় কখনও মুচকি কখনও অট্টহাসি উপহার দিয়েছে। মহিন্দারের বলে হোল্ডিং আউট হতেই আমি প্রথম মুখ খুললাম। ওদের সকলের হয়ে সবজান্তা এডিটর সাহেব বললেন, 'আপনার ফোরকাস্ট মিলে যাওয়ার একটাই কারণ : আপনি ক্রিকেটের কিস্যু বোঝেন না (ঝ-এর উচ্চারণ Z-এর মতো, বলা বাহুল্য)!

লোকে আনন্দে হাসে, কাঁদে, গান করে, নাচে, বিয়ার-শ্যাম্পেন খায়, চেঁচায়, অন্যের মাথা ফাটায়। আমি শুধু ঘুমাই। ভেবেছিলাম এত বড় আনন্দের জন্য তিনদিন টেনে ঘুম দেব। কিন্তু সোমবার সকাল সাড়ে দশটায় আমার ঘুম ভাঙিয়ে খবর দেওয়া হল, তখনই অফিস যেতে হবে। পৌঁছতেই এডিটর সাহেব অর্ডার দিলেন, 'এই লিস্টিটা সঙ্গে রাখুন, এঁদের কোনরকম কমেন্ট এখনও পাইনি। খোঁজ করুন, কমেন্ট কালেক্ট করুন। যেখানে দরকার যান। টাকা পয়সা বেশি করে নিয়ে নিন।'

অফিস থেকে সোজা রাইটার্স বিল্ডিংয়ে গিয়ে শুনলাম, চিফ মিনিস্টার লাঞ্চ করতে বাড়ি গেছেন। তখনই তাঁর বাড়ি গিয়ে শুনলাম, রাইটার্সে চলে গেছেন। রাইটার্সে গিয়ে যদি শুনি যে সি এম বাড়িতে 'টী' করতে গেছেন, এই ভয়ে বাড়ির সামনেই বসে থাকলাম। না, জ্যোতিবাবু 'টী' করতে আসেননি। রাত্রি পৌনে এগারটায় তাঁর গাড়ি থামতেই লাফিয়ে গেলাম। সি এম বললেন, 'আমি বাড়িতে কোনও রিপোর্টারের সঙ্গে কথা বলি না। কী জানতে চান? সব মিথ্যা.... সব গপ্পো....।'

— 'না, ইয়ে, আমি ওয়ার্ল্ড কাপে....'

— 'আমি ক্রিকেট-টিকেট দেখি না। অত সময়-টময় নেই। ইন্ডিয়া নাকি চ্যাম্পিয়ন-ট্যাম্পিয়ন কী সব হয়েছে!'

আমি কথা-টথা না বাড়িয়ে নমস্কার-টমস্কার করে ফিরে এলাম। গভীর রাত্রে আই

এফ এ সম্পাদক অশোক মিত্রর কাছে বক্তব্য জানতে চাইতেই বলে উঠলেন : 'আবার কীসের বক্তব্য? সিক্সটিস্থ জুলাই বড় ম্যাচ খেলাবই। কে কী বলল জানার দরকার নেই।'

অনেক রাত, কথা না বাড়িয়ে বাড়ি চলে এলাম। পরদিন খুব ভোরে নিশীথ ঘোষের বাড়ি গেলাম। চটপটে ভৃত্য জানিয়ে গেল, 'বাবু বললেন, বাবু বাড়ি নেই।' আমি বললাম, 'বাবুকে গিয়ে বল, বাবু যখন বাড়ি নেই, ফিরলেই দেখা হবে, আমি অপেক্ষা করছি।'

পৌনে দশটা নাগাদ বসার ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'এত বড় একটা ঘটনা ঘটল। আপনার প্রতিক্রিয়া.... ?'

টিমের প্রতিক্রিয়া? স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে হারার আগেই আমরা লিগ থেকে আউট হয়ে গেছি। পি কে.... থাক, আপনারা আবার উল্টোপাল্টা লিখে দেবেন।'

পঙ্কজ রায়কে সৌভাগ্যবশত রাস্তাতেই পেয়ে গিয়ে বললাম, 'আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। এই ব্যাপারে আপনার কমেন্টস না পেলে....'। পঙ্কজ রায় আমাকে থামিয়ে বললেন : 'আমিও আপনাকে খুঁজছিলাম। কানমাদিকার আমাকে চিঠি দিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেছে। আসলে তো টেলিগ্রামই পাঠানোর কথা....।'

বিকেলের ফ্লাইটে দিল্লি গেলাম মঙ্গলবার। রাত্রেই চেতন চৌহানকে টেলিফোন করে রি-অ্যাকশন জানতে চাইলাম। চৌহান বললেন, 'আই শ্যাল কাম ব্যাক'। আমি বললাম, 'ভারতের এই জয়....'। চৌহান বললেন, 'গ্রেট।.... বাট আই শ্যাল কাম ব্যাক।'

বুধবার সকালে বুটা সিংয়ের কাছে গিয়ে বললাম, 'এত বড় একটা ঘটনা, আপনার কথা শুনতে এলাম।'

বুটা সিং মিটিমিটি হেসে : 'তার আগে বলুন, বড় খবরটা কী করে পেলেন?'

— 'তার মানে?'

— 'আমার ধারণা আপনিই প্রথম রিপোর্টার, যিনি খবরটা পেয়েছেন। অন্য কেউ পেলে নিশ্চয় আমার কাছে আসত। আসলে ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি গোল্ডমেডেল আমাকেও দিতে চেয়েছিল। আমি রিফিউজ করেছি, কারণ আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সমান সম্মান বা পুরস্কার অ্যাকসেপ্ট করার মতো মূর্খ আমি নই। অনেক কষ্টে আমাকে সিলভার মেডেল দিতে রাজি করিয়েছি।'

খবর পেলাম প্রাক্তন ভারতীয় হকি অধিনায়ক বলবীর সিং দিল্লিতেই আছেন। এডিটর সাহেবের লিস্টে তাঁর নামও ছিল। ডিফেন্স কলোনিতে ভাইপোর বাড়িতে বলবীর তখন হোয়াইট কফি খাচ্ছিলেন। এশিয়াডের সময় আলাপ হয়েছিল। মিষ্টি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভারতের খেলাধুলোর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ঘটনাটি সম্পর্কে আপনার বক্তব্য জানাবেন?'

— 'এটা যে আপনারা বুঝেছেন, তাতেই আমি খুশি। দিনের পর দিন অন্যায় চালিয়ে যাচ্ছে মহাজনের মতো কর্মকর্তারা। আমি যে এবার এমন নির্ভীক প্রতিবাদ জানাব, ওঁরা ভাবতেই পারেনি।'

কলকাতা ফেরার সময় দিল্লি এয়ারপোর্টে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির সঙ্গে দেখা। হাতে 'দি

গার্ডিয়ান' এবং উল্টোরথ পত্রিকা। ফ্লাইটের সামান্য দেরি আছে। কোনটা পড়বেন, ভাবছিলেন। ভাবনার হাত থেকে তাঁকে মুক্তি দেবার জন্য এগিয়ে গিয়ে বললাম, 'এত বড় একটা ঘটনা....'।

— 'আর বলবেন না। এই প্রথম আমি কোনও ইম্পর্ট্যান্ট ব্যাপারে আমি সময়মত স্টেটমেন্ট দিতে পারলাম না। শনিবার রাত্রে আমার টেলিফোন এবং জিপ দুটোই খারাপ ছিল। এবার থেকে এই ধরনের বড় ইভেন্টের সময় আগে থেকেই স্টেটমেন্ট সব পত্রিকায় জমা দিয়ে রাখব।'

৪১

ভারত একদিনের ক্রিকেটে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর সারা দেশে আনন্দ, উল্লাস, উৎসব এবং গর্বের যে সাইক্লোন প্রবাহিত হয়েছে, ক্রিকেটারদের কৃতিত্বের তুলনায় তা কিছুই নয়। ওস্তাদ ওস্তাদ রিপোর্টার এবং দিস্তা দিস্তা এজেন্সি কপির কল্যাণে সব খবরই এখন আপনাদের নখদর্পণে। তবু একটি খবর, আসলে যা অনেকগুলো খবরের সমষ্টি, আপনাদের জানা নেই। জানা নেই নিশ্চিত, কারণ কোনও কাগজেই এ পর্যন্ত তা প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয়নি কারণ কোনও রিপোর্টার জানে না। জানে না কারণ...। এত ফেনিয়ে কী লাভ, স্ট্রেট বলে ফেলাই ভাল, যে খবর কেউ দিতে পারে না সে খবর বাবুরাম সাপুড়ে দেয়। এমনকি, যা কখনও ঘটেনি, সে খবরও বাবুরাম সাপুড়ে দেয়। এমনকি... থাক, নিজের প্রশংসা করতে ভাল লাগে না, সারা জীবনই ওই জিনিস করে যাচ্ছি কিনা!

২৬ জুন থেকে ৫ জুলাই— এই দশদিনে ভারতবর্ষে মোট এক লক্ষ তের হাজার সাতশ তিনটি শিশু জন্মেছে। এর মধ্যে ছাপ্পান্ন হাজার একশ একানব্বুই জন ছেলে। এর মধ্যে সাত হাজার দুশ পঁচাত্তর জনের বাবা-মা বিশ্বজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটারদের নাম নিজেদের ছেলেদের নাম হিসাবে বেছে নিয়েছেন।

এই বাবা-মারা সকলেই নিঃসন্দেহে, ক্রিকেট-রসিক। নাম বাছার ক্ষেত্রেও পপুলারিটি এবং পারফরমেন্সের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে।

ঠিকই ধরেছেন, সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় ছেলের নাম হয়েছে কপিলদেব। তিন হাজার পাঁচশ বিয়াল্লিশ জন। এরা প্রত্যেকেই যদি বড় হয়ে বড় বোলার হয়, টেস্টে পার হেড আধখানা করে উইকেট পায়, লিলির রেকর্ড ভেঙেচুরে গুঁড়ো হয়ে ধুলোয় মিশে যাবে। বেশ হবে। মহিন্দার অতঃপর আরও অন্তত আটশ একান্ন জনের নাম। ম্যানুফ্যাকচারাররা তৈরি হন, বছর কুড়ি-পঁচিশ পরে অন্তত আটশ একান্নটি টপ ক্লাস হেলমেট লাগবে। এরা প্রত্যেকে টেস্টে দশ রান করে করলেই বয়কটের রেকর্ড পালিয়ে বাঁচবে।

থার্ড ফেবারিট : সন্দীপ। এই নামটা, ইন ফ্যাক্ট অনেক বেশি মায়ের পছন্দ হয়েছে, কিন্তু তত বেশি বাবাদের পছন্দ না হওয়ায় মাত্র চারশ সতেরজন একইসঙ্গে ফিল্মস্টার

আর চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটারের নাম পাবার সুযোগ পেল।

মদনলাল নাম পেল চারশ তিনজন নবজাতক। এদের মধ্যে যারা বড় হলে ভীতু ও দুর্বল হবে, তাদের নাম পাল্টাতে হবে।

তিনশ তিরানব্বুই সেট বাবা-মা যশপালের নাম বেছে নিলেও, তাদের মধ্যে কেউই বাংলার নন। বাংলায় নাকি যশপাল নাম চলে না। প্রতিবাদ হিসাবে যশপাল নাকি কলকাতায় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দুশ বার মিনিটে উনিশ রানের একটা দায়িত্বশীল ইনিংস খেলার হুমকি দিয়েছেন।

কেউ সৈয়দ, কেউ কিরি, কেউ মানি— সৈয়দ কিরমানিকে মনে রেখেছেন তিনশ সাতাত্তর সেট বাবা-মা। এই বাবা-মাদের একেবারে গোড়া থেকেই ছেলের মাথায় নামকরা সব তেল মালিশ করে যেতে হবে, যাতে বেশি চুল গজানোর চান্স না পায়।

রজার নাম পেল তিনশ একচল্লিশটি ফুটফুটে ছেলে। এরা সকলেই দেখতে সুন্দর, কিন্তু কখনই হাসবে না।

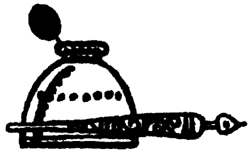
সাউথ ইন্ডিয়ায় দুশ আটজন কৃষ্ণমাচারী এবং বাংলায় সাতজন শ্রীকান্ত— মোট দুশ পনেরজন কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্তকে সম্মানিত করল।

এই দশদিনে, দুশ একজন বলবিন্দার, একশ নিরানব্বুই জন কীর্তি, একশ বাহাত্তর জন রবি এবং একশ তেষট্টি জন দিলীপ এল।

এবং সাউথ ক্যালকাটায় এক বিখ্যাত নার্সিং হোম থেকে খবর এল, একটি নবজাতকের নাম দেওয়া হয়েছে— সুনীল। বিশ্বকাপে যে নিদারুণ ব্যর্থ, গৌরবময় জয়ে যার কোনও ভূমিকা নেই, তার নামে নিজেদের ছেলের নাম যাঁরা রাখলেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করা দরকার। নার্সিং হোমে মা-র সঙ্গে দেখা করা গেল না, তবে বাবা নিজেই দেখা দিলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'একজন ব্যর্থ ক্রিকেটারের নামে ছেলের নাম দিলেন কেন?'

ভদ্রলোক বেশ ক্রুদ্ধস্বরে জবাব দিলেন : 'কে বলেছে, সুনীল ব্যর্থ? আপনি কি খবর রাখেন যে ফাইনালের পর গভীর রাত্রে কপিলদেবের ঘর থেকে জিম্বাবোয়ে ম্যাচে পাওয়া শ্যাম্পেনের বোতলটা ছুটে মাত্র ছত্রিশ সেকেন্ডে নিয়ে এসেছিল সুনীল? আমাদের প্রিয় কপিলদেব। যমজ ছেলে হয়েছে, একজনের নাম কপিলই রেখেছি। অন্যজনের নাম আমি সুনীলই রাখলাম। সুনীল ভালসান যদি আমাদের সেকেন্ড ফেবারিট হয়, আপনাদের কিছু বলার আছে?'

৪২



ছিলাম, ছিলাম, আমিও ছিলাম। বোম্বের শহর এয়ারপোর্টে ৪ জুলাই আমিও হাজির ছিলাম। ভারতের অবিশ্বাস্য জয়ে আবেগতাড়িত হয়ে নিজের খরচেই বোম্বে গিয়েছিলাম এবং এডিটরের নির্দেশ ছাড়াই নিজের উদ্যোগে একটা রিপোর্ট পাঠিয়েছিলাম। ক্রিকেট সংখ্যাও প্রকাশিত হয়ে গেল, এডিটর সাহেবের ব্লু আইড বয়েদের লেখায় সব পৃষ্ঠা ভরে গেল, তবু আমার ছোট্ট রিপোর্টটার জায়গা হল না। কিন্তু, মহামতি এডিটরসাহেব এই পৃষ্ঠাটি আমাকে ছেড়ে রেখেছেন। আপনারা পড়ুন বা না-পড়ুন, ৪ জুলাই বোম্বে থেকে পাঠানো উচ্ছ্বসিত রিপোর্টটা এখানে প্রকাশ করছি।

জয় জয় জয় জয় জয় হে!

অবশেষে বিলাতরূপ স্বর্গ হইতে ভারতরূপ মর্তে ক্রিকেটাররূপ দেবতারা অবতরণ করিলেন। আমি ফরাক্কার দর্মাবেষ্টিত ভোজনালয়ে কচি কলাপাতায় পরিবেশিত সুপক্ক ইলিশ খাইয়াছি, ওস্তাদ আলি আকবর খানের সরোদবাদন শুনিয়াছি, শ্যাম থাপার ব্যাকভলি দেখিয়াছি, রাজা অয়দিপাউসের ভূমিকায় শম্ভু মিত্রর অভিনয় দেখিয়াছি, ফুটবল মাঠে বৃষ্টিস্নাত বিকালে মাটির ভাঁড়ে আদা-চা খাইয়াছি, চর্মচক্ষে অমিতাভ বচ্চনকে দেখিয়াছি, স্বয়ং চারু মজুমদারের সহিত একটানা তিন ঘণ্টা কথাবার্তা বলিয়াছি, কিন্তু কখনই এইরূপ আবেগে আপ্লুত হই নাই। কখনই আমার স্বভাবশুষ্ক দুই চক্ষু এইরূপ অশ্রুসাগরে ভাসমান হয় নাই।

সৌভাগ্যক্রমে আমার বিরল আনন্দাশ্রু যথেষ্ট পরিশ্রুত, অশ্রুবিধৌত চক্ষে বিজয়ী বীরেদের অবলোকন করিয়া ধন্য হইতে কোন অসুবিধা হয় নাই।

প্রথমে বীরশ্রেষ্ঠ কপিলদেব, তৃতীয়ে ধীরোদাত্ত নায়ক অমরনাথ। এবং তাঁহাদের মাঝখানে, দ্বিতীয়ে, খ্যাতকীর্তি প্রেম শাহ, এয়ার ইন্ডিয়ার করিৎকর্মা মেকানিক, লর্ডসে ঐতিহাসিক বিজয়ের পর যাঁহার ট্যুইস্ট নৃত্য আমরা দূরদর্শনে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য অর্জন করিয়াছিলাম। শহর বিমানবন্দরেও তিনি নামিলেন প্রায় নাচিতে নাচিতেই, চঞ্চল দুই হস্তে উড্ডীন ও কম্পমান তেরঙ্গা ঝাণ্ডা, আহা, মুখে বীরশ্রেষ্ঠ কপিলদেবের মতোই সরল বিজয়হাস্য।

আমার সঙ্গে কোনও মালা ছিল না, কারণ, বিজয়ী বীরেদের গলায় মালা দুলাইবার সৌভাগ্য অর্জন করিবার মতো মামার জোর বা গায়ের জোর— কোনটাই আমার নাই। ওই চিঁড়া-চ্যাপ্টা ভিড়ের মধ্যেই চোদ্দজন ক্রিকেটার, একজন ম্যানেজার এবং একজন প্রেম শাহ— একুনে ষোলজনকে মোট একশ ছিয়াত্তরটি মালা পরান হইল। বীরেদের উন্নত মস্তক সম্মুখে ঝুলিয়া পড়িল, ঝুলিতে ঝুলিতেই উজ্জ্বল হাস্য বিচ্ছুরণ করিল। বিশেষত অধিনায়ক কপিলদেবের বীরত্ব ও সহ্যশক্তির প্রশংসা করিতে হয়। বিশালোদর একান্ন জন ঘনিষ্ঠ অনুরাগী তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন, কপিলদেব বিচলিত হইলেন না। এগারজনের দাড়ি তাঁহার নাসিকা চুম্বন করিল, বীরশ্রেষ্ঠ কপিলদেব হাঁচিলেন না।

বীরশ্রেষ্ঠ গাভাসকারও কম যান না। একশত সতের জন কিশোরী এবং দুইশত ছত্রিশ জন যুবক তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া টাগ-অফ-ওয়ার লড়িলেন, তিনি অচঞ্চল থাকিলেন। লাক্সারি বাসে উঠিবার পর তিনি অবশ্য আরও সহ্যশক্তি প্রদর্শন করিলেন। অত্যুৎসাহিনী একজন বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার হাত কামড়াইয়া ধরিলেন, 'সানি হানি'র মধুহাস্য তবু অটুট থাকিল।

নক্ষত্ররা লাক্সারি বাসে উঠিবার আগেই বিস্তর ব্যবসায়ী বিস্তর পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করিলেন। ব্যবসায়ীদের মধ্যে রাজনীতি-ব্যবসায়ীরাও ছিলেন। এক বিখ্যাত তণ্ডুল ব্যবসায়ী ঘোষণা করিলেন, তিনি এক বৎসর চোদ্দজন খেলোয়াড়, একজন ম্যানেজার এবং একজন প্রেম শাহ— একুনে এই ষোলজনকে বিনামূল্যে চাউল সরবরাহ করিবেন। পাঁচ জন চাউল খান না, অন্য পাঁচজনের ইংল্যান্ড হইতে চাউল গ্রহণ করা সম্ভব নয়, বাকি ছয়জনও এব্যাপারে আগ্রহ প্রদর্শন না করায়, ষোলজনকেই মূল্য ধরিয়া দেওয়া সাব্যস্ত হইল। এক বৎসরের চাউলের বদলে প্রত্যেকে এক হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। টাকার অঙ্ক শুনিয়া পাতিল নাসিকা এবং আজাদ ভ্রূ কুঞ্চন করিলেন। চলচ্চিত্রতারকা এবং মন্ত্রীতনয়কে আলাদা করিয়া চিনিতে অসুবিধা নাই।

এক মদ্য প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক সিক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন, এক বৎসর চোদ্দজন ক্রিকেটার, একজন ম্যানেজার এবং একজন প্রেম শাহ— একুনে ষোলজনকে বিনামূল্যে বিয়ার সরবরাহ করিবেন। পাঁচ জন বিয়ার খান না, বাকি এগারজনের মধ্যে কেউ কেউ ইংল্যান্ডে থাকিবেন আগামী অন্তত দুই মাস, কেহ কেহ আবার এই কোম্পানির বিয়ার পছন্দ করেন না, এক্ষেত্রেও, সুতরাং মূল্য ধরিয়া দেওয়া শ্রেয় বিবেচিত হইল। প্রত্যেকে সাড়ে সাত হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। চলচ্চিত্রতারকা এবং মন্ত্রীতনয়ের মুখেও সামান্য হাসি ঝিলিক মারিল।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্লেড উৎপাদক সংস্থার কর্ণধার ঘোষণা করিলেন, এক বৎসর মোট ষোলজনকে বিনামূল্যে ব্লেড দেওয়া হইবে। পাঁচজন দুই মাস ইংল্যান্ডে থাকিবেন পাতিল এবং সাঁধু দাড়ি রাখেন, বাকিদের মধ্যে অনেকের আবার ব্র্যান্ডের বাছবিচার আছে, সুতরাং সেই মূল্য ধার্যের ব্যবস্থা। হিসাবে মাত্র শ দেড়েক টাকা দাঁড়ানোয়, উক্ত কর্ণধার স্পট ডিসিশান নিলেন, আত্মীয়স্বজনের জন্যও বিনামূল্যে ব্লেড, এই হিসাবে—

ষোলজনকে তিন হাজার টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

এক সুগন্ধী কেশতৈল প্রস্তুতকারক সংস্থার স্বত্বাধিকারী এক বৎসর বিনামূল্যে কেশতৈল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু কিরমানির কেশ চর্চার প্রয়োজন নাই, অন্যদের মধ্যে অনেকেই মস্তক তৈল নিষিক্ত করিতে চাহেন না, সুতরাং ষোলজন মাথাপিছু আড়াই হাজার। এইরূপে বিস্কুট, কোল্ড ড্রিঙ্কস, জিনস, চা, চিনামাটির ডিনার ও টি সেট, শেভিং ক্রিম, প্রভৃতি দ্রব্যের উৎপাদক সংস্থার মালিক বা প্রতিনিধিরা মূল্য ধরিয়া দিলেন। একটি বিশিষ্ট স্যুটকেশ নির্মাতা সংস্থার কর্ণধার প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছিলেন, তিনি জানিতেন প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সঙ্গে বা গৃহে তাঁহার কোম্পানির অন্তত সাতান্নটি করিয়া ব্রিফকেস বা স্যুটকেস আছে, তিনি ষোলটি প্যাকেট একটি ব্রিফকেসে আনিয়া ছিলেন। প্রত্যেক প্যাকেটে স্যুটকেসের মূল্য হিসাবে সাড়ে পাঁচশত টাকা, স্যুটকেসটি ম্যানেজারকেই দেওয়া হইল, কারণ এর আগে তাঁহাকে স্যুটকেস বা ব্রিফকেস উপহার দেওয়ার সৌভাগ্য কোম্পানির হয় নাই।

এইরূপ বাঘা বাঘা ব্যবসায়ীদের ভিড়ে আমার মতো সাধারণ ক্রিকেট-আমোদীর অবস্থা যাহা হইবার তাহাই হইল। কেহ আমাকে পিষিল, কাহাকেও আবার আমি পিষিলাম। এবং ফাঁকেফোঁকরে বীরেদের দেখিয়া মানবজীবন ধন্য করিলাম।

মাঝে আবার একটি ফ্যাকড়া দেখা দিল। এই পত্রিকার এক ফটোগ্রাফার হ্যাঁচকা টান মারিয়া কহিলেন, 'দেখুন, দেখুন, কী ছবি তুলছি, বিশ্বনাথকে কেউ চিনছে না।' ওই হ্যাঁচকা টানের প্রত্যুত্তরে আমিও কনুই দিয়া কঠিন ধাক্কা দিলাম। ফটোগ্রাফার কোনক্রমে ব্যালান্স রাখিল।

কোথায় ভালসন, আজাদ প্রমুখ নক্ষত্রদের দেখিবার জন্য আমরা ধস্তাধস্তি করিয়া গলদঘর্ম এবং ছিন্নচর্ম হইতেছি, এখন আমাদের বিশ্বনাথকে দেখিতে হইবে! বিশ্বনাথ কি ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন টিমে খেলিয়াছেন? বিশ্বনাথের পকেটে কি মেডাল আছে? তবু, তিনি অন্তত দুইটি বিশ্বকাপে খেলিয়াছেন, তাই যাহোক একজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলিলেন। টাইগার পতৌদিও একই ফ্লাইটে নামিলেন, কই, তাঁহার ছবি তো কেহই তুলিল না। তবু, যদি দৈবাৎ কাহারও ছবিতে ফাঁকে ফোঁকরে তিনি থাকিয়া যান ক্যাপশনে নিশ্চিত তাঁহার নাম বাদ পড়িবে। হুঁ শখ কত, যে জীবনে ওয়ার্ল্ড কাপে খেলেই নাই, তাঁহার আবার ক্যাপশনে নাম!

৪৩

বিশ্বনাথ এবং পতৌদি দুজনের সঙ্গেই দেখা হয়েছিল ৭ জুলাই সন্ধেবেলায়, ব্রাবোর্ন স্টেডিয়ামে। জিনের গ্লাস থেকে পতৌদি এবং বিয়ারের গ্লাস থেকে বিশ্বনাথ মুখ তুলে একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নদের ইন্টারভিউ নিতে ভাল রিপোর্টারদের পাঠিয়ে আমাদের মতো এলেবেলে ক্রিকেটারদের কাছে আপনাকে পাঠিয়েছে বুঝি ?'

টাইগার বললেন, 'যশপাল আমার চেয়ে ভাল মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান, আমার চেয়ে অনেক ভাল কভার পয়েন্ট ফিল্ডসম্যান। এই ইন্ডিয়া টিমে আমার জায়গা হত না।'

ভিশি বললেন, 'যশপাল, সন্দীপ, দিলীপ, কীর্তি— সবাই আমার চেয়ে অনেক ভাল ব্যাটসম্যান। এই টিমে আমার জায়গা হয়নি, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন।'

ওদের দুজনের সঙ্গে আসলে ফাউ ইন্টারভিউ হয়ে গেল। ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর আমাকে দু-তিনটে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয়েছে। শেষেরটাই সবচেয়ে ভাল। ইংল্যান্ডে গিয়ে থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যাওয়া ইংরেজ সাংবাদিকদের ইন্টারভিউ নিতে হবে, যারা ইন্ডিয়াকে আন্ডার এস্টিমেট করে আন্ডারডগ বলেছিল।

হিথরো এয়ারপোর্টে নেমে খুব হতাশ হলাম। ভেবেছিলাম, একজন ইন্ডিয়ানকে দেখেই প্রচুর লোক ঘিরে ফেলবে এবং ক্রিকেট সম্পর্কে প্রচুর প্রশ্ন করবে। ইন ফ্যাক্ট, মনে মনে আমি একাত্তরটা প্রশ্ন এবং উত্তর ভেবে রেখেছিলাম।

ইংল্যান্ডের খবরের কাগজগুলো দেখে অবাক হতে হল। মাত্র ষোলদিন আগে হয়েছে প্রুডেনশিয়াল কাপ ফাইনাল, অথচ খেলার পৃষ্ঠা জুড়ে যত ফালতু খবর— উইম্বলডন, কোনর্স না কে যেন হেরেছে, ম্যাকেনরো না কে যেন এবার খুব ভাল ব্যবহার করছে, বয়কট নামে একটা লোক কীভাবে এই বয়সেও প্রচুর রান করছে, ইলিংওয়ার্থ নামে একটা একান্ন বছরের বুড়ো নাকি ভিক মার্কসের চেয়েও ভাল অফ স্পিন করাচ্ছে, কেনি ড্যালগ্লিশ না কে যেন বছরের সেরা ফুটবলার হয়েছে, গর্ডন ব্যাঙ্কস নামে একটা লোক নাকি গোলকিপারদের ট্রেনিং স্কুল খুলতে চাইছে— এই সব। হাড়ে হাড়ে চিনে নিয়েছি ব্রিটিশ জাতটাকে, চ্যাম্পিয়ন ইন্ডিয়া টিমের খবর নিয়ে অন্তত তিনমাস হৈ চৈ করার

উদারতাটুকু পর্যন্ত নেই।

ইন্ডিয়ায় ফিরে কপিলরা কী করেছে, ভারতের সব কাগজে কী দারুণভাবে বেরিয়েছে। ফুটবলের মতো একটা ছোট খেলায় (মাত্র নব্বুই মিনিটের) ইতালি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেও আমরা সাত দিন কত খবর ছেপেছিলাম, অথচ ভেবে দেখুন, কপিল ইন্ডিয়া থেকে ফিরল, এত উৎসবের পর হিথরো এয়ারপোর্টে জার্নালিস্ট বলতে একা আমিই! কপিল কী করে প্লেন থেকে নামল, কী পোশাক ছিল ওর, কোন কোম্পানির কী মডেলের কত নম্বর গাড়িতে চড়ে ও নিজের আস্তানায় ফিরল, নর্দামটনশায়ার কাউন্টির প্রেসিডেন্ট কপিলকে কত আউন্স ওজনের ফুলের তোড়া উপহার দিলেন, অ্যালান ল্যাম্ব জড়িয়ে ধরে এবং ডেভিড চ্যাপেল হাত ধরে কী বলল, বিশ্বাস করুন, ইংল্যান্ডের কোনও কাগজে এসব খবর বেরল না। ভাবছি, একটা প্রপোজাল দেব, যাতে বছরে অন্তত পাঁচজন ইংরেজ স্পোর্টস জার্নালিস্ট ইন্ডিয়ায় গিয়ে কিছু শিখে আসার সুযোগ পায়।

স্ক্রাইবস সেলার-এ দেখা হল ফ্র্যাঙ্ক কীটিংয়ের সঙ্গে। বললেন, 'আমরা সকলেই খুব অনুতপ্ত। ইন্ডিয়াকে আর কখনও আন্ডারডগ বলব না। ওয়ার্ল্ড কাপের আগের দু-তিনটে সিরিজে গোহারান হারলে বা টুর্নামেন্টের আগের প্র্যাকটিস ম্যাচগুলোয় জঘন্য খেললেও না। আমি এবার থেকে ইন্ডিয়াকে ফেবারিট বলব। অন্তত নাইনটিন নাইন্টিনাইনের ওয়ার্ল্ড কাপ পর্যন্ত।'

কীটিং বিয়ার অফার করলেন। থার্ড চুমুকটা দেবার সময়েই হেনরি ব্লোফিল্ডকে ঢুকতে দেখলাম। কিন্তু একেবারে অন্যদিকের টেবিলে বসলেন। অনুমতি নিয়ে কীটিং-এর অফার করা বিয়ারের গ্লাস নিয়েই ব্লোফিল্ডের টেবিলের দিকে গেলাম, একটুও ভনিতা না করে তিনি বললেন, 'ইন্ডিয়া চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় আমার দেড় রাত ভাল ঘুম হয়নি। ছি ছি, কত বড় ভুল আমরা করেছি। আমি লিখেছিলাম, আগেও কতবার বলেছি, ওয়েস্ট ইন্ডিজের পেস বোলাররাই 'দি বেস্ট'। এখন সব কথা আমাকে গিলতে হচ্ছে। রবার্টস-হোল্ডিং-গার্নার-মার্শালের চেয়ে কপিল-মহিন্দার-মদন রজার বেটার পেস বোলার, এখন থেকে তিন বছর এই কথা হাজার বার লিখে যাব, তাতে যদি প্রায়শ্চিত্ত হয়।'

জন উডককের বাড়িতে গেলাম। এত বাজে জার্নালিস্টের এত ভাল বাড়ি গাড়ি কী করে থাকে, কে জানে! উডকক বললেন, 'ইন্ডিয়া ফেবারিট, এটা লিখিনি বলে সাতদিন ধরে শোকপ্রকাশ করেছি, এবার থেকে সব সময় ইন্ডিয়াকে ফেবারিট বলব। আমার আর-একটা কমেন্ট নিয়ে খুব লজ্জায় পড়েছি। মাস তিনেক আগে লিখেছিলাম, 'ব্রুস ইয়ার্ডলি মাঝেমধ্যে সত্যিই ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, বেঙ্কটরাঘবন এখনও আন্তর্জাতিক মানের বোলার, কিন্তু স্পিন বোলিংয়ের এই দুর্ভিক্ষের যুগেও ইংল্যান্ডে রয়েছে অন্তত চারজন ভাল অফ স্পিনার— ভিক মার্কস, এডি হেমিংস, জিওফ মিলার এবং জন এমবুরি। আমি খুবই অনুতপ্ত যে কীর্তি আজাদের নাম তখন করা হয়নি। স্বীকার করছি, আমার জানা ছিল না। ভাবছি, এত বিপর্যয়ের পর ক্রিকেট জার্নালিজম আর করব কিনা।'

রেগ হেটারের মধ্যে অবশ্য বিশেষ অনুতাপ দেখলাম না। বললেন, 'যখন যেমন,

তখন তেমন। এখন ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ব্যাটসম্যান মহিন্দার অমরনাথ, বেস্ট বোলার রজার বিনি, বেস্ট উইকেটকিপার সৈয়দ কিরমানি, বেস্ট ফিল্ডসম্যান যশপাল শর্মা, বেস্ট ওপেনার শ্রীকান্ত, বেস্ট ক্যাপ্টেন কপিলদেব, বেস্ট ম্যানেজার মান সিং, বেস্ট অফ স্পিনার কীর্তি আজাদ, বেস্ট স্লিপ ক্যাচার সানি গাভাসকার, বেস্ট টুয়েলফথ ম্যান সুনীল ভালসন— এসব স্বীকার করতে কোনও কুণ্ঠা নেই। বছর দেড়েক আগে লিখেছি, বথাম, কপিল, ইমরান আর হেডলি ওয়ার্ল্ডের সেরা চারজন অলরাউন্ডার। নিজের নিজের দিনে এরা সকলেই অপ্রতিরোধ্য। এখন বথাম, হেডলি আর ইমরানের জায়গা মদনলাল, বিনি আর সাঁধুর নাম লিখব। যখন যেমন, তখন তেমন। কিছু লোক অবশ্য অন্যরকম বলবে, লিখবে। তাতে কান দিলে চলবে না। পরশু পড়ছিলাম, কে যেন লিখেছে, যশপালের চেয়ে জাহির ভাল ব্যাটসম্যান! কী বলবেন, বলুন?'

ব্রায়ান ব্রেনই সবচেয়ে বেশি অনুতপ্ত। বললেন, 'পরে বুঝেছি, ইন্ডিয়াকে আন্ডার এস্টিমেট করে কত বড় ভুল করেছি। যে ইন্ডিয়া টিম বহু সিরিজে বহু টেস্টে হেরেও সেভেন্টি ওয়ানে একবার আমাদের মাটিতে আমাদেরও হারিয়েছে, যে ইন্ডিয়া আগের দুটো ওয়ার্ল্ড কাপে ইস্ট আফ্রিকার বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ ছাড়া আর সব ম্যাচেই (এমনকি শ্রীলঙ্কার কাছেও) হারলেও বারবিসে ওয়েস্ট ইন্ডিজে একটা একদিনের ম্যাচে গৌরবজনক জয় পেয়েছে, যে ইন্ডিয়া সব কটা প্র্যাকটিস ম্যাচে জঘন্য খেলেও ভাল খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছে, যে ইন্ডিয়া এবারের প্রুডেনশিয়াল কাপের আগে দুটো সিরিজে হারলেও এবং গত কুড়িটি টেস্টে জয়ের মুখ না দেখলেও দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে যাচ্ছে, তাদের 'আন্ডারডগ' বলে আমরা যে অন্যায় করেছি, জানি সেজন্য কোনও শাস্তিই যথেষ্ট নয়। এক কাজ করুন, আমরা অজ্ঞ ব্রিটিশ সাংবাদিকরা কান ধরে লাইন দিয়ে দাঁড়াই, ক্ষমা চাই, ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে আপনাদের খবরের কাগজে ছাপুন। পাবলিক দারুণ নেবে।'

৪৪

বিশ্ববিজয়ী ভারতীয় ক্রিকেটারদের অভূতপূর্ব অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা দেখার পরই খাস কলকাতায় এত বড় একটা সংবর্ধনা সভায় হাজির থাকার সৌভাগ্য হবে, কল্পনাও করিনি। মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী। ঊষা উত্থুপের উদ্বোধনী ভক্তিমূলক পপ সঙ্গীতের পর, সভাপতির ডাকে একে একে মঞ্চে উঠে আসেন সংবর্ধিত চারজন। আই বি এ সি, ইন্টারন্যাশনাল, যুগশান্তি এবং ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংয়ের প্রধান কর্মকর্তারা মঞ্চে আসন গ্রহণ করার পর অডিটোরিয়ামের প্রথম দুই সারিতে চার ক্লাবের অন্য সব কর্মকর্তা, চার টিমের চুয়াল্লিশ জন ফুটবলার, আই এফ এ সম্পাদক অশোক মিত্র, রাম গাঙ্গুলি, শরদিন্দু পাল, মন্টু ঘোষ, চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বাগত সম্ভাষণ জানান হয়। প্রধান অতিথি, ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তীর বিশেষ অনুরোধে অশোক মিত্রকেও শেষ পর্যন্ত মঞ্চে উঠতে হয়। তিনি রাম গাঙ্গুলিকেও সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রচারবিমুখ অনুচরশ্রেষ্ঠ সেই সম্মান প্রত্যাখ্যান করেন।

উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীযুক্ত এম দত্তরায় বলেন, 'আপনারা জানেন, আমি খুবই অসুস্থ, বলতে গেলে শয্যাশায়ী। আজ এই বয়সে পৌঁছে সক্রিয়ভাবে কিছু করা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু দেখে ভাল লাগছে, যে বীজ আমরা তিরিশ বত্রিশ বছর আগে পুঁতেছিলাম, তা আজ বিরাট গাছে— মহীরুহ না কী বলে যেন— পরিণত হয়েছে। আমার রাজত্বকালে প্রচুর গট-আপ হয়েছে, কিন্তু দুই ম্যাচে একশ চুরানব্বই গোলের কথা আমরা কল্পনাই করতে পারিনি। চেষ্টা করলে, নিষ্ঠা থাকলে, সাধনা থাকলে, কত উন্নতি করা যায়, এ হল তারই প্রমাণ। এবার শুনলাম, লিগের সব ডিভিশন মিলিয়ে সেভেন্টি এইট পার্সেন্টি ম্যাচ 'গট-আপ' হয়েছে। ব্যাপারটাকে সেন্ট পার্সেন্টে নিয়ে যেতে হয়ত এখনকার সেরা কর্মকর্তাদের পাঁচ বছরের বেশি লাগবে না। আমার আশীর্বাদ রইল।'

ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, 'কেন্দ্রের চক্রান্ত সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ বসে নেই। শিল্প, বিদ্যুৎ, খাদ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও অন্তত খেলাধুলোর ক্ষেত্রে যে অন্য রাজ্যের তুলনায় আমরা পিছিয়ে নেই, তা আর একবার প্রমাণিত হল। রাজ্য

সরকারের ক্রীড়া দপ্তর খেলার মাঠের ব্যাপারে আরও বেশি করে নাক গলানোয় অনেকেই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু, আজ একথা কে অস্বীকার করবেন যে, প্রগতিশীল বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই দুই ম্যাচে একশ চুরানব্বই গোল সম্ভব হয়েছে। খেলার মাঠে ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের যে দৃষ্টান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলি স্থাপন করল, সেজন্যও চার ক্লাবের কর্মকর্তা এবং ফুটবলারদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

বিশেষ অতিথি, কংগ্রেস নেতা আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বামফ্রন্ট সরকার অন্যায়ভাবে কৃতিত্বের ভাগ নিতে চাইছে। ক্রীড়ামন্ত্রী প্রমাণ করতে পারবেন যে এই দুটি অবিস্মরণীয় ম্যাচের ফলাফলে তাঁদের কোন অবদান আছে? চার ক্লাবের অসাধারণ কিছু কর্মকর্তা এবং চুয়াল্লিশ জন দুর্ধর্ষ ফুটবলার ছাড়া আর কেউই এর জন্য কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। তবে, আমার বিশ্বাস, আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মহান ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত না হলে কর্মকর্তা বা ফুটবলাররা এত সাহস পেত না, এমন সাফল্যও পেত না।'

পরবর্তী বক্তা অশোক মিত্র : 'যদিও মন্ত্রী বা পলিটিক্যাল লিডার বা আমলাদের কথা অমান্যি করার বদভ্যেস আমার কখনই ছিল না, আজ শ্রদ্ধেয় আনন্দগোপালবাবুর একটি উক্তির বিরোধিতা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। তিনি বলেছেন চার ক্লাবের কর্মকর্তা এবং চুয়াল্লিশ জন ফুটবলার ছাড়া আর কেউই কৃতিত্ব দাবি করতে পারে না। আমি কৃতিত্ব দাবি করছি না, আড়ালে থাকতেই ভালবাসি। তবু, এত লোকের সামনে সত্য ঘটনা গোপন করতে পারব না। চারাটি ক্লাবের কর্মকর্তারা এত বড় এবং এত ভাল কাণ্ড ঘটাতেই পারতেন না, যদি আমরা, মানে আই এফ এ-র মাতব্বররা পরিবেশ তৈরি করে না রাখতাম। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবকে আমি সাপোর্ট করি, কিন্তু বিশ্বাস করুন, আই বি এ সি-র ওপর এখন আর আমার রাগ নেই। যোগ্য দলই বেশি গোল করেছে, যোগ্য দলই বেশি ভাল গড়াপেটা ম্যাচ খেলেছে। এই দুটি ম্যাচ তরুণ ফুটবলারদের আরও বেশি গোল করতে এবং খেতে অনুপ্রাণিত করবে। আমি এই সভায় একটা প্রস্তাব করছি। ম্যাচ গট-আপ করে জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় যাঁরা কাটিয়ে দিচ্ছেন, সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে কলকাতাকে গড়াপেটার স্বর্গে পরিণত করছেন, শেষ বয়সে তাঁদের যাতে কষ্টে পড়তে না হয়, একটা ফান্ড তৈরি করা হোক। সামনের বছর সিজনের শুরুতে একটা প্রদর্শনী ম্যাচে ইন্টারন্যাশনাল আর আই বি এ সি-র কম্বাইন্ড টিম এবং ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং আর যুগশান্তির কম্বাইন্ড টিম খেলুক। আমরা আগে থেকেই অ্যানাউন্স করে দেব, সত্তর মিনিটে দুশো বাহাত্তরটা গোল হবে। টিকিটের দাম অন্তত একশ টাকা করব। দেখবেন, বিদেশ থেকে বহু জার্নালিস্ট আর ট্যুরিস্টও আসবে, পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখতে যেমন কোনারকের সূর্যমন্দিরে এসেছিল। ওই একটা ম্যাচ থেকে অন্তত এক লক্ষ টাকার ফান্ড হয়ে যাবে। অবশ্য, সবার আগে গভর্নমেন্টের পারমিশন দরকার। গভর্নমেন্টের পারমিশন না নিয়ে আমি আই এফ এ অফিসের দেওয়ালে চুনকাম পর্যন্ত করাই না।'

সভাপতির অনুরোধে বক্তব্য রাখলেন এক বিশিষ্ট সাংবাদিক : 'এই ধরনের সংবর্ধনা

অনুষ্ঠানে যা হয়, তাই হল। যে যার কোলে ঝোল টানলেন। কলকাতা ময়দানে গড়াপেটা ম্যাচ বেড়ে যাওয়ার জন্য সাংবাদিকদের পরোক্ষ হলেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা কেউই উল্লেখ করলেন না। বছরের পর বছর অবিরাম গড়াপেটা হয়েছে, আমরা হয় চুপ করে থেকেছি, না হয় তিন লাইনে চিমটি কেটে কাজ সেরেছি। এমন কি, লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, এই দুই ম্যাচে একশ চুরানব্বই গোলের পর কিছু উটকো সাংবাদিক যখন আই এফ এ-র সেক্রেটারির রেজিগনেশন দাবি করেছে, আমরা তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছি। আমরা আই এফ এ-র কর্মকর্তাদের যাবতীয় নোংরামিকে প্রশ্রয় না দিয়ে গেলে পয়লা আগস্ট এমন ঐতিহাসিক ঘটনা কিছুতেই ঘটত না। অবশ্য আই এফ এ সম্পাদকও অকৃতজ্ঞ নন, তিনি আমাদের বেছে বেছে কার্ড পাঠান, তিনি আমাদের জার্নালিস্ট ক্লাবের ইনভিটেশন টুর্নামেন্টে নানাভাবে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। কিছু ফালতু লোকের কথায় তিনি রিজাইন করলে আমাদের খুব অসুবিধে হত।'

সংবর্ধিতদের পক্ষ থেকে ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের এক কর্মকর্তা বললেন, 'আমি একটা মাঝারি ক্লাবেরও কর্মকর্তা। কিন্তু ছোট ক্লাবের কর্মকর্তা হিসাবে যে সম্মান আজ পেলাম, তা জীবনে কখনও পাইনি। পড়াশুনো বেশিদূর করিনি, গুন্ডা-বদমাশদের সঙ্গে বেশি সময় কাটিয়েছি, মন্ত্রীদের সঙ্গে এক স্টেজে বসার সৌভাগ্য হবে কখনও কল্পনা করিনি। আজকের এই স্মরণীয় অনুষ্ঠান আমাকে... আমাদের ভবিষ্যতে আরও বড় গট-আপ ম্যাচ খেলতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমাদের প্রিয় নেতা অশোক মিত্র যাবজ্জীবন আই এফ এ-র সম্পাদক থাকুন। আমরা বিশ্বাস করি, এক ম্যাচে পাঁচশ গোলের ব্যবস্থা করাও একদিন সম্ভব হবে।'

সভাপতির ভাষণে মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী বলেন, 'গট-আপ স্পেশালিস্টরা যদি আলাদা অ্যাসোসিয়েশন করেন, ময়দানে টেন্টের জন্য জায়গা দেব। গট-আপ মাস্টাররা যদি পাড়ার বখাটে ছেলেদের হাতে লাঞ্ছিত হন, চিফ মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলে পুলিস ফোর্সের ব্যবস্থা করব। আই এফ এ সেক্রেটারির রেকমেন্ডেশন থাকলে, গট-আপ স্পেশালিস্টদের গলফ গ্রিনে ফ্ল্যাট দেব। মাঝে মাঝে গট-আপ-এর বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী বক্তৃতাও দেব।'

সবশেষে মোট চারজন কর্মকর্তা ও চুয়াল্লিশ জন ফুটবলারকে একটি করে সুদৃশ্য ট্রফি এবং একুশজন কর্মকর্তা, দুজন মন্ত্রী, একজন বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা এবং চুয়াল্লিশ জন ফুটবলারকে জায়েন্ট সাইজের এক প্যাকেট করে তুলো উপহার দেওয়া হল। সকলে যখন মহাজাতি সদন থেকে বেরচ্ছেন, সমবেত বেরসিক ও অকৃতজ্ঞ ক্রীড়ামোদীরা উচ্চকণ্ঠে ধিক্কার ও গালিগালাজ দিতে থাকেন। তুলোর প্যাকেট কেন দেওয়া হয়েছিল, তখন বোঝা গেল। সকলেই কানে তুলো গুঁজে বেরিয়ে গেলেন।

৪৫

গত পরশু সাতসকালে নামকরা খবরের কাগজের নামকরা রিপোর্টারের টেলিফোন পেয়ে চমকে উঠলাম। তিনি খুব ব্যস্ত লোক। মাস ছয়েক আগে দুর্গাপুরে বসে একদিন আমাকে বলেছিল, 'তুমি যে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে লেখার চান্স পাও, সে কাগজ রোজ পাঁচশর বেশি বিক্রি হয় না। কিন্তু আমাদের কাগজ সুপার হটকেক, রোজ অ্যাট লিস্ট সাতাশ লাখ কপি বিক্রি হয়। তোমাদের আর কী, লিখে দিলেই হল। আমাদের রেসপনসিবিলিটি কত বেশি ভেবে দ্যাখ, যা লিখব কমসে কম সাতাশ লাখ ইন্টু ফাইভ, এক কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ লোক পড়বে। তাই প্রতিটি শব্দ লিখতে হয় ভেবেচিন্তে। ভাবতে পার, একঘণ্টায় আমি লিখি বড় জোর সাড়ে দশটি শব্দ। হুঁ হুঁ, রেসপনসিবিলিটি ব্যাপারটা তো কখনও বুঝলে না।'

না বুঝলেও বড় রিপোর্টারের প্রতি শ্রদ্ধায় মন ভরে গিয়েছিল। টেলিফোনে সে-ই যখন বলল— 'তোমাকে আমার খুব দরকার', চমকে উঠলাম। দায়িত্বের চর্বিতে মোটা হয়ে যাওয়া ভয়ঙ্কর রিপোর্টার বলছে, আমাকে দরকার, আমার কি আনন্দে কিছুটা নেচে নিয়ে তারপর ফের টেলিফোন ধরা উচিত?

বাঘা রিপোর্টার বলল, 'আমি তো কখনও থার্ড ডিভিশনের খেলা দেখি না, আমাকে হেল্প কর ভাই। আই বি এ সি-র দুজন স্ট্রাইকারের নাম আর ঠিকানা দিতে পার?'

আমাকে খবরটা নিয়ে গ্র্যান্ড হোটেলে যেতে বলা হল। অল্প সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব সেজেগুজে গ্র্যান্ডের চারশো সতের নম্বর ঘরে পৌঁছে দেখি দুর্ধর্ষ রিপোর্টার বন্ধু এক সাহেবের সঙ্গে বসে বিয়ার খাচ্ছেন। ঘরে ঢুকতেই আলাপ করিয়ে দিল : 'মিট মি জুনো মেন্নি অফ জুভেন্টাস টুরিন।'

গত কয়েক বছরে হাজার চেষ্টা করেও কলকাতায় সেকেন্ড ডিভিশনের কোনও ক্লাবের কর্মকর্তার সঙ্গে, আলাপ করতে পারিনি। আর ইতালির এক নম্বর টিমের একজন কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল! বাবুরাম সাপুড়ে, তুমি আর কত ওপরে উঠবে?

মেন্নি সাহেব বললেন, 'আপনারা নিশ্চয় জানেন যে, ওয়ার্ল্ড কাপের পর থেকেই পাওলো রোসি আর তেমন ভাল ফর্মে নেই। এই সিজনে এ পর্যন্ত সাতাশটা ম্যাচে মাত্র

এগারটা গোল করেছে। রবার্টো বেত্তেগার আবার পুরনো চোটটা চাগিয়ে উঠছে। তাই ইমিডিয়েটলি আমাদের দুজন ভাল স্ট্রাইকার দরকার । ইন ফ্যাক্ট তিনজন। একজন চোট পেলে বা ফর্ম হারালেও যাতে অসুবিধা না হয়। কেভিন কীগানকে আমরা পাচ্ছি। বুড়ো হাতি লাখ টাকা। বাকি দুজন, খবর পেয়েই ছুটে এসেছি— নিরাশ করবেন না, ক্যালকাটার এই ক্লাব থেকে নিতে চাই। এক ম্যাচে একশ চোদ্দ গোল, সেকেন্ড হাফে পঁয়ত্রিশ মিনিটে ছিয়াশি গোল! ইনক্রেডিবল! স্টকহোমের একটা স্কুল টিমের বিরুদ্ধে জুভেন্টাস পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একবার সতের গোল করেছিল। ওই ম্যাচে একাই এগার গোল করে রোসি একটা ডায়মন্ড রিং পেয়েছিল। আর এখানে তো কী যেন নাম.... ভট্‌চায্ না কী যেন, একাই তিরিশ গোল করেছে। ওকে না নিয়ে আমি দেশে ফিরব না। পাশের স্ট্রাইকারও নিশ্চয় ভাল, না হলে এত গোল হবে কী করে? তাকেও চাই। তবে তাকে না পেলে, খুব অসুবিধায় নাও পড়তে পারি। আলজিরিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ স্টার লাখদর বেলৌমি জুভেন্টাসে খেলতে রাজি আছে। তবে ক্যালকাটার এই ভট্‌চায্‌কে না নিয়ে আমি দেশে ফিরছি না। আমি শুনলাম, আপনি সব খবর রাখেন। একবার এই ভট্‌চাযের বাড়িতে আমাকে নিয়ে চলুন। টাকাপয়সা কোনও প্রবলেম নয়, ইন্ডিয়ান মানিতে দশ লাখের মতো দেব, প্লাস পার্কস।

বিশাল গাড়ি চড়ে আই বি এ সি-র স্ট্রাইকারের বাড়িতে গেলাম। গৌতম ভট্‌চাযের ডিম্যান্ড ছিল সাড়ে বার লাখ, মেন্নি সাহেব মেনে নিলেন। ফেরার সময় বললেন, 'বেশ সস্তায় হয়ে গেল, রোসির মতো ফালতু স্ট্রাইকারও এর চেয়ে বেশি নেয়।'

রিপোর্টার বন্ধুকে ফিসফিস করে বললাম, 'এই গাড়িতে আমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিলে পাড়ায় প্রেস্টিজ বেড়ে যেত, নির্ঘাৎ পুজো কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট হয়ে যেতাম।'

বাঘা রিপোর্টার পিঠ চাপড়ে বলল, 'এখনই বাড়ি যাবে কী হে, তোমাকে আমার আরও দরকার। রাত পর্যন্ত।

অ্যাসাইনমেন্ট নাম্বার টু : ইতালিরই সাম্পদোরিয়া ক্লাব, একজন গোলকিপার চাইছে, যার হজম শক্তি খুব ভাল। মিঃ হেনরি জিওরদানো এসেছেন। এমন গোলকিপার চাই, যে মিনিটে অন্তত একটা গোল খেতে পারে। মিঃ জিওরদানো বললেন, 'একশ চোদ্দর দরকার নেই, আমার টিমের হয়ে দরকার হলে নব্বই মিনিটে পঁচাত্তরটা গোল খেলেই চলবে। আমরা সিজনে গড়ে দেড়খানা গট-আপ ম্যাচ খেলি। সে সব ম্যাচে গোল খাবার জন্য স্পেশাল গোলকিপার পোষা হয়।

গতবার আমাদের একটা ম্যাচে হিসেবমত সাতান্নটা গোল খাওয়া দরকার ছিল, কিন্তু স্পেশালিস্ট গোলকিপার ছেচল্লিশটার বেশি গোল খেতে পারেনি। ক্লাবের ডিসিপ্লিনারি কমিটির সামনে হাজির হয়ে সে বলে, 'গোলে মাত্র ছেচল্লিশবারই বল আসায় সাতান্নটা গোল খাওয়া সম্ভব হয়নি। কমিটি অবশ্যই ওর এক্সপ্ল্যানেশন অ্যাকসেপ্ট করেনি। দরকার হলে পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে বল টেনে এনে গোলে ঢোকাতে হবে। ক্যালকাটার ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং বা যুগশান্তির গোলকিপারকে পেলে, আমরা নিশ্চয়ই আর বিপদে

পড়ব না।'

ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিংয়ের গোলকিপারকে পাওয়া গেল না, তাকে আগেই সই করিয়ে নিয়েছে এক বিখ্যাত সার্কাস কোম্পানি। যুগশান্তির গোলকিপারকে অবশ্য পাওয়া গেল। তার একটা এক্সট্রা কন্ডিশন ছিল : সঙ্গে যুগশান্তির একজন অফিসিয়ালকে নিতে হবে। উপযুক্ত কর্মকর্তা গোলের পিছনে দাঁড়িয়ে ইনস্পায়ার না করলে বেশি গোল খাওয়া যায় না। সাম্পদোরিয়ার মিঃ জিয়ারদানো রাজি হয়ে গেলেন।

কিন্তু সেই কর্মকর্তা ঝামেলা বাড়ালেন। সাহেবের মুখের ওপর বলে দিলেন, 'ইতালি ওয়ার্ল্ড কাপ জেতায় আপনারা সাপের সাত পা দেখেছেন বুঝি? শুধু ভাল গোলকিপার আর অফিসিয়াল নিলেই আশি-নব্বই গোল খাওয়া যায় ভেবেছেন! না, আমি এত রিস্ক নিয়ে আপনাদের কনট্রাক্টে সই করতে পারব না। অন্তত আরও দুজনকে নিতে হবে।'

— 'বলুন।'

— 'নাম্বার ওয়ান, আমার টিমের এক নম্বর স্টপারকে নিতে হবে। জেন্টিলি জীবনে কটা গোল করেছে? বেশি গোল পেতে গেলে, একজন দুর্দান্ত সেমসাইড গোলগেটার দরকার যে নিজের গোল ভাল চেনে। আমার টিমের একজন স্টপারকে দিতে পারি যে মিনিটে দু-গোল করতে পারে।'

— 'আর একজন কার কথা বলছিলেন?'

— 'রেফারি। উপযুক্ত রেফারি ছাড়া খুব বেশি গোল খাওয়া যায় না। আমরা যে ম্যাচটায় আশি গোল খেলাম, তার রেজাল্ট শিটের কপি একটা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে, দেখেছেন নিশ্চয়। এমনিতে গোল হলে তা লিখে, পাশে সময়টা লিখে নেন রেফারিরা। কিন্তু আমাদের ম্যাচের রেফারি প্রথম থেকেই দাগ কেটে, ক্রিকেটের স্কোর লেখার মতো হিসেব রেখেছেন। ভাবতে পারেন, খেলা শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অজস্র গোল হবে। অজস্র গোল খাওয়া বা দেওয়ার সমঝদার রেফারিও দরকার, বুঝলেন।'

মিঃ জিয়ারদানো এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। সাম্পদোরিয়া ক্লাবের চেয়ারম্যানের কাছে টেলেক্স পাঠিয়ে নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।

৪৬

গত সংখ্যায় বাবুরাম সাপুড়েকে গরহাজির দেখে আপনারা কি ভেবেছিলেন যে আমি অসুস্থ? না না, দুশ্চিন্তার কিছু নেই। গত সপ্তাহে রোজ আধ ঘণ্টা করে— মোট সাড়ে তিন ঘণ্টা সর্দিতে ভুগেছি। অ্যাবসেন্ট সেজন্য হইনি।

শনিবারই এডিটর সাহেব ডেকে বললেন, 'আপনাকে খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে, কয়েকদিন রেস্ট নিন, অন্তত সামনের সপ্তাহটা।' রিচার্ড অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' দেখেই কিনা কে জানে, সম্প্রতি যেন এডিটরের কিঞ্চিৎ হৃদয় পরিবর্তন হয়েছে। মাঝে মাঝে বেশ মহৎ-মহৎ কথাবার্তা বলেন।

সত্যি কথা বলতে কি, বরাদ্দ যদিও সপ্তাহে এক পৃষ্ঠা, আমার মতো দৌড়ঝাঁপ আর কোন জার্নালিস্ট করে? হিল্লি-দিল্লি-বম্বে-বনগাঁ ঘুরে এত ইন্টারভিউ আর কে করে? আমার বিশ্রাম অবশ্যই দরকার।

এক সপ্তাহ বিশুদ্ধ বিশ্রাম যে এত কঠিন ব্যাপার, আগে জানা ছিল না। মঙ্গলবার থেকেই ছটফটানি শুরু, বুধবার সোজা অফিস। এডিটর সাহেব দেখলেন, কিন্তু ঠিক দেখলেন না! নিজের চেয়ারে বসে পঁয়তাল্লিশ মিনিট ধরে সাহস সঞ্চয় করে এডিটরের ঘরে ঢুকে বললাম : 'আমি এক সপ্তাহ ছুটি নিতে পারব না, আজ থেকে কাজ করব, এই সপ্তাহেও লিখব।'

অভাবনীয় সৌজন্য দেখিয়ে এডিটর সাহেব পাইপ নামালেন, কলম থামালেন এবং তারপর মৃদু হেসে বললেন, 'না, লিখবেন না।'

স্তম্ভিত হয়ে অনেকক্ষণ তাঁর সামনে বসে থাকি, তিনি অবশ্যই তা চাইলেন না : 'আপনার লেখার বিরুদ্ধে গত এক মাসে একশ তেরজন ইম্পর্ট্যান্ট লোক কমপ্লেইন করেছেন। এই একশ তেরজনের মধ্যে এগারজন ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট— দুজন মিনিস্টার, পাঁচজন স্পোর্টস অফিসিয়াল, তিনজন জার্নালিস্ট আর একজন ব্যুরোক্র্যাট। আমরা টপ লেভেল থেকে ডিসিশন নিয়েছি, আপাতত কিছুদিন আপনাকে বিশ্রামে রাখা হবে। এই সময়টা, আশাকরি, আপনি নষ্ট করবেন না। চাকরি বাঁচাতে হলে নিজেকে শুধরে নিন, এমন লেখার জন্য নিজেকে তৈরি করুন, যাতে কোনও ইম্পর্ট্যান্ট লোকই কমপ্লেইন না

করেন। প্রথমে আধ পৃষ্ঠা, তারপর এক পৃষ্ঠা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম কিছুটা ঠাট্টা ইয়ার্কি করার জন্য। ওই, যাকে বলে কমিক রিলিফ আর কি। আমরা যে সব ভারি ভারি দারুণ দারুণ লেখা লিখি, তাতে যাতে পাঠক-পাঠিকাদের মাথা না ধরে, সেজন্যই একটু হাস্যকৌতুকের ব্যবস্থা। বাট ইউ হ্যাভ ক্রসড ইয়োর লিমিট। আপনি মশাই ডেঞ্জারাস লোক। নিজের ছাড়া অন্য কারও লেখা পড়ার বদভ্যেস নেই বলে আগে জানতাম না, আপনি আমাকেও, কী যেন মাঠের ল্যাঙ্গোয়েজটা, 'খাস্তা' করেন। দুজন মিনিস্টারকে এত চটিয়ে দিয়েছেন যে দরকার হলেও রাইটার্সে যাওয়া বন্ধ। পাঁচজন অফিসিয়ালকে এমন চটিয়ে দিয়েছেন যে তাঁরা সকলে মিলে একশ বারজনকে ঢিল ছোঁড়া এবং দুশ তিরানব্বইজনকে গালাগালি দেওয়ার জন্য আমার পিছনে লাগিয়ে দিয়েছেন। এসব তা-ও অনেকটা প্র্যাকটিস হয়ে গেছে, তিনজন জার্নালিস্ট একদম লাইফ হেল করে দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কেউই আপনার মতো ফালতু জার্নালিস্ট নয়। স্পোর্টস জার্নালিজমে একজনের অ্যালুমিনিয়াম জুবিলি সামনের বছরেই, আর-একজনের তার পরের বছর।

অ্যান্ড লাস্ট বাট নট লিস্ট, তৃতীয়জন এখন ইন্ডিয়ার সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট জার্নালিস্ট বম্বে-দিল্লি-সাউথ ইন্ডিয়ার বহুলোক প্রচণ্ড খেটে বাংলা শিখে নিচ্ছেন, শুধু এই জার্নালিস্টের লেখা পড়ে বোঝার জন্য। আপনার লেখার বিরুদ্ধে তাঁরও অনেক অভিযোগ। হুমকি দিয়েছেন, আপনার লেখা বন্ধ না করলে তিনি ময়দানে আমাদের একঘরে করে দেবেন, কোনও প্লেয়ার আর আমাদের সঙ্গে কথা বলবে না, কোনও বড় ক্লাবের মস্তানেরা আর আমাদের গালাগালি দেবে না, কোনও অফিসিয়াল আমাদের পাত্তা দেবেন না, এমনকি তাঁর ফতোয়া পেয়ে কোনও পাঠক-পাঠিকাও নাকি আর আমাদের কাগজ কিনবেন না। দয়া করে আপনাকে চাকরি দিয়েছিলাম, এখন অনুশোচনায় একই সঙ্গে সেদ্ধ ও দগ্ধ হচ্ছি।'

বড় কষ্ট পেলাম। এডিটর সাহেবের কথায় নয়, এই কথা শুনে যে সুবিখ্যাত জার্নালিস্ট আমার বিরুদ্ধে বলেছে, যাকে কিনা আমার সামান্য আয় থেকে বিয়ার পর্যন্ত খাইয়েছি।

বৃহস্পতিবার সকালে জার্নালিস্ট বন্ধুর বাড়িতে গেলাম। গোঁফ আর চোখ একই সঙ্গে পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন : 'কী চাই?' ছি ছি, এই কি বন্ধুর ব্যবহার? এতদিন আমার একমাত্র গর্ব ছিল, এই বড় জার্নালিস্ট আমার বন্ধু।

— 'কী ব্যাপার, এত খারাপ ব্যবহার করছ কেন? আমি কী অপরাধ করেছি?'

— 'লিস্ট পড়তে সোয়া তিন ঘণ্টা সময় লাগবে। এখন হাতে সময় নেই, আধ ঘণ্টা পরেই বেরোতে হবে অন্য কাগজের বাচ্চা জার্নালিস্টদের লেখায় ভুল-ধরা কমিটির মিটিং আছে। তুমি অপেক্ষা করলেও কোনও লাভ নেই, কারণ তারপর ময়দানের অসৎ কর্মকর্তা-বাঁচাও কমিটির জরুরি মিটিং। আর সাড়ে ঊনত্রিশ মিনিট সময় দিতে পারি।'

— 'আমার বিরুদ্ধে তুমি কমপ্লেইন করেছ কেন ভাই? আমি তো তোমার পথ ধরেই চলার চেষ্টা করি।'

— 'ন্যাকামি কোরোনা। সুব্রত ভট্টাচার্যকে 'খাস্তা' করে ম্যাচ রিপোর্ট আগে থেকেই

তৈরি করে রাখছ, আমার মতো?'

— 'কী মুশকিল, আমাকে তো ম্যাচ রিপোর্ট করতেই দেয় না কখনও, সেজন্য সব ওস্তাদ রিপোর্টাররা আছে না।

— 'নিশীথ ঘোষ যে ময়দানের আদর্শ কর্মকর্তা, একথা লিখছ না কেন?'

— 'ইয়ে মানে, এত মিথ্যা কথা লিখতে গেলে মনের জোর দরকার। তোমার পক্ষে যা সম্ভব, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।'

— 'গট-আপ ম্যাচ নিয়ে এত হই চই করছ কেন? লোক-দেখানর জন্য যেটুকু লেখার সে তো আমরাও লিখছি, মাতব্বরদের নিয়ে টানাটানি করছ কেন? অশোক মিত্রর মতো নির্লোভ এবং যোগ্য লোকের পিছনে লেগেছ কেন? রাম গাঙ্গুলির মতো সংযমী ভদ্রলোকের নামে মিথ্যা কথা রটাচ্ছ কেন?'

— 'এসব তো আমাদের সবজান্তা এডিটর করছে।'

— 'আবার ন্যাকামি! তুমি উল্টোপাল্টা লেখনি ১২ আগস্ট সংখ্যায়? সল্টলেকে জমি বা অন্য কোথাও ফ্ল্যাট চাও না বলে স্পোর্টস মিনিস্টার আর পি ডব্লু ডি মিনিস্টারকে এভাবে ছোট করতে হবে?'

— 'আমার লেখাটা তো ইয়ার্কি ঠাট্টার ডিপার্টমেন্ট। এত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন?

— 'দেখ, তোমাদের ফালতু এডিটরের মতো সপ্তাহে একুশটা সিরিয়াস লেখা লিখে যাও, কিছু বলার নেই। কিন্তু তোমার এই সপ্তাহে একবার ইয়ার্কিও আর আমাদের সহ্য হচ্ছে না। তুমি তো জার্নালিস্টদের ধরেও টান মেরেছ।'

— 'সে তো ইয়ার্কি....'।

— 'ফের ন্যাকামি? সত্যি কথা বলে ইয়ার্কি মারতে হয়।'

— 'যাক, এখন কী করতে হবে, বল।'

— 'আমরা সবাই মিলে প্রেসার দিলে তোমার লেখা বন্ধ হয়ে যাবে, তোমাদের মাঠে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে, তোমাদের কাগজও উঠে যাবে। যদি কাগজ এবং নিজেকে বাঁচাতে চাও, বিশুদ্ধ ঠাট্টাইয়ার্কি কর, ময়দানের কোনও বাস্তুঘুঘুরও যেন তা পড়ে কষ্ট না হয়।'

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, এডিটর সাহেবের নজর এড়িয়ে আমার বক্তব্য নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হচ্ছি। গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবার সারারাত চিন্তা করে দেখলাম, বিখ্যাত জার্নালিস্ট বন্ধুর পরামর্শমত বিশুদ্ধ ইয়ার্কিঠাট্টামূলক লেখা তৈরি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাহলে কি লেখা ছেড়ে দেব? এবং সাধের চাকরি?

পুনশ্চ: আমার হঠকারিতার জন্য আমাদের পত্রিকা উঠে যাচ্ছে, এই খুশির খবরটাকে সেলিব্রেট করার জন্য গত সপ্তাহেই আমার বিখ্যাত জার্নালিস্ট বন্ধু নাকি সাতজনকে নিজের পয়সায় চা খাইয়েছেন।

৪৭

প্রখ্যাত যাত্রাভিনেতা শান্তিগোপাল আমাকে খুব ভালবাসেন, মানে পাত্তাটাত্তা দেন। গত সোমবার তাঁর কাছে ধর্না দিয়ে বললাম, 'শান্তিদা, আমাকে নতু কোলে সাজিয়ে দিন।'

শান্তিগোপাল, আমার প্রিয় শান্তিদা কার্ল মার্কসের মতো চিন্তিত মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে?'

— 'শান্তিদা, দাদা আপনার মতো মেক-আপ দুনিয়ার আর কেউ নিতে পারে না। আমাকে শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য নতু কোলে বানিয়ে দিন।'

লেনিনের মতো বুদ্ধিদীপ্ত মুখ করে শান্তিদা জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কী। কে নতু কোলে?'

— 'যাত্রা করে জীবনটা মাটি করলেন, নতু কোলেকে চিনবেন কী করে? নতু কোলে হলেন জগন্নাথ কোলের ভাই, কালীঘাট ক্লাবের কর্তা, গট-আপ অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট। লাইফ-প্রেসিডেন্ট এম দত্তরায় অসুস্থ, বলতে গেলে নতু কোলেই প্রেসিডেন্ট। ৩১ আগস্ট লিগের খেলা শেষ হচ্ছে। পয়লা সেপ্টেম্বর গট-আপ অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং কমিটির বিশেষ সভা, আমি ওই মিটিংয়ে হাজির থাকতে চাই। এমনিতে প্রেস কেন, বিড়াল বা ইঁদুরেরও 'নো অ্যাডমিশন।' আমার প্ল্যানটা এইরকম: মিটিং শুরু হওয়ার চল্লিশ মিনিট আগে নতু কোলের বাড়িতে টেলিফোন করে বলব, 'আমাকে শরাদা, শরদিন্দু পাল ফোন করতে বলেছেন, উনি সি এ বি-তে একটা বিশেষ কাজে আটকে গেছেন। আজ মিটিংটা হচ্ছে না। রাত্রে শরাদা আপনার সঙ্গে দেখা করবেন।' ব্যস, নতু কোলে আসবেন না। কিন্তু নতু কোলে আসবেন! মানে, আপনি আমাকে নতু কোলে বানিয়ে দেবেন।'

শান্তিগোপাল, আমার শান্তিদা হিটলারের মতো মুখ করে জিজ্ঞেস করলেন, 'শুধু সাজিয়ে দিলেই হবে?'

— 'হ্যাঁ, শান্তিদা। অভিনয় শেখাতে হবে না। শুধু সাজিয়ে দিন। আমি তো প্রিসাইড করব, কথাই বলব না। দাদা, আমাকে সাহায্য করুন। এই মিটিংটার রিপোর্ট প্রকাশিত

হলে দেশবাসীর প্রভূত উপকার হবে। আপনি অবশ্য অস্বীকার করেন, কিন্তু লোকে এখনও বলাবলি করে, উনিশ শ সাতাত্তরের চব্বিশে সেপ্টেম্বর ইডেনে পেলের ভূমিকায় আপনিই অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন। প্রায় পেলের মতো একটা ফ্রি কিকও নিয়ে ফেলেছিলেন। আমাকে অত কিছু করতে হবে না, শুধু নতু কোলে সাজিয়ে দিন। সভাপতি হয়ে মৃদু হাসব, মাথা নাড়ব আর সব কথা শুনব।'

শান্তিদা, শান্তিগোপাল আমাকে সত্যিই নতু কোলে বানিয়ে দিলেন। আমি শরাদার চামচে হিসাবে ফোন করলাম। নতু কোলে সেজে গট-আপ অ্যাসোসিয়েশনের ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে প্রিসাইড করলাম। মৃদু হাসলাম। মাথা নাড়লাম। সব কথা শুনলাম।

শুরু করলেন ক্যালকাটা জিমখানার দিলীপ ঘোষ : 'আপনারা সকলেই জানেন, কী সঙ্কটপূর্ণ মুহূর্তে আজ আমরা মিটিংয়ে বসেছি। অন্য কথা সকলে পরে বলবেন। আমি প্রথমেই অভিযোগ তুলছি : এই কমিটির একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি, যিনি আই এফ এ-রও জয়েন্ট সেক্রেটারি, এবার জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তাঁর কথাতেই আমরা সোনালি শিবিরকে দুটো পয়েন্ট আগে দিয়েছিলাম। কথা ছিল রিলে সিস্টেমে লাস্ট ম্যাচে তাঁর ক্লাব আমার ক্লাবকে ওই দুই পয়েন্ট দেবে।

কিন্তু শেষ ম্যাচে দুই পয়েন্ট তিনি দেননি। সেজন্য আমাদের এবার সেকেন্ড ডিভিশনে নেমে যেতে হল। জয়েন্ট সেক্রেটারি কারণ দেখান, ইয়েস, 'শো কজ', কেন তাকে এই অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে না।'

আমি (নতু কোলে) মৃদু হেসে গট-আপ অ্যাসোসিয়েশন তথা আই এফ এ-র জয়েন্ট সেক্রেটারির দিকে তাকালাম। নার্ভাস হাসি মুখে মেখে তিনি বক্তব্য রাখতে শুরু করলেন: 'প্রিয় গট-আপ বন্ধুরা, আমাকে ভুল বুঝবেন না। জানেনই তো, আমার পদের মোহ নেই, আমাকে সবাই জোর করে পোস্ট দেয়। আমাকে জয়েন্ট সেক্রেটারি রাখবেন না, ক্ষতি নেই, কিন্তু প্লিজ বিশ্বাসঘাতক বলবেন না। লাস্ট ম্যাচে জিমখানাকে দুই পয়েন্ট কেন, পারলে তিন পয়েন্ট দিতাম। কিন্তু একটা উটকো কাগজ সেদিনের কাগজে এমনভাবে সব কথা ফাঁস করে দিল, আমি ফেঁসে গেলাম। বিলিভ মি অর নট, আই এফ এ-র সেক্রেটারি না থাকলে আমি কিছুতেই কথার খেলাপ করতাম না। হল কি, গভর্নমেন্টের দিক থেকেও চাপ এল। এদিকে আমার ক্লাবেও নানারকম ঝুটঝামেলা চলছে। দু-তিন সপ্তাহ ধরে ক্লাবেই যাচ্ছি না। রাম গাঙ্গুলির মতো ভাল লোককেও মেম্বাররা গালাগালি দিচ্ছে। আর ওই ফালতু কাগজটা! সেদিন জিমখানাকে দু পয়েন্ট দিলে পরদিনের কাগজে আমাকে একেবারে ছিঁড়ে খেত। তবু, বিশ্বাস করুন, আমি খুব অনুতপ্ত। আর কখনও এরকম করব না। যদি আই এফ এ-র সেক্রেটারি থাকি, সামনের বার জিমখানাকে ফার্স্ট ডিভিশনে ফিরিয়ে আনার জন্য সবরকম সাহায্য করব। আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন। আমাকে আপনারা শাস্তি দিন। একশবার কান ধরে উঠ-বস করতে বলুন। কিন্তু প্লিজ, গট-আপ অ্যাসোসিয়েশন থেকে তাড়িয়ে দেবেন না। একটা ভুলের জন্য এতদিনের সার্ভিস বা সিনসিয়ারিটিকে ভুলে যাবেন না। ইয়ে, যদি বলেন, একটু কেঁদেও দিতে পারি। কিন্তু

প্লিজ....।'

রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন গড়াপেটার উদীয়মান নক্ষত্র রবীন লোধরায়: 'ওসব কান্নাকাটি আমরা শুনতে চাই না। এটা ঠিক যে জয়েন্ট সেক্রেটারি বিশ্বাসঘাতকতা করায় জিমখানা নেমেছে এবং আমরা বেঁচেছি। কিন্তু এসব হল তুচ্ছ ব্যাপার। বড় কথা হল, আদর্শ। গড়াপেটার মহান আদর্শ সামনে রেখে আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। বিশ্বাসঘাতকের এখানে কোনও জায়গা নেই। আজ ভয়ে একজন বিট্রে করলে, কাল আর-একজন করবে। এইভাবে অবিশ্বাস বাড়বে, চেইনটাই ভেঙে যাবে। আমি জয়েন্ট সেক্রেটারির অপসারণ চাই। সরি, আজ প্ল্যাকার্ড আর ফেস্টুন আনতে পারিনি। বানাতে দিয়েছি, পরের মিটিংয়ে আনব।'

অন্য জয়েন্ট সেক্রেটারি শরদিন্দু পাল বললেন, 'না রবীনবাবু প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন আনার আর দরকার নেই। আমার প্রপোজাল, বিশ্বাসঘাতক জয়েন্ট সেক্রেটারির বদলে সোনালি শিবিরের রবীন্দ্রনাথ লোধরায়কেই জয়েন্ট সেক্রেটারি করা হল। এ লাইনে এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি, আমার সঙ্গী হিসেবে ইনিই সবচেয়ে উপযুক্ত।

দেখুন, এই লাইনটা হল ফেইথ আর অনেস্টির লাইন। শুধু কথার ওপর পয়েন্টের লেনদেন। পয়েন্ট মানে টিকিট, পয়েন্ট মানে টাকা, মানে, শুধু কথার ওপর টিকিটের লেনদেন, টাকার লেনদেন। এখানে সত্যিই বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই।

নতুদাকে, মানে নতুদার লেফটেন্যান্ট মৃণাল চক্রবর্তীকে কথা দিয়েছিলাম, লাস্ট ম্যাচে এক পয়েন্ট দেব। ফালতু কাগজটায় ওইদিন বেরিয়েও গেল যে আমরা পয়েন্ট দিচ্ছি। কিন্তু, ওই যে রবীনবাবু বলেছেন, 'আদর্শ হচ্ছে আদর্শ। বলেছি যখন চুরি করব, করবই। সেভেন্টি নাইনে কালীঘাট আমাদের বাঁচিয়েছিল, এবার আমরা ওদের বাঁচালাম। এইট্টি থ্রি-তে আমরা বিপদে পড়লে কালীঘাট আবার বাঁচাবে। এভাবে এই অ্যাসোসিয়েশনের সবাই সবাইকে বাঁচাবে। কারও ঠাকুর্দার সাধ্যি নেই গট-আপের ব্যবসা বন্ধ করে। জয় হিন্দ।'

শরদিন্দু পালের প্রস্তাব সমর্থন করলেন অধ্যাপক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। নতুন জয়েন্ট সেক্রেটারি হলেন রবীন লোধরায়। আই এফ এ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি আর গট-আপ অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি থাকলেন না। তবে, পাস্ট রেকর্ড দেখে তাঁকে কমিটি থেকে তাড়ানো হল না।

অধ্যাপক চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'আমার আবার আজ একটা গড়াপেটা-বিরোধী সভায় লেকচার দিতে হবে। মিটিং আজকের মতো শেষ হলেই ভাল হয়। সবশেষে শ্রদ্ধেয় নতুদা কিছু বলুন।'

সবাই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, নতুদা কিছু বলুন!' আমি কায়দা করে ঠিক দরজার পাশেই বসেছিলাম। হঠাৎ উঠে দৌড় লাগালাম। ধুতি পরা সত্ত্বেও, শান্তিদার সাহায্য ছাড়াই, কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি কার্ল লিউইস হয়ে গেলাম!

৪৮

সোবিয়েত রাশিয়া সফর সেরে ভারতীয় ফুটবল দল পালাম এয়ারপোর্টে পা রাখতেই আমি ছুটে গেলাম। প্রশান্ত বলল, 'হ্যালো সাপুড়েদা, আপনি এত দূর চলে এসেছেন!' মনোরঞ্জনও কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'সাহেব কোথায়?' মনোরঞ্জন আর প্রশান্ত একসঙ্গে জিজ্ঞেস্ করল, 'কোন সাহেব?' আমি বললাম, 'গোয়ার সাহেব। ইংল্যান্ডের সাহেব। বুটল্যান্ড সাহেব।'

ওরা দুজন দেখিয়ে দিল। তাকিয়ে দেখি। বিশাল ঝোলাঝাপ্পা নিয়ে সাহেব খুবই হিমশিম খাচ্ছেন। একটা বড় লাগেজ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'চিনতে পারছেন?' সাহেব চোখ টিপলেন। আমি অপেক্ষা করলাম। শান্ত মিত্রর কাছে শুনেছিলাম, বুটল্যান্ড সাহেব একবার স্রেফ অভ্যেসে চোখ টেপেন। দ্বিতীয়বার চোখ টেপেন কাউকে চিনতে পারলে। এবং পরপর তিনবার চোখ টিপলে বুঝতে হবে যে... না, আমার তিনবারের দরকার ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয়টিও না হওয়ায় নার্ভাস হয়ে পড়ছিলাম। এমন সময়— তিনি টিপলেন— চোখ। এবং আমার পিঠে সাহেবি চাপড় মেরে জানতে চাইলেন, কীভাবে আমাকে সাহায্য করতে পারেন। সাহেবের লাগেজ ঘাড়ে রেখে একটু ঝুঁকে বললাম, ইন্টারভিউ চাই, এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ। সবার আগে চাই, এখনই।

আর-একটা বড় ব্যাগ আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সাহেব টানা তিনবার চোখ টিপে বললেন, 'ওক্খে, স্টার্ট!'

— 'এই ট্যুর কেমন হল?'

গাড়িতে উঠে, আর একবার চোখ টিপে বুটল্যান্ড সাহেব বললেন, 'ফাইন, আমরা দুটো ম্যাচেই হেরেছি।'

— 'হারার জন্য চিন্তা করবেন না। বহু বছর ধরে আমরা হারা প্র্যাকটিস করছি। তার ওপর রাশিয়ার মতো দেশে গিয়ে...। আচ্ছা মিঃ বুটল্যান্ড, আপনারা কি সোবিয়েত রাশিয়ার ন্যাশনাল টিমের সঙ্গে খেললেন?'

— 'প্রায় তা-ই। সেকেন্ড ডিভিশনের মোটামুটি ভাল টিম। টর্চ, টিমটার নাম টর্চ।

আপনি নাম শোনেননি?'

— 'না।'

— 'আমিও না! তবে খুব ভাল টিম। নাহলে আমার টিম হারল কেন?'

— 'রাইট। মিঃ বুটল্যান্ড, আপনার টিমের কে কে ভাল খেলল?'

— 'মনোরঞ্জন আর প্রশান্ত। আমার ট্যাকটিকসে দারুণ কাজ হল।'

— 'কীরকম?'

— 'ট্রেনিং দেখেই বুঝেছিলাম, এই দুজনেই টিমের বেস্ট প্লেয়ার। নিউক্যাসল ইউনাইটেডে খেলার সময় আমাদের টিমের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ বটলগ্রিনের কাছে একটা কায়দা শিখেছিলাম। তিনি বলতেন, বেস্ট প্লেয়ারদের চটিয়ে দিতে পারলে তারা আরও অনেক ভাল খেলে। আমি দিল্লি ক্যাম্প চলার সময় খবর পেলাম, ইন্ডিয়া টিমের ক্যাপ্টেন হওয়ার যোগ্যতা আছে তিনজনের— মনোরঞ্জন, প্রশান্ত আর পারমিন্দার। গত তিন-চার বছরে মনোরঞ্জন নাকি ভারতের হয়ে প্রতেকটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছে, প্রশান্ত মাত্র কয়েকটি ম্যাচে বাদ পড়েছে, পারমিন্দার বাদ পড়েছে এই চার বছরে অনেক ম্যাচেই। আমি ভাবছিলাম, এই অবস্থায় পারমিন্দারকে ক্যাপ্টেন করতে পারলে, আমার টিমের দুজন বেস্ট প্লেয়ার চটে যেতে বাধ্য।'

— 'ও, তাহলে এজন্যই পারমিন্দারকে ক্যাপ্টেন করা হয়েছে?'

— 'একজাক্টলি সো। তবে আরও দু-একটা ছোট কারণ ছিল। যেমন, গভর্নর সাহেব পারমিন্দারকে ক্যাপ্টেন করার অর্ডার দিয়েছিলেন। যেমন—'

— 'গভর্নর সাহেব?'

— 'হুঁ, গভর্নর। মিঃ জিয়াউদ্দিন। আর একটা খুব ছোট কারণ, জে সি টি-র দিক থেকে আমাকে বেশ ভাল অফার...।'

— 'আচ্ছা, আচ্ছা। মিঃ বুটল্যান্ড, আপনার হিসেবমত মনোরঞ্জন আর প্রশান্ত কি সত্যিই সঙ্গে সঙ্গে চটে গেল?'

— 'মাথা খারাপ? ওরা তেমন সোজা ছেলেই নয়। চটতেই চাইছিল না। শেষে প্র্যাকটিস ম্যাচে জে সি টি-র কুলতারকে দিয়ে লাথি মারালাম, তবে একটু চটল। জে সি টি-র পারমিন্দার অন্যায়ভাবে ক্যাপ্টেন হয়ে গেল, এই কথাটাও বারবার ওর কানের কাছে রেকর্ডের মতো বাজাবার দায়িত্ব তিনজন প্লেয়ারকে দিলাম। কিছুটা চটল, আর তাতেই কী খেলা খেলল! ঠিকমত চটতে রাজি হলে, মনোরঞ্জন একাই যে কোন এশিয়ান টিমকে রোখার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এইখানেই প্রবলেম। মোটে চটতে চায় না।'

— 'আর প্রশান্ত?'

— 'একটা ভুল করে ফেলেছিলাম। একবার কথায় কথায় বলে ফেলেছিলাম, প্রশান্ত ইজ দ্য বেস্ট মিডফিল্ডার ইন ইন্ডিয়া। এই ভুলের জন্যই ও নিজের সেরা খেলা খেলেনি। তবে হ্যাঁ, অন্য অনেকের চেয়ে ঢের ভাল খেলেছে। আরও ভাল খেলবে। এখন শুধু ওকে চটিয়ে যাওয়ার জন্য নতুন নতুন স্কিম নিতে হবে।'

— 'আপনার টিমের ফরোয়ার্ডরা কেমন খেলছে?'

— 'টর্চ টিমের ডিফেন্ডাররা ওদের খুব প্রশংসা করেছে? বলেছে, অন্য কোনও টিমের ফরোয়ার্ডদের বিরুদ্ধে খেলে ওরা এত আনন্দ পায়নি।'

— 'কোনও ফরোয়ার্ডকে চটানোর চেষ্টা করবেন না?'

— 'না, বাজে প্লেয়ারদের চটাতে নেই। আমার টিমের কোচ আমাকে কখনই চটাতেন না।'

— 'আর গোলকিপার?'

— 'বেস্ট গোলকিপারকে আমরা পাইনি। তবু দেখুন, কীরকম লড়ে যাচ্ছি।'

— 'কে বেস্ট গোলকিপার?'

— 'ভাস্কর গাঙ্গুলি।'

— 'তাহলে ওকে ডাকতে বলছেন না কেন?'

— 'আপনারা একসঙ্গে দুটো বেস্ট পেতে পারেন না। হয় বেস্ট গোলকিপার পাবেন, নয়ত বেস্ট কোচ।'

— 'কেন?'

— 'ভাস্কর বেস্ট গোলকিপার। কিন্তু আমি যদি ওকে ডাকতে বলি, গভর্নর আমার চাকরি নট করে দেবেন। তখন, যদি বা চক্ষুলজ্জায় বেস্ট গোলকিপারকে ডাকা হয়, বেস্ট কোচের সার্ভিস ইন্ডিয়া টিম পাবে না। টিমের স্বার্থে তাই আমি ভাস্করকে নেওয়ার ডিম্যান্ড জানাচ্ছি না।'

— '৪-২-৪ সিস্টেম কেমন চলছে?'

— 'সিস্টেমটা পাল্টাব ভাবছি।'

— 'আবার ৪-৩-৩?'

— 'না, না, নো স্টেপ ব্যাকওয়ার্ডস। আমি এগোতে চাই। দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার মিডফিল্ডারে খেলা হচ্ছে। এবার আমি পাঁচ মিডফিল্ডার রাখতে চাই। ৫-৫-০ সিস্টেম।

— 'ইউ মিন কোনও ফরোয়ার্ড থাকবে না?'

— 'না, ওরা তো থেকেও নেই। তাই রাখবই না। চারজন ব্যাক আর একজন সুইপার— এই হল পাঁচজন ডিফেন্ডার। পাঁচজন মিডফিল্ডার উঠেনেমে খেলবে। কখনও তিন ফরোয়ার্ড দুই হাফ, কখনও চার ফরোয়ার্ড এক হাফ, কখনও পাঁচ ফরোয়ার্ড শূন্য হাফ, কখনও দুই ফরোয়ার্ড তিন হাফ, কখনও এক ফরোয়ার্ড চার হাফ, কখনও শূন্য ফরোয়ার্ড পাঁচ হাফ। এত ভ্যারিয়েশন দেখে অপোনেন্ট টিম চমকে যাবে।'

— 'সৌদি আরবের কোচ তেলে সান্তানাও চমকে যাবেন?'

— 'কে তেলে সান্তানা?'

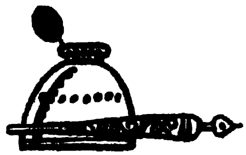
— 'ইয়ে, লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপেও ব্রাজিল টিমের কোচ!'

— 'ব্রাজিল? মন্দ টিম নয়। তবু সেই কোচও চমকাবে।

— 'কিন্তু মিঃ বুটল্যান্ড, সিস্টেম নিয়ে যে এত ভাবছেন, আপনি কি জানেন যে চিফ কোচ হিসাবে যুগোস্লাভিয়ার সিরিক মিলোভান এসে গেছেন?'

গাড়ি ততক্ষণে জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়ামে পৌঁছে গেছে। বুটল্যান্ড সাহেব গাড়ি থেকে নেমে হন হন করে চলে গেলেন। নামার সময় কতবার চোখ টিপলেন বুঝতে পারলাম না।

৪৯



আপনারা সকলেই জানেন যে ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নির্দেশে অথবা উপদেশে, অথবা পরামর্শে অথবা অনুরোধে, অথবা কাকুতি মিনতিতে কপিলদেব, মহিন্দার অমরনাথ প্রমুখ ভারতীয় ক্রিকেট নক্ষত্ররা এবার টেস্টম্যাচের রিপোর্ট করছেন না। কপিলদেব ও অমরনাথের কাছে এক লক্ষ টাকার, বেঙ্কট, কিরমানি, মদনলাল ও যশপালের কাছে চৌত্রিশ হাজার টাকার, বিনি, দোশি, বেঙ্গসরকার ও গায়কোয়াড়ের কাছে সাতাশ হাজার টাকার, শাস্ত্রী, সাঁধু ও ভালসনের কাছে আঠার হাজার টাকার অফার ছিল। গাভাসকার এবং পাটিলের কাছে কোনও অফার ছিল না, কারণ ওরা দুজন দুটি পত্রিকার সম্পাদক। অন্য পত্রিকায় রিপোর্ট করার সুযোগ নেই, নিজের পত্রিকায় লিখলে নতুন কোনও অফারের প্রশ্ন নেই।

নির্ভরযোগ্য সূত্রের খবর, ক্রিকেটারদের প্রতিবাদ তথা শোকসভার বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন টিম ম্যানেজার এবং অন্যতম নির্বাচক বিষাণ সিং বেদি। তিনি বলেন, 'তোমরা নিশ্চয় জানো যে পাকিস্তান সফরে আমি ইন্ডিয়া টু ডে' পত্রিকায় ম্যাচ রিপোর্ট করেছি, পাকিস্তান টেলিভিশনে এক্সপার্ট হিসাবে থেকেছি। পাকিস্তান সফরের পর, বোর্ডের কর্মকর্তারা আমাকে বলেন, যেহেতু আমি সিলেক্টর, ম্যাচ রিপোর্ট করতে পারব না, টেলিভিশনে এক্সপার্ট থাকতেও পারব না।

এটাও নিশ্চয় তোমরা জান যে দেশের স্বার্থে খেলা বা বিশেষজ্ঞের ভাষ্য দেওয়া আমি বন্ধ রেখেছি। এবার তোমাদের পালা। আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, বোর্ড অন্যায় করছে। তবু এই অন্যায় আমি মেনে নিতে অনুরোধ করছি, দেশের কথা ভেবে। ব্যাপারটা একটু বুঝিয়ে বলি। আমি যদি বলতাম যে লিখবই, সিলেক্টরের পোস্ট আমাকে ছাড়তে হত। কিন্তু কপিল আর মহিন্দার আজ যদি বলে যে লিখবেই, ক্যাপ্টেন আর ভাইস-ক্যাপ্টেনের পোস্ট ওদের ছাড়তে হবে না। এখন এই দুজনেরই বাজার, এদের চটানোর ক্ষমতা কারও নেই। আগে যেমন সানিকে চটানোর সাহস পায়নি। কেউ কোনও শাস্তিই দিতে পারবে না, তবু কপিল আর মহিন্দারকে আমি লিখতে বারণ করছি, শুধুমাত্র টিম স্পিরিটের কথা ভেবে। তোমরা লিখে প্রচুর টাকা পেলে, এদিকে লিখতে না পেরে বা প্রচুর টাকা লস

করে তোমাদের টিমের ম্যানেজার মনমরা হয়ে থাকল, এটা নিশ্চয় কাজের কথা নয়। এতে টিম স্পিরিট নষ্ট হতে বাধ্য। সুতরাং, ভাইসব এসো আমরা একসঙ্গে ত্যাগ স্বীকার করি।'

সম্ভবত বিষাণ সিং বেদির মর্মস্পর্শী বক্তব্যর জন্যই ক্রিকেটাররা শেষ পর্যন্ত না লিখতে, না লিখে ত্যাগ স্বীকার করতে, ত্যাগ স্বীকার করে টিম স্পিরিট বাড়াতে রাজি হন। বোর্ড সভাপতি এন কে পি সালভে নির্বাচক বিষাণ সিং বেদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ২৬৬টি টেস্ট উইকেটের চেয়েও তাঁর এই ভাষণ দেশের পক্ষে বেশি জরুরি ছিল। এজন্য বোর্ডের পক্ষ থেকে কাষ্ঠ নির্মিত একটি মিনিয়েচার প্রুডেনশিয়াল কাপ দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়।

বোর্ড এবং ক্রিকেটাররা একমত হয়ে যাওয়ায় ভারতবর্ষের মোট ৯১টি দৈনিকপত্র ও সাময়িকপত্র বিপদে পড়ে গেছে। প্রথম টেস্টে তো আর কিছু করার ছিল না, দ্বিতীয় টেস্ট থেকে কিছু করার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা শুরু হয়। অন্তত ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে সমাধান খুঁজে না পেলে পত্রিকাগুলির বিক্রি পঞ্চাশ থেকে দেড়শ কপি কমে যেতে বাধ্য। মূলত সার্কুলেশন ম্যানেজারদের আগ্রহেই স্পোর্টস এডিটরদের গভীর চিন্তাভাবনায় ডুবে যেতে হয়েছে।

বাঙ্গালোর টেস্টের দ্বিতীয় দিন সকালে কে এস সি এ স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে সমবেত স্পোর্টস এডিটর এবং/অথবা রিপোর্টারদের করুণ ও চিন্তিত মুখ দেখে আমার খুব কষ্ট হয়। আমি ওই একদিনের জন্য বাঙ্গালোর গিয়েছিলাম, একদিনে এত করুণ মুখ দেখার প্র্যাকটিস আমার নেই। বম্বের এক গোলগাল স্পোর্টস এডিটরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের সকলের মুখ এমন শুকনো কেন?'

— 'ইয়ার্কি মারছেন!'

— 'না না, সবে লাইনে এসেছি, এখনই কী আপনার সঙ্গে ইয়ার্কি মারব? সত্যি জিজ্ঞেস করছি, আপনাদের মুখ এমন করুণ দেখাচ্ছে কেন?'

তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'ক্রিকেটারদের লেখা এখন পাবলিক খাচ্ছে। তোমাদের কাগজেও তো সব প্লেয়াররা লেখেটেখে, সবই জান। ক্রিকেটাররা ড্রেসিং রুমের দু-একটা গপ্পো লেখায় ঢুকিয়ে দিতে পারে, প্লেয়ারদের সম্পর্কে দু-একটা চাঞ্চল্যকর মন্তব্য করতে পারে, প্লাস একটু পারস্পরিক পিঠ চুলকোনি, এই হল ম্যাচ রিপোর্ট। এটাই এখন কাটছে, পাবলিক নিচ্ছে খাচ্ছে। ক্রিকেটারদের, আই মিন, প্লেইং ক্রিকেটারদের লেখা ছাড়া খবরের কাগজ ঝালছাড়া মাংস, জিয়াউদ্দিন ছাড়া এ আই এফ এফ। তাই রাত্রে ঘুম হচ্ছে না, মানে কাল হয়নি। আমরা বেঙ্গসরকারকে ঠিক করে রেখেছিলাম, লাস্ট মোমেন্টে বিপদে পড়ে গেলাম। এই টেস্টটার যা হবার হল, এর পরেই বা কী করব?'

খেলার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, গর্বিত হন, গর্বিত হন, মাত্র এগার মিনিট ভেবেই আমি একটা সলিউশন বার করে দিয়েছি। বম্বের স্পোর্টস এডিটর সেকেন্ড টেস্টের সময় এক্সপেরিমেন্টটা করে দেখবেন। সাকসেসফুল হলে, ইন্ডিয়ার আর সব কাগজ এই পথেই

হাঁটবে। হোয়াট বাবুরাম সাঁপুড়ে থিঙ্কস টু ডে, দি হোল ইন্ডিয়া উইল থিঙ্ক ইট টুমরো।

আমি বললাম, মূল ব্যাপারটা হল, আপনারা তাদের দিয়ে লেখাতে চান, যারা 'ক্লোজ টু দি গেম', যারা গপ্পো এবং চাঞ্চল্যকর বক্তব্য দিতে পারবে। সেকেন্ড টেস্টে আপনি একটা জিনিস ট্রাই করুন। আম্পায়ার স্বরূপ কিষেণকে দিয়ে লেখান। সেকেন্ড ডে-র খেলার পর একটি নমুনা রিপোর্ট আমি গোলগাল স্পোর্টস এডিটরের হাতে দিলাম (তিনি খুব খুশি হয়েছেন)। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি :

বাঙ্গালোর, ১৫ সেপ্টেম্বর : আজ সকালে জাহির চাইছিল, ভিজে আউট ফিল্ডেই খেলা শুরু হোক। কপিলের বক্তব্য, তা সম্ভব নয়। ভিজে মাঠে বল জমে যাবে, বল আটকে যাবে, গাভাসকারের সেঞ্চুরি এবং যশপালের হাফ সেঞ্চুরি হবে না। কপিলের বক্তব্যই যুক্তিযুক্ত মনে হল। তাছাড়া, দেশের মাটিতে ক্যাপ্টেনকে কিছু প্রিভিলেজ দেওয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অলিখিত নিয়ম। পতৌদি পেয়েছে, ওয়াদেকার পেয়েছে, গাভাসকার পেয়েছে, কপিলই বা পাবে না কেন?

আমাদের সিদ্ধান্ত জানার পর জাভেদ মিয়াঁদাদ নাকি মন্তব্য করেছে, 'এইজন্যই ইন্ডিয়ায় আসতে ইচ্ছা করে না।' যেহেতু কথাটা ড্রেসিং রুমে বলা হয়েছে, আমি ওয়ার্নিং দিতে পারিনি।

সানিকে আউট দেবার পর ও প্রায় সাড়ে পাঁচ সেকেন্ড ক্রিজে দাঁড়িয়েছিল। সাধারণত ও দাঁড়ায় না। বারি ক্যাচটা লুফেই লাফিয়ে অ্যাপীল করল, মিয়াঁদাদ আর মহসিনও লাফাল, এত বেশি লাফানোয় আমার সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক, তাই একটু দেরিতে আঙুল তুললাম। ড্রেসিং রুমে ফিরে সানি জানান, বারি মোটেই ক্যাচ ধরেনি, কারণ বলটা ওর ব্যাটে লাগেনি, পায়ে লেগেছে। তখন কিছু বলিনি। তবে চায়ের সময় সানিকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি ওকে কট বিহাইন্ড নয়, লেগ বিফোর উইকেট দিয়েছি। খেলা চলার সময়েই বারির কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছি, ওর একটা টেস্ট ক্যাচ কমিয়ে দেওয়ার জন্য। বারি খুব ভাল লোক। বলেছে, 'কমিয়েছেন, তাতে কী, পরে বাড়িয়ে দেবেন।'

বম্বের স্পোর্টস এডিটর এর পর একটা কঠিন প্রশ্ন করেন, 'কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টের পর, বোর্ড যদি আম্পায়ারদেরও লেখা বন্ধ করে দেয়?'

খেলার প্রিয় পাঠক-পাঠিকারা, গর্ব রাখার জন্য আলাদা ঘর খুঁজুন, আমি মাত্র পৌনে আট মিনিট ভেবেই আবার সলিউশন দিলাম : 'কোনও চিন্তা নেই, থার্ড টেস্টে তাহলে বোর্ডের কোনও কর্মকর্তাকে দিয়েই লেখাবেন।'

— 'কে পড়বে?'

— 'সবাই পড়বে। খুব ইন্টারেস্টিং কপি হবে। একটা নমুনা-কপি দিচ্ছি, ভেবে দেখুন।'

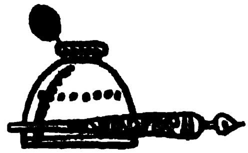
শুধু প্রথম দুটো প্যারাগ্রাফ এখানে উদ্ধৃত করছি :

বাঙ্গালোর, ১৫ সেপ্টেম্বর : আজ সকালে আরও আধঘণ্টা আগে খেলা শুরু করা যেত। করলে, পাবলিকের ইটে প্যাভিলিয়নের জানালার এবং আমার চশমার কাচ ভাঙত না। ঘোটসকার ঠিক আছে, এই স্বরূপকিষাণকে পাল্টান দরকার। কপিলকে বোঝাতে

পারে না, পতৌদি হলে কী করত? মামসার মতো আম্পায়ার একবার আমার কাছে দরবার করেছিল, পতৌদি ইন্ডিয়া ক্যাপ্টেন থাকলে আম্পায়ারিং করবে না।

সানি বিয়াল্লিশ করল। টিমের পক্ষে রানটা জরুরি ছিল। ও আউট হওয়ায় আমি অবশ্য খুশিই হলাম। একশো করলেই আবার চাপটাপ দিত কতরকম। সানিকে নিয়ে ঘর তো কম দিন করছি না! গতকাল মহিন্দার এবং আজ কপিল কম রানে আউট হওয়াও ভাল ব্যাপার। ওদের মন একটু খারাপ থাকায় লেখার ব্যাপারে বিশেষ চাপ দিতে পারল না।

৫০



কী করে যেন রটে গেছে, আমিও সানি গাভাসকারের পাখা, আই মিন ফ্যান। বুঝছি না, কে আমার পিছনে লাগল। আমি বোকাসোকা ভালমানুষ, কারও আটে ছয়ে থাকি না। এভাবে আমার বদনাম করার কী মানে হয়? সেই সেভেন্টি ওয়ান থেকেই আমি গাভাসকারের একনিষ্ঠ সমালোচক, গুণমুগ্ধ শত্রু। অন্তত একশ'আটটি চায়ের দোকানে অন্তত সাতশ একান্নটি আড্ডায় আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছি যে, গাভাসকার এমন কিছু ব্যাটসম্যান নয়। অ্যান্টি গাভাসকার কমিটির বাঘা বাঘা লোকেরা ময়দানে আসার অনেক আগেই আমি এই সব যুক্তি খুঁজে বার করেছি : এক, গাভাসকার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ব্যাট করেন। তিনি ব্যাট করলে টিমের ক্ষতি, কারণ রান বাড়ে না, তাই অপোনেন্ট টিমের ক্যাপ্টেন আর বোলাররা তাঁকে কখনও আউট করতে চায় না। এইভাবেই টুকটুক করে এত সেঞ্চুরি হয়ে গেছে। দুই, গাভাসকার অধিকাংশ সেঞ্চুরি করেছেন দুর্বল দলের বিরুদ্ধে। তিনি প্যাকার সিরিজে থাকলে এবং গ্রেগ চ্যাপেল প্যাকার সার্কাসে না ঢুকলে ডনের রেকর্ড গ্রেগ চ্যাপেলই ভাঙতেন। তিন, গাভাসকার চালাকি করে কিছু সেঞ্চুরি করে নিয়েছেন বিখ্যাত বোলাররা বিখ্যাত হয়ে ওঠার আগেই। কালীচরণের টিমের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরিগুলো যখন করা হয়, মার্শাল বিখ্যাত হননি। আটাত্তরে ভারত সফরে ইমরানের বিরুদ্ধে মাদ্রাজের সেঞ্চুরিটাও ফালতু, কারণ ইমরান তখনও এত ভয়ঙ্কর ছিলেন না। চার, দেশের চেয়ে বিদেশের মাটিতে সেঞ্চুরি করা অনেক বেশি কঠিন, দেশে অনেক সুবিধা পাওয়া যায়, আম্পায়ারের সহানুভূতি পাওয়া যায়, সুবিধাজনক পিচ পাওয়া যায়— এসব বাজে কথা। আসলে দেশের মাটিতে সেঞ্চুরি করাই বেশি কঠিন। কারণ হোম পাবলিকের গালাগালি হজম করে সেঞ্চুরি করতে হয়। ডন উনত্রিশটি সেঞ্চুরির মধ্যে আঠারটি করেছিলেন দেশে, এগারটি বিদেশে। সানি তেরটি দেশে, ষোলটি বিদেশে। ডনের রেকর্ডের সঙ্গে সানির, সুতরাং, তুলনাই হয় না।

জানি না, কে আমার এমন সর্বনাশ করল। কে রটাল, আমিও সানি গাভাসকারের পাখা, আই মিন ফ্যান।

ফলে, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি গাভাসকার কমিটির ইমার্জেন্সি মিটিংয়ে আমাকে ডাকা

হয়নি। তবে, আপনারা শুনে সুখী হবেন, শেষ পর্যন্ত একটা ব্যবস্থা হয়েছিল। আমার এক ক্রিকেটার বন্ধু, যিনি একটিও টেস্ট খেলেননি, কখনও ভারতীয় স্কোয়াডেও ছিলেন না এবং গাভাসকার পঁচানব্বই টেস্ট খেলায় বিরক্ত, যথারীতি স্পেশাল ইনভাইটি হিসাবে কল পেয়েছিলেন। অনেক বলে কয়ে তাঁকে রাজি করালাম। একসঙ্গে শান্তিদা, যাত্রা কেশরী শান্তিগোপালের কাছে গেলাম। তাঁর মেক-আপ রুম থেকে যখন বেরলাম, দুজনেই একরকম দেখতে। শান্তিদা অবশ্য ওই ক্রিকেটারকেও বাবুরাম সাঁপুড়ে বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, দরকার ছিল না।

এ আই এ জি সি-র ইমার্জেন্সি মিটিং ডাকা হয়েছিল চার নভেম্বর বম্বের সীরক হোটেলে সন্ধে সাতটায়। ইনভাইটি ক্রিকেটার ফ্রম বেঙ্গল থেকে কনফারেন্স রুমে পৌঁছে দেখি মাত্র দুজন হাজির। আমাকে নিয়ে আড়াই জন। স্পেশাল ইনভাইটির ভোটিং রাইট থাকে না, সুতরাং আমাকে হাফ হিসাবে কাউন্ট করাই উচিত। কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট দিল্লির প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীযুক্ত এক্স ভগ্নকণ্ঠে বললেন, 'কোরাম হচ্ছে না। সাতজন জার্নালিস্ট মেম্বার দিল্লিতেই রয়ে গেছে। তিনজন সুইসাইড করার চেষ্টা করেছিল, এখনও নার্সিংহোমে। বাকি চারজন মনের দুঃখে কন্টিনিউয়স ড্রিঙ্কিংয়ের রেকর্ড গড়ার চেষ্টা করছেন। গাভাসকার একাই শুধু রেকর্ড করতে পারে নাকি? কমিটির তিনজন ক্রিকেটার মেম্বারের মাইল্ড হার্ট অ্যাটাক হয়েছে, ভেবেছিলাম এর মধ্যে রিকভার করবে, করেনি। মিটিং আজ হবে না। নেক্সট উইক-এ হতে পারে, সবাই সেরে-সামলে উঠলে।

কাগজের পয়সায় বাইরে গিয়ে কিছু করতে না পারলে মন খচখচ করে। মিটিং যখন হল না, কিছু একটা করা দরকার। সো, ব্যাক টু বাবুরাম সাঁপুড়ে। পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় সানি গাভাসকারের ফ্ল্যাটে হাজির। গালে পাম অলিভ শেভিং ক্রিম এবং বাঁ হাতে থামস আপ নিয়ে সানি সোফায় বসলেন এবং ডান হাতে আয়োডেক্স নিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুতে মালিশ করতে লাগলেন। তিন মিনিট মালিশ করার পর বাথরুমে গেলেন, এগার মিনিটের মধ্যেই ব্রেকফাস্ট সেরে হাতে ভি আই পি নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বললেন, 'চলুন, অফিস যেতে যেতে ইন্টারভিউ দেব।' গাড়িতে ওঠার সময় বললেন, 'ফিয়াটটা কিনতে হয়েছে বা পেট্রলও কিনতে হয়। এই দুটোও স্পনসর্ড করানো যায় কিনা ভাবব, এই সিরিজ শেষ হবার পর।'

— 'মিঃ গাভাসকার, টুয়েন্টি নাইন্থ সেঞ্চুরির পর আপনি কটা টেলিগ্রাম পেয়েছেন?'

— 'এখনও গোনা চলছে। আজ সকাল আটটা সাঁইত্রিশ মিনিট পর্যন্ত জানি, পাঁচ হাজার দুশ বিরানব্বই।'

— 'রেকর্ড ছোঁয়ার পরই নিশ্চয় বাবা-মার কথা মনে পড়েছিল?'

— 'না। বাবা-মার চেয়েও যাঁরা বেশি শুভানুধ্যায়ী, তাঁদের কথা মনে পড়ছিল। সাউথ ইন্ডিয়ার সেই মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান, যে একবার অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে গিয়ে চল্লিশের ঘরে ঢুকতে পারেনি, সে একটা কাগজে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, কী করে মার্শালকে খেলতে হবে। বম্বে তথা ভারতের এককালের নাম্বার ওয়ান ব্যাটসম্যান, যিনি ফিফটি ওয়ানে ইংল্যান্ড ট্যুরে ট্রুম্যানের বলে স্কোয়ার লেগ আম্পায়ারের দিকে দৌড়েছিলেন, ওই কাগজে

এবং আর একটি পত্রিকায় জানান, মার্শালকে আমি যেভাবে খেলছি তাতে তিনি বিস্মিত। কীভাবে খেলা উচিত, তাও বলে দিলেন।'

— 'আপনি ওই দুজনের পরামর্শমতই খেললেন?'

— 'না। আমি বুঝে গেলাম, ওই দুজনের পরামর্শের ঠিক উল্টোটা করলেই ভাল রেজাল্ট পাওয়া যাবে। পাওয়া গেল। ওদের থ্যাঙ্কস জানাতে হবে। টেলিগ্রাম করার ব্যাপারটা পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাম ডিপার্টমেন্ট স্পনসর করলে ভাল হয়।'

— 'আর কার কথা মনে পড়ল?'

— 'এগারটা ভার্নাকুলার ডেইলির এগারজন লেখকের/পত্রলেখকের কথা মনে পড়ল, যাঁরা কানপুরে মার্শালের বলে আমার হাত থেকে ব্যাট পড়ে যাওয়ায় ছাপার অক্ষরে কেঁদেছিলেন, হেসেছিলেন, নেচেছিলেন, বলেছিলেন আমার মিডল অর্ডারে নেমে যাওয়া উচিত। একে তো ফর্ম নেই, তার ওপর টেকনিক নেই, তারও ওপর নিজের চেনা জায়গা ছেড়ে মিডল অর্ডারে নেমে এলে— আমি দাঁড়াব কোথায়? তাই দিল্লিতে পৌঁছেই মার্সেনিলকে ভাল আঠা কিনে আনতে বললাম। দারুণ গাম। তালুতে আর গ্লাভসে এক টিউব লাগালাম, ব্যাট আর হাতছাড়া হওয়ার চান্স থাকল না। বহুবার মার্শালের বল জোরে আমার ব্যাটে লাগল, বহুবার আমার ব্যাট জোরে মার্শালের বলে লাগল, তবু হাতের ব্যাট হাতেই থাকল। প্যাভিলিয়নে ফিরেও ব্যাট হাত থেকে ছাড়াতে পারছিলাম না। কপিল, মদন, সাঁধু আর কিরি— চারজন একসঙ্গে টেনেও কিছু করতে পারল না। শেষে হোটেল হায়াৎ রিজেন্সির তিনজন রুম অ্যাটেন্ডেন্ট দু-কেটলি গরম জল আর একটা সাঁড়াশি দিতে হাত থেকে ব্যাট ছাড়াল। আমি ওই এগারজন লেখক/পত্রলেখকের কাছে আজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।

— 'আর কারও কাছে?'

— 'হ্যাঁ, আরও আছে। আমি কৃতজ্ঞ সেই সব সবজান্তা সাংবাদিকদের কাছে, যাঁরা আমার শেষের দিন গুনছিলেন। শেষ ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পেরেই আমি আবার শুরুর মতো হুক শট নিলাম এবং সেঞ্চুরি পেলাম। কিন্তু আমি আরও বেশি কৃতজ্ঞ, অন্য কারণে। প্রুডেনশিয়াল কাপ থেকে ফিরে আসার পর, তাঁদের অনেক লেখা পড়ে আমি অনেক হেসেছি। আমি খুব ব্যস্ত লোক, খেলা ও খেলার বাইরেও। এত চাপের মধ্যে থাকি যে, হাসার চান্স পাই না। কিন্তু লন্ডনে এক বিখ্যাত ডাক্তার আমাকে বলেন, একমাত্র প্রচুর হাসিই টেনশন কমাতে থাকে এবং টেনশন কমলেই আমি রান পাব। তিনি প্রেসক্রিপশনে বড় করে একটা কথাই লিখে দিলেন : 'প্রচুর হাসি চাই, দিনে তিনবার, খাবার পর।' ইংল্যান্ড থেকে ফিরেই, সুতরাং, আমি এই জার্নালিস্টদের লেখা পড়তে শুরু করি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ আর ডিনারের পর। এবং স্বীকার করতে কুণ্ঠা নেই, আমি প্রচুর হেসেছি। আলটিমেটলি হাসির ওভারডোজ হয়ে যাওয়ায় আমি লাঞ্চের পর অন্য বইপত্র পড়তে শুরু করি।

৫১

স্পোর্টস জার্নালিস্ট হিসাবে আমার উত্থান সত্যিই অভূতপূর্ব। যে রেটে উঠছি, বছর চুরাশি বয়সে বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্পোর্টস জার্নালিস্ট হয়ে যেতে পারি, এই বিশ্বাস আমার আছে। আর তাই, আমি ফেমাস হতে থাকায় কেউ জেলাস হলে অবাক হই না। দিলীপ বেঙ্গসরকারের মতো কাঁধ নাচিয়ে বলি : 'ওয়েল, অল ইন দ্য গেম!'

কিন্তু ডেইলি পেপারের অলরেডি ফেমাস জার্নালিস্ট বন্ধু এত তাড়াতাড়ি আমার অ্যান্টি হয়ে যাবে, ভাবতে পারিনি। ইন ফ্যাক্ট মডার্ন স্পোর্টস রিপোর্টিংয়ের ঘাঁৎঘোৎ প্রথম ওর কাছেই শিখেছিলাম। দেখা হলেই 'গুরু' বলি। দেখা হলে, পকেটে শুধু বাসভাড়া রেখে সব খরচ করে খাওয়াই। তবু, হায় তবু, বন্ধু আমার ওপর ক্ষিপ্ত। তিন দিন চেষ্টা করেও বোঝাতে পারিনি যে স্পোর্টস জার্নালিস্ট হিসাবে আমি তাঁর নখের যুগ্যি নই। আমি তো ফেমাস হব সেই চুরাশি বছর বয়সে, টুথাউজ্যান্ড থার্টি টুতে, এখনই রেগে যাওয়ার কী দরকার?

তবু, বন্ধু রেগে থাকলেও, গত সপ্তাহে এক সকালে ওর বাড়িতেই যেতে হল। আমাদের এডিটর সাহেব জানিয়েছেন, এক সিজনে নটা টেস্ট, আটটা ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল, বেশ কিছু জোনাল ম্যাচ, গাভাসকারের রেকর্ড ইত্যাদি কভার করে নামকরা রিপোর্টাররা সম্ভবত জানুয়ারিতে ক্লান্ত থাকবেন। ছুটি নেবেন না, তবে অফিসে বসে বিশ্রাম নেবেন। বলা যায় না, আমাকেই নেহরু গোল্ড কাপ কভার করতে হতে পারে। সেজন্যই, সাতসকালে যেতে হল। লোডশেডিংয়ে কলিং বেল না বাজায় দরজায় চড়চাপড় মারতে হল। বন্ধু, আমার পয়সায় প্রচুর খাওয়া প্রিয় ও ক্ষুব্ধ বন্ধু দরজা খুলেই জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ, কী মনে করে?'

নিজের দরকার থাকলে, এসব অবজ্ঞা গায়ে মাখতে নেই। বরং, একেবারে কাদা হয়ে গিয়ে বললাম, 'ফ্রেন্ড, বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে এসেছি।'

ইদানীং এ লাইনে প্রচুর চ্যাংড়া এসে গেছে। সবাই নিজেকে বিরাট জার্নালিস্ট ভাবে। কেউ কারও কথা শুনতে চায় না। এই বাজারে বাবুরাম সাপুড়েই সম্ভবত একমাত্র স্পোর্টস

জার্নালিস্ট যে অন্যের উপদেশ নেয়। সেজন্য, নামকরা স্পোর্টস জার্নালিস্টরা আজকাল আর জ্ঞানট্যান দেবার চান্স পান না। ক্ষুব্ধ বন্ধু তাই যেন একটু খুশি হলেন। বিরক্ত মুখের তিন ভাগের একভাগে সামান্য হাসি ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বিপদ?'

—'ইফ এভ্রিথিং গোজ ওয়েল, যদি অ্যাজ এক্সপেক্টেড, ক্রিকেট ম্যাচগুলো কভার করে আমাদের বড় রিপোর্টাররা টায়ার্ড হয়ে পড়ে, (লাক ভাল হলে কেউ কেউ অসুস্থও হয়ে পড়তে পারে) নেহরু গোল্ড কাপটা আমাকেই কভার করতে হবে।'

—'এটা কোন বিপদ হল?'

—'না, এটা বিপদ নয়, বিপদ হল নাম নিয়ে। ফরেন টিমগুলোর প্লেয়ারদের নাম নিয়ে মুশকিলে পড়ব। প্লেয়ার্স লিস্ট তো ইংরেজিতে দেওয়া হবে। এক-একটা কাগজ এক-এক রকম বাংলা বানান লিখবে। আমি একটা গাইড লাইন চাইছি। তুমি এ লাইনে ঝানু। একটু আলো দেখাও ভাই। নাইনটিন সেভেন্টি সেভেনে কসমস ক্লাব কলকাতায় পৌঁছনোর আগে একজন প্লেয়ারের নাম তোমরা লিখলে চিনাগ্লিয়া। টিম আসার দু দিন আগে তোমরা জানালে : চিনাগ্লিয়া নয়, কিনালিয়া। সেই শুরু হল।'

—'কী শুরু হল?'

—'ঐ নাম নিয়ে জিমন্যাসটিকস। আচ্ছা, সাবির আলি, না, সাব্বির আলি? এটা জানতে চাইছি, কারণ সূত্রটা জানা দরকার। সূত্রগুলো পেয়ে গেলে ফরেন টিমের সব প্লেয়ারের নাম নিজে নিজেই ঠিকঠাক লিখতে পারব।'

—'সাব্বির, এতো বহু আগেই আমরা জানিয়ে দিয়েছি। অনেকে অ্যাকসেপ্টও করেছে। দুটো বি সুতরাং 'ব্বি'।

—'কিন্তু, যারা অ্যাকসেপ্ট করেছে, তারা ফুটবলারকে সাব্বির লিখলেও, ডেকাথিলিটকে সাবির লিখছে। কিন্তু ডেকাথিলিটের নামেও তো দুটো 'বি'।'

—'ভুল লিখছে। সব 'সাব্বির।'

—'লয়েড-এ দুটো 'এল' আছে, তাহলে কি ক্লাইভ ল্লয়েড লিখব? রজার বিনির বিনিতেও দুটো 'এন', তোমরা 'বিন্নি' না লিখে 'বিনি' লেখ কেন?'

—'একসেপশন প্রুভস দ্য রুল। অন্য কথা জিজ্ঞেস কর।'

—'ইদানীং তোমরা লিখছ মনীন্দর সিংহ, গুরুশরণ সিংহ... ইত্যাদি। হঠাৎ 'হ' যোগ হল কেন? তাহলে কি এবার থেকে জৈল সিংহ লেখা হবে?'

—'ওটা স্পোর্টস-এর ব্যাপার নয়, প্রেসিডেন্ট যদি কোন স্পোর্টস ইভেন্টে আসেন তখন অবশ্য অসুবিধা। তবে সব পৃষ্ঠার জন্য এক নিয়ম থাকতে হবে, তেমন কোন কথা নেই। যেমন ধর, স্পোর্টস পেজে আমরা প্লেয়ারদের 'সে' বলি, 'তিনি' নয়। তেতাল্লিশ বছর বয়সী সেঞ্চুরি 'করে', কিন্তু ছত্রিশ বছর বয়সী সুব্রত মুখার্জি প্রতিবাদ 'করেন।' প্লেয়ারদের 'তিনি' 'তাঁর' বলে সম্মান দেওয়ার কোন মানে হয় না।'

—'মহারাজা বলীন্দর সিং যদি বলীন্দ্র সিং হয়, মনিন্দার সিং মণীন্দ্র সিং নয় কেন?'

—'আজেবাজে প্রশ্ন কোরো না, আমার সময় কম।'

—'দুজোঁ, দুঁজ, দুজন, ডুজন?'

—'দুজোঁ।'

—'কেন?'

—'আমরা লিখছি, তাই।'

—'পাতিলকে সবাই এখন পাটিল লিখছে। কেন, তা অবশ্য বুঝছি না।

—'খুব সহজ কারণ। মারাঠি ভাষায় 'ত'-এর উচ্চারণ নেই। তাই 'পাটিল।'

—'বেশ। তাহলে সন্দীপ পাটিল সম্পাদিত খেলাধুলোর পত্রিকার নাম কী করে 'সৎকার' হয়। কেন লেখ না— 'সটকার?'

—'বাজে প্রশ্ন। জবাব দেবার সময় নেই।'

—'ম্যাটস ওয়াইল্যান্ডার না উইল্যান্ডার? কার্লোস কিরমায়ার না কারমায়ার? গিলারমো ভিলাস, কেন বিলাস হবে?'

—'টেনিসের লাইনে আমি নেই।

—'গাভাসকার সাতাশটা সেঞ্চুরি গাভাসকার হিসাবে করার পর, হঠাৎ 'গাওসকার' হয়ে যাচ্ছে কী করে?'

—'মারাঠিতে এরকম উচ্চারণ হয়। মারাঠিতে লেখে 'গাবাসকার'। তার থেকে গাওসকার।'

—'হঠাৎ নাম নিয়ে এত উঠে পড়ে লাগলে কেন?'

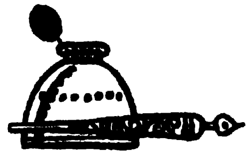
—'রিসেন্টলি, এগুলো আমাদের স্কুপ। কোন নতুন খবর দেবার জো নেই, চ্যাংড়া রিপোর্টারদের জন্য। তাই আমরা নাম-এর স্কুপেই কনসেনট্রেট করছি।'

—'মহীন্দর থেকে মহিন্দার হয়ে এখন 'মোহিন্দার'-এ এসেছে। বেঙ্গসরকারকে 'বিঙ্গ সরকার, কিরমানিকে কুরমানি— এসবের জন্যও রেডি থাক। জেনো ব্যাকরণ থেকেই সব হচ্ছে।'

—'সুরজিৎকে সুরজিত, বিশ্বজিৎকে বিশ্বজিত— এসবও কি ব্যাকরণ মেনে, ভাই?'

—'কেন ফালতু প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করছ? একটাই গাইড লাইন দিচ্ছি, যত্ন করে নিয়ে যাও : কাগজে আজ যে বানান, যে উচ্চারণ দেখবে, পরদিন থেকে সেইসব লিখবে। বেশি সূত্র বোঝার চেষ্টা করে লাভ নেই, তোমার মোটা মাথায় ওসব ঢুকবে না।'

৫২



এ আই এ জি সি-র আই মিন, অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি গাভাসকার কমিটির মিটিং শেষ পর্যন্ত বসল গত ১৯ নভেম্বর, দিল্লির হোটেল তাজপ্যালেসে। ভারতের বিপর্যয় আমরা বহুবার সহ্য করেছি, ইন ফ্যাক্ট, প্রায় সব সিরিজেই বিপর্যয় হজম করা আমরা প্র্যাকটিস করি। কিন্তু আমেদাবাদে অন্য একটা ব্যক্তিগত বিপর্যয় ঘটে গেছে, যা হজম করা আমাদের, আই মিন এ আই এ জি সি-র মেম্বারদের পক্ষে কঠিন ছিল। তাই, কনফারেন্স রুমে ঢুকে অবাক হয়ে গেলাম। কমিটির সব মেম্বার হাজির, ইভন দ্যাট ফেলা ফ্রম বাঙ্গালোর, যিনি লেগ স্পিন বোলিং ছেড়ে লেগ পুলিং জার্নালিজমে না এলে তাঁর বন্ধু চন্দ্রশেখর তিনটে টেস্টেও খেলার চান্স পেতেন কিনা সন্দেহ। ২৯ অক্টোবর থেকে ১৩ নভেম্বর— এই ষোল দিনে আমাদের এই কমিটির জীবনে যে ঘোর দুর্যোগ নেমে এসেছে, তার ধকল সামলে এত তাড়াতাড়ি এমন জমজমাট মিটিং করা যাবে, কল্পনাই করা যায়নি। মনে জোর, আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা শুধু সানি গাভাসকারেরই আছে নাকি?

প্রেসিডেন্ট কিছু বলার আগেই কলকাতার ক্রিকেটার বন্ধু উঠে দাঁড়ালেন। ক্লাব ক্রিকেটে তাঁর ঊনত্রিশটা কোয়ার্টার সেঞ্চুরি আছে। দুহাত ছড়িয়ে নাটকীয় ভঙ্গিতে বললেন, 'নো ফর্মালিটি টুডে। আজ আমাদের আনন্দের দিন। আমাদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ গাভাসকার শেষ পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেট থেকে রিটায়ার করতে চেয়েছে। আর মাত্র তিনটে টেস্ট। তারপরই, উই আর ফ্রি ফ্রম সানি গাভাসকার। আজ কোন আলোচনা নয়, আমাদের বোতল এবং প্রাণ খুলে সেলিব্রেট করা উচিত।'

দ্যাট ফেলা ফ্রম বাঙ্গালোর, পাইপ রাখলেন, মুখ খুললেন : 'এখনও সেলিব্রেট করার সময় আসেনি। ভিশি থেকে কপিল— সবাই বোঝাচ্ছে, বোঝাবে গাভাসকার যেন এখনই রিটায়ার না করে। দুঃখের কথা আর কী বলব, আমাদেরই একজন, এই চক্রান্তে যোগ দিয়েছে।'

সভায় শ্মশানের নীরবতা নেমে এল। ততক্ষণে বুঝলাম, বিষাণ সিং বেদি মিটিংয়ে নেই। আস্তে আস্তে, প্রায় নিজেকেই বললাম, 'হায় বেদিও গাভাসকারের পাখা হয়ে গেলেন!'

পাশে-বসা মাদ্রাজের স্বল্পভাষী সাংবাদিক জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কিছু বললেন?'

—'দুঃখ হচ্ছে, বেদির মতো অ্যান্টি গাভাসকার স্পেশালিস্টও সানির ফ্যান হয়ে গেলেন।'

—'না, এখনও এতটা ভেঙে পড়ার কোন কারণ নেই। বিষাণের বক্তব্য, কমিটিকে যতটা হেল্প করা সম্ভব ও করেছে। কিন্তু সিলেক্টর হওয়ার পর, কোন ব্যাপারেই এমনকি গাভাসকারের পিছনে লাগার মতো ভাল কাজেও সরাসরি যুক্ত থাকা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। ওর দ্বিতীয় বক্তব্য, দিল্লির ওয়ান টুয়েন্টি ওয়ান আর আমেদাবাদের নাইনটির পর এই কমিটির কোন ফিউচার নেই। এটাকেই আমরা বিট্রেয়াল মনে করছি। কিন্তু, বিষাণ সানির ফ্যান হয়ে গেছে, অবস্থাটা এত খারাপ নয়।'

দিল্লির প্রবীণ ভাইস প্রেসিডেন্ট উঠলেন, 'গাভাসকার যদি সত্যিই এবার রিটায়ার করে, আমাদের সেলিব্রেট করা উচিত নয়। শোকসভা করা উচিত।'

গোটা মিটিং দিল্লির দিকে তাকাল। দিল্লি বিষণ্ণ হাস্যে বিস্তারিত হলেন, 'ভয় পাবেন না, আমি বিষাণের বন্ধু বলে ভাববেন না যে ওর লাইনে যেতে চাইছি। গাভাসকারের খেলা ছেড়ে দেওয়া উচিত— এই মূল স্লোগান নিয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রমে, অনেক ত্যাগ স্বীকার করে, নিজেদের এবং ভারতীয় ক্রিকেটের সমূহ ক্ষতি করে আমরা এই কমিটি বা ফোরাম গড়ে তুলেছি। গাভাসকার খেলা ছেড়ে দিলে তো আমাদের কমিটির কাজ শেষ।

শেষ। কমিটি উঠে যাবে। এতদিন একটা মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে একসঙ্গে কাজ করেছি। কমিটি ভেঙে যাওয়ার সময় একটা শোকসভা করতেই হবে।'

দ্যাট ফেলা ফ্রম বাঙ্গালোর এতক্ষণ কাগজের গুলি পাকিয়ে ইংল্যান্ডবাসী সুবিখ্যাত গাভাসকার বিরোধী সাংবাদিক ভাষ্যকারের গায়ে ছুঁড়ছিলেন। শোকসভার কথা শুনে পুনরায় গাত্রোত্থান করলেন, 'কমিটি ভাঙার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমার আশঙ্কা এদেশের মূর্খ ক্রিকেট পাবলিক গাভাসকারের কথা বলতেই থাকবে। গাভাসকার রিটায়ার করার পর, সে এখনই করুক আর এইট্টি সিক্সেই করুক, আমাদের কাজ হবে প্রমাণ করা যে, গাভাসকার অতি বাজে ব্যাটসম্যান। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, এই সত্য বলায় কুসংস্কারাচ্ছন্নরা গ্যালিলিওকে পুড়িয়ে মেরেছিল। এখন আমাদের কয়েকজনকে পুড়িয়ে না মারলেও পাবলিক ঠাট্টা করছে। কিন্তু একদিন যখন প্রমাণ হয়ে যাবে যে সত্যিই গাভাসকার ভাল ব্যাটসম্যান ছিল না, তখন স্কুলের বইপত্রে গ্যালিলিওর মতো আমাদের ছবিও ছাপা হবে। আসুন, আমরা এখন থেকেই কাজে লেগে যাই। আমি অলরেডি কিছু খসড়া তৈরি করেছি, যাতে প্রমাণ করা যাবে গাভাসকার কোন রেকর্ডই করেনি।'

মাদ্রাজের বিদগ্ধ মিড্‌ল অর্ডার ব্যাটসম্যান লাফিয়ে উঠে বললেন, 'ফ্যানটাস্টিক। কিন্তু সেঞ্চুরির রেকর্ডটা হয়নি, একথা কী করে বলা যাবে?'

পাইপের ছাই ঝেড়ে বাঙ্গালোর : 'ইন ফ্যাক্ট, আমরা ঐ পয়েন্টে ঢুকবই না। শুধু বলব, গাভাসকার বলেই দিয়েছে যে ডনের রেকর্ড ও ছুঁতে পারেনি, কারণ ডন ঊনত্রিশটা

সেঞ্চুরি করেছিলেন তেতাল্লিশটা টেস্ট কম খেলে।'

আমি খুব আস্তে মাথা নেড়ে নিজেকেই বললাম, 'সত্যি, ডনের তুলনা নেই।'

বাঙ্গালোর ধমক দিলেন. চুপ করুন মশাই! ডনের সময় আমরা থাকলে, দেখতাম কী করে এত ওপরে ওঠে! থাকগে, যা বলছিলাম, সেঞ্চুরির রেকর্ডটা আসলে রেকর্ড নয়, একথা যখন ক্রিমিনাল নিজেই কনফেস করছে, আমাদের আর প্রমাণ করার দরকার থাকছে না।'

—'সবচেয়ে বেশি টেস্ট রানের রেকর্ড?'

সহাস্যে বাঙ্গালোর : 'মাথা খাটান, মাথা খাটান, মাথাটা কি শুধু টুপি পরার জন্য আছে নাকি? স্যার গ্যারি আট হাজার বত্রিশ রান করেছিলেন তিরানব্বুই টেস্টে। বয়কট সেই রানে পৌঁছল এবং ডিঙিয়ে যান একশ সাত নম্বর টেস্টে। সানির নিজের যুক্তি অনুসরণ করেই বলা যায়, স্যার গ্যারির রেকর্ড বয়কট ভাঙেনি। সুতরাং সানির, বয়কটের রেকর্ড ভাঙার কোন প্রশ্ন ছিল না। থাকল গ্যারির রেকর্ড। গ্যারি আট হাজার বত্রিশ করেছিলেন তিরানব্বুই টেস্টে। এই রান করতে সানির লেগেছে আরও দুটো বেশি— পঁচানব্বুই টেস্ট। তাহলে, এটাও রেকর্ড নয়।'

—'পঞ্চাশ এবং পঞ্চাশের বেশি রানের ইনিংসের রেকর্ড এতদিন ছিল বয়কটের, বাইশটা সেঞ্চুরি, বিয়াল্লিশটা হাফ সেঞ্চুরি— মোট চৌষট্টি। আমেদাবাদ টেস্টে সেই রেকর্ডটাও সানি ভাঙল। ঊনত্রিশটা সেঞ্চুরি, ছত্রিশটা হাফ সেঞ্চুরি— মোট পঁয়ষট্টি। এটাকে কী করে অস্বীকার করবেন?'

দাঁত খিঁচিয়ে বাঙ্গালোর : 'এমন উজবুককে এই মিটিংয়ে কে ঢুকতে দিল? সেঞ্চুরি আর হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড রাখার জন্য আলাদা আলাদা খোপ আছে। প্রথম কথা, ডনের সেঞ্চুরির রেকর্ড গাভাসকার ভাঙেনি। দ্বিতীয় কথা, জিওফের হাফ সেঞ্চুরির রেকর্ড গাভাসকার ভাঙেনি। অর্থাৎ কিনা, গাভাসকার কোন রেকর্ডই ভাঙেনি।'

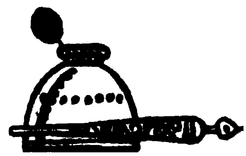
আমি মিনমিন করে জিজ্ঞেস করলাম, আচ্ছা, 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটারদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্যাচের রেকর্ডটা নিয়ে কী লাইন নেওয়া হবে?'

ধীরে ধীরে বাঙ্গালোর : 'তিনটে লাইন নেওয়া যায়। এক, উইকেটকিপারও ফিল্ডিং সাইডের লোক। সানির চেয়ে বেশি ক্যাচ কিরমানি আর ইঞ্জিনিয়ার নিয়েছে। লাইন নাম্বার টু, ঐ ডনের সেঞ্চুরির রেকর্ডের লাইন, সোলকার তিপ্পান্নটা ক্যাচ নিয়েছিল সাতাশ টেস্টে। তিপ্পান্নটা ক্যাচ নিতে গাভাসকারের অনেক বেশি টেস্ট লেগেছে, সুতরাং সোলকারের রেকর্ড ভাঙেনি। সানির নিজের লজিক, কারও কিছু বলার নেই। তিন নম্বর লাইনটা খুব সূক্ষ্ম, টেকনিকাল, দুনিয়ার সব বড় স্লিপ ফিল্ডসম্যানেরা, কাউড্রে, সিম্পসন, গ্রেগ চ্যাপেল, নীল হার্ভে, ওয়ালি হ্যামন্ড, ওয়ালিস ম্যাথিয়াস— সবাই ফার্স্ট স্লিপের লোক। গাভাসকার, ভিশি থাকার সময় পর্যন্ত সেকেন্ড স্লিপে দাঁড়িয়েছে এবং ওখানে দাঁড়িয়েই সবচেয়ে বেশি ক্যাচ নিয়েছে। ফাস্ট স্লিপের ক্যাচ সবচেয়ে কঠিন, কারণ ফাইনেস্ট স্নিক নিতে হয়।'

—'ইন্ডিয়ার হয়ে সবচেয়ে বেশি টেস্ট খেলার রেকর্ড?'

পাইপ মুখে তুলতে তুলতে বাঙ্গালোর : 'হ্যাঁ, এই রেকর্ডটা আমরা মানব। এবং বলব একজন বাজে ক্রিকেটার এত বেশি টেস্ট খেলার সুযোগ পেয়েছে বলেই এত রান আর সেঞ্চুরি করেছে। আমি সম্পূর্ণ খসড়া নেক্সট মিটিংয়ে পেশ করব।'

৫৩



হঠাৎ ভাল-লাগার স্বাদই আলাদা। শীতের শুরুতে হঠাৎ পাতে-ওঠা কচি মুলো বা পেঁযাজ কলিব মতোই সুস্বাদু এক হঠাৎ-ভাল লাগা আমাকে ছুঁয়ে গেল গত রবিবাব, বম্বে থেকে কলকাতায আসাব ফ্লাইটে। কোল্ড স্টোবেজেব আলুব মতোই একঘেয়ে হাসিতে ভরপুর এয়ার হোস্টেস যথাবীতি স্বাগত জানালেন। এতে ভাল লাগাব কী থাকতে পারে? প্লেনে উইনডো সিট পেতে হবে এমন কোন বাযনাক্কা নেই আমাব, সুতরাং সেটা পাওয়ায ভাল লাগারও প্রশ্ন ছিল না। আসি-আসি শীতেব কচি মুলো বা পেঁয়াজকলিব মতো হঠাৎ-সূক্ষ্ম ভাল-লাগা এল ব্রিফকেসটা দেখে। পাশেব সিটেব ঝকঝকে ভদ্রলোকের ছোট্ট ব্রিফকেসের ওপব সুদৃশ্য স্টিকাব— ব্যাকেট হাতে প্রকাশ পাড়ুকোনের। ভদ্রলোককে বন্ধু ভাবার ইচ্ছা হল। আহা, এই অন্তত একজন মানুষকে পাওয়া গেল, যিনি ক্রিকেটেব চেয়ে অন্য খেলাকে বেশি গুরুত্ব দেন। আব, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, প্রকাশের জন্য গর্ব না করতে পারলে কাব জন্য করা যাবে?

কিন্তু আলাপ করা চাট্টিখানি কথা নাকি? প্লেনে অপরিচিত দুই বাঙালি কদাপি নিজেদের মধ্যে বাক্যালাপ করেন না। অলিখিত কোড অফ কন্ডাক্ট। অন্য প্রদেশেব লোক পেলে ভুল হিন্দি বা ঝুল ইংরেজিতে কথার খই ফোটাতে বাধা নেই অবশ্য। অথচ, এই বাঙালি ভদ্রমহোদয়ের সঙ্গে আলাপ করা দরকার। অন্তত আমার হঠাৎ ভাল-লাগার খবরটুকু দেওয়া দরকার। কারণটা জানানো দরকার। বলা দরকার, গোটা দেশ সব খেলা ছেড়ে শুধুমাত্র ক্রিকেট নিয়ে পাগলামি করায় আমিও তিতিবিরক্ত। আসলে ওপেন করাই সবচেয়ে কঠিন, কী ক্রিকেটে, কী আলাপে। একুশরকম অল্টারনেটিভ নিয়ে মনে মনে [illegible] করার পর বাইশ নম্বরটা ছাড়লাম : 'প্রকাশ পাড়ুকোনের স্টিকারটা সত্যিই [illegible]'

[illegible]

[illegible] 'ক্রিকেট-ক্রিকেট করে গোটা দেশটা পাগল হয়ে গেল মশাই।'

[illegible]

আমি [illegible] বললাম, 'এই ক্রিকেট অ্যাপাথির বাজারে আপনি যে ব্রিফকেসে

প্রকাশ পাড়ুকোনের স্টিকার লাগিয়েছেন, সেজন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

ভদ্রমহোদয় হাসলেন। কিন্তু অভিনন্দন গ্রহণ করার জন্য তাঁকে মুখও খুলতে হল। 'ধন্যবাদ।' আবার হঠাৎ ভাল-লাগা। নভেম্বরের দুপুরে হঠাৎ পাতে-ওঠা কচি মুলো বা পেঁয়াজকলির মতো। বহুদিন পর, সম্ভবত বছর পাঁচেক পর একজন বাঙালি ভদ্রলোকের মুখে 'থ্যাঙ্কু'-র বদলে 'ধন্যবাদ' শুনলাম। এবং কী আনন্দ, দিনটা ছিল শুধুই হঠাৎ-ভাল-লাগার, ভদ্রমহোদয় কথা বলতে শুরু করলেন : 'আমি মনে করি, সব খেলাকেই সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ক্রিকেট ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনও খেলা নেই, এই চিন্তাটা বন্ধ করা দরকার। ব্রিটিশরা চলে গেল, কিন্তু এই কলোনিয়াল গেমটা আরও মাটি গেঁড়ে বসল। তবে, প্রকাশের স্টিকারটা আমার ব্রিফকেসে উঠেছে বাই চান্স। নরিম্যান পয়েন্টে স্টিকারের বিখ্যাত দোকান কোলোরামায় কাল বিকেলে গিয়েছিলাম। সানি গাভাসকারের স্টিকার কেনার জন্য। আউট অফ স্টক। এনিওয়ে, আপনি কি সানির লেটেস্ট স্টিকারটা দেখেছেন? ওঃ, দারুণ, হাঁটু গেড়ে কভার ড্রাইভ। সিলভার প্রিন্ট অন প্রুশিয়ান ব্লু। গতকাল দুপুরে বান্দ্রায় একটি ফিয়াট গাড়ির পিছনের কাচে দেখলাম। কিন্তু, আউট অফ স্টক। এত সেঞ্চুরি করলে স্টকে স্টিকার থাকবে কী করে? কিন্তু দিলীপ বেঙ্গসরকারের স্টিকারও নেই শুনে অবাক হলাম। আরও অনেকেই আউট অফ স্টক। যাদের আছে, তাদেরটা আবার আমার স্টকেও আছে। কীর্তি আজাদের স্টিকারটা দেখেছেন? ফ্যান্টাস্টিক! এ টাওয়ারিং সিক্স ওভার দি হেড অফ থার্ড ম্যান। শেষ পর্যন্ত চার্লস বোরোমিও, বিজয় অমৃতরাজ আর প্রকাশ পাড়ুকোনের স্টিকার দেখাল। প্রকাশেরটাই বেছে নিলাম।'

একটু হতাশ হলাম। কিন্তু অপরিচিত বাঙালি ভদ্রমহোদয় এতক্ষণ এক নাগাড়ে কথা বলায় খুশিও হলাম। বললাম, 'চার্লি বোরোমিওকে দেখেছেন নিশ্চয়। এমন অমায়িক চ্যাম্পিয়ন দুটো পাবেন না।'

— 'বোরোমিওকে দেখিনি। তবে, আমি অ্যাথলেটিক্স ভালবাসি। শুধু ক্রিকেট নিয়ে পাগলামি করতে আমার ঘেন্না হয়। পার্টিকুলারলি জ্যাভেলিন থ্রো দেখতে আমার বেশ ভাল লাগে।'

— 'গুরতেজ সিংয়ের সঙ্গে আলাপ আছে?'

— 'না, একেবার রজার বিনির সঙ্গে বাঙ্গালোর এয়ারপোর্টে আলাপ করার সৌভাগ্য হয়েছিল। জানেন তো, ক্রিকেটে কলকে না পেলে ও অ্যাথলেটিক্সে দাঁড়াতই, অল্প বয়সে দারুণ জ্যাভেলিন ছুঁড়ত।'

— 'আপনার ফেবারিট ফুটবলার?'

— 'ভিভ রিচার্ডস। অ্যান্টি-গুয়ার হয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছেন। অ্যান্ড ইয়ান বথাম, স্কানথোর্প ইউনাইটেডের হয়ে ফোর্থ ডিভিশন ফুটবল লিগ খেলেছেন। অ্যান্ড সুরজিৎ সেনগুপ্ত, বাঙালিদের মধ্যে।'

— 'সুরজিৎ?'

— 'হ্যাঁ। আপনারা জানেন কিনা জানি না, হি ওয়াজ এ মিডিয়াম পেসার ডিউরিং হিজ কলেজ ডেজ। ফুটবল যেমনই খেলুক, ক্রিকেটটা ভালই খেলত।'

— 'ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলার হিরোদের সম্পর্কে আপনার জানার আগ্রহ কীরকম? আমি তো ক্রিকেট ছাড়া অন্য খেলার বই পেলেই পড়ি।'

— 'সময় কম পাই। তবে রিসেন্টলি মাইকেল ফেরিরা সম্পর্কে যেখানে যা পাচ্ছি পড়ছি। শুধু ক্রিকেট নিয়ে পড়ে থাকলেই তো হবে না।'

— 'আপনি তাহলে বিলিয়ার্ডেরও ভক্ত?'

— 'একজ্যাক্টলি। রিসেন্টলি, 'সেলিব্রিটি' ম্যাগাজিনে একটা ইন্টারভিউতে মাইকেল ফেরিরা বলেছেন যে, তিনি 'পদ্মশ্রী' প্রত্যাখ্যান করেছেন, সানি গাভাসকারকে 'পদ্মভূষণ' দেওয়ায়। তিনি মনে করেন, খেলাধুলোয় তাঁর অবদান গাভাসকারের চেয়ে কম নয়। তাই লেখাপত্র ঘেঁটে বোঝার চেষ্টা করছি, একথা বলার মতো অডাসিটি ভদ্রলোকের এল কোত্থেকে?'

— 'ফেরিরা কিন্তু অ্যামেচার ওয়ার্ল্ড বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন।'

— 'সো হোয়াট? কটা লোক বিলিয়ার্ড খেলা দেখেছে? আমি মেলা কাগজপত্র ঘেঁটে এখনও বুঝছি না, ভদ্রলোক নিজেকে এত ইম্পর্ট্যান্ট ভাবছেন কেন। আমি বোঝার চেষ্টা করেই যাচ্ছি। আফটার অল, আমি মনে করি না যে শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলা নিয়ে পাগলামি করা উচিত।'

— 'কোনও হকি প্লেয়ারের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কখনও?'

— 'ওহ্ সিওর। আমার এক বন্ধু, যশপাল শর্মার এক বন্ধুর দাদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দিল্লিতে হোটেল হায়াৎ রিজেন্সিতে একবার যশপালের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সকাল সাড়ে দশটায়। আমি দশটা বত্রিশে পৌঁছে শুনি যশপাল মার্কেটিংয়ে গেছে। ওর কোন দোষ নেই। আমার জন্য পৌনে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর বেরিয়েছে। লাউঞ্জে বসলাম। রিসেপশন থেকে বলল, দেড়টার মধ্যে ফিরে যাবে। ঘণ্টা তিনেক সময় তো দেখতে দেখতে কেটে যায়। পাশেই একজনকে দেখে চেনা চেনা লাগল। চিনলাম, ভাস্করণ। মস্কো অলিম্পিকের গোল্ড উইনিং হকি টিমের ক্যাপ্টেন ভাস্করণ। তিনি শ্রীকান্তের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আলাপ হল। ভাস্করণ বলছিলেন, কোয়েম্বাটোরে একটা হকি ট্রেনিং স্কুল খুলতে চান। প্ল্যানটা হল....।' ভদ্রমহোদয়, বম্বে থেকে কলকাতায় আসার ফ্লাইটে আমার পাশে বসা হঠাৎ ভাল-লাগার ভদ্রমহোদয় থেকে গেলেন। আমি সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলাম, 'হ্যাঁ, প্ল্যানটা কীরকম?'

ভদ্রমহোদয় বিষণ্ণ হেসে বললেন, 'খুবই দুঃখের কথা, প্ল্যানটার কথা বলার সুযোগ ভাস্করণ পাননি। শুধু ক্রিকেট নিয়ে পাগলামি করাকে আমি ঘৃণা করি। তাই, ওই প্ল্যানটা না শুনতে পারার দুঃখ আমি ভুলতে পারছি না।'

— 'ভাস্করণ বলার সুযোগ পেলেন না কেন?'

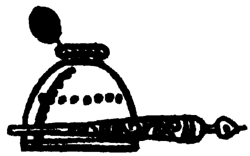
— 'হঠাৎ দেখলাম, বাইরে বেরচ্ছেন মহিন্দার অমরনাথ। অটোগ্রাফ নেওয়ার জন্য

দৌড়ে গিয়ে দেখি, গাড়িটা ছেড়ে দিয়েছে। ট্যাক্সি নিয়ে ফলো করে ভিটলভাই প্যাটেল হাউসের গেটে ধরলাম এবং অটোগ্রাফ নিলাম। তারপর হোটেল হায়াৎ রিজেন্সি-তে ফিরে আর ভাস্করণকে লাউঞ্জে দেখিনি।

— 'তিনজনের স্টিকার পেয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রকাশেরটা বেছে নিয়েছেন। আপনি নিশ্চয় ব্যাডমিন্টন ফ্যান?'

— 'নট একজাক্টলি। প্রকাশকে একটা কারণেই বেশি ভাল লাগে ও সানি গাভাসকারের ফ্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড। সানিও প্রকাশের ফ্যান অ্যান্ড ফ্রেন্ড। তবে ব্যাডমিন্টনও আমি ভালবাসি। শুধু ক্রিকেট নিয়ে পাগলামিকে আমি ঘেন্না করি।'

৫৪



ফেমাস হবার জন্য ভিটামিন 'এফ' ট্যাবলেট খেতে হবে কিনা, তা বাজারে পাওয়া যায় কিনা, এসব চিন্তায় যখন মগ্ন, তখনই হৈ হৈ করে এসে গেল কলকাতা টেস্ট : । এগারটি চিঠি সতেরটি টেলিফোন কল ছাড়াও, সাতজন সরাসরি আমার কাছে এসে টিকিট চেয়েছেন। টিকিটের জন্য অনুরোধের ভূমিকায় যা যা বলা হয়েছে, তার সাঁইত্রিশ ভাগের এক ভাগ সত্যি হলেও, আমি অলরেডি ফেমাস স্পোর্টস জার্নালিস্ট। কিন্তু মুশকিল হল, এত টিকিট কোথায় পাই?

আসানসোল থেকে মেজপিসিমা : 'স্নেহের বাবু, সাত বৎসর পর তোমাকে চিঠি লিখিতেছি। তখন তোমার নিউমোনিয়া হইয়াছিল, আশা করি এতদিনে সুস্থ হইয়া গেছ। টুকলুর (তোমার ছোটমাসির বিবাহের সময় দেখিয়াছ, আমার কোলে) মুখে শুনিলাম, তুমি নামকরা জার্নালিস্ট হইয়াছ। টুকলুর ইচ্ছা, কলিকাতায় এবার টেস্টম্যাচ দেখিবে। একটি টিকিটের ব্যবস্থা অতি অবশ্যই করিবে। টুকলুর বয়স কম, কলকাতায় মাঠঘাট চেনাও নাই ঠিকমত, সঙ্গে পাড়ার একটি বড় ছেলেকে পাঠাইবার ইচ্ছা আছে। সম্ভব হইলে (রাগ করিও না, এই কথাটা এমনিই লিখিলাম, তোমার পক্ষে সবই সম্ভব, এই বিশ্বাস আমার আছে) ওই ছেলেটির জন্যও একটি টিকিট রাখিও।

তোমাদের জন্য খুবই চিন্তা হয়। কতদিন দেখি না। একবার সময় পাইলে গরিব পিসিমার বাড়ি আসিও। আগে খবর দিলে স্টেশনে গাড়ি পাঠাইব। রাঙাবৌদি এবং রাঙাদাকে আমার প্রণাম জানাইও। তুমি আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও।

ইতি

আঃ মেজপিসিমা

পুনশ্চ : খেলা শুরুর আগের দিন সকালে টুকলুরা টিকিট নিতে যাইবে। ভাইয়ের টিকিটের দাম নিবার জন্য জোর করিব না, কিন্তু অন্য ছেলেটির টিকিটের দাম নিতে অন্যথা করিও না।'

মেদিনীপুর থেকে মাস্টার মশাই : 'বীজ আমিই পুঁতিয়াছিলাম, কিন্তু বুঝি নাই যে

তাহা একদিন মহীরুহে পরিণত হইবে। তোমার লেখা প্রতি সপ্তাহে ছাপা হয়, তুমি মহীরুহ ছাড়া কী? স্বীকার করিতে কুণ্ঠা নাই, আমি চারাগাছের আভাসও পাই নাই। কত বকিয়াছি, কত মারিয়াছি, আমার ভাঙা গলার আওয়াজ শুনিলেই, হাতের শক্ত তালু দেখিলেই তোমার কথা মনে পড়ে। ছোটবেলায় কাহাকেও দেখিয়া বুঝার উপায় নাই, ভবিষ্যতে কী হইবে। শুভকে মনে আছে? তুমি আর শুভ একই সঙ্গে পড়িতে। শুভ ছিল যেমন মেধাবী, তুমি তেমনই গবেট। আজ সে ওয়াগন ব্রেকার, তুমি লেখক।

এবার কাজের কথায় আসি। আমার সেজভাই ইছাপুর গান অ্যান্ড শেল ফ্যাক্টরিতে কাজ করে, আসন্ন টেস্টম্যাচ খেলা দেখিতে চায়। তুমি এখন নামকরা লোক, নিশ্চয় অনেককেই টিকিট দিতে হইবে। এই ভিড়ে গরিব মাস্টারমহাশয়ের কথা মনে পড়িবে কিনা জানি না। হয়ত পড়িবে। ছোটবেলাতেই দেখিয়াছি, পড়াশুনায় মন না থাকিলেও, তোমার মন বেশ পরিষ্কারই ছিল।

পত্রপাঠ উত্তর দিয়া নিশ্চিত করিবে। আশীর্বাদ জানিবে।

ইতি....।'

দুর্গাপুর থেকে প্রদীপ মজুমদার : 'বাবু, চিঠি পেয়ে খুব অবাক হয়ে যাচ্ছিস, তাই না? সত্যি কলেজ হস্টেলের সেই দিনগুলি ভাবলে হঠাৎ মাঝের কয়েকটা বছর সরে যায়, সব কথা মনে পড়ে। তোর লেখা প্রতি সপ্তাহে পড়ি আর অফিসের কলিগদের বলি, এই বাবু আমার কলেজ জীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনেকে বিশ্বাস করে না।

দশ ডিসেম্বর থেকে ইন্ডিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফিফথ টেস্টম্যাচ, কলকাতায়। তুই তো জানিস, আমি ক্রিকেট-পাগল সেই কবে থেকেই। আমার সৌভাগ্য, এর পর থেকে আর আমাকে টিকিটের জন্য এর কাছে ওর কাছে ভিক্ষে চাইতে হবে না। একটা ক্লাব হাউসের কার্ড পেলে ভাল হয়। নাহলে চোখে রোদ পড়ে না— এমন একটা জায়গার টিকিট।

এত ব্যস্ততার মধ্যে থেকে তোকে আর চিঠির জবাব দিতে হবে না। আমি আট তারিখে বিকেলে তোর অফিসে গিয়ে কার্ড বা টিকিট নেব।

শুভেচ্ছাসহ....'

এই রকম আরও আটটি মর্মস্পর্শী চিঠি। টেলিফোনে আমার স্বাস্থ্যের খবর নিয়েছেন তিনজন আত্মীয়, চারজন বন্ধু এবং দশজন— ঠিক কী তা জানি না। আমার শরীর ভাল আছে জানার পর, এই ধরনের আরও কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথার পর, প্রত্যেকেই একটি করে টিকিট চেয়েছেন। কারও মনেই তিলমাত্র সন্দেহ নেই যে, আমি টিকিট দিচ্ছিই।

যে সাতজন সশরীরে টিকিট চেয়ে গেছেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন বহুবার চেষ্টা করেও টেলিফোনের লাইন পাননি। বাকি দু'জনের ধারণা, দেখা না করলে এমন গুরুতর সাজে সিদ্ধিলাভ করা যায় না।

কিন্তু আমি কী করব? ইলেভেন প্লাস সেভেনটিন প্লাস সেভেন— মোট পঁয়ত্রিশটা টিকিট দরকার। সি এ বি অফিসে বা জগমোহন ডালমিয়ার বাড়িতে ডাকাতি না করলে, আমার পক্ষে এত টিকিট পাওয়া অসম্ভব। দুটো লিস্ট তৈরি করলাম। প্রথম লিস্ট: কাদের

টিকিট না দিলে চলবে না। পাঁচজন। বাকি ত্রিশ জনকে কীভাবে কাটাতে হবে, তা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। দ্বিতীয় লিস্ট : যাদের কাছ থেকে টিকিট পাওয়া যাবে। এই লিস্টেও পাঁচজনের নাম।

ছাব্বিশে নভেম্বর থেকে চেষ্টা শুরু করি। প্রথম টার্গেট— এডিটর, খেলা। আমাদের এডিটর সাহেবের অভদ্রলোক হিসাবে খ্যাতি আছে, তাই বেশি লোক তাঁর কাছে টিকিট চাইছে না। কিন্তু, খেলার এডিটর বলে কথা, চাইলে বিশ-তিরিশটা টিকিট তাঁর কাছে সিগারেট। তাঁর কাছে 'নস্যিই ' বলতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু শব্দটা মনে হয় অবসোলিট, গত দেড় বছরে আমি নস্যি দেখিনি, কারও কাছে না। এনিওয়ে, প্রথমে এডিটর সাহেবের কাছে গেলাম। বললাম, 'আসানসোল থেকে মেজপিসিমা একটা টেস্ট টিকিটের জন্য লিখেছেন পিসতুতো ভাইয়ের জন্য। একটা টিকিট দেবেন?' এডিটর সাহেব একটুও অভদ্রতা না করে বললেন, 'কালই আপনার মেজপিসিমাকে চিঠি লিখে দিন, টিকিট পাওয়া যাবে না। আপনার পিসিমার ছেলের জন্য টিকিট দেব কী, আমি নিজের গাড়ি ধোয়ার ছেলেটির পর্যন্ত পুরো পাঁচদিনের টিকিট দিতে পারছি না।'

যাদের টিকিট দিতে হবেই, এই লিস্টে নাম ছিল পাঁচজনের, পিসিমার ছেলে টুকলুর নামটা কেটে দিলাম। আহা, এরপর আমার মেজপিসিমা হয়ত আমার জন্য আর 'খুবই চিন্তা' করিবেন না!

সি এ বি সম্পাদক জগমোহন ডালমিয়ার দেখা পেলাম অফিসেই, ঘরে তখন আরও একচল্লিশ জন লোক। তাঁরা সবাই খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তবু এক ফাঁকে বলে ফেললাম, 'একটা টিকিট চাইছিলাম, আমার মাস্টারমশাইয়ের জন্য।'

— 'কেন, জার্নালিস্ট ক্লাব থেকে পাচ্ছেন না?'

— 'না। আমি তো ওই ক্লাবের মেম্বারই না। অ্যাপ্লাই করে রেখেছি অবশ্য। কুকিং গ্যাস, বাচ্চাদের ভাল স্কুলে অ্যাড়মিশন, লটারির প্রাইজ, চাকরি, স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের মেম্বারশিপ— এসব কি চাইলে পাওয়া যায় নাকি?'

— 'জার্নালিস্ট ক্লাব যাকে মেম্বার করেনি, আমি তাকে টিকিট দিলে, কেলেঙ্কারি হবে। স্পোর্টস জার্নালিস্টরা মানে স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের রেসপেক্টেড মেম্বাররা চটে যাবেন। একজনের উপকার করতে গিয়ে নিজের এবং নিজেদের অ্যাসোসিয়েশনের এত বড় ক্ষতি আমি করতে পারব না। ভবিষ্যতে আমি যখন সি এ বি-র সেক্রেটারি থাকব না, তখন আসবেন। একটা টিকিট নিশ্চয় দেব। সরি।'

পাঁচজনের লিস্ট থেকে মাস্টারমশাইয়ের নাম কেটে, বিশ্বনাথ দত্তর কাছে গেলাম: 'বিশুদা আপনিই একমাত্র লোক, যিনি বরাবর আমাকে টিকিট দেন। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর ছোট শ্যালককে টিকিট না দিলেই নয়। এবার যদি আপনি দুটি টিকিট—!'

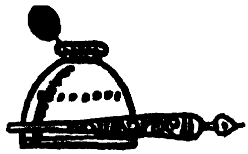
বিশুদা একটা সাইক্লোস্টাইল করা চিঠি হাতে দিলেন। সারমর্ম : 'এত দিন তোমাকে/আপনাকে টেস্টের টিকিট দিয়েছি। অনেকদিন মাঠে থাকায়, লিস্ট বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থা যে প্রায় সব টিকিটই আমাকে নিতে হবে। তাই ঠিক করেছি, আর

টিকিট নেব না, দেবও না। দুঃখিত।'

দুটি লিস্টেই আর একটি করে নাম থাকল। টিকিট দিতে হবে আমার মিসেসকে এবং টিকিটটা পেতে হবে এ আই এফ এফ সম্পাদক অশোক ঘোষের কাছ থেকে। সকালে অশোকদার বাড়ি হাজির হতেই দুর্ধর্ষ মৃদুহাসি উপহার দিলেন। অর্থাৎ কেন গেছি বুঝেছেন। তাই স্ট্রেট বলে ফেললাম, মিসেস সাপুড়ের জন্য একটা টিকিট দরকার, তিনি রোজ মাঠে যান না যান পাড়ার সবাইকে দেখাবেন। স্ট্যাটাস সিম্বল বলে কথা।'

অশোক ঘোষ ব্রিফকেস খুললেন। একটা খাম হাতে দিয়ে বললেন. 'এর মধ্যে ক্লাব হাউসের একটা কার্ড আছে, নিয়ে যান। আজ ফার্স্ট ডিসেম্বর। আশা করি এক সপ্তাহে পাড়ার সবাইকে এবং আত্মীয়স্বজনদের কার্ডটা মিসেস সাপুড়ে দেখিয়ে ফেলতে পারবেন। তারপর, আট তারিখ বিকেলে কার্ডটা আমাকে ফেরত দিয়ে যাবেন। ঠিক আছে?'

৫৫



আমার মাসতুতো ভাই স্কুলে পড়ায়। ক্লাস এইটের বাংলার কোয়েশ্চেন পেপারটা ও-ই সেট করেছিল। রচনার বিষয় ছিল— 'আমার জীবনের লক্ষ্য।' দুই সেকশন মিলিয়ে একাশিজন ছাত্রের মধ্যে চব্বিশজন টেস্ট ক্রিকেটার এবং সতেরজন কলকাতার বড় ক্লাব ফুটবলার হতে চেয়েছে। একজন প্রকাশ পাড়ুকোনের মতো এবং আর একজন মাইকেল ফেরিরার মতো হতে চেয়েছে। তিনজন শিক্ষক হতে চায়, কারণ শিক্ষকতার মতো মহান পেশা আর নেই। সাতজন ডাক্তার, পাঁচজন ইঞ্জিনিয়ার এবং চারজন সাহিত্যিকও আমরা পেতে চলেছি, জীবনের লক্ষ্যে যদি এই ছাত্ররা পৌঁছাতে পারে। বাকি উনিশজনের মধ্যে সতেরজন, কী আনন্দ এবং কী আশ্চর্য, বিজ্ঞানী হতে চায়। এদেশের উন্নতি আর কেউ রুখতে পারবে বলে মনে হয় না। একজন অমিতাভ বচ্চন, নিদেনপক্ষে মিঠুন চক্রবর্তীর মতো ফিল্মস্টার হতে চেয়েছে। মাসতুতো ভাই একটি উত্তরপত্র তুলে ধরে বলল, 'অ্যান্ড হিয়ার ইজ এ সারপ্রাইজ প্যাকেট ফর ইউ। এই ছেলেটা আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টার হতে চায়।'

কারণ হিসাবে ছেলেটি লিখেছে, তার আশা, আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টার হতে পারলে নানা জায়গায় যেতে পারবে, গাভাসকারের সঙ্গে আলাপ করতে পারবে এবং কর্মকর্তাদের মনের সুখে গালাগালি দিতে পারবে।

মাসতুতো ভাইকে বললাম, 'ছেলেটার ঠিকানা এনে দাও, দেখা করব। আমি এত চেষ্টা করেও আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টারের চাকরি পাচ্ছি না, সেই খেলার ডেস্কে ঘষেই মরছি। আজকালের রিপোর্টার হওয়ার জন্য এই অসাধারণ ছেলেটি কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা আমার জানা দরকার। আই ওয়ান্ট টু ফলো হিম। ধরা যাক, ছেলেটি নাইনটিন নাইনটিন থ্রি-তে ওর জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছবে। নেক্সট চান্স আমার।'

লেক টাউনে বাড়ি। নাম উৎসব লাহিড়ী। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। উচ্চতা চার ফুট পৌনে দশ ইঞ্চি। বয়স সোয়া তের। আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টার হবেই, এ ব্যাপারে উৎসবের মনে কোনরকম সংশয় নেই।

— 'ভাই উৎসব, তুমি এই লক্ষ্যে পৌঁছানর জন্য কবে থেকে প্রস্তুত হচ্ছ?'

— 'নাইনটিন এইট্রি ওয়ানের ডিসেম্বর থেকে, যখন বুঝলাম যে আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টার হলে সানি গাভাসকারের সঙ্গে ছবি ছাপা যাবে। নিশীথ ঘোষ আর অশোক মিত্রকে গালাগালি দেবার সুযোগের সম্ভাবনাও আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। বাবা পুলিস অফিসার, মোটেই ছুটি নেন না, অথচ আমার খুব দেশ বেড়ানর শখ। আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টাররা আসলে এক-একজন ট্যুরিস্ট।'

— 'কিন্তু, তুমি কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করছ?'

— 'লেখার উপযুক্ত হাত তৈরি করছি। রোজ সকালে ওয়েট ট্রেনিং করছি, হাত, পা আর পিঠের মাসল মজবুত করার জন্য। আমার বিশ্বাস আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টারদের রোজ অন্তত দু-হাজার ওয়ার্ড লিখতে হয়, একুশ মাইল হাঁটতে হয় এবং অন্তত ময়দানের তিন-চারজন শক্তিশালী জীবের হাতে মার খেতে হয়। এজন্য ফার্স্ট এইড সম্পর্কেও জেনেশুনে নিচ্ছি।'

— 'তুমি লেখার হাতের কথা বলছিলে?'

— 'হ্যাঁ, লেখার হাতটা প্রথমে মজবুত করে নেওয়া হল। পরপর লেখা। এর মধ্যেই লেখায় আজকাল টাইপ এনে ফেলেছি।'

— 'কীরকম?'

— 'কেউ ভাল খেললে লিখতে হবে, কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক দিন খেলার পৃষ্ঠায়, অন্তত তিনবার এই সেন্টেন্সটা থাকতে হবে। এককালের প্রখ্যাত খেলোয়াড় পঞ্চাশ বছর বয়সে একটা ভাল পাস বাড়ালে বা একটা ভাল শট নিলেই লিখতে হবে— 'তিনি কিছুই হারাননি'। একশটির মধ্যে অন্তত একটি ক্ষেত্রে গোল হতে পারে, এমন পাস নামকরা ফুটবলারের পা থেকে এলেই লিখব, তাতে 'গোলের গন্ধ' ছড়ানো ছিল। চার লাইন অন্তর ব্যবহার করতেই হবে— 'বিশ্বাস করুন', 'বলতেই হয়', 'মানতেই হয়' ইত্যাদি। লক্ষ্য করেছি, আজকালের খেলার পাতায় কেউ শুধু শতরান করে না, প্রায় সব শতরানই দুরন্ত, দর্শনীয় অথবা চমকপ্রদ, এবং তা বাউন্ডারি ও ওভার বাউন্ডারি দিয়ে 'সাজানো' হয়। এবং ওভার বাউন্ডারিগুলি 'বিরাট'। পাঠক-পাঠিকাদের ভুল বোঝার স্কোপ নেই যে কোন কোন ওভার বাউন্ডারি খুব ছোট্ট।'

— 'তোমার হবে ভাই।'

— 'হিন্দি ফিল্মের যেমন থিম সং, আজকালে এক্সপার্টদের ম্যাচ রিপোর্টেও তেমন থিম লাইন থাকে। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট সিরিজের ম্যাচ রিপোর্টে ভিভ রিচার্ডসের থিম লাইন— 'আমরা প্রতিশোধ' নিতে এসেছি। এই সেনটেন্সটা রোজ থাকবে। কপি তৈরি করার সময় এ কথা মনে রাখতেই হবে। কলকাতায় সন্তোষ ট্রফি চলার সময় কোচ শান্ত মিত্রর ম্যাচ রিপোর্টের থিম লাইন ছিল— 'বাংলাকে সমর্থন করুন।'

— 'আর?'

— 'ফুটবল সিজন এলে ক্রিকেটকে এবং ক্রিকেট সিজন এলে ফুটবলকে এবং সারা বছর অন্য সব খেলাকে ভুলে যেতে হবে। টেনিসের খবর অবশ্য ছেপে যেতে হবে, কত

হাজার ডলার পুরস্কারমূল্যের টুর্নামেন্ট তা জানিয়ে, পাতা ভরাবার জন্য। মাইকেল ফেরিরাকে আজকালের খেলার পাতায় ঢোকার জন্য অন্তত বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠে নিতে হবে। এবং কিছুতেই সাড়ে তিন সেন্টিমিটারের বেশি জায়গা দেওয়া চলবে না। আজকালের স্পোর্টস টিম খুব টিম স্পিরিটে বিশ্বাস করে। আমি তাই ওদের মতোই নিজের মনকে তৈরি করে নেওয়ার চেষ্টা করছি।'

— 'পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে আমার যা কাণ্ডজ্ঞান, সোয়া তের বছরেই তুমি...।'

— 'হেডিং নিয়েও ভাবছি। তৈরি হচ্ছি। 'লেন'-এর দিকে টানটা রাখতেই হবে। মজিদ মাতালেন, সুরজিৎ জেতালেন, গৌতম জাগালেন— এইসব আর কি।'

— 'বাইরের খেলার রিপোর্ট করার জন্য কীভাবে তৈরি হচ্ছ?'

— 'পৌঁছেই জানাব, কে কোন হোটেলে কত নম্বর ঘরে কার সঙ্গে আছে এবং সেই দিন সকালে বা বিকেলে সে কার সঙ্গে বসে তাস খেলছিল বা কার সঙ্গে সিনেমা দেখতে গিয়েছিল। যে টিমে আসছে না, তার বিক্ষোভ, যে ভাল খেলছে না তার প্রতিজ্ঞা— এসব থাকবে। ডুরান্ড বা রোভার্সের বড় ম্যাচের আগে দুই ক্যাপ্টেনই বলবে, 'আমরা জিতবই'— এই খবরটা পাঠাতে হবে। জেতার পর সিনিয়র ফুটবলাররা বলবে 'প্রমাণ করে দিয়েছি, ফুরিয়ে যাইনি'। হারার পর সিনিয়র ফুটবলাররা বলবে, 'প্রমাণ করে দেব, ফুরিয়ে যাইনি।' জেতা-টিমের কোচ আর ফুটবল সেক্রেটারি ফুটবলারদের জড়িয়ে ধরবেন। দ্বিতীয় সারির কর্মকর্তারা থাকবেন। হারা-টিমের কোচ আর ফুটবল সেক্রেটারি রেফারিকে এবং প্রয়োজনমত দু-একজন ফুটবলারকে দোষ দেবেন। হারা-টিমের কয়েকজন কান্নায় ভেঙে পড়বেন। এসব আগে থেকেই লিখে রাখা যায়। শুধু নামগুলো বসিয়ে নিলেই হয়। ফেরার সময় কে কবে কীভাবে ফিরছে, সেই খবরটা পাঠাতে হবে। পাঞ্জাবি টিম থাকলে লেখাটা জমান যাবে। ক্রিকেটের রিপোর্টিংও মূলত হোটেল রিপোর্টিং। প্রতি রবিবার সকালে এয়ারপোর্ট হোটেলে যাই, ফাইভ স্টার হোটেলের হালচাল বোঝার জন্য।'

এই সময় বাইশ বছর বয়সী এক যুবক উৎসবদের বাড়িতে ঢুকল। মুখে ত্যারছা হাসি মেখে সোফায় বসল। আনন্দবাজারের স্পোর্টস পেজ খুলে লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে লাগল। উৎসবের দিকে তাকালাম। বলল : 'আলাপ করিয়ে দিই, রকিদা, কৌরব মজুমদার। রকিদা রোজ সকালে আনন্দবাজার খুলে খেলার পাতায় লাল পেন্সিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে। সব ভুল ধরে। সারাদিন ধরে তার সমালোচনা করে। আর সারা সন্ধে সাধনা করে, কী করে কিছু না জেনেও সবজান্তা হওয়া যায়।'

— 'কেন?'

— 'রকিদার জীবনের লক্ষ্য— আজকালের স্পোর্টস এডিটর হওয়া।'

৫৬

সাড়ে তিন মাসে নটা টেস্ট, সাতটা অফিসিয়াল ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল আর দুটো আনঅফিসিয়াল ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচের পর ক্রিকেটার, বোর্ড অফিসিয়াল, সিলেক্টর, জার্নালিস্ট, স্ট্যাটিসটিসিয়ান, রেডিও আর টেলিভিশন কমেন্টেটর, এক্সপার্ট আর প্রোগ্রাম একজিকিউটিভ ভিমল, চার্মিনার, বোরোলিন, স্বরূপকিষাণ, ঘোটসকার— সকলেই ক্লান্ত। এই ক্লান্তি দূর করার জন্য মাদ্রাজ টেস্ট শুরু হওয়ার আগের দিন থামস-আপ-এর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ পার্টি থ্রো করা হয়। চুক্তিবদ্ধ থাকায়, সুসজ্জিত মঞ্চের দুইপাশে বসে প্রতি তিন মিনিটে একটি করে থামস-আপ-এর বোতল শেষ করে যেতে হয় সানি গাভাসকার আর কপিলদেবকে। চুক্তিপত্রে অবশ্য বলা ছিল, সানি দুশ একুশ বোতল আর কপিল একশ পঁচাত্তর বোতল শেষ করলেই চলবে। সেভেন্টি নাইনের ওভাল টেস্ট আর এইট্টি থ্রির প্রুডেনশিয়াল কাপের জিম্বাবোয়ে ম্যাচের কথা ভেবেই সংখ্যা দুটি নির্দিষ্ট কবা হয়, বলা বাহুল্য। অন্যতম চুক্তিবদ্ধ সন্দীপ পাটিল আসেননি। কারণটা ঠিক কী, নতুন ছবির শ্যুটিং, না বিশেষ স্টেট ফ্লাইট না পাওয়া— তা অবশ্য জানা যায়নি।

আমি যখন ঢুকি, সানির একশ এগার এবং কপিলের বিরানব্বই বোতল থামস-আপ খাওয়া হয়েছে। ওরা নাকি লাঞ্চ থেকেই থামস-আপ নিয়ে বসে গেছে, নো সলিড ফুড।

এক বোতল থামস-আপ আর একটা ফিশ ফ্রাই নিয়ে কাছের একটা টেবিলের দিকে গিয়ে দেখি, আমার বন্ধু, বড় কাগজের ফেমাস রিপোর্টার। টেবিলে তিন বোতল থামস-আপ, দু-হাতে ছটা ফিশ ফ্রাই, মুখে দুটো ফিশ ওরলি, ইশারায় বসতে বলল। আমি কনগ্র্যাচুলেট করলাম। বললাম, 'ঢের ঢের বুক রিভিউ পড়েছি, কিন্তু তোমারটা লা-জবাব। বাচ্চাদের মধ্যে বিষ ছড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেছ, তবু পারনি, তাতেই বোঝা যায় তুমি কত হার্মলেস ক্রিচার। কনগ্র্যাচুলেশনস।'

ফিশ ওরলি শেষ করে ফিশ ফ্রাই মুখে দেবার আগে, সামান্য ফাঁক পেয়ে বন্ধু জিজ্ঞেস করল, 'লেখাটা পড়েছ?'

— 'তুমি তো জান ভাই, ব্লু-জার্নালিজমের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে আমি তোমাকে এবং

তোমার লিডারকে কত মানি। তোমার লেখা পড়ব না, এটা হতে পারে?'

— 'ব্লু জার্নালিজম?'

— 'ইয়েলো জার্নালিজম ব্যাপারটা অবসোলিট হয়ে গেছে। আশির দশক হল ব্লু জার্নালিজমের দশক। ব্লু ফিল্ম, ব্লু জার্নালিজম— হেঁ হেঁ, জানই তো সব।'

— 'এইরকম বুক রিভিউ আগে পড়েছ?'

— 'না। তোমাদের কাগজের ছোটদের পাতায় প্রকাশিত লেখাটা অন্তত দেড়শ লোক পড়েছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মধ্যে এগারজন আমার পরিচিত। খুব হাই স্ট্যান্ডার্ডের লেখা তো, তিনজন অল্প একটু পড়েই লেখাটা ছেড়ে দিয়েছে, আর ভেবেছে যে সত্যিই বুঝি অস্ট্রেলিয়া থেকে গাভাসকারের তৃতীয় বই 'আইডল ডেজ' প্রকাশিত হয়েছে। বাকি আটজনের মধ্যে ছয়জনের ধারণা, তুমি গাভাসকারের বিরুদ্ধে লেখার অর্ডার পেয়ে যা পেরেছ লিখেছ, তোমার কোন দোষ নেই। এদের বুঝিয়েছি, এরকম মনে করার কোন কারণ নেই। গাভাসকার আই মিন গাওসকর, কারেকশন— গাওস্কর দেশদ্রোহীর মতো ব্যাট করে কুড়ি রানে আউট হয়েছে ১২ ডিসেম্বর, লেখাটা সেই দিনের কাগজেই বেরিয়েছে। তার মানে, আগে লেখা। গাভাসকার যে কত খারাপ, সেটা বোঝার জন্য ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তোমাকে ওয়েট করতে হয়নি, এটা সবাইকে বুঝিয়ে বলেছি। দুজন তোমার লেখার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল। যে বই লেখা হয়নি, কখনও লেখা হবে না, তার রিভিউ এই প্রথম পাওয়া গেল। কনগ্র্যাচুলেশনস। তোমার কল্পনাশক্তি ও উর্বর মস্তিষ্ক ব্লু জার্নালিজমের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করল।'

থামস-আপের তৃতীয় বোতল আর একই সঙ্গে পঞ্চম ও ষষ্ঠ ফিশ ফ্রাই মুখে তোলার আগে বন্ধু বলল, 'কাউকে বোলো না, তোমার কাছে একটা টপ সিক্রেট ফাঁস করছি। ক্রিকেটের ওপর কোন একটা বইয়ের রিভিউ করার শখ আমার বহুদিনের। ক্রিকেট বুঝি না, কিন্তু তাতে কী, অনেক কিছুই তো না বুঝে লিখি। প্রবলেম হল ইংরেজি নিয়ে। ক্রিকেটের প্রায় সব ভাল বই ইংরেজিতে লেখা। আমার আবার ইংরেজিটা ঠিক আসে না। ক্রিকেটের কোন ভাল বইয়ের রিভিউ করা তাই সম্ভব হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত কাল্পনিক বুক রিভিউ করলাম। দারুণ আইডিয়া, পাবলিক ভাবছে। কিন্তু এভাবে ছাড়া বুক রিভিউ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।'

প্রধান মঞ্চের কাছে একবার গেলাম, কিছু থামস-আপ আর ফ্রায়েড প্রন আনতে। গাভাসকার অর গাওসকর অর গাওস্করের তখন একশ ছত্রিশ, কপিলের একশ বাইশ। মাঝরাত পর্যন্ত ওদের লড়ে যেতে হবে।

ফারুখ ইঞ্জিনিয়ার একটি বাচ্চা মেয়েকে অটোগ্রাফ দিচ্ছিলেন। অটোগ্রাফ বুক ফেরত নিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা যেন কী?' ইঞ্জিনিয়ার হাসলেন, নার্ভাস হয়ে একবারের বদলে দুবার চোখ টিপলেন। নিজের নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে ফের হাসলেন, এবং ফের চোখ টিপলেন। আমি 'হ্যালো' বললাম। বললাম, 'গুলাম পার্কারের খেলা দেখে আপনি মুগ্ধ। গুলাম এইট্টি টু-র ইংল্যান্ড ট্যুরে ইন্ডিয়া টিমে থাকায়

গাভাসকারকে খুব গালাগালি হজম করতে হয়েছিল। আপনি টেলিভিশনে বলেছেন, পার্কার এত ভাল ফিল্ডার যে মাঠে থাকা মানে অন্তত পঞ্চাশ রান বেঁচে যাওয়া। অপোনেন্ট টিম যত রান করত, ও থাকলে তার চেয়ে পঞ্চাশ কম করবে, তাই তো?'

— 'রাইট।'

— 'শ্রীকান্ত সম্পর্কেও আপনি এইরকম কথা বলেছিলেন।'

— 'রাইট। ইন ফ্যাক্ট, বিনি, যশপাল আর মদনলাল সম্পর্কেও নানা সময়ে আমি এই কথা বলেছি।'

— 'কিরিও দুর্দান্ত উইকেট-কিপিং করে পঞ্চাশ রান সবসময় বাঁচাচ্ছে। কপিলকে আউটফিল্ডে সকলেই আউটস্ট্যান্ডিং মনে করেন। গুরশরণ আর অরুণলাল দেশের সেরা ক্লোজ ইন ফিল্ডার। এদের মধ্যে একজনও যদি টিমে আসে, পঞ্চাশ রান বাঁচতে পারে।'

— 'রাইট।'

— 'তাহলে, আমাদের টিমে এমন আটজন (পার্কার, শ্রীকান্ত, বিনি, যশপাল, মদনলাল, কিরমানি, কপিলদেব আর অরুণলাল বা গুরশরণ) প্লেয়ার রাখা যায়, যারা পার-হেড পঞ্চাশ রান বাঁচাবে। আটজনে মিলে মোট চারশ রান বাঁচাবে।'

— 'রাইট।'

— 'তাই বলছিলাম, আপনার স্কিমটা এক্ষুনি বোর্ডের কাছে পাঠিয়ে দিন। আপনার অঙ্ক মিললে, ইন্ডিয়া টিম সব ম্যাচ জিতবেই। কানপুরেই শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ চারশ চুয়ান্ন করেছিল। ঐ চুয়ান্ন আমাদের ব্যাটসম্যানদের তুলতে হত। অন্য সব টেস্টে এই আটজন ঠিকঠাক ফিল্ডিং করলে, ম্যাচ জেতার জন্য আমাদের বলতে গেলে রানই করতে হত না।'

এক কোণে পাঁচজন লোককে একই টেবিলে মাথা রেখে বসে থাকতে দেখে অবাক হলাম। পাঁচজনই হতাশায় টেবিলশায়ী। আমার ডাকে চারজন একসঙ্গে মাথা তুললেন।

— 'কী ব্যাপার?'

— 'আমরা হতাশ। আমরা সিলেক্টর।'

আবছা আলোয় এবার ভাল করে দেখলাম। বিষাণ বেদি, পঙ্কজ রায়, হনুমন্ত সিং, আর চাঁদু বোরদে।

— 'যা হয়ে গেছে, ভুলে যান। ক্রিকেটে হারজিত আছেই। আমরা তো খারাপ টিমের কাছে হারিনি।'

— 'ধুস্। আমরা মোটেই এজন্য হতাশ নই। আমরা মাঝে মাঝেই হারা প্র্যাকটিস করি। আসলে, একটুর জন্য একটা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আমরা ভাঙতে পারলাম না।'

— 'কোন্ রেকর্ড?'

— 'একই সিজনে চারজনের বেশি ন্যাটা স্পিনারকে কোন দেশেই কখনও ট্রাই করা হয়নি। চারটের রেকর্ড অবশ্য আছে। আমরা দোশি, ভাট, শাস্ত্রী আর মণিন্দারকে খেলিয়ে রেকর্ড টাচ করেছি, কিন্তু ভাঙতে পারলাম না।'

— 'ইস্!'

— 'অনেক খুঁজেও রাজিন্দর সিং হন্‌সকে পাওয়া গেল না। পেলে, এখানে খেলিয়ে দিতাম।'

চারজনই আবার হতাশায় টেবিলে এলিয়ে পড়ছেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'গুলাম আমেদ কি এতই হতাশ যে মাথা তুলতেই পারছেন না?'

বিষাণ বেদি বললেন, 'ওর একসঙ্গে দুটো স্ট্রোক হয়েছে। এই রেকর্ড ভাঙতে না পারার দুঃখ তো ছিলই। তার উপর, একটু আগে খবর এসেছে, বাঙ্গালোরে গুলাম আমেদ বেনিফিট ম্যাচের অনেক টিকিট এখনও বিক্রি হয়নি। সিলেক্টররা পাষাণ নয়, আমাদেরও হৃদয় আছে, বুঝলেন?

৫৭

উনত্রিশে ডিসেম্বর বিকেলে অফিসে ঢুকে মনে হল খেলার সম্পাদক ভিনু মানকড়ের রেকর্ড ভেঙেছেন। আমার ধারণা ছিল রেকর্ড ভেঙেছেন 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার'-এর সম্পাদক। 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার'-এর সম্পাদকের ঘর ফাঁকা। কিন্তু খেলার সম্পাদকের ঘরে ঢুকতে গিয়ে প্রচুর ধাক্কা খেতে হল। এডিটর সাহেব রিভলভিং চেয়ারে বসে ঘুরে ঘুরে মৃদু মৃদু হাসছেন, যেন এইমাত্র (কমলদার কথায় 'এই মাত্তর) দুশ ছত্রিশ করে এলেন। ঘরে অন্তত চল্লিশজন গাভাসকারের পাখা, সকলেই এডিটর সাহেবকে কনগ্র্যাচুলেট করছেন। শেষ পর্যন্ত তিনি মুখ খুললেন, 'কিন্তু, সানিকে কনগ্র্যাচুলেট করেও তো একটা টেলিগ্রাম পাঠানো দরকার। কে টেলিগ্রাফ অফিস যাবে?' চল্লিশজন কোরাসে বললেন, 'আজ আমরা কোথাও যাব না, শুধু আপনাকে কনগ্র্যাচুলেট করব।' মাপা কোয়ান্টিটি আর কোয়ালিটির হাসি ফের পাওয়া গেল।

ঘণ্টা দেড়েক পর ঘর একটু ফাঁকা হতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কি কিছু করার আছে?' অদ্ভুত দক্ষতায় মৃদু হাসি মুখে ধরে রেখে এডিটর সাহেব বললেন, 'অফিসের সবাই এখন মাসখানেক ধরে সেলিব্রেট করবে। তাছাড়া, গোটা সিরিজ কভার, ক্রিকেটারদের ইন্টারভিউ, ট্রেন আর প্লেন জার্নি— এসব করে আমাদের রিপোর্টাররা সবাই টায়ার্ড। আপনি উপযুক্ত হলে আপনিও টায়ার্ড থাকতেন। ভাগ্যিস উপযুক্ত নন, তাই এখন কাজ করার জন্য অন্তত একটা লোক আমার হাতে আছে। আপনার মতো অপদার্থকে কেন নিয়েছি, এ নিয়ে অনেকেই অবাক হয়ে নানা প্রশ্ন করেছেন। এখন সবাই বুঝছেন, সব অর্গানাইজেশনেই একটা করে ওয়ার্থলেস লোক রাখতে হয়। এনিওয়ে, আপনি পরশু সকালের ফ্লাইটেই বম্বে যান। গাভাসকারের একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ চাই। গোটা সিজন ধরে পাঠক-পাঠিকারা টপ ক্লাস ইন্টারভিউ পেয়েছেন, পড়েছেন। একটা ইন্টারভিউ থার্ড ক্লাস হলে ক্ষতি নেই, বরং স্বাদ বদল হবে। গো এহেড। আপনার কাছে তো সানির একটা অটোগ্রাফ আছে, এয়ারপোর্টে ওটা দেখালেই আপনাকে ভি আই পি কোটা থেকে টিকিট দিয়ে দেবে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের জেনারেল ম্যানেজার একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন, আজ থেকে ওরা 'অনুশোচনা সপ্তাহ' পালন করছেন। এই

উইকে ওরা গাভাসকারের অটোগ্রাফ দেখালেই ভি আই পি কোটা থেকে টিকিটের ব্যবস্থা করে দেবেন।'

একত্রিশ তারিখে সকালের ফ্লাইটে বম্বে গেলাম। বিশ্বাস করুন, পরদিন, ফার্স্ট জানুয়ারি দুপুরেই গাভাসকারকে পেয়ে গেলাম। টেলিফোনে সময় দিলেন, 'একটা সাড়ে সতের থেকে একটা ঊনত্রিশ, একজাক্টলি সাড়ে এগার মিনিট। একটা সোয়া সতেরয় গাভাসকারের ড্রইং রুমের পর্দা সরিয়ে দেখি, 'আইডলস'-এ সই করছেন। আমাকে দেখেই সই বন্ধ করে বললেন, 'একশ বাহাত্তর।' রূপার মিঃ মেহরা সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে তিনশ চুয়াল্লিশ টাকা দিয়ে বললেন, 'হিয়ার ইজ ইওর রয়্যালটি। এগুলো দুপুরের মধ্যে বিক্রি করে বিকেলে আবার আসব।'

ইন্টারভিউ শুরু হল :

বাঃ সাঃ : কনগ্র্যাচুলেশনস মিঃ গাভাসকার।

গাভাসকার : থ্যাঙ্ক্যু। বাট, সে গাওস্কর।

বাঃ সাঃ : কেন বলব? যারা লিখছে, তারাও তো গাভাসকার বলে।

গাভাসকার : সে তো সবাই বলে। বাবা বলে, মা বলে, পামি বলে, দিলীপ দোশি বলে— আই মিন, আমার কাছের লোকেরা সবাই বলে। কিন্তু আনন্দবাজার বলে না। আনন্দবাজারকে আমি ভয় পাই। আনন্দবাজারের ভয়েই আমি ম্যাড্রাসে এত কষ্ট করে ডাবল সেঞ্চুরিটা করেছি। কতবার ইচ্ছা করে আউট হয়ে যাবার লোভ হয়েছে, কতবার ইচ্ছা করে স্লিক করার বল পেয়েছি, শুধু আনন্দবাজারের ভয়ে ঠিকঠাক খেলে গেছি। বয়স হচ্ছে তো, এত ভয় আর পোষায় না, প্লিজ, গাওস্কর বলুন, অ্যাট লিস্ট কলকাতার কাগজে গাওস্কর লেখা হোক, পামি আর রোহনের স্পেশাল রিকোয়েস্ট। আনন্দবাজারের ভয়ে আমার আয়ু কমে যাক, এটা নিশ্চয় আপনারা চান না?

বাঃ সাঃ বালাই ষাট! (এটা আসলে বলিনি, মনে মনে ট্রানস্লেশন করতে পারিনি)। ওয়েল, মিঃ গাওস্কর, কনগ্র্যাচুলেশনস্।

গাভাসকার : থ্যাঙ্ক্যু।

বাঃ সাঃ : মাদ্রাজের এই ডাবল সেঞ্চুরিটা আপনি বলছেন, ভয়ে করেছেন। হতে পারে। আর কোনও কারণ?

গাভাসকার : আছে। কলকাতা টেস্টের রেস্ট ডে-তে আমি 'আইডলস'-এ সই করেছিলাম। তার আগেই আমার দুটো ইনিংস শেষ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ম্যাড্রাসে খেলা শুরুর আগেই আমি 'আইডলস'-এর তিনশ একাত্তরটা কপিতে সই করে হাতেনাতে রূপার কাছে থেকে সাতশ বিয়াল্লিশ টাকা পেয়ে গিয়েছিলাম। সেজন্য মনে খুব ফুর্তি ছিল। তাই ডাবল সেঞ্চুরি। জানেনই তো, আমি টাকা বড় ভালবাসি, যা আপনারা, আই মিন জার্নালিস্টরা একদম ভালবাসেন না।

বাঃ সাঃ : দুজনকে ব্যাটটা দিয়ে দিলেন কেন?

গাভাসকার : এই অ্যানসারটা ছাপবেন না, প্লিজ। (ছেপে দিচ্ছি, গাভাসকারের,

কারেকশন গাওস্করের মুখোশটা খুলে দেওয়া দরকার) আসলে দিইনি, ব্যাটটা দুজন কিনেছে। দুজন আগেই আমাকে বলেছিল, থার্টিয়েথ সেঞ্চুরি করলে, ঐ ব্যাটটা অনেক দামে বিক্রি হবে। ওর কাছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের একজন বিজনেস ম্যাগনেট প্রপোজাল দিয়ে রেখেছেন, ব্যাটটা পাঁচ লাখ টাকায় কিনবেন। দুজনের কমিশন একলাখ। আমি পাচ্ছি চার লাখ। আমি বললাম, প্রপোজাল অ্যাকসেপটেড। কিন্তু এটা প্রকাশ করা চলবে না। জানাজানি হলে, আনন্দবাজার আমার আয়ু আশি বছর কমিয়ে দেবে। সেঞ্চুরি করতে পারলে, আমি তোমাকে ব্যাটটা দেব, সঙ্গে একটা লাগসই গপ্পোও বলে দেব। ফলে, আমি চার লাখ টাকা পাব, ইমেজ বাড়বে, খেলার এডিটর মাঠ-ময়দানের ডায়েরির একটা সাবজেক্ট পাবে, অ্যাট মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট— আনন্দবাজার আমার আয়ু কমাতে পারবে না।

বাঃ সাঃ : অ! আচ্ছা, ব্যাটটা আপনি দুজনকে কোথায় দিয়েছেন— প্যাভিলিয়নে ঢোকার আগে মাঠেই, না প্যাভিলিয়নে?

গাভাসকার : মাঠেই। একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন? আপনাদের 'আজকাল'-এই ছবিটা ছাপা হয়েছে।

বাঃ সাঃ : কিন্তু আনন্দবাজার লিখেছে, ব্যাটটা প্যাভিলিয়নে দুজনকে দিয়েছেন।

গাভাসকার : লিখেছে নাকি? তাহলে প্যাভিলিয়নেই দিয়েছি। আনন্দবাজার যখন বলেছে। ছবিটা বানানো। আনন্দবাজার যা বলবে, তাই সত্যি। প্লিজ, গাওস্কর লিখবেন।

বাঃ সাঃ : আপনি কি জানেন, আনন্দবাজার শেষ পর্যন্ত ফার্স্ট পেজে আপনাকে 'রূপকথার নায়ক' বলে স্বীকার করেছে?

গাভাসকার : জানি না আবার। আমি একজন বেঙ্গলি টু মারাঠি ট্রানস্লেটর রেখেছি মাইনে দিয়ে, রোজ সকালে আনন্দবাজারের স্পোর্টস পেজের গাভাসকার পোরশন ট্রানস্লেট করার জন্য। ডাবল সেঞ্চুরি করার পর আমি 'রূপকথার নায়ক' হলাম। ভাগ্যিস থার্টিয়েথ সেঞ্চুরিটা করেই উইকেট থ্রো করিনি। লাস্ট ডে শুরুতেই ইচ্ছা করে স্লিক করার একটা বল মার্শালের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। অবশ্য, দুজনের কাছে গেলে আউট হতাম না। এটা ছাপবেন না, প্লিজ। দুজনের সঙ্গে কনট্রাক্টেই ছিল : ও এই ইনিংসে আমার ক্যাচ ধরবে না। ওয়ান এইটি টু থেকে ওয়ান নাইনটি টু তে কীভাবে গেছি, মনে আছে?

৫৮

এই জন্যই এদেশের কিছু হবে না। ভাস্কর গাঙ্গুলি ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ যাওয়ায় কোথায় আনন্দ করব, তা নয়, এই পোড়া কাগজের লোকেরা উল্টে সমালোচনা-টমালোচনা শুরু করেছে। কী আর করবে, টেস্ট ক্রিকেট শেষ, নেহরু গোল্ড কাপ শুরু সেই এগার জানুয়ারি, মাসের দশটা দিন পাতা ভরাতে হবে তো। ইন্ডিয়া টিমের সম্ভাব্য ফুটবলারদের তালিকায় তিনজন গোলকিপারের নাম ছিল। এই তিনজনের মধ্যে ভাস্করের নাম নেই। আমি ভাস্করকে পছন্দ করি, কারণ ফুটবলারদের মধ্যে ওই আমাকে একটু-আধটু পাত্তা দেয়। আমার সামনে সিগারেট খায় না। (মানে, এমনিতেই ও সিগারেট খায় না। তবে খেলেও, আমার সামনে খেত না, এটা নিশ্চিত বলা যায়।) তবু ভাস্কর বাদ যাওয়ায় আমি খুশি হয়েছিলাম। কী আনন্দের কথা, ভাস্করের মতো ভাল গোলকিপারের চেয়ে আরও ভাল তিনজন গোলকিপার ইন্ডিয়ায় পাওয়া গেছে।

কিন্তু আমাদের মহামান্য এডিটর সাহেবের মতে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের মতো, বাংলার ফুটবলের বিরুদ্ধে জিয়াউদ্দিন সাহেবের 'চক্রান্ত' চলছেই। সুতরাং, তদন্ত করতে হবে। চক্রান্তের স্টোরি তুলে আনতে হবে। ভিলেনদের খুঁজে বার করতে হবে। স্পোর্টস জার্নালিজমে কিছু না হলে, ভাবছি, কোন প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিতে চাকরি নেব। গোয়েন্দা গল্পে দেখেছি, প্রধান গোয়েন্দার সহকারীটি সাধারণত গবেট হয়। এই চাকরিটা আমি পাবই।

হিন্দুস্থান পার্কে এ আই এফ এফ সম্পাদক অশোক ঘোষের বাড়িতে গিয়ে বসার ঘরে মাত্র চোদ্দ মিনিট অপেক্ষা করতে হল। দেওয়ালে টাঙানো অসংখ্য ছবি আর এদিক-সেদিক রাখা ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলের হরেক সুভেনিয়ার আর মেমেন্টো দেখতে দেখতে ভুলে গেলাম, কেন গেছি। অশোকবাবু ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার?' কী আশ্চর্য সেক্রেটারির গলা শুনেই মনে পড়ে গেল, কেন গেছি। বললাম, 'বেশি সময় নষ্ট করব না। আপনি ব্যস্ত লোক, আমিও ব্যস্ত সাজতে চাই। একটা প্রশ্নের জবাব দিন, চলে যাব।' ডানহিল সিগারেটের প্যাকেট মেলে ধরে অশোকবাবু বললেন, 'প্রশ্ন করুন।' সিগারেট ধরাতে ধরাতেই প্রশ্ন করলাম : 'ভাস্করকে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া হল

কেন?' অশোকবাবু আমাকে খাবার দিতে বললেন। আলুর দমে ডালপুরি চুবিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাস্করকে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া হল কেন?'

অশোক মিত্রর জরুরি টেলিফোন এল। আই এফ এ সম্পাদক পরামর্শ নিলেন, আই এফ এ অফিসের নতুন পর্দার রঙ কী হবে— গোলাপি না সবুজ। গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শেষ হতেই, শেষ রসগোল্লা চামচেয় তুলতে তুলতে প্রশ্ন করলাম, 'ভাস্করকে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া হল কেন?'

অশোক ঘোষ বললেন, 'চা খান।' চায়ের কাপে শেষ চুমুক দেওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাস্করকে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া হল কেন?'

আমার খাওয়া হয়ে গেছিল। তখন আর টেলিফোনও আসেনি। ঘরে আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ নেই। অশোক ঘোষ জবাব শুরু করলেন : 'মেজর ইস্যুতে এখন আমি আর স্টেটমেন্ট দিচ্ছি না। যা বলার প্রেসিডেন্ট বলবেন। ফাইনাল টিম করবেন মিলোভান। আপাতত প্লেয়ারদের বেছে নিয়েছে দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ— শুধু এটুকু বলতে পারি। বরং অন্য একটা স্কুপ নিন। নেহরু কাপের ফার্স্ট ম্যাচ যে বলে খেলা হবে, তা পড়বে হেলিকপ্টার থেকে। ঐ হেলিকপ্টার ছাড়াও—'

আমি বললাম, 'ধন্যবাদ, এসব ইম্পর্ট্যান্ট খবর গেলার এবং পাবলিককে গেলাবার জন্য আমাদের বড় রিপোর্টাররা আসবেন। ধন্যবাদ, ডালপুরি, আলুরদম, মিষ্টি আর চায়ের জন্য।'

অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ শান্ত মিত্রর অফিসে গেলাম। 'থামস আপ' আনানোর পর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার জন্য আমি কী করতে পারি?'

—'একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পারেন, ভাস্করকে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দিলেন কেন?'

—'আমি দিলাম?'

—'এ আই এফ এফ সেক্রেটারি বলেছেন, আমজাদ খান আর আপনিই ফুটবলারদের বেছে নিয়েছেন।'

—'বলেছেন নাকি? তাহলে, আমরাই বেছেছি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি ভাস্করকে বাদ দিইনি।'

—'কে বাদ দিল?'

—'এ আই এফ এফ-এর সঙ্গে আমাদেব, আই মিন কোচেদের চুক্তি রয়েছে, কখনও কোনও অফিসিয়ালের বিরুদ্ধে কিছু লিখতে বা বলতে পারব না। চুক্তি ভাঙ্গলে অরুণ সিন্‌হার মতো আমাদের 'গুডবাই' করে দেবে।'

—'তার মানে, কোন কর্মকর্তার চাপেই ভাস্করকে বাদ দিতে হয়েছে?'

—'অ্যাঁ? আমি একথা বললাম নাকি? না, আর কিছু বলব না। এই একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, কিছু বললেই সেটা অফিসিয়ালদের এগেইনস্টে চলে যায়। আমি ক্লাব লেভেলে কোচের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি, ন্যাশনাল লেভেলে নয়। মিঃ সাপুড়ে, আপনি কি এক কাপ কফি খাবেন?'

আমজাদ খানের জন্য দুদিন অপেক্ষা করতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভাস্করকে ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া হল কেন?'

—'বাদ দিয়েছে নাকি? আসলে, গত পনের দিন কলকাতায় আসার জন্য প্রিপারেশনে এত ব্যস্ত ছিলাম যে খবরের কাগজ পড়ার সময় পাইনি।'

—'প্লেয়ারদের তো আপনারাই বেছেছেন। আপনি আর শান্ত মিত্র।'

—'ভ্যাট!'

—'এ আই এফ এফ সেক্রেটারি বলেছেন।'

—'বলেছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আমরাই বেছেছি। কিন্তু সত্যি বলছি, ভাস্করকে আমি বাদ দিইনি।'

—'কে বাদ দিল?'

আমজাদ কোন জবাব না দিয়ে পরম ভক্তিভরে চোখ বুজলেন। আমার মনে হল, উনি খলিফা জিয়াউদ্দিনের নাম ও মুখ স্মরণ করলেন।

ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং বলে কথা, পরদিন দুপুরের গীতাঞ্জলিতেই বম্বে চলে গেলাম। বাবুরাম সাপুড়ের রিজার্ভেশন দরকার হয় না। একসঙ্গে তিনজনকে পেয়ে গেলাম মোরারজি মিলসের গেস্ট হাউসে। ভারতীয় ফুটবলের মহান নেতা ও এশীয় ফুটবলের মুক্তিসূর্য খলিফা জিয়াউদ্দিন, ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্যৎ ও আশার আলো জিয়াউদ্দিন-তনয় পরভেজ এবং এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল 'টিম ড্যামেজার', মুখ্য নির্বাচক তথা চিফ ট্যালেন্ট স্টপার মগন সিং। সেন্টার টেবিলের ওপর রাখা দুর্ধর্ষ অ্যাশপটটার দিকে তাকিয়ে তিনজনকেই টার্গেট করে কোয়েশ্চেন থ্রো করলাম: 'ইন্ডিয়া টিম থেকে ভাস্কর বাদ পড়ল কেন?'

জিয়াউদ্দিন: 'কে ভাস্কর? ও, ভাস্কর। আমি জানি না কেন বাদ পড়েছে।'

মগন সিং: 'ঠিক হয়েছে বাদ পড়েছে। এশিয়াডের সময় থেকেই চেষ্টা করছি। কিন্তু, কেন বাদ পড়েছে, আমি জানি না।'

পরভেজ: 'এসব বিরোধীদের অপপ্রচার। বাবাকে হেনস্থা করার চক্রান্ত। ভাস্কর বাদ যাওয়ায়, আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু, কেন বাদ গেছে, আমি জানি না।'

আমি বললাম, 'মিঃ সিং ফিফটি সিক্স মেলবোর্ন-অলিম্পিকের ট্রায়ালের প্রথমেই আপনি ছাঁটাই হয়েছিলেন। ফলে ভারতীয় ফুটবলের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল। ইন্ডিয়া সেবার অলিম্পিক সেমিফাইনালে উঠেছিল। আপনি থাকলে গোল্ড পেত। আবার এতবড় একটা অবিচার হচ্ছে আপনার কি রোখা উচিত নয়।'

মগন সিং: 'দু বছরের চেষ্টায় যা করতে পারলাম, আপনি তাকে রুখতে বলছেন? জানেন, এশিয়াডের সময় কী ঘটেছিল। আমি এশিয়াড ভিলেজে পরে গিয়ে যখন ঘরে ঢুকছি, ওর পিছন দিয়েই গেলাম। ও কার সঙ্গে যেন কথা বলছিল। আমাকে দেখতে পেল না। অথচ ব্রহ্মানন্দ কত ভাল দেখুন। আমি যখন ওর সামনে দিয়ে ঢুকছি ও একা দাঁড়িয়েছিল, আমাকে দেখে উইশ করল।'

—'তাহলে ব্রহ্মা বাদ গেল কেন?'

—'ও পরভেজকে উইশ করেনি, দাড়ি কাটতে কাটতে শুধু হেসে নড করেছিল।'

পরভেজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'একথা কি সত্যি মিঃ পরভেজ যে আপনি একটু অ্যাবনর্মাল? একবার টিম মিটিং চলার সময় আপনি কি সত্যিই বাথরুমে ঢুকে পড়েছিলেন। এবং তিন ঘণ্টার মধ্যে আপনার কোন সাড়াশব্দ ছিল না? একথা কি সত্যি যে এজন্য ভাস্কর, ঐ ঘরে ভাস্কর ছিল, একটু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল? সেই থেকেই নাকি আপনি বলে আসছেন যে ভাস্করকে বাদ দেবেনই?'

পরভেজ চশমা খুললেন। চশমা পরলেন। এবং জবাব না দিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলেন। আমি বেরিয়ে এলাম। কারণ তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করার মতো সময় আমার হাতে ছিল না।

৫৯

আমি মশাই প্রপার চ্যানেলে বিশ্বাস করি। মিলোভানের এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেবার জন্য তাই আই ও এ-র প্রেসিডেন্ট রাজা বলিন্দার সিংয়ের কাছে পারমিশন চেয়েছিলাম। বলিন্দার সিংয়ের কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন সেন্ট্রাল এডুকেশন মিনিস্টারের তিন নম্বর পি এ, কারণ প্রথমে পারমিশনটা আমি মিনিস্টারের কাছেই চেয়েছিলাম। বলিন্দার সিং মাত্র পাঁচদিন ঘুরিয়ে দেখা দিলেন এবং এ আই এফ এফ সভাপতি খলিফা জিয়াউদ্দিনের কাছে রেফার করলেন। বম্বের অঞ্জুমান স্কুলে গিয়ে জানলাম, হেডমাস্টার জিয়াউদ্দিন সাহেব অনেক আগেই রিটায়ার করেছেন। একশ একাত্তর টাকা ট্যাক্সি ভাড়া দিয়ে শেষ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট সাহেবকে পাওয়া গেল মোরারজি মিলসের এক্সিকিউটিভ মগন সিংয়ের অ্যান্টি চেম্বারে। সাংবাদিক শুনে মগন সিং কফির অর্ডার দিলেন। 'খেলা'র সাংবাদিক শুনে অর্ডার উইথড্র করলেন। জিয়াউদ্দিন বললেন, 'নেহরু কাপের জন্য ট্রেনিং হচ্ছে ক্যালকাটায়, ওখানে অশোক ঘোষ আছেন, তার কাছে পারমিশান নিন। ভাস্করকে বাদ দিয়ে আমি এখন একটু রেস্ট নিচ্ছি, এসব ছোটখাট ব্যাপারে ইন্টারফেয়ার করব না।'

অশোক ঘোষ প্রথমে জিয়াউদ্দিনের কাছে যেতে বললেন। জিয়াউদ্দিনের কাছ থেকেই আসছি শুনে বলিন্দার সিংয়ের কাছে যেতে বললেন। বলিন্দার সিংই জিয়াউদ্দিনের কাছে পাঠিয়েছিলেন শুনে কোয়ার্টার মিনিট ভেবে নিলেন এবং বললেন, 'ইন ফ্যাক্ট, আমরা চাই না মিলোভান কোন ইন্টারভিউ দেন। খেলার মতো বাজে পত্রিকায় তো নয়ই। আপনি বরং মিলোভানের সঙ্গেই যোগাযোগ করুন। ইন দি মিন টাইম, আমি টেলিফোনে মিলোভানকে বলে দিচ্ছি, যেন আপনাকে ইন্টারভিউ না দেন।'

অশোক ঘোষের টেলিফোনিক অ্যাডভাইস না পাওয়া অথবা পাওয়ার ফলেই মিলোভান এক কথায় ইন্টারভিউ দিতে রাজি হয়ে গেলেন। শান্ত মিত্র চা বললেন। আমজাদ খান কফি বললেন। বাঁ হাতে চা এবং ডান হাতে কফির কাপ নিয়ে প্রশ্ন করলাম : অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের পোস্টটাকে আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন?

মিলোভান : (শান্ত মিত্র এবং আমজাদ খানের দিকে তাকিয়ে) কেন এই প্রশ্ন?

বাঃ সাঃ : ইয়ে, আপনি দীর্ঘকাল যুগোশ্লাভিয়া টিমে মিলজান মিলজানিকের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে থেকেছেন কিনা, তাই।

মিলোভান : ও, হ্যাঁ, খুব ইম্পর্ট্যান্ট পোস্ট।

বাঃ সাঃ : ইন্ডিয়ায় এসেই আপনি নাকি ফুটবলারদের ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করানোর কথা ভেবেছিলেন?

মিলোভান : হ্যাঁ। অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। আমি এত বছর ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল দেখেছি, এখনও পর্যন্ত একজনও টপ ক্লাস ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার দেখিনি যে ভাত বা ইডলি বা কাঁচালঙ্কা বা ঝাল মাংস খায়। দিল্লিতে বেঙ্গলের দুজন ফুটবলারকে হাত দিয়ে ভাত খেতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেছিলাম। এভাবে ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলার হওয়া যায় না।

বাঃ সাঃ : আপনি বলেছেন, অ্যাটাকিং ফুটবল খেলবেন। কিন্তু সৌদি আরবের বিরুদ্ধে দিল্লি ম্যাচে তেমন কিছু দেখা যায়নি। এবার নেহরু কাপে দেখা যাবে?

মিলোভান : দেখা বা বোঝা যাবে কিনা জানি না, তবে আমরা অ্যাটাকিং ফুটবল খেলব।

বাঃ সাঃ : আপনি একাধিক ইন্টারভিউতে বলেছেন, জাতীয় দলের ভাল খেলার জন্য সাংবাদিকদেরও ভূমিকা আছে। একটু ঝেড়ে কাশবেন? একটু পরিষ্কার?

মিলোভান : একটা একজাম্পল তো হাতের কাছেই আছে। এই যে বলছিলেন, ইন্ডিয়া টিমের অ্যাটাকিং ফুটবল দেখা যাবে কিনা। এই ধরনের প্রশ্ন না তুলে, স্ট্রেটঅ্যাওয়ে লিখে দেবেন ইন্ডিয়া অ্যাটাকিং ফুটবল খেলেছে। এক নম্বর গোলকিপার বাদ গেলেও চুপ করে থাকবেন, তাতে টিমের মনোবল বাড়বে। টিম জঘন্য খেললেও বলবেন দারুণ লড়েছে, তাতে মনোবল বাড়বে। আমারও দর বাড়বে— এটা কিন্তু ছাপবেন না।

বাঃ সাঃ : আপনি নাকি বলেছেন, ফুটবলের ক্যাপ্টেনের কাজ শুধুমাত্র টস করা। এই নিয়ে ঝামেলা করার মানে হয় না। তাই প্রতি ম্যাচে আলাদা ক্যাপ্টেন বানাচ্ছেন। যুগোশ্লাভিয়ায় এরকম হয়?

মিলোভান : না। কোথাও হয় না। একটা নতুন জিনিস আপনাদের দিয়ে গেলাম। আমি যতদিন আছি ঠিক আছে, তারপর প্রতি ম্যাচে আলাদা কোচেরও ব্যবস্থা করতে পারেন। আসলে, সব ম্যাচের জন্য যদি কাউকে ক্যাপ্টেন করা হয়, আর তার যদি একটু আধটু পারসোনালিটি থাকে, কোচের অথরিটির পক্ষে ব্যাপারটা অস্বস্তিকর, যদি সেই কোচ বিদেশি হন, এবং তার যদি পারসোনালিটি একটু কম থাকে।

বাঃ সাঃ : মিঃ মিলোভান, আপনি একটি ইন্টারভিউতে নাকি বলেছেন, ফুটবলাররা হল বারবণিতার মতো, অর্থের লোভে ওরা অনেক কিছুই করতে পারে।

মিলোভান : বলেছি? যদি বা বলে থাকি, ছাপা হয়েছে? যদি বা ছাপা হয়ে থাকে, ফুটবলাররা যেন না পড়ে। এ নিয়ে আপনারাও হৈ চৈ করবেন না। টিমের মনোবল নষ্ট হয়ে যাবে। ইন ফ্যাক্ট, মনোবলের বড়ই অভাব। আমি প্রি-অলিম্পিকের আগে

যুগোশ্লাভিয়া থেকে এক শিশি (লার্জ সাইজ, এক লিটার) পিওর মনোবল এনেছিলাম। প্রি-অলিম্পিকে প্রতি ম্যাচে সাড়ে সাত ফোঁটা করে খরচ করেছি। নেহরু কাপের জন্য অনেকটা বাঁচিয়ে শিশিটা এ আই এফ এফ প্রেসিডেন্টের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে দেখি, তলানি পড়ে আছে, বাকিটা নাকি শিশি থেকে অ্যাকসিডেন্টালি পড়ে গেছে। আসলে খেয়ে নিয়েছেন, উইথ মিল্ক। নাহলে ইন্ডিয়ার বেস্ট গোলকিপারকে বাদ দেওয়ার মনোবল পাওয়া যায় কী করে? তলানিটা রেখে দিয়েছি, নেহরু কাপে একটা ম্যাচে ইউজ করব। অন্য সব ম্যাচে পিওর যুগোশ্লাভ মনোবলের শিশিতে জল ঝাঁকিয়ে যতটুকু হয়।

বাঃ সাঃ : কিন্তু, ফুটবলারদের আপনি এমন ঘেন্না করেন কেন?

মিলোভান : আমি ফুটবলারদের ভালবাসি।

বাঃ সাঃ : তাহলে আপনি বললেন কেন যে......

মিলোভান : বারবণিতার মতো হলেই ভালবাসা যাবে না, তার কি মানে আছে?

বাঃ সাঃ : আপনি নাকি আরও বলেছেন, এটাও ছাপা হয়েছে, আপনি কাউকে স্টার মনে করেন না, কিছু ফুটবলার স্টার হয়ে যায় জার্নালিস্টদের কলমের জোরে। আপনি বলছেন. ক্রুয়েফ-রুমেনিগে-জিকো-ফালকাও-রোসি-মারাদোনারা সব স্টার হয়েছেন জার্নালিস্টদের কলমের জোরে?

মিলোভান : হুঁ।

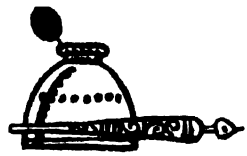
বাঃ সাঃ : তাহলে এত টাকা খরচ করে আপনার মতো কোচকে আনার কী দরকার? দু-তিনজন অমন জার্নালিস্ট রাখলেই তো হয়। এদেশে না থাকলে, বিদেশ থেকে ভাড়া করেও আনা যায়। চার পাঁচটা স্টার লিখে লিখে বানাতে পারলেই ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসের ফুটবল খেলতে পারবে।

মিলোভান : না, না, কোচও লাগবে। মনোবল বাড়ানোর জন্য। এবার মনোবলের শিশিটা ফাঁকা, তাই। নাহলে দেখতেন। স্পেশাল শিশি অবশ্য এখন আর পাওয়া যায় না। যুগোশ্লাভিয়া টিম নিয়ে বাইরে গিয়েছিলাম, মিলজান মিলজনিক অসুস্থ থাকায়। মার্শাল টিটো হাত ধরে বলেছিলেন. 'তুমি আর এই এক্সট্রা স্ট্রং মনোবলের শিশিই ভরসা।' হায়, সেই মার্শাল টিটোও নেই, এক্সট্রা স্ট্রং গিল্ড সোসালিস্ট মনোবলের জন্য শিশিও নেই।

বাঃ সাঃ : প্রি অলিম্পিক চলার সময় বিদেশের মাটিতে ভারতের সম্মান কি নষ্ট হয়নি. যখন আমাদের একজন ফরেন কোচ আর একজন ফরেন কোচের গলা টিপে ধরেছিলেন? বাই দি ওয়ে। আপনি বৃটল্যান্ডের গলা কেন টিপে ধরে ছিলেন?

মিলোভান : পাশে বসে বড্ড চিৎকার করছিল। আমার কানে তাই সুড়সুড়ি লাগছিল। সুড়সুড়ি লাগলে আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হয়। আমার কনসেনট্রেশন নষ্ট হলে টিমের মনোবল নষ্ট হয়। আর টিমের মনোবল নষ্ট হলে...... সবাই তো জানেন। আর প্রশ্ন করবেন না। বেশি প্রশ্ন করলেও মনোবল নষ্ট হয়।

৬০



আমাদের এডিটরচন্দ্র সম্প্রতি গাভাসকার-বন্ধু হিসাবে যথেষ্ট নাম করেছেন। 'চন্দ্র'টা কিন্তু কথার কথা নয়। সত্যিই এডিটর সাহেবের নিজস্ব কোন আলো নেই, গাভাসকার-সূর্যের আলোয় তিনি আলোকিত, কিঞ্চিৎ গ্ল্যামারায়িত। বললাম, 'একটা লেখা চাই।'

এডিটরচন্দ্র : পাড়ার সরস্বতী পুজোর সুভেনিয়ারের জন্য? গাভাসকারকে নিয়ে লেখা?

বাঃ সাঃ : না এবং না। লেখাটা 'খেলা'র জন্যই চাইছি। আমার পেজে ছাপব। গাভাসকারকে নিয়ে লেখা চাই না। আপনি আমাদেব হেড অফ দি ফ্যামিলি, লিডার অফ দি পার্টি, পালের গোদা— যা বলেন তা-ই। আপনার বদনাম নিজে করতে পারি, অন্য কেউ করলে সহ্য হয় না। বড় চুল রাখার আসল বিপদ এই যে কান খোলা থাকে না। কান খোলা না থাকলে কে কী বলছে শোনা যায় না। আপনি তাই শুনতে পাচ্ছেন না, লোকে বলাবলি করছে, গাভাসকার ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই আপনি লিখতে পারেন না। গাভাসকার খেলা ছেড়ে দিলে বা গাভাসকারকে ফালতু লোকেরা অ্যাটাক করা বন্ধ করে দিলে আপনার বেকার হয়ে যাবার চান্স নাকি নাইনটি সেভেন পার্সেন্ট। আপনি বেকার হলে আমিও বেকার হব। বেকার হলে খেতে পাব না। খেতে না পেলে মরে যাব। মরে গেলে 'হিং টিং ছট' লিখে দেশের উপকার করতে পারব না। দেশেব কথা ভেবেই আপনাকে রিকোয়েস্ট করছি, গাভাসকার বাদ দিযে অন্য প্লেয়ারদের নিয়ে লিখুন। আমার পেজেই। অন্য কেউ গাভাসকার ছাড়া অন্য কোন আপনার লেখা ছাপবে না, স্পেশালিস্ট হয়ে গেছেন কিনা। এই লেখাটায় ক্রিকেট থাকবে না। অন্য কোন ক্রিকেটারের কথা লিখতে গেলেও আপনি গাভাসকারকে টেনে আনবেন। আমি আটটা নাম বেছে দিচ্ছি। আপনি এই আটজন সম্পর্কে দু-চার লাইন করে লিখুন। একটু সিনসিয়ারলি প্র্যাকটিস করলে, পরে আপনি অন্য প্লেয়ারদের নিয়ে গোটা লেখাও লিখতে পারবেন। বেকার হওয়ার ভয়ে অথবা বাবুরাম সাপুড়ের উল্টোপাল্টা লেখার জায়গায় ভাগ বসানোর আনন্দে এডিটরচন্দ্র রাজি হয়ে গেলেন। পরদিনই আটজন ক্রীড়াবিদ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত

লেখা আমার হাতে তুলে দিলেন।

সুরজিৎ সিং : সম্প্রতি শোচনীয় মোটর-দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন বলে বলছি না, সুরজিৎ সিং সত্যিই সাম্প্রতিককালের শ্রেষ্ঠ হকি ডিফেন্ডার। বহুবার তিনি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলে ধরেছেন, প্রায় সুনীল গাভাসকারের মতো। গাভাসকার যেভাবে ক্রিকেটারদের সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন, সুরজিৎ অবশ্য হকি খেলোয়াড়দের নিয়ে তেমন কিছু করে উঠতে পারেননি।

ভাস্কর গাঙ্গুলি : নিঃসন্দেহে ভারতীয় ফুটবলের এক নম্বর তারকা, যেমন ভারতীয় ক্রিকেটে সুনীল গাভাসকার। অনেক চেষ্টার পর কর্মকর্তারা ভাস্করকে বাদ দিতে পেরেছেন। অনেক চেষ্টাতেও ক্রিকেট-কর্মকর্তারা অবশ্য গাভাসকারকে বাদ দিতে পারেননি। গাভাসকারের সব সেঞ্চুরি স্কোরবুকে ধরা আছে চিরকালের জন্য, ভাস্করের গোল-বাঁচানোর ঘটনাগুলি কোন স্কোরবুকে ধরা নেই, থাকে না। ভাস্করের মনের জোর অপরিসীম, প্রায় গাভাসকারের মতোই।

মাইকেল ফেরেরা : তিনবারের বিশ্ব অপেশাদার বিলিয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন। ইন্টারভিউ দেবার সময় কিছু চেপে রাখেন না। খোলাখুলি কথা বলেন, ঠিক সুনীল গাভাসকারের মতো। বোম্বাইয়েই থাকেন। 'পদ্মশ্রী' প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, গাভাসকার 'পদ্মভূষণ' পাওয়ায়। এখন মনে করেন, গাভাসকারের জায়গা সবার ওপরে। গাভাসকারের মতোই, ফেরেরাও ভাল জুতো পরতে ভালবাসেন।

দিব্যেন্দু বড়ুয়া: ভারতের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় দাবাড়ু। বুদ্ধি ও বিনয়ের যথার্থ সংমিশ্রণ ঘটেছে এই ছেলেটির মধ্যে— ঠিক সুনীল গাভাসকারের মতো। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে এক অনুষ্ঠানে অন্য দুই ক্রীড়াবিদের সঙ্গে গাভাসকার আর দিব্যেন্দুকেও সংবর্ধিত করা হয়। পরে গাভাসকার বলেছেন, ছেলেটি যে প্রতিভাবান তা দেখলেই বোঝা যায়। গাভাসকারের অনুরোধেই দিব্যেন্দুর একটা রঙিন ছবি আমাকে ছাপতে হয়। গাভাসকার আরও বলেছেন, 'দিব্যেন্দুর মতো মনঃসংযোগ থাকলে আমি পঞ্চাশটা সেঞ্চুরি করতে পারতাম।'

প্রকাশ পাড়ুকোন : অল ইংল্যান্ড চ্যাম্পিয়নশিপসহ দুনিয়ার সব বড় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট জয় করেছেন। এখনও ফাইনালে ওঠেন, তারপর হারেন। অসাধারণ ভদ্র খেলোয়াড়। সেজন্যই তিনি সুনীল গাভাসকারের প্রিয় ও আদর্শ ক্রীড়াবিদ। গাভাসকারের সঙ্গে প্রকাশের বন্ধুত্ব স্বভাবতই গভীর। প্রকাশ আত্মজীবনী লেখার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিচ্ছেন সুনীল গাভাসকার। গাভাসকারের অনুরোধে অন্তত একটি আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে প্রকাশ 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার'-এর গেঞ্জি পরে খেলতে রাজি হয়েছেন।

বিজয় অমৃতরাজ : এক সময়ে বলা হয়েছিল : এ বি সি অফ ফিওচার টেনিস— অমৃতরাজ, বর্গ আর কোনর্স। বি পাঁচবার এবং সি তিনবার উইম্বলডন জিতেছেন, এ একবারও সেমিফাইনালে ওঠেননি। তবু, প্রতি বছরই উইম্বলডনের আগে ভারতীয় পত্রপত্রিকায় গম্ভীর লেখা বেরোয় : এবার কি বিজয় পারবেন? প্রতিবারই লেখা হয়,

এবারই শেষ সুযোগ। টেনিস এলবো না ভোগালে এবং অপোনেন্ট প্লেয়ার তাঁর বিরুদ্ধেই খুব ভাল না খেললে বিজয় অন্তত একবার সেমিফাইনালে উঠতেন, এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে দ্বিমত নেই। খেলে উপার্জন করার দি ক দিয়ে তাঁর সঙ্গে একজন ভারতীয়রই তুলনা করা যায়— সুনীল গাভাসকার। দুর্দান্ত হাসির জন্য অমৃতরাজ জনপ্রিয় ও বিখ্যাত— ঠিক গাভাসকারের মতোই। অনেক সময় ডান হাতে ঘড়ি পরেন— ঠিক সুনীল গাভাসকারের মতো।

ভি চন্দ্রশেখর : সাম্প্রতিককালের ভারতশ্রেষ্ঠ টেবল টেনিস নক্ষত্র। নিখুঁত ডিফেন্স, যা সানি গাভাসকারের ডিফেন্সের সঙ্গে তুলনীয়। সানির মতোই, কর্মকর্তাদের চক্ষুশূল। এবং সানির মতই, টপ ফর্মে থাকতে থাকতে খবরের কাগজে লেখা শুরু করেছেন। চন্দ্রশেখর চিকেন বিরিয়ানি খেতে ভালবাসেন। গাভাসকার অবশ্য কোনরকম খাবারই পছন্দ করেন না। পাঠক-পাঠিকারা জেনে খুশি হবেন, আলাপ না থাকলেও চন্দ্রশেখরের নাম গাভাসকার শুনেছেন। টেবল টেনিসের চন্দ্রশেখর বেনিফিট ম্যাচ হলেও খেলতে রাজি আছেন। ব্যাট না করলেও অন্তত তিন ওভার বল অবশ্যই করবেন।

চার্লস বোরোমিও : দিল্লি এশিয়াডে জীবনের প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতাতেই সোনা এবং আটশ মিটার দৌড়ে রেকর্ড। আবির্ভাবেই বিস্ময়— যেমন একাত্তরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরে জীবনের প্রথম সিরিজেই গাভাসকার। দুজনেই রেকর্ড ভালবাসেন। দুজনেই ক্যাসেট ভালবাসেন। সোনা জিতে খবর হন বোরোমিও, চোট পেয়েও খবর, এমনকি খবর 'অর্জুন' না হয়েও। যেমন গাভাসকার খবর— সেঞ্চুরি করে, সেঞ্চুরি না করে, এমনকি নিজের বইতে সই করেও। বোরোমিওর গায়ের রঙ কালো, পছন্দ করেন সাদা রঙ। গাভাসকারের পছন্দ অবশ্য কালো রঙ।

৬১

এদেশে কোন খবরের কাগজ নেই। সবই ভুল খবরের কাগজ। আপনারা তাই ভুল খবর পেয়েছেন যে, নেহরু কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় মনোনীত হয়েছেন লাজলো কিস এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই পুরস্কার গ্রহণ করেছেন তাঁর হয়ে খলিফা জিয়াউদ্দিন। অন্যের হয়ে নেওয়া এরকম কত ট্রফি জিয়াউদ্দিন সাহেবের বাড়িতে আছে, কাপটি কে কবে কীভাবে হাঙ্গেরিতে নিয়ে গিয়ে কিসের হাতে তুলে দেবেন, কিস আদৌ এই খবরটা কখনও জানতে পারবেন কিনা, কাপটা নিতে গিয়ে জিয়াউদ্দিন সাহেবের হাত কাঁপছিল বলে পরের বছর থেকে 'ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট'-কে অনেক অনেক ছোট সাইজের কাপ দেওয়া হবে কিনা— এসব প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, 'ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট' হিসাবে কিস নন, জিয়াউদ্দিনই আসলে মনোনীত হয়েছেন। তিনি নিজের প্রাইজই নিয়েছেন। মনোনয়ন কমিটিতে ছিলেন খলিফা জিয়াউদ্দিন, মগন সিং এবং অশোক ঘোষ। ভোটাভুটি হয়েছিল কিনা জানা নেই। যা জানি না, তা লিখব না। ভুল খবর কিছুতেই দেব না।

আমি এই মনোনয়নের তীব্র প্রতিবাদ করছি। জিয়াউদ্দিন সাহেব যে উপযুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সোনার দেশে উপযুক্ত লোকের সংখ্যা এত বেশি যে, একটি পুরস্কার যথেষ্ট নয়। 'মেন অফ দি টুর্নামেন্ট' হিসাবে আমি দশজনকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করতে চাই। অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশিতব্য 'অটোবায়োগ্রাফি অফ বাবুরাম সাপুড়ে'র একটি করে কপি আমি দশজনের হাতেই তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। নাইন্টিফোরের জুনের মধ্যেই বইটা বেরিয়ে যাবার কথা। যে দশজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে, ক্রীড়ানুরাগীদের কাছে সংক্ষেপে তাঁদের পরিচিতি পেশ করার দায়িত্ব অস্বীকার করতে পারছি না।

খলিফা জিয়াউদ্দিন: কোন দেশের কোন খেলার কোন কর্মকর্তাই এত দীর্ঘকাল এত নিখুঁত ও এত অক্লান্তভাবে সংশ্লিষ্ট খেলাটির ক্ষতি করতে পারেননি। যতদিন বাঁচবেন, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তা থাকবেন এবং নেহরু কাপের অন্যতম 'ম্যান অফ দি টুর্নামেন্ট' হিসাবে পুরস্কৃত হবেন। উদ্বোধন ও সমাপ্তিদিবসে তাঁর কম্পিত পদক্ষেপ নবীন টুর্নামেন্টটিকে যথাসম্ভব আভিজাত্য ও আপাত-প্রাচীনত্ব দিয়েছে। অনুষ্ঠান

সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সুপুত্র পরভেজকেও সঙ্গে এনেছিলেন।

মগন সিং : ভাস্কর গাঙ্গুলিকে নির্বাসিত করার মতো জঘন্য অপরাধ করার পরও ইডেনে সহাস্যে আবির্ভূত হবার সাহস দেখিয়েছেন। খলিফা জিয়াউদ্দিনের আরব্ধ কাজ সম্পন্ন ও সম্পূর্ণ করার দায়িত্বে অবিচল। কিছুকাল আগে, চুয়াত্তরের তেহরান এশিয়াডে ভারতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসাবে তাঁর ঢাউস মাপের ছবি ছাপা হয়েছিল, তিনি প্রতিবাদ করেননি। ছাপ্পান্নর মেলবোর্ন অলিম্পিকের ট্রায়াল থেকে প্রথম সপ্তাহেই বাদ পড়েছিলেন। তথাপি হতোদ্যম না হয়ে ভারতীয় ফুটবলের সমূহ ক্ষতি করার সুমহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন।

প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি : নেহরু কাপের উদ্বোধনী দিবসে ঘোষক এবং সমাপ্তি দিবসে ববি মুরের পার্শ্বচর হিসাবে, দূরদর্শনের পর্দায় সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। মধ্যবর্তী সময়ে দীর্ঘ কারাবাসকালে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় ফুটে ওঠার ব্যাপারে ব্যস্ত থাকলেও, নেহরু কাপের কথা এতটাই ভেবেছেন যে, এ আই এফ এফ সচিব অশোক ঘোষকে তাঁর সঙ্গে আলোচনার জন্য জেলে ছুটে যেতে হয়েছে। জেল থেকে বেরিয়েই অত্যন্ত অল্প সময় ও অবকাশেই এ আই এফ এফ সম্পাদক বনাম ক্রীড়ামন্ত্রীর 'ব্যাটল রয়াল' বাধিয়ে দিতে পেরেছেন। ছোট ছোট পায়ের কাজ বা শিল্পকর্মেই বড় ফুটবলারকে চেনা যায়। উদ্বোধনী দিবসে ট্রেনের গার্ডের ভঙ্গিতে প্রিয়বাবুর 'গ্রিন সিগনাল' দেওয়া যাঁরা দেখেননি, তাঁরা জানেন না কী হারিয়েছেন।

সুভাষ চক্রবর্তী : নেহরু কাপের এবং সল্ট লেক স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের ব্যস্ততা ও তাড়াহুড়োর মধ্যেও দেশের না-খেতে পাওয়া কোটি কোটি মানুষের কথা ভুলে যাননি। কলকাতা ময়দানের উর্বর জমিতে ধান চাষ করানোর কথা ভেবেছেন। এস এস এস যে ফুটবলের প্রতি পক্ষপাত দেখাবে না, এটা বোঝানোর জন্য অথবা ধানচাষে নেতৃত্ব দেবার কথা ভেবে শীতের রোদ্দুর থেকে নিজের মাথা বাঁচানোর জন্য মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী পানামা ক্যাপ মাথায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট থেকেছেন। তাঁর হুমকিতে ঘাবড়ে গিয়েই চব্বিশে জানুয়ারি রাত্রে এ আই এফ এফ কর্তারা বলতে পারেননি যে, প্রয়োজনীয় চেয়ারের চেয়ে একটিও বেশি থাকলে খেলাতে পারব না।

এস এস হাকিম : টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ভারতীয় রেফারিরা নিজেদের দুর্নামের প্রতি সুবিচার করার চেষ্টা করেছেন। সমস্যা দেখা দেয় ফাইনালের দিন। পোল্যান্ড আর চীন— দুটি টিমই এত ভদ্র যে, ব্যক্তিত্বহীনতা প্রকাশ করার কোন সুযোগই সুযোগ্য মেলভিন ডি'সুজা পাচ্ছিলেন না। ভারতীয় রেফারিদের এই দুর্দিনে এগিয়ে আসেন রোম অলিম্পিকে ল্যাং মেরে টিমে আসা প্রাক্তন ফুটবলার, চিফ কোচের পিছনে লাগার কাজে বিশেষজ্ঞ অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচ এবং জিয়াউদ্দিনের চোখে এশিয়াডের সেরা রেফারি— এস এস হাকিম। লাইন্সম্যানের ক্ষমতা সীমিত, তবু তাই দিয়েই তিনি ভারতীয় রেফারিদের দুর্নামের পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার প্রাণপণ চেষ্টা করেন।

শান্ত মিত্র ও আমজাদ খান : এই দু'জন প্রাইজ নিতে একসঙ্গে মঞ্চে উঠবেন।

কোনরকম ক্ষমতা ও দায়িত্ব না পেয়েও জাতীয় দলের সহকারী কোচ হিসাবে পাবলিকের গালমন্দ হজম করার ব্যাপারে যে অসামান্য সহ্যক্ষমতা এঁরা দেখিয়েছেন, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তা পি৺লের অক্ষরে লেখা থাকবে। দুজনের মধ্যে আমজাদ খানই আগে পুরস্কার নেবেন, কারণ চিফ কোচের পাশে বসার অধিকার তিনিই পেয়েছিলেন এবং বেঞ্চে বসে একবারও ঘাড় নাড়াননি, কোনরকম নড়াচড়া করেননি। নব্বুই মিনিটে বার পাঁচেক চোখের পলক এবং বার সাতেক নিঃশ্বাস ফেলেছেন শুধু।

জ্যোতি বসু : সল্ট লেক স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ইংরেজিতে ভাষণ দিয়ে বিদেশি খেলোয়াড়, কোচ, রেফারি ও কর্মকর্তাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি ইংরেজি জানেন। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বাংলায় ভাষণ দিয়ে এই রাজ্যের মানুষদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি বাংলাও জানেন।

অশোক ঘোষ : খলিফা জিয়াউদ্দিন, মগন সিং, অশোক মিত্র— এই সব গুণী ব্যক্তিদের নিয়ে যিনি অনায়াসে চলেন, তাঁকেও পুরস্কৃত করতে আমি বাধ্য। সুভাষ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কাউন্টার অ্যাটাকে ইতালিয়ান ফুটবলের দক্ষতা দেখিয়েছেন।

অশোক মিত্র : দেড় মাস ধরে নেহরু কাপ অর্গানাইজিং কমিটির একশ সাতচল্লিশটি নিউজপেপার নোটিসে সই করেও ক্লান্ত হননি, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং শ্রীযুক্ত ববি মুরের সঙ্গে করমর্দনের সময় মুখে হাসি ধরে রেখেছেন। এত ব্যস্ততার মধ্যেও বাংলার কথা ভুলে যাননি। নেহরু কাপের ডামাডোলের মধ্যেই বাংলা দলের সম্ভাব্য ফুটবলারদের তালিকা থেকে প্রসূন ব্যানার্জিকে বাদ দিতে পেরেছেন।

পুনশ্চ : মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মহোদয়কে পুরস্কৃত করতে না পেরে খুবই খারাপ লাগছে। কারণ, নেহরু কাপের আসরে সেভাবে কৃতিত্ব প্রদর্শন করার সুযোগ তিনি পাননি। তবে, স্টেডিয়ামের উদ্বোধনের দিন হেয়ারস্কুল থেকে মশালদৌড় শুরুর অনুষ্ঠানে অসাধারণ দক্ষতায় পূতাগ্নি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছেন, যাতে ফটোগ্রাফাররা সব অ্যাঙ্গেল থেকে ছবি নিতে পারেন। খোদ জ্যোতিবাবু স্টেডিয়ামে পূতাগ্নি তুলে ধরেই সব মাটি করে দেন। সান্ত্বনা পুরস্কার হিসাবে 'অটোবায়োগ্রাফি অফ বাবুরাম সাপুড়ে'র একটা কপি মাননীয় পূর্তমন্ত্রীকেও আমি দেব।

৬২

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, আগামী পয়লা ডিসেম্বর, উনিশশ চুরাশি, আমার একটি চিঠি পাওয়ার কথা। চিঠিটি আমি আগেই প্রকাশ করে দিচ্ছি।

প্রিয় বাবুরাম,

আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড কলকাতা টেস্টের একটি কমপ্লিমেন্টারি টিকিট অবশ্যই চাই। অন্যান্য বার কোন না কোন সোর্স থেকে টিকিট পেয়ে যাই। কিন্তু এবার দরকার বিনে পয়সার টিকিট। তুই ছাড়া এমন টিকিট আমাকে আর কে দিতে পারে? তোর নিশ্চয় সেই ভিখারিটির কথা মনে পড়ছে, চেৎলা বয়েজ স্কুলে যাবার পথে অধুনাবিলুপ্ত কাঠের পুলে যার দেখা আমরা পেতাম। তার আবেদন ছিল : 'আমাকে একটা টাকা দেবেন?' বাইশ বছর আগে এক টাকার দাম নিশ্চয় এখনকার অদ্ভুত পৌনে তিন টাকা ছিল, তবু কী আশ্চর্য, আমরা দেখতাম, কেউ কেউ সত্যিসত্যিই এক টাকা দিয়ে যাচ্ছেন। বিশ্বাস কর, ঐ দৃষ্টান্ত মনে রেখে আমি একেবারে কমপ্লিমেন্টারি টিকিট চাইছি না। তবে, তুলনাটা অন্তত এইটুকু বিস্তৃত করা যায় যে, এখনও কাঠের পুল থাকলে আমি কিছু টাকা তুলে নেবার চেষ্টায় এখন বসে যেতেও পারতাম। এবং বাবুরাম, ঐ বিশিষ্ট ভিক্ষুকের আবেদনের সুরটা মনে আনার চেষ্টা কর, ধরে নে, 'আমাকে একটা টাকা দেবেন'-এর সুরেই আমি বলছি, 'আমাকে একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট দে ভাই।' বাবুরাম, স্পোর্টস লাভার হাবার অমার্জনীয় অপরাধে গত এক বছরে আমি বিধ্বস্ত। ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে পারিনি। ভাইয়ের কলেজের টিউশন ফি বাকি পড়েছে পাঁচ মাসের। গত এগার মাসে মৃণাল সেনের 'খণ্ডহর' ছাড়া আর কোন ছবি দেখিনি। একুশটা বিয়ের নেমন্তন্ন অ্যাটেন্ড করতে পারিনি স্রেফ উপহার কেনার অক্ষমতায়। এই অবস্থায়, তোর কাছে ভিক্ষা করা ছাড়া আমার সামনে অন্য কোন রাস্তা খোলা নেই। ভারত-ইংল্যান্ড কলকাতা টেস্টের একটা কমপ্লিমেন্টারি টিকিট আমাকে দিবি?

লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমের কলকাতা টেস্টের টিকিট পেয়েছিলাম অনেক চেষ্টায় খেলা শুরুর দিন ভোরে, তা-ও দুশ টাকার। এবং এই টিকিট পেতে আমাকে ট্যাক্সি আর মিনিবাস ভাড়ায় খরচ করতে হয়েছিল আরও একশ সাতান্ন টাকা। মাঠে চারদিনে খরচ

হয়েছিল একাত্তর টাকা। তোদের গাভাসকার আর অন্য ক্রিকেটারদের কৃপায় অবশ্য একদিনের মাঠের খরচ বেঁচে গিয়েছিল।

এই টেস্ট ম্যাচটার আগেই অবশ্য আমাকে আরও দুটো ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। সেপ্টেম্বরে পিয়ারলেস ট্রফি, যদিও আন্তর্জাতিক ব্যাপার ছিল না, খেলা জমেছিল এবং ফ্যামিলি বাজেট ধাক্কা খেয়েছিল কিঞ্চিৎ। ফাইনালের দিন ধাক্কাধাক্কিতে আমার চশমাটি পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যাওয়ায় ধাক্কা প্রবলতর হয়।

ডিসেম্বরের শুরুতে ধাক্কা দেবার সিদ্ধান্ত নেন ব্যাডমিন্টনের কর্তারা। প্রথম সারির কোন নক্ষত্র না থাকা সত্ত্বেও প্রচণ্ড দামি টিকিট কিনতে আমাদের বাধ্য করা হয়, চমৎকার অস্পষ্ট বিজ্ঞাপন দিয়ে। পিয়ারলেস ট্রফি আর এশিয়ান ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপ— খেলার মাঠের এই দুটি ধাক্কার মাঝখানে এসেছিল বাংলার বাঙালির, আহা— বাংলার ও বাঙালির, চিরন্তন বাৎসরিক ধাক্কা— দুর্গোৎসব। তাই, তোর আপস্টার্ট এডিটর না বুঝলেও তুই বুঝবি বাবুরাম, কলকাতা টেস্ট শেষ হবার পর আমি সেইসব মহৎ ব্যক্তিদের লিস্ট তৈরি করতে শুরু করি। যারা আমাকে ধার দিতে পারেন।

ধার ব্যাপারটার একটা সাংগঠনিক দিক আছে, তার সময়ই পাওয়া গেল না। টেস্ট শেষ হতে না হতেই নেহরু গোল্ড কাপের সংগঠকরা দুশ টাকার সিজন টিকিট নেড়ে লোভ দেখালেন। ইনস্যুরেন্সের প্রিমিয়াম বন্ধ করে দুশ টাকার চাঁদ হাতে পেলাম। কিস, স্মোলারেক, রোমান, গ্যারেকা, বুরুচাগা, পোনসে— না আমরা ঠকিনি। তবে ডুবেছি।

বাঙালি ফুটবলকে যতটা ভালবাসে, ব্রাজিলকেও ঠিক ততটাই। নেহরু কাপের ধাক্কায় আহত হয়ে শয্যাশায়ী থাকলেও তাই টাটার সুপার প্রচারপুষ্ট সাও পাওলোর সুপার বয়দের জন্য পঁচিশ টাকা খরচ করতে হল। খেলা দেখে সুপার-হতাশ হতে হলেও, পঁচিশ প্লাস একুশ মোট ছেচল্লিশ টাকার বিয়োগ ব্যথা সইতে হয়।

সাও পাওলোর আওয়াজ মিলাতে না মিলাতেই হৈ হৈ করে এসে গেলেন ডাবল উইকেটের ফ্ল্যাগ দুলিয়ে সোবার্স-হল-লয়েড-লিলি-গার্নার-জাহির-ইমরান। আবার টিকিট। আবার খরচ। অবশ্য এক্ষেত্রে ধার সংগ্রহের সাংগঠনিক দিকে মনোযোগ দেবার জন্য কয়েকদিন সময় পাওয়া গেল। ভেবেছিলাম, বিশ্বাস কর বাবু, ভেবেছিলাম যে এই টুর্নামেন্টটা দেখব না, এক বছরে এত ধাক্কা হার্টে সইবে না। তবু, ডেনিস লিলি কলকাতায় খেলে চলে যাবেন, আমি টেলিভিশনের 'সরি ফর দি ইন্টারাপশন' দেখব, এ হয় না। হতে পারে না।

ধুঁকতে ধুঁকতে খবর পেলাম, কে কে বিড়লা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, আমাদের বর্গ দেখাবেন। চুরাশির জুনে ইনডোর স্টেডিয়ামে বর্গের বিরুদ্ধে ম্যাকেনরো বা কোনর্সের বদলে বন্ধু ও প্র্যাকটিস পার্টনার ভিটাস গেরুলাইটিসকে পাওয়ায় আমরা প্রথমে একটু দুঃখিত হয়েছিলাম ঠিকই, কিন্তু খেলা দেখে মন ভরে গেছে। পকেট খালি হয়েছে, বলা বাহুল্য। সেদিন স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসার সময় চোখ সামান্য সজল হয়েছিল। দুর্ধর্ষ টেনিস দেখার আনন্দে না ধারে ডুবে যাবার দুঃখে, নাকি দুটো কারণেই— জানি

না।

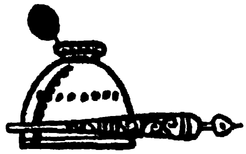
সারা দেশের মাঠ ময়দান কাঁপিয়ে অতঃপর এল সেই ঐতিহাসিক খবর— চুরাশির সেপ্টেম্বরে চোখের সামনে চিরকালের স্বপ্নের ফুটবল নক্ষত্ররা। পেলে, বেকেনবাউয়ার, ববি মুর, ইউসোবিও, জর্জ বেস্ট, জোহান ক্রুয়েফ, গর্ডন ব্যাঙ্কস খেলে গেলেন ইডেনে। একশ টাকার টিকিট (এই প্রথম কালোবাজারে যেতে হল) কিনেছি দুশ নব্বুই টাকায়। আর্থিক ধাক্কায় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে যেতেও স্বপ্নকে চোখ ছাড়া করতে চাইনি। নভেম্বরের গোড়ায়, আমি যখন ব্যস্ত গত কয়েকমাসের ক্ষয়ক্ষতি এবং ক্ষত সামলাতে আসন্ন ভারত-ইংল্যান্ড টেস্টম্যাচের জন্য, কলকাতায় গাভাসকারের শেষ টেস্ট এবং বব উইলিসের লিলিকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়া দেখতে যখন নিরুপায় প্রস্তুতি নিচ্ছি, অ্যামেচার অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা ঘোষণা করলেন : সল্টলেক স্টেডিয়ামে আবির্ভূত হবেন ইংল্যান্ডের চার বিশ্বখ্যাত অ্যাথলিট— ডালে টমসন, অ্যালান ওয়েলস, সেবাস্তিয়ানকো এবং স্টিভ ওভেট। হোক প্রদর্শনী অ্যাথলেটিকসের আসর, টিকিটের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা বা দেরি করিনি। এ রোগ সারে না।

সামনে টেস্ট। জানি টিকিট পাওয়াই কঠিন। তবু, আমার একটা বিনে পয়সার টিকিট চাই বাবুরাম। চেৎলা বয়েজ স্কুলে যাবার পথের সেই হারিয়ে যাওয়া কাঠের পুলের কথা মনে পড়ছে? পড়ুক। আমার একটা টিকিট চাই, কমপ্লিমেন্টারি টিকিট।

ইতি—

অরিন্দম

৬৩



কলকাতায় অনুষ্ঠিত ডাবল উইকেট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সংগঠক এবং কর্মীদের আন্তরিক ধন্যবাদ। ডেনিস লিলিকে দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। দেখলাম, এমন কি মিয়াঁদাদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধও। দেখে ধন্য হলাম, এই বয়সেও দিলীপ দোশির বলে স্যার গ্যারির একটি কভার ড্রাইভ, ডেনিস লিলির দুটি বিখ্যাত আউটস্যুইঙ্গার, মাইকেল হোল্ডিংয়ের ব্যাটছোঁয়া বলের সঙ্গে গ্যালারির গভীর বন্ধুত্ব, ভাল লেংথ থেকে লাফিয়ে ওঠা জোয়েল গার্নারের অন্তত সাতটি বল, ইমরানের একটি দুরন্ত পুল।

টেস্টম্যাচের পর নেহরু গোল্ড কাপ, নেহরু গোল্ড কাপের পর সাওপাওলোর সুপার সকার, সুপার সকারের পর এই ডাবল উইকেট টুর্নামেন্ট— টিকিট বেশি বিক্রি হওয়ার সম্ভাবনা এমনিতেই কম ছিল। টিকিটের দাম বেশি করে সংগঠকরা নিশ্চিত করেন, মাঠে ফালতু ভিড় হবে না। টেস্টম্যাচ চলার সময়ে ঠাসাঠাসিতে বসতে অসুবিধা হয়, আশি পঁচাশি হাজারের নাইট্রোজেনে আবহাওয়া বিষাক্ত হয়, অফিস টাইমে ট্র্যাফিক জ্যাম হয়। টেস্টম্যাচ এবং আন্তর্জাতিক ফুটবলের আসর বসার ঠিক পরে পরেই এসব যাতে না হয়, তার দিকে উদ্যোক্তাদের কড়া নজর ছিল। টিকিটের দাম বেশি রাখায় সাপ মরেছে, কিন্তু লাঠি ভাঙেনি। মাঠে ভিড় হয়নি বা পরিপূর্ণ ইডেন লিলিকে স্বাগত জানাতে পারেনি, কিন্তু সংগঠকরা আর্থিক সাফল্য পেয়েছেন।

কলকাতার সাংবাদিকরাও এই টুর্নামেন্টে সবাইকে মুগ্ধ করার সুযোগ পেয়েছেন। কেউ একই সঙ্গে টুর্নামেন্ট চালিয়েছেন এবং ধারাভাষ্য দিয়েছেন, কেউ একই সঙ্গে টুর্নামেন্ট চালিয়েছেন এবং বিরামহীন ঘোষণার দায়িত্ব পালন করেছেন, কেউ একই সঙ্গে লোকাল ম্যানেজার এবং পি আর ও-র দায়িত্ব পালন করেছেন, কেউ ক্রিকেটারদের উড়িয়ে আনার এবং জড়ো করার দায়িত্ব পালন করেও নিজের বাড়িতে পার্টি ডেকে ইমেজ বাড়িয়েছেন। মুগ্ধ করেছেন সেই সাংবাদিকরাও, যাঁরা এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি টুর্নামেন্টে কোন কাজের দায়িত্ব পাননি। তাঁরা বুকে প্রেস ব্যাজ এবং মুখে করুণ হাসি লাগিয়ে হালকা পরিবেশে বিষণ্ণতার প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করে গেছেন। কলকাতার ক্রীড়া সাংবাদিকদের (যাদের

একজন হওয়ার জন্য আমি কয়েক বছর ধরে লড়ে যাচ্ছি) মধ্যে যে এত বিভিন্নমুখী প্রতিভা ও ক্ষমতা লুকিয়ে আছে, তা বোঝার সুযোগ করে দেবার জন্যও উদ্যোক্তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

অপ্রত্যাশিত চমক যে কোন অনুষ্ঠানকেই আকর্ষণীয় করে তোলে। যা হবার, যা হয়, ঠিক সেইভাবে সব কিছু ঘটলে চমক থাকে না। টেবিল পাততে, টেবিলের ওপর টেবিলক্লথ পাততে, গোটা কুড়ি চেয়ার পাততে যে একুশ মিনিট সময় লাগল, এতে কোন চমক নেই। শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী বিড়লা ছাড়া আর কাউকেই যে ট্রফি-রাখা টেবিলের পিছনে বসতে দেওয়া হল না, তাতেও চমক নেই। ভাল করে সব কিছু দেখার জন্য সামনের ফটোগ্রাফারদের দিকে যে কমলালেবুর খোসা আর ঢিল ছোঁড়া হল, তাতে তো চমক নেই-ই। একটুও না চমকেও আমরা অবশ্য খুশি হচ্ছিলাম চেয়ারে-বসা স্যার গ্যারি আর ডেনিস লিলিকে দেখে। সর্বকালের সেরা ক্রিকেটার এবং সর্বকালের সেরা বোলার। চমক নেই, কিন্তু প্রত্যাশা ছিল। প্রধান উদ্যোক্তা-সাংবাদিক মাইকে যথারীতি আধিপত্য বিস্তার করলেন, আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাকলাম, স্যার গ্যারি এবং ডেনিস লিলির সংক্ষিপ্ত ভাষণের জন্য। এবং এখানেই দুর্ধর্ষ চমক। উদ্যোক্তা-সাংবাদিকের ভূমিকা ও ঘোষণার পর হোল্ডিং-গার্নার ট্রফি এবং ছয় ক্রিকেটার ডলার প্রাইজ নিলেন। খেল খতম। স্যার গ্যারি কিছু বলার চান্স পেলেন না, ডেনিস লিলিও না। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে স্মৃতিচিহ্ন হিসাবেও কিছু দেওয়া হল না এই দুজনের হাতে। উল্লাস প্রকাশের সামান্যতম সুযোগ পেল না তরুণ ক্রিকেট প্রেমিকরা, যারা টিকিট কেটে কষ্ট করে মাঠে এসেছিল প্রধানত সর্বকালের সেরা ক্রিকেটারকে প্রণাম জানাতে, ডেনিস লিলিকে প্রথম দেখার এবং শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ পেতে। ওদের কিছু না বলতে দিয়ে এবং ওদের হাতে কোন স্মৃতিচিহ্ন বা পুরস্কার তুলে না দিয়ে সংগঠকরা যে চমক দিলেন, তা 'সারপ্রাইজ অফ দি ইয়ার' হিসাবে পুরস্কৃত হবেই।

টুর্নামেন্টের দুদিন আমরা উইকেটের পিছনে সৈয়দ কিরমানি আর সম্বরণ ব্যানার্জিকে দেখেছি। সম্বরণের কাছ থেকে দুটি চমৎকার স্টাম্পিং পাওয়া গেছে। কিরির চেয়ে বেশি সময় সম্বরণের হাতেই গ্লাভস থেকেছে। তবু যে সম্বরণকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, সেজন্য আমরা আশ্বস্ত হয়েছিলাম — যাক, ঘরের ছেলেদের ছোট করার কথা তাহলে আমরা ভুলে যাইনি। তবু, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হচ্ছিল, দোশি আর অরুণলালকে বোধহয় একটু মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। সংগঠকদের ধন্যবাদ, সেই ভুল শেষ পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছেন। প্রাইজ মানি ছাড়া যে টাকা ক্রিকেটারদের দেওয়া হয়, তার ভাগ বাংলার জুড়ি অরুণলাল-দোশিকে দেওয়া হয়নি। আহা, বাংলার দুই সেরা ক্রিকেটারকে অপমানিত করার এমন সুযোগ কি যখন তখন পাওয়া যায়। ধন্যবাদ।

নক্ষত্রদের দেখা, কাছ থেকে দেখার আশায় হন্যে হয়ে ঘুরেছি সেই পনের ফেব্রুয়ারি সন্ধে থেকে। সাতবার দমদম এয়ারপোর্টে গেছি, দশ কাপ কফি আর সিকিউরিটির ধাক্কা খেয়েছি, তবু সবাইকে ভালভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। তাই, সতের তারিখ সন্ধের পরও

এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম। স্যার গ্যারিকে আর একটু দেখার ইচ্ছা পূর্ণ হল না, তিনি লাউঞ্জ দিয়ে গেলেনই না। কিন্তু, যা দেখলাম, তা জন্মজন্মান্তর মনে থাকবে। এত অন্তরঙ্গ মুহূর্তে ডেনিস লিলিকে দেখব কল্পনাও করিনি। ভেবেছিলাম, সংগঠকরা লিলিকে নিয়ে এগোবেন, তাঁদের হাতে হাতে থাকবে সর্বকালের সেরা ফাস্ট বোলারের লাগেজ আর ফুলের তোড়া, আমার মতো ফালতু লোকেরা মহানায়ককে ফাঁকফোকর দিয়েও দেখার সুযোগ পাব কি না সন্দেহ। কিন্তু, কী মধুর বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বাবুরাম সাপুড়ের জন্য, লিলি, তিনশ পঞ্চান্ন উইকেটের ডেনিস লিলি নিজের সব মালপত্র নিজেই বহন করলেন। গ্র্যান্ড হোটেল থেকে বাস এসে থেমেছিল এয়ারপোর্টের দরজায়। বারবার বাসের সামনে গিয়ে নিজের মালপত্র লাউঞ্জে তুলে আনলেন, লিলি। আগে মিসেস লিলির দুই হাতেও ভারি ব্যাগ, কোন হাতে আর ফুলের তোড়া নেবেন— এই সমস্যার কথা ভেবেই নিশ্চয় তাঁর হাতে বা তাঁর স্বামীর হাতে ফুলের তোড়া বা একটি গোলাপও দেওয়া হয়নি। ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম লিলিকে দেখার এই সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। সংগঠকদের ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ।

৬৪

ভেবেছিলাম আপনাদের এবার কিছু অভিজ্ঞতার ভাগ দেব, সাম্প্রতিক সফরের অভিজ্ঞতা। আমি কয়েক দিনের জন্য বাইরে গিয়েছিলাম কিনা। কত সব নামকরা লোকের সঙ্গে দেখা হল, কত কী দেখা হল, আপনাদের শোনানোর ইচ্ছা ছিল। কিন্তু কলকাতায় ল্যান্ড করেই অন্য অ্যাসাইনমেন্ট পেলাম। এডিটরের নির্দেশ, 'স্পোর্টস পারসোনালিটি অফ দি ইয়ারকে ইন্টারভিউ করতে হবে।' আমি জিজ্ঞেস করলাম— 'মাইকেল ফেরিরা'? এডিটর সাহেব নির্বিকার। তার মানে, ঠিক বলিনি। 'সুনীল গাভাসকার'? এডিটর নির্বিকার। মরিয়া হয়ে জানতে চাইলাম, 'তাহলে নিশ্চয় দিব্যেন্দু বড়ুয়া?' এ : নি: (এডিটর নির্বিকার)। 'পি টি ঊষা'? এ : নি : 'কপিলদেব'? এ : নি : 'খলিফা জিয়াউদ্দিন'? এ : নি : সৈয়দ মোদি, ইন্দুপুরী এবং নিশীথ ঘোষের নামেও এ : নি : থাকায় হাল ছেড়ে দিয়ে বললাম, 'আপনি বোধহয় আমাকে বিদেশে পাঠাতে চাইছেন!'

—'যা যোগ্যতা, বিদেশের কাছে পাঠাতেই ভরসা পাই না, আপনাকে পাঠাব বিদেশে? না, না, কোন দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনি মধ্যমগ্রাম যান। মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের ইন্টারভিউ নিন। খুব সাবধান, একটুও ছটফট করবেন না, থুপথুপ করে হাঁটবেন বসবেন। একটু ফিট দেখলেই, একটু ফুটবলার-ফুটবলার মনে হলেই আপনাকে হাফপ্যান্ট আর বুট দিয়ে ট্রায়াল দিতে বলবেন হেডমাস্টার মশাই। ফ্রি সাইজ হাফপ্যান্ট আর বুট ওনার সঙ্গে থাকে, অল টাইম। একুশ থেকে একত্রিশের মধ্যে সম্ভাবনাময় কাউকে পেলেই উনি হাফপ্যান্ট পরান, পরের বছরের সুব্রত কাপের কথা মনে রেখে। খুব সাবধান।'

আমার ভয়ের কারণ ছিল না। কখনও গলির রবারের বলের টুর্নামেন্টেও খেলিনি। লুডো খেলাতেও কখনও জিতিনি। বছরে চার মাস গরমের ভয়ে, বছরে চার মাস শীতের ভয়ে আর বছরে চার মাস বৃষ্টির ভয়ে কোনও আউটডোর গেম খেলিনি। মধ্যমগ্রাম হাইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের মতো ফেমাস ট্যালেন্ট স্পটার এত বড় ভুল করতে পারেন না।

হেড মাস্টারমশাই তাঁর ঘরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। মনে হল স্কুলেরই কোন শিক্ষক। ব্যক্তিগত বন্ধুও হতে পারে অবশ্য। একটা খাম নিয়ে ভদ্রলোক চলে যেতেই হেডমাস্টার মশাই আমাকে আপাদমস্তক দেখে বিড়বিড় করলেন— 'একে দিয়ে হবে না।'

'অ্যাঁ?'

'না, না, আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম। দু-মিনিট অপেক্ষা করতে হল বলে দুঃখিত। এই ভদ্রলোক এইট্টি টু-র টিমে ছিলেন, সামান্য পেমেন্ট বাকি ছিল, চুকিয়ে দিলাম। ইন্টারভিউ কিন্তু দেড়ঘণ্টার বেশি দিতে পারব না। স্কুলে পরীক্ষা চলছে কিনা।'

— 'একথা কি সত্যি যে আপনার টিমে অ-ছাত্ররা....'

— 'বোগাস! ওই ব্যাটা আশুতোষের প্রোপাগান্ডা।'

— 'আশুতোষ কে স্যার?'

— 'ওই কুমার আশুতোষ ইনস্টিটিউশনের কথা বলছি। ইদানীং সুবিধা করতে না পেরে আমাদের ল্যাং মারার লাইন নিয়েছে। রটাচ্ছে, আমরা নাকি এগারজন অ-ছাত্র খেলিয়েছি। মিথ্যাবাদী কোথাকার। আমরা কোনও ম্যাচেই পাঁচজনের বেশি অ-ছাত্র খেলাইনি। কুমার আশুতোষের সাতজনের রেকর্ড কেউ ছুঁতে পারেনি।'

— 'আপনারা এত বয়স্ক ফুটবলার খেলান কেন?'

— 'আপনি দেখছি ফুটবলের কিস্যুই জানেন না। যে কোন নামকরা কোচের কাছে জেনে নেবেন, সাকসেসফুল টিমে অন্তত পাঁচজন অভিজ্ঞ প্লেয়ার থাকতেই হবে। তারাই টিমকে খেলায়, টানে। অভিজ্ঞতা ছাড়া কেউ অভিজ্ঞ হয় না, এটা নিশ্চয় মানবেন। আমরা এমন পাঁচজনকে সব সময় টিমে রাখি, যারা অন্তত সাত বছর ভাল টুর্নামেন্টে খেলেছে। তবে, বয়সের ব্যাপারটাও দেখতে হয়। একত্রিশ বছরের বেশি বয়সী ফুটবলারকে আমরা কখনও খেলাই না। প্রিন্সিপল বলে একটা কথা আছে না!'

— 'স্যার, হেডস্যার, খেলাধুলোর জন্য আপনি এমন প্রাণপাত পরিশ্রম করেন, শুনেছি হাফপ্যান্ট আর বুট নিয়ে ঘোরেন, এত সময় দেন, এত সবের পর স্কুলে পড়াশোনার দিকে নজর দেওয়ার সময় থাকে?'

— 'দেখুন, আমরা সব সময় ছাত্রদের বলি, ছাত্রজীবন প্রস্তুতির সময়। এই সময় খেলাধুলো করতে হবে প্রাণ দিয়ে। কিন্তু পড়াশুনোও একটু একটু করতে হবে। আমি তাই ফুটবল টিম করার জন্য এত ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও মাঝে মধ্যে ছাত্রদের পড়াই।'

— 'মতি মজুমদার নাম নিয়ে যে এবার সুব্রত কাপে আপনার স্কুলের হয়ে খেলে এল, তার আসল নাম যে অন্য, তার বয়স যে প্রচুর, সে যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি সেই সেভেন্টি নাইন থেকে— এসব জানাজানি হয়ে গেছে। কোনও মন্তব্য?'

— 'আবেগ, উত্তেজনা, আনন্দ— এসব যে কী ডেঞ্জারাস জিনিস তা অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে হয়। টানা তিনবার সুব্রত কাপ জিতে এতই অফ-ব্যালান্স হয়ে গেলাম যে ভাড়াটে প্লেয়ারগুলোকে রেখেই গ্রুপ ছবি উঠে গেল। আর এমন ভুল হবে না।'

— '*এই যে রাজধানীর বুকে বেশি বয়সী ছেলেদের খেলিয়ে মাঠে আওয়াজ খাচ্ছেন,*

এতে লজ্জা হয় না স্যার?'

— 'বাংলার সম্মানের জন্য আমাদের সব লজ্জা ত্যাগ করতে হবে। মাঠের ঠাট্টা-টিটকিরি থাকবে না, বুড়ো প্লেয়ার খেলানর কথা লেখা থাকবে না, টানা তিনবার চ্যাম্পিয়নশিপের রেকর্ডটা থাকবে, বাংলার সম্মান থাকবে।'

— 'এই যে বেআইনি প্লেয়ার খেলানোর জন্য দিল্লি থেকে চিঠিচাপাটি আসছে, খবরের কাগজে লেখালেখি হচ্ছে, এতে আপনাদের অপমান বোধ হয় না?'

— 'ফাজলামি নাকি? বাংলার সম্মানের জন্য এসব অপমান কেউ গায়ে মাখে নাকি? বাংলার সম্মান সবার আগে মশাই, বুঝুন, বোঝার চেষ্টা করুন।'

— 'ছেলেদের বেনামে বেআইনে খেলিয়ে ওদের ক্রিমিনাল তৈরি করছেন। কোনরকম পাপবোধ হয় না স্যার, হেডস্যার?'

— 'মাথা খারাপ না আনন্দমার্গী? কী সব বলছেন মশাই! একদিকে বাংলার সম্মান বাড়াবার জন্য লড়ব, অন্যদিকে পাপবোধ ধরে রাখব? কান খুলে শুনে নিন মশাই, বাংলার সম্মানের জন্য আমি, আমরা সব করতে পারি, পাপ-ফাপ কিছু মানি না।

— 'স্যার, হেডস্যার, আপনি একজন অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী। একটি শিক্ষায়তনের প্রধান। এমনকি কাগজপত্রেও জালিয়াতি করে বেআইনি প্লেয়ার খেলিয়ে আপনি কি খারাপ আদর্শ স্থাপন করছেন না?'

— 'দূর মশাই! আপনার মাথায় কিস্যু নেই, নট ইভন গোবর। নিজেদের আদর্শ আগে না বাংলার সম্মান আগে? আপনারা এত স্বার্থপর কেন? বাংলার সম্মানের জন্য নিজের সামান্য আদর্শ আর বিবেক বিসর্জন দিতে পারব না?'

— 'আপনি বারবার বাংলার সম্মানের কথা বলছেন। কিন্তু, বাংলার একটা স্কুলকে নিয়ে এমন বিশ্রী সব অভিযোগ উঠছে, অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হচ্ছে, এতে কি বাংলারই অসম্মান হচ্ছে না?'

— 'আপনি কচু বোঝেন। বাংলার সম্মান বাড়ানোর জন্য, বাংলার অসম্মান মেনে নিতেই হবে। এই সোজা কথাটা বোঝার মতো বুদ্ধি না থাকলে স্পোর্টস জার্নালিজম করেন কেন, এম এল এ হয়ে গেলেই পাবেন!'

৬৫

কতবার বম্বে গেছি কাজে-অকাজে। সন্ধের নরিম্যান পয়েন্টে উদ্দেশ্যহীন হেঁটে কেটেছে কত স্মরণীয় মুহূর্ত, ওবেরয় টাওয়ার্স আর সীরক-এর ঝলমলানিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে কত আশ্চর্য স্মৃতি, কত গভীর গোপন বেদনার সঙ্গী হয়ে আছে রাতের জুহু বিচ। সাজান, কৃত্রিম বম্বের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব গভীর। কিন্তু এবারের মতো শিহরিত কখনই হইনি। বম্বেতে পৌঁছেই খবর পেলাম, ২৮ ফেব্রুয়ারি কমলা নেহরু পার্কে, হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে, ভারতগৌরব, সম্ভাব্য পদ্মবিভূষণ, ফুটবল-অধীশ্বর, মহামান্য এ আই এফ এফ সভাপতি খলিফা জিয়াউদ্দিনের সংবর্ধনা সভা। চান্সটা হাতছাড়া করলাম না। নানা ব্যাপারে জিয়া সাহেব আমার উপকার করেছেন। আমি অকৃতজ্ঞ নই। উপকারের প্রতিদান দেবার চেষ্টা করেছি। বাংলার ছেলেদের ছোট করার জন্য বড় বড় লেখা বাজারে ছেড়েছি। ভারতীয় ফুটবল ঈশ্বরের আরও ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইনি। টেলিফোন করলাম : 'হ্যালো, ইয়ে, হেঁ হেঁ, আমি এসে গেছি। আপনার সংবর্ধনা, ইয়ে, আমি আসব না— তা হয়?'

—'খবরটা পেলেন কী করে? আমিই তো জেনেছি গতকাল রাত্রে। কলকাতায় বসে খবর পেয়ে গেলেন?

—'হেঁ হেঁ, হুঁ হুঁ, জিয়াদা, জার্নালিস্টদের সব খবর রাখতে হয়। কী ঘটল তা জানলেই হয় না, কী ঘটবে তা-ও জানতে হয়। আমাদের ফটোগ্রাফার বলছিল কি, আপনার ওই সবুজ লম্বা কোটটা পরে সংবর্ধনা নিলে ভাল হয়, অনেকটা সাজাহান-সাজাহান ভাব আসে, ছবিও ভাল আসে।'

জিয়াদা (একবার জিয়াদাদু বলায় খুব চটে গিয়েছিলেন, পনের মিনিট আমার সঙ্গে কথাবার্তা বন্ধ রেখেছিলেন) দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আর ছবি! যখন আঞ্জুমান স্কুলের হেডমাস্টার ছিলাম, একবার স্কুল ম্যাগাজিনে আমার ছবি দেখে তিনজন প্রোডিউসার-ডিরেক্টর টেলিফোন করেছিলেন। ফিল্মে যেতে রাজি হইনি।'

২৮ ফেব্রুয়ারি হ্যাঙ্গিং গার্ডেনে গিয়ে হতাশ হলাম। চমৎকার পরিবেশ, টেবিলে টেবিলে সাজানো খাবার, কমলালেবুর রস, চা-কফি নিয়ে বেয়ারাদের ব্যস্তসমস্ত

ঘোরাফেরা, দশ ফুট উঁচু চেয়ার, সাত হাজার টুনি বাল্ব, একদিকে শায়িত সমুদ্র— কিন্তু ডায়াসে জিয়াদা নেই। হতাশা এবং বিস্ময় গোপন ও হজম করার জন্য তিন গ্লাস কমলালেবুর রস, আধকাপ কফি, সাতটা চপ, দেড়শ গ্রাম চানাচুর আর তিনটে স্যান্ডউইচ খেলাম। ততক্ষণে বম্বের মেয়র বিশুদ্ধ পাঞ্জাবি ইংরেজিতে ভাষণ পড়তে শুরু করেছেন। বম্বে মিউনিসিপ্যালিটির টাইপিস্ট অথবা মেয়রের স্পিচ রাইটার— দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয় আগে, আই এ এফ এফ-র কর্মকর্তা ছিলেন, এককথায় অপদার্থ। মেয়র সাহেব মিনিটে পৌনে তিনবার হোঁচট খাচ্ছিলেন, হয় টাইপিংয়ে গণ্ডগোল, অথবা স্পিচ রাইটার এমন সব শব্দ ব্যবহার করেছেন যা একবারে উচ্চারণ করা মেয়রের পক্ষে সম্ভব নয়। বিরক্ত মেয়রকে কতবার যে দাড়ি আর পাগড়ি চুলকোতে হল।

উপস্থিত ভদ্রমহোদয় আর ভদ্রমহিলাগণ মেয়র সাহেবের কথা শুনছিলেন, এমন অভিযোগ কেউই করতে পারবেন না। তাঁদের কান কাজ করছিল না, মুখ ব্যস্ত ছিল সামনের প্লেটের অসাধারণ খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে, চোখ নিবদ্ধ ছিল ডায়াসে-বসা 'সানি' 'হানি' গাভাসকারের ওপর, মাঝে মাঝে অবশ্য তাঁরা দুদিকে বসা মাইকেল ফেরিরা আর রোহিণী খাদিলকারের দিকেও তাকাচ্ছিলেন। আমার পাশের টেবিলের ভদ্রমহিলা তাঁর ভদ্রস্বামীকে জিজ্ঞেস করলেন, রোহিণী খাদিলকার কে? তাকে গাভাসকারের পাশে বসতে দিয়েছে কেন? ভদ্রলোক বম্বেতে থাকলে কী হবে, প্রচণ্ড খবর রাখেন। জানালেন, রোহিণী দাবা খেলেন। ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন, দাবা ইনডোর গেম না আউট ডোর, কতজনে মিলে খেলে.... ইত্যাদি। ততক্ষণে সানি গাভাসকার ধরা গলায় বক্তৃতা দিতে উঠেছেন। আমি আরও দুটো স্যান্ডউইচ খেতে খেতে ভাবার চেষ্টা করলাম, জিয়াউদ্দিনের বদলে ফেরিরা-গাভাসকার-খাদিলকারের সংবর্ধনা হচ্ছে কেন? যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং বজ্রাহত এবং শোকাপ্লুত চিত্তে তিনজনের বক্তৃতা সহ্য করলাম। আমাদের ফটোগ্রাফার একবার মোহনবাগান-মহমেডান কভার করতে যাবার পথে ময়দানে বাঁদরের খেলায় আটকে গিয়ে তার এক্সক্লুসিভ ছবি তুলে বীরদর্পে অফিসে ফিরেছিল! খুবই স্বাভাবিক, জিয়াউদ্দিনকে না দেখেও সে অবিচলিত থাকে এবং গাভাসকার-ফেরিরা-খাদিলকারের ছবি তুলে যায়। সন্ধেটাই নষ্ট হল ভাবতাম, যদি প্লেট, কাপ আর গ্লাসের জিনিসগুলো ভাল না হত।

সভা শেষ। প্রথমে 'জনগণমন' তারপর নাজিয়া হোসেনের গান মাইক্রোফোনে ভাসল। জিয়াদার কথা ভাবতে ভাবতে আরব সাগরের দিকে তাকিয়ে কাশলাম। আরব সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিয়াদার কথা ভাবতে লাগলাম। হঠাৎ ধাতস্থ হয়ে ঘড়িতে দেখি— পৌনে দশটা। ফটোগ্রাফার সামনের চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে নিদ্রামগ্ন। কিন্তু চারপাশের অন্য অনেক টেবিলের ধারে বেশ কিছু মানুষ। সন্ধেবেলায় তাঁদের দেখিনি। মাইক্রোফোন সচল হল : আর কিছুক্ষণের মধ্যেই, ঠিক রাত দশটায় আমাদের শ্রদ্ধেয় খলিফা জিয়াউদ্দিন সাহেবের সংবর্ধনা সভা শুরু হবে। জিয়াউদ্দিন সাহেব এসে গেছেন। আজকের সভাপতি হাজি মস্তান সাহেবও এক্ষুনি এসে যাবেন। তাকিয়ে দেখি ডায়াসে সহাস্যে উপবিষ্ট জিয়াদা। বিখ্যাত সবুজ নকশা কোটটা পরে

আসতে ভুল করেননি। ফটোগ্রাফারকে জাগিয়ে বললাম, 'গেট রেডি, এবার আসল ফাংশান শুরু হবে, আমরা ভুল করে আগে চলে এসেছিলাম।' সমুদ্রের হাওয়ায় ফের খিদে মাথা চাড়া দিলে কী হবে, টেবিলে কিছু ফাঁকা গ্লাস ছাড়া কিছুই ছিল না। যথা সময়ে নাকি সব গ্লাস ভর্তি করে দেওয়া হবে। কে জানে।

সভাপতি হাজি মস্তান আসন গ্রহণ করার পর সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান এ আর আনতুলে বক্তব্য রাখলেন : 'জনাব খলিফা জিয়াউদ্দিনের সংবর্ধনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে আমাকে মনোনীত করায় আমি কৃতজ্ঞ। আসুন, বম্বের এই সন্তানের প্রতি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিবেদন করি। বহুবার আমি জিয়া সাহেবকে বলেছি, এই উপমহাদেশের অন্য দুই রাষ্ট্র জিয়া নামের দুই জবরদস্ত রাজনীতিবিদকে পেলেও, আমরা পাইনি— তিনি রাজনীতির বদলে ফুটবল জগতে থাকায়। জিয়া সাহেব অবশ্য আমাকে বুঝিয়েছিলেন, ফুটবলেও রাজনীতি আছে, এবং তা রাজনীতির রাজনীতি থেকে অনেক কূট এবং লাভজনক। ব্যক্তিগতভাবে আমি জিয়া সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ। যখন সিমেন্ট কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে আমি হাবুডুবু, জিয়া সাহেব সাহস দিয়েছেন : 'কেলেঙ্কারিকে কেলেঙ্কারি ভাবলে রাজনীতি বা ফুটবলে-রাজনীতি করা যায় না। পাবলিক প্রথমে গালাগালি দেবে, তারপর সব ভুলে যাবে, তারপর ফের ভোট দেবে আর নানা কমিটির প্রেসিডেন্ট বানাবে। আজ, যখন কোর্টে আমাকে কোণঠাসা করার চেষ্টা চলছে, তখনও জিয়া সাহেবের কথাই আমাকে মনের জোর দেয়। কথা দিচ্ছি, আবার ক্ষমতায় ফিরলে, কুপারেজে কলকাতায় সল্টলেকের চেয়েও ভাল স্টেডিয়াম তুলব, সেজন্য যদি আর একটা সিমেন্ট স্ক্যান্ডালে পড়তে হয়, পড়ব।'

প্রধান বক্তা মগন সিং লিখিত ভাষণ পাঠ করার আগে জিয়া সাহেবকে দেখিয়ে পাস করিয়ে নিলেন : 'কর্মক্ষেত্রে সফল হতে গেলে, সবচেয়ে বেশি যা দরকার— তা হল দৃঢ়তা। সফল রাজনীতিবিদ, সফল একজিকিউটিভ, সফল ব্যবসায়ী, সফল ফুটবল-রাজনীতিবিদ— যে কোন সফল ব্যক্তির দিকে তাকান। তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাই সবার আগে চোখে পড়বে। এই দৃঢ়তাই আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীজিয়াউদ্দিনকে ভারতীয় ফুটবল জগতে রাজত্ব কায়েমের সুযোগ দিয়েছে। আমি তাঁকে দেখছি বহুদিন ধরে, একেবারে কাছ থেকে। কতবার কত সঙ্গত সমালোচনার মুখে আমরা ভেঙে পড়েছি, জিয়া সাহেব শুধু নিজেই দৃঢ় থাকেননি, আমাদেরও টেনে তুলে সোজা রেখেছেন। আশি বছর বয়সে তাঁর শরীর একটু ভেঙেছে, মন নয়। আজও যে কোন অন্যায় তিনি করেন সহাস্যে ও নির্ভয়ে। এশীয় ফুটবল কনফেডারেশনের সভাপতি পিটার ভেলাপ্পন বলেছেন, নানা দেশে দুর্নীতিপরায়ণ ও ধান্দাবাজ বহু কর্মকর্তা দেখলেও আমাদের জিয়ার মতো দৃঢ়তা আর কারও মধ্যেই দেখেননি। খুবই দুঃখের কথা, ভারত সরকার 'ভারতরত্ন' না হোক অন্তত 'পদ্মভূষণ' দিয়ে জিয়া সাহেবকে সম্মানিত করেননি। এই সভায় এই মর্মে অনুরোধ ও দাবি জানিয়ে একটি প্রস্তাব নেওয়া হোক। মূল প্রস্তাব পাঠানো হোক ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টারের কাছে। কপি ফরোয়ার্ডেড টু রাজীব, সোনিয়া অ্যান্ড প্রিয়াঙ্কা গান্ধী।'

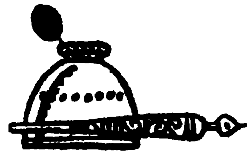
জিয়া-পুত্র পরভেজ : 'অনেকে বলেন, আমি স্বাভাবিক নই। তাহলে বলতে হয়, কোন প্রতিভাবান ব্যক্তিই স্বাভাবিক হন না। এই ডায়াসে উপবিষ্ট হাজি মস্তান, এ আর আনতুলে, আমার পিতৃদেব খলিফা জিয়াউদ্দিন— এঁদের মধ্যে কেউ কি স্বাভাবিক? স্বাভাবিক থাকলে দেশের এক নম্বর প্লেয়ারকে বাদ দেবার জন্য প্যাঁচ কষা যায়? বাবার কাছ থেকে এই অস্বাভাবিকতার শিক্ষাই আমি পেয়েছি। মাঝেমধ্যে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলি, ও কিছু না, বয়সের দোষ, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা নিশ্চয় আরও অন্তত চল্লিশ বছর এ আই এফ এফ প্রেসিডেন্ট থাকবেন। তারপর দায়িত্ব নেবার জন্য আমি প্রস্তুতি নিচ্ছি, আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন।'

আবেগে আপ্লুত জিয়াউদ্দিন সাহেব বললেন, 'অন্য পার্টির লিডার মরলে পলিটিকাল লিডাররা বলেন, শোকপ্রকাশ করার ভাষা নেই। নিজের সংবর্ধনা সভায় দাঁড়িয়ে আমাকে বলতে হচ্ছে, আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা নেই। পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতীয় ফুটবলের অক্লান্ত সেবা করে আমি অনেক কিছুই পেয়েছি, তবু নিজের শহরে যে সম্মান আজ পেলাম, তার সঙ্গে অন্য কিছুরই তুলনা হয় না। মগন সিং আজ আমার চারিত্রিক দৃঢ়তার কথা বলেছেন। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি, অন্যায় করার জন্য যে দৃঢ়তা দরকার তা মগন সিং এবং আমার ছেলের মধ্যেও দারুণভাবে আছে। আমার পর এই দুজন মিলে ট্র্যাডিশন ভালভাবেই ধরে রাখতে পারবে। আজ আমার সম্মানে যিনি সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন, সেই এম দত্তরায় কলকাতায়, বিশেষ নড়াচড়া করতে পারেন না। আমার গুরুকে স্মরণ করে বক্তব্য শেষ করছি।'

সভাপতি হাজি মস্তান বললেন, 'কথা কম কাজ বেশি— প্রয়াত সঞ্জয় গান্ধীর এই উপদেশ আমি বরাবরই মেনে চলি। জিয়া সাহেবের কাজকর্মই তাঁকে স্মরণীয় করে রাখবে।'

সভাপতি মহাশয় এর পর জিয়াউদ্দিন সাহেবের একটি বই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করলেন। প্রথম পাঁচকপিতে জিয়াদার অটোগ্রাফ আছে। ডায়াস থেকেই জিয়াদা একটি কপি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। 'হাউ টু বি অ্যান আইডিয়েল স্পোর্টস অফিসিয়াল।' এম দত্তরায়ের ভূমিকা। সংক্ষিপ্ত আত্মজীবনীর পর একে একে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার: 'কীভাবে যোগ্যদের বাদ দিতে হয়', 'কীভাবে প্রতিপক্ষদের শায়েস্তা করতে হয়', 'কীভাবে হিসাবের গরমিল সামলাতে হয়', 'কীভাবে ভোট কিনতে হয়'। বইটি শেষ হয়েছে এইভাবে: 'এই বই পড়ে যদি ভবিষ্যতের সব কর্মকর্তা নির্ভয়ে অন্যায় করার অনুপ্রেরণা পান, তবেই আমার পরিশ্রম সার্থক ও স্বপ্ন সফল হবে।'

৬৬



আমার ধারণা ছিল, এডিটরদের, বিশেষ করে সবজান্তা এডিটরদের বয়স বাড়ে না। কিন্তু দেখছি, আমাদের এডিটর সাহেবেরও বয়স বাড়ছে। সম্প্রতি তাঁর মধ্যে অত্যাশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য : তিনি এখন বাবুরাম সাপুড়ের মতো এলেবেলে লোকেদের সঙ্গেও ডেকে কথা বলেন, লেখা নিয়েও আলোচনা করেন, কখনও কখনও। মাঝেমাঝে অবশ্য আগের হাবভাব ফুটে ওঠে, কিন্তু রাতারাতি কি আর কেউ আগাগোড়া পাল্টাতে পারে?

দলবদল শুরু হওয়ার দিন বিকেলে সবে চেয়ারে-বসা ভাত ঘুম থেকে উঠেছি, এডিটর সাহেব আলতো করে ডাকলেন, 'একবার আমার ঘরে আসুন।' এখনও এই মোলায়েম সুরে অভ্যস্ত হইনি কিনা, বেশ কানে লাগল।

বললেন, 'এই যে দলবদল নিয়ে এত হইচই, তার মধ্যে আপনি একদম নেই, এটা আমার ভাল লাগছে না। কিছু করুন, কিছু ধরুন, বাজারে কিছু ছাড়ুন।'

— 'ইয়ে, আপনি যখন বলছেন, নিশ্চয় করব ধরব ছাড়ব, তাহলে আজ থেকে দলবদলের আগাম খবর দেবার দায়িত্ব আমার?'

— 'নট অ্যাট অল। ওটা অন্যদের হাতেই থাক। এব্যাপারটা না জেনেশুনে করলে কী হয়, দেখলেন না। একটা ডেইলি পেপার দলবদল শুরু হওয়ার দিন রিপোর্ট ছাপল, অমলরাজ দেশে বিশ্রাম নিচ্ছে, বাবু মানিও দেশে— ওর মা অসুস্থ। অথচ সেদিনই সাড়ে এগারটায় ওরা দুজন মোহনবাগানে সই করল, আসলে কলকাতায় পৌঁছে গেছে দু'দিন আগেই। এসব রিস্ক নেবেন না, আপনাকে কিছু লিখতে বলেছি বলে বেশি বেড়েও যাবেন না। এখন দেখছি, কিছু লোক আজেবাজে লেখা চায়। উল্টোপাল্টা ইন্টারভিউ পছন্দ করে। আমি আপনার কাছে একজ্যাক্টলি এরকম লেখাই আশা করি।

সাংবাদিক জীবনের (আহা, সা-ং-বা-দি-ক- জী-ব-ন!) শুরুতেই ফাঁকা মাঠে গোল করার, মানে, ফাঁকা মাঠ খোঁজার শিক্ষা নিয়েছি। ফুটবলারদের কথাবার্তায় তো সব কাগজপত্র ভর্তি, কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁরা ভি আই পি, অ্যাট লিস্ট ফুটবল সেক্রেটারি, তাঁদের ইন্টারভিউই ছাপা হয়। সুতরাং কিছু যখন করতে হবে, বাজারে যখন কিছু ছাড়তে

হবে, ধরতে হবে সেই মহাত্মাদের যাঁরা সরাসরি প্লেয়ার ধরেন, ছাড়েন। তিন বড় ক্লাবের তিনজন টপ রিক্রুটিং অফিসারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্ট করলাম একই সময়ে, গে রেস্টোর্যান্টে। তিনজনই অন্য দুজনকে দেখে অবাক হলেন, কিন্তু আমিও অবাক হলাম এটা দেখে যে তাঁরা তিনজন বেশ বন্ধু, সম্পর্কে কোনরকম চিড় নেই। কথাটা তুলতেই এক নম্বর রিক্রুটিং অফিসার জানালেন, 'আমরা তিনজনই রিক্রুটিং অফিসার্স ইউনিয়নের একজিকিউটিভ কমিটির একই গ্রুপের মেম্বার।'

আমার অ্যান্টিসিপেশন অনুযায়ী তিন রিক্রুটিং অফিসার হই হই করে বললেন, 'চা স্ন্যাক্স-এর বিল তাঁরাই মেটাবেন, কে কী খাবেন বলুন।'

আমার প্রথম প্রশ্ন : এবার মহমেডান টিম করতে তিনজন প্লেয়ার বাজারে নেমে গেছে। এ সম্পর্কে কোনও মন্তব্য?

এক নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : 'আমরা ইউনিয়ন থেকে এজন্য কড়া চিঠি পাঠাব তিন বড় ক্লাবের কাছে। প্রেস কনফারেন্স করব। এই অদ্ভুত কাজটা, আমাদের কাজে হাত দেবার ব্যাপারটা শুরু করেছিল সুব্রত ভট্টাচার্য। এবার মইদুল আর সাবির বড্ড বাড়াবাড়ি করল। আমরা আর এক বছর দেখব। যদি আমাদের প্রফেশনে এরকম হামলা চলতেই থাকে, বদলা নেব। ওরা প্লেয়ার হয়েও রিক্রুট করছে, আমরা রিক্রুটিং অফিসার হয়েও খেলব। আমি থার্ড ডিভিশনে একবার সিজনে তিন গোল করেছিলাম, ইয়ার্কি না।'

দ্বিতীয় প্রশ্ন : একথা কি সত্যি যে আপনারা কখনও কখনও ভয় দেখিয়ে প্লেয়ারদের সই করান? যেমন এবার— মহমেডান ভয় দেখাল দোরজি আর সরকারকে?

দু'নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : 'ভয় দেখাতে হয় মাঝে মাঝে, তবে সেটা সব ক্ষেত্রেই প্লেয়ারদের অনুরোধে। ধরুন, আপনি একটা ক্লাবকে কথা দিয়ে ফেলেছেন, হয়ত অ্যাডভান্সও নিয়েছেন, কিন্তু পরে মনে হল, অন্য টিমে থাকলে সুবিধে বেশি। ডিসিশন চেঞ্জ করতে চাইলে কথা-পাওয়া ক্লাব চটবে, সেই ক্লাবের কর্মকর্তারা ভবিষ্যতে ক্ষতি করতে পারেন, দরকার হলেও কখনও সেই ক্লাবে যাওয়া যাবে না, লোকে গালাগালি দেবে, আরও অনেক ফ্যাকড়া। তখন আপনি অন্য ক্লাবের রিক্রুটিং অফিসারদের বললেন আপনারা ভয় দেখিয়ে আমাকে নিয়ে যান। রিভলভার হলেই ভাল হয়, গপ্পোটা বেশি জমে। কথা পাওয়া ক্লাবকে পরে বলা যায়, কী করব, জোর করে তুলে নিয়ে গেল। এই লাইনটা অবশ্য খুব পুরনো হয়ে গেছে। তবু মাঝে মাঝে চলছেও, দেখতেই পাচ্ছেন।'

তৃতীয় প্রশ্ন : আগে কথা দিয়ে পরে ডিসিশন চেঞ্জ করার আর কোন লাইন আছে?

তিন নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : আছে। টাকা পয়সার ব্যাপারে ফাইনাল কথা না হলে তো আর কেউ কথা দেয় না। সেই মতো অ্যাডভান্সও হয়ে যায়। এরপর হঠাৎ আপনি টুপি থেকে নতুন বায়না বার করতে পারেন : তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে অমুককেও নিতে হবে। টিমে যদি না লাগে— তবুও। এতেই কাজ হয়। কথা পাওয়া ক্লা পিছিয়ে যায়। তাতেও কাজ না হলে, বলতে পারেন টিম হয়নি বলে চলে যাচ্ছি। ভাইয়ের কেরি করে দেননি বলে চলে যাচ্ছি .. এইরকম কত আছে।

চতুর্থ প্রশ্ন : অ্যাডভান্স কত পার্সেন্ট দিতে হয়?

এক নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : 'ভ্যারি করে, জিরো থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট। বাজে প্লেয়ারকে কোনও অ্যাডভান্স দেওয়া হয়নি, এমন নজির যেমন আছে, ভাল প্লেয়ারকে গোটা অ্যামাউন্ট অ্যাডভান্স করতে হয়েছে— এমন ব্যাপারও ঘটেছে। একবার তো আমার ক্লাব টোটাল অ্যামাউন্টের চেয়ে দেড় হাজার টাকা বেশি অ্যাডভান্স দিয়েছিল, একজন ফরোয়ার্ডকে। অ্যাডভান্স বেশি নেবার জন্য সব ফুটবলারই চাপ দেয়। প্রথম কারণ, শেষ পর্যন্ত টাকা মেরে দেবার ব্যাপারে তিন বড় ক্লাবের সুনাম। দ্বিতীয় কারণ, আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, ঠিক এই সময়েই ফুটবলারদের হঠাৎ প্রচুর টাকার দরকার পড়ে। কারও তখনই জমি কিনতে হবে, কারও তখনই ফ্ল্যাটের জন্য টাকা জমা দিতে হবে, কারও বোনের তখনই বিয়ে, কারও ঘাড়ে প্রচুর দেনা এবং তা তখনই মেটাতে হবে।

পঞ্চম প্রশ্ন : এগারজনকে নিয়ে ফার্স্ট টিম, আরও ধরলাম এগারজন, বাইশজন প্লেয়ারই তো যথেষ্ট। তবু আপনারা, মানে সব বড় টিম তিরিশ-বত্রিশজন করে প্লেয়ার সই করান কেন?

দুনম্বর রিক্রুটিং অফিসার : তিনটে কারণ দেখাতে পারি। এক, অন্তত তিন চারজনের চোট থাকবে, তিন-চারজন অ্যাবসেন্ট থাকবে, তবু যাতে সকালে দুটো টিম করে প্র্যাকটিস ম্যাচ খেলা যায়, তার ব্যবস্থা রাখা দরকার। দুই, আমরা রিক্রুটিংয়ের ব্যাপারে এত বেশি স্পেশালিস্ট যে, খেলা দেখার বা বোঝার সময় পাই না। তাই, বেশি জুনিয়র প্লেয়ার নিতে হয়, তার মধ্যে যে দাঁড়ায়। আটজনকে নিলে একজন দাঁড়াবে না? তিন, সিজনের শেষের দিকে অন্তত এক ডজন বিক্ষুব্ধ প্লেয়ার দেখা যায়, পেমেন্ট বা চান্স না পেয়ে। চোট তো কিছু থাকবেই। তখন শেষের দিকে টুর্নামেন্টগুলোয় টিম হবে কী করে? তাই অ্যাট লিস্ট বত্রিশজনকে নিতে হয়।

ষষ্ঠ প্রশ্ন : স্টার প্লেয়াররা আপনাদের ঘোরায় না? নাচায় না? বাড়িতে থেকেও 'নেই' বলে পাঠায় না?

তিন নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : বলে না আবার, তবে আমাদেরও অনেক টেকনিক আছে। বাড়িতে নেই শুনলে কাছাকাছি কোন চায়ের দোকানে বা মোড়ে ঘাপটি মেরে থাকি, যাতে বাড়ি থেকে বেরলেই দেখা যায়। বাড়িতে না থাকার কথাটা বাইচান্স সত্যি হলেও ক্ষতি নেই, বাড়িতে ফেরার মুখে ধরি। টেলিফোনে 'নেই' শুনলে, দশ মিনিট পর গলা পাল্টে এমন নাম বলি যে প্লেয়ার দৌড়ে এসে রিসিভার ধরে। কখনও কখনও হঠাৎ গেরিলা পদ্ধতিতে বেডরুমে ঢুকে পড়ি। প্লেয়ারের মা-বাবাকে প্রণাম-টনাম করেও মাঝে মাঝে কাজ হয়।

সপ্তম প্রশ্ন : রিক্রুট করার সময় আর কোনও সমস্যা?

এক নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : কত আছে। এই ধরুন দাদার সমস্যা। এই দলবদলের সময় হঠাৎ ফুটবলারদের এক একজন দাদা গজায়। প্লেয়ারের হয়ে এঁরা নতুন নতুন দাবি জানান। দলবদল শেষ হবার পরই দাদারা অদৃশ্য হন।

অষ্টম প্রশ্ন : আপনাদের মিথ্যা কথা বলতে হয় না?

দু'নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : 'ভাল প্লেয়ারদের অ্যাডভান্স এবং আমাদের মিথ্যার পার্সেন্টেজ প্রায় সমান— সেভেন্টি টু সেন্ট পার্সেন্ট। মিথ্যা কথাটা আমাদের দিয়েই বলানো হয়, যাতে সেক্রেটারিরা পরে ভালমানুষ সেজে বলতে পারেন, এমন কথা দেওয়া হয়েছে— তা তো আমি জানতাম না! অমুককে সই করাবে না, এই গ্যারান্টি পেয়ে তুমি সই করেছ? ইস, ...টা এমন মিথ্যা কথা বলে! যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে, এবার থেকে আমার সঙ্গে সরাসরি কথা বলবে, কেমন?'

নবম ও শেষ প্রশ্ন : ইন্টারভিউতে প্রথমেই আপনাদের ইউনিয়ন, প্রতিবাদ এবং সমস্যার কথা উঠেছিল। আপনাদের কি আর কোনও সমস্যা বা দাবি আছে?

তিন নম্বর রিক্রুটিং অফিসার : 'অনেক আছে, আপাতত একটা নিন, তিন ক্লাবই কলকাতার বাইরের ফুটবলার আর আনছে না। এতে আমাদের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছে। বাইরের একজন ফুটবলারের জন্য অন্তত তিনটে ট্যুর পাওয়া যায়, সঙ্গে কত কিছু। কিন্তু, দুর্ভাগ্য, ক্লাবগুলোর আর উৎসাহ নেই। আমাদের ইউনিয়নের এক সিনিয়র মেম্বার এবার সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিলেন। তিনবার দিল্লি গিয়েও তিনি পারমিন্দারকে আনতে পারলেন না। এইসব বাজে লোক প্লেয়ার রিক্রুটিংয়ের মতো মহৎ প্রফেশনে এলে, ক্ষতি তো হবেই। এই ভদ্রলোককে অবশ্য ইউনিয়ন থেকে তাড়ানো যাবে না, একটা বড় ক্লাবের সেক্রেটারির ভাই কিনা।'

৬৭

প্রাক্তন ক্রীড়াবিদকে ইন্টারভিউ করা যে এত কঠিন, এই প্রথম জানলাম। অতীতের বিখ্যাত দৌড়বীর ও মুষ্টিযোদ্ধা, প্রয়াত বলাইদাস চট্টোপাধ্যায়ের অন্যতম প্রধান শিষ্য জ্যাকিদা অবশ্য পরবর্তীকালে হরতালদা এবং মূর্তিমন্ত্রী হিসেবে প্রচুর নাম করেছেন। কিন্তু মূলত যেহেতু তিনি খেলার মাঠেরই লোক, তাঁর এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেবার অধিকার বাবুরাম সাপুড়ের আছে।

পরপর সাতদিন মাননীয় মন্ত্রী জ্যাকি ওরফে যতীন চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। প্রথম দিন সকালে রাইটার্সে গিয়ে জানা গেল, একটি ক্যারম কম্পিটিশনের উদ্বোধন করতে বালিগঞ্জ গেছেন। দ্বিতীয় দিন মাননীয় মূর্তিমন্ত্রীর কনফিডেনশিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট জানালেন, অনারেবল মিনিস্টার মাছ-ধরা প্রতিযোগিতার চিফ গেস্ট হয়ে বেলেঘাটায় গেছেন। তৃতীয় দিন মোহনবাগান ক্লাবের ডিফেন্স কমিটির মিটিং। জ্যাকিদা চেয়ারম্যান। এডিটর সাহেবের কাছে কনফেস করলাম, এই প্রথম একজন স্পোর্টস পারসোনালিটির ইন্টারভিউ নেবার অ্যাসাইনমেন্ট ফেইল করলাম। এডিটর সাহেব বললেন, 'উল্টোপাল্টা না ঘুরে রাইটার্সের প্রেস কর্নারে বসে থাকুন, জ্যাকিদা নর্থ বেঙ্গলে থাকলেও একবার প্রেস কর্নারে আসেন। অ্যাডভাইস নাম্বার টু, সঙ্গে ফটোগ্রাফার রাখবেন। ছবি ছাপার চান্স থাকলে জ্যাকিদা ক্যাবিনেট মিটিংও মিস করতে রাজি। লেগে থাকুন, হয়ে যাবে।'

হল না। পরপর আরও চারদিন জ্যাকিদাকে পাওয়া গেল না, অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ সভা এবং অনুষ্ঠানে ব্যস্ত থাকায়। হতাশ হয়ে ঠিক করলাম, আপাতত বাংলার কোচ শান্ত মিত্রর একটা ইন্টারভিউ নেওয়াই ভাল। জ্যাকিদার জন্য পরের সপ্তাহের সাতদিন লড়া যাবে।

২৩ মার্চ সকালে বাংলার ট্রেনিং-এর পরে শান্ত মিত্রকে ধরার আশায় মাঠে গেলাম। দূর থেকে প্রচুর পুলিস দেখে ঘাবড়ে গেলাম। পুলিস দেখলেই বুক ঢিপঢিপ করে, কারণ আমি ক্রিমিনাল নই। পুলিস খুব পবিত্র ও শুচিবায়ুগ্রস্ত জীব, কখনও খারাপ লোকেদের

ছোঁয় না। যথাসম্ভব ক্রিমিনাল ক্রিমিনাল মুখ করে মাঠের ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। শান্ত মিত্র কী যেন বোঝাচ্ছিলেন ভাস্কর গাঙ্গুলিকে, ভাস্কর কী যেন বোঝাচ্ছিলেন সুদীপকে, সুদীপ কিছু একটা বলছিলেন বিশ্বজিৎকে। বিশ্বজিৎ কী করছেন বোঝার আগেই জ্যাকিদার গলা পেয়ে রোমাঞ্চিত হলাম। সাত দিন লড়াই করে যাঁর দেখা পাইনি, ওই তিনি বসে আছেন, মাত্র আট গজ দূরে, চেয়ারে, সহাস্যে। সুভাষ ভৌমিকের সেরা ফর্মের মতো 'অফ দি মার্ক স্পিড' নিয়ে জ্যাকিদার আট ইঞ্চির মধ্যে গিয়ে আর্জি পেশ করলাম, 'বাবুরাম সাপুড়ে ফ্রম 'খেলা', আপনার একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নিতে চাই।' জ্যাকিদা চুরুট নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ফোটোগ্রাফার কোথায়?' এস এস কাঞ্জিলালকে দেখিয়ে দিলাম।

— 'যাক, ইন্টারভিউ নিতে যাকেই পাঠাক, ফোটোগ্রাফারটা ভাল পাঠিয়েছে। আপনি দু-চারটে কোয়েশ্চেন করুন, আর কাঞ্জিলাল ভায়া ততক্ষণে দশ-বিশটা ছবি তুলুন।'

— 'রাইট। আচ্ছা অনারেবল মিনিস্টার, এত সকালে আপনি মাঠে এসেছেন কেন?'

— 'রং। আমাকে অনারেবল মিনিস্টার বলবেন না।'

— 'ওকে। মিঃ চক্রবর্তী....'

— 'ধুস্! আমাকে জ্যাকিদা বলবেন। মাঠে ছোট আর স্মার্ট নামই ভাল। কেন মাঠে এসেছি, এই নিয়ে হতচ্ছাড়া কাগজগুলো কাল যাচ্ছেতাই লিখবে। আমি মনে করি সব কাগজই হতচ্ছাড়া, কিন্তু কাগজের রিপোর্টারগুলো সব সোনার ছেলে। আমি খবরের কাগজের শত্রু, কিন্তু খবরের কাগজের লোকেদের বন্ধু। সবাইকে ফ্ল্যাট দিয়ে ফ্ল্যাট করি, যাতে কিছু না লেখে। তবে সবাইকে তো আর ফ্ল্যাট দেওয়া যায় না, তারাই যাচ্ছেতাই লেখে। আমি ভাল করেই জানি, কাল ফ্ল্যাট-না-পাওয়া, আই মিন ফ্ল্যাট-না-হওয়া লোকেরা লিখবে, আমি এখানে এসেছি মানি আর অমলরাজকে পাহারা দিতে। লিখবে আমার নির্দেশেই এত পুলিস আজ এখানে এসেছে। লিখবে, এসবই আমি করেছি আমার মোহনবাগান ক্লাবের জন্য। আসলে আমি এসেছি বাংলার জন্য। বাংলার ছেলেরা ম্যাড্রাসে কেমন খেলবে, বুঝতে এসেছি। ওদের এনকারেজ করতে এসেছি। মানি আর অমলরাজকে যাতে কলিমুদ্দির গুণ্ডারা ডিসটার্ব করতে না পারে, সেজন্য পুলিস রাখার ব্যবস্থা করেছি। আফটার অল, মানি আর অমলরাজ বেঙ্গলের ভাইটাল প্লেয়ার।'

— 'জ্যাকিদা, কলিমুদ্দি কে?'

— 'শামস, ডেপুটি স্পিকার।'

— 'ও কলিমুদ্দিন শামস।'

— 'আমি কলিমুদ্দিন বলি না, বললে কিছুটা ভাল শোনায়। আসলে ও এত বাজে লোক, কলিমুদ্দি বললে ঠিক হয়।'

— 'কলিমুদ্দিনের ওপর আপনার রাগ কেন? এসপ্লানেড হকার্স ইউনিয়নের ব্যাপারে, না মহমেডান স্পোর্টিংয়ে থাকার জন্য?'

— 'আরও অনেক কারণে। ভাল গাড্ডায় পড়েছে এবার, আর মাঠের ব্যাপারে নাক

গলানোর টাইম পাবে না। মোহনবাগান হল গিয়ে বাংলার গৌরব, মোহনবাগানের জন্য কিছু করা মানে বাংলার জন্য কিছু করা। আজ অবশ্য আমি মোহনবাগানের মানি-অমলরাজকে পাহারা দিতে আসিনি, বাংলার মানি-অমলরাজকে নিশ্চিন্ত করতে এসেছি।'

— 'বেঙ্গলের প্র্যাকটিস তো দেখলেন। কার ক্যাপ্টেন হওয়া উচিত?'

— 'আপনি একটা খবর দিতে পারেন, প্রশান্তর মোহনবাগানে আসার ব্যাপারটা কতখানি নিশ্চিত?'

— 'মনে হয়, মোহনবাগানে সই করবেই।'

— 'করবেই! বাঃ, তবে প্রশান্তর ক্যাপ্টেন হওয়া উচিত। আগে অবশ্য আমি বিদেশের কথা ভেবেছিলাম। এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে, প্রশান্ত।'

— 'জ্যাকিদা, এসবই আপনি বলছেন বাংলার কথা ভেবে, তাই তো?'

— 'হ্যাঁ। নেক্সট কোয়েশ্চেন।'

— 'গত বছর মহমেডানকে সবার আগে বড় ম্যাচ খেলতে বাধ্য করেছিলেন কেন, ওদের টার্ন না থাকা সত্ত্বেও?'

— 'এই কোয়েশ্চেনটা বাদ দিচ্ছি।'

— 'বাদ দিচ্ছেন মানে?'

— (চুরুট ধরিয়ে) 'সব কোয়েশ্চেনের অ্যানসার দেবার নিয়ম আছে নাকি? এনি ফাইভ, এনি সিক্স, আইদার অর— এসব থাকে না? আমি এই কোয়েশ্চেনটা টাচ করলাম না।'

— 'জ্যাকিদা, প্রশান্ত মোহনবাগানে সই করতে গেলে যদি অশান্তি হয়?'

— 'জার্মানরা কোনও অশান্তি করার সাহস পাবে না। ওদের বাঁচাবে কে? ওদের জ্যাকিদা নেই, কলিমুদ্দিও নেই।'

— 'এটা কী বলছেন? ময়দানে ওদের স্ট্রেংথ নেই? মারপিট হলে...

— 'দেখুন, ফুটবলের মতো মারপিটও আজকাল আর ইনডিভিজুয়াল গেম নয়। টিমওয়ার্ক চাই। প্রশান্তকে সই করানোর দিন একটা জিপে আমার অ্যাকশন স্কোয়াডের ছেলেরা থাকবে, ঝামেলা এড়ানোর জন্য আই এফ এ ট্রান্সফার অফিসের সামনে প্রচুর পুলিসও থাকবে। পুলিস এবং মস্তানের কম্বিনেশনের মতো ভাল জিনিস আর হয়?'

— 'ঐ অ্যাকটিভ জিপটাও বাংলার খেলাধুলোর উন্নতির জন্যই যাবে আশা করি?'

— 'হ্যাঁ, ময়দানে অশান্তি হলে বাংলার খেলাধুলোর সর্বনাশ। এই সর্বনাশ আমি হতে দেব না।'

— 'ইস্টবেঙ্গল (বা মহমেডান) মাঠে কি কখনও ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা হবে না?'

— 'কলিমুদ্দির ক্লাবের মাঠে ওসবের প্রশ্নই ওঠে না। ইস্টবেঙ্গল মাঠে বছর পাঁচেক আগে এজন্য আমি ভিজিট-টিজিট করেছিলাম। অনেক খরচ। এই রাজ্যে বাজে খরচ এখন যত কম করা যায়। মোহনবাগান মাঠে, বাংলার গর্ব মোহনবাগানের মাঠে ফ্লাডলাইট আছে। কলকাতায় দুটো মাঠে ফ্লাডলাইটের কী দরকার? তাছাড়া, জার্মানরা ওসব

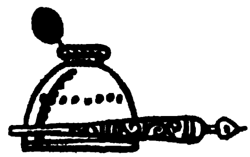
হ্যালোজেন-ট্যালোজেন হ্যান্ডলও করতে পারবে না।'

— 'কিন্তু জ্যাকিদা....'

— 'নো মোর কোয়েশ্চেন। মানি-অমলরাজ মোহনবাগানের গাড়িতে উঠে পড়েছে। আপনাদের কাঞ্জিলালের ক্যামেরার রিলও ফুরিয়ে গেছে। নমস্কার।'

— 'নম—'। আমি কথা শেষ করার আগেই, সুভাষ ভৌমিকের মতো 'অফ দি মার্ক স্পিড' নিয়ে জ্যাকিদা সাদা অ্যাম্বাসেডরে সেঁধিয়ে গেলেন।

৬৮



দেশগৌরব, ময়দানকুলতিলক, অভিজাত কর্মকর্তা শ্রী ধীরেন দে মহোদয়ের উদ্দেশে এই মানপত্রটি নিবেদিত। পাঠক-পাঠিকাগণ মনে মনে এই মানপত্র পাঠ করিবেন এবং মনে মনেই প্রত্যেক প্যারাগ্রাফের শেষে হাততালি দিবেন। হাত ব্যথা হইয়া গেলে 'হিয়ার হিয়ার' বলিবেন। মুখ ব্যথা হইলে, ফের হাততালি দিবেন। আবার হাত ব্যথা হইলে 'হিয়ার হিয়ার'— এইরূপ চলিবে।

'হে মহান ময়দানব, আপনি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা, হৃদয়ের ভালবাসা ইত্যাদি প্রভৃতি গ্রহণ করুন। গত তিন দশক ধরিয়া (মতান্তরে আরও বেশি কাল) ময়দান সেবার যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আপনি স্থাপন করিয়াছেন, ময়দানী কর্তাগিরিকে যে মোলায়েম শয়তানির পর্যায়ে তুলিয়া নিয়াছেন, সেজন্য আমরা গর্বিত। হে মহাপুরুষ, আপনি এই গর্বের ভাগ নিন।

অন্য ক্লাবের কর্তাদের কলা দেখাইয়া যেভাবে আপনি কিবা কং কিবা বাম সরকারের মন্ত্রীদের তৈলমর্দনে বিশেষজ্ঞ হইয়াছেন, এবং অনেক অন্যায়ের উপর আভিজাত্যের আস্তরণ লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহার কোনও তুলনা ভূভারতে নাই। হে মহান তৈলমর্দক, আপনি আমাদের বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার্ঘ্য গ্রহণ করুন।

মোহনবাগান ক্লাবে খেলোয়াড় আসিয়াছে, খেলোয়াড় গিয়াছে, কিন্তু আপনি আছেন এবং সেই খেলোয়াড়দের মেম্বারশিপ কার্ড আছে। মোহনবাগান উদার ক্লাব, সব খেলোয়াড়কেই সদস্যপদ দেয়। গত তিন দশকে এই খেলোয়াড়দের মধ্যে কেহ কেহ দেহ রক্ষা করিয়াছেন, অনেকে এই রাজ্যেই থাকেন না, অনেকে কলিকাতা এবং কাছাকাছি থাকিলেও ময়দানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। হে ময়দানকুলচূড়ামণি, আপনার মহত্ত্ব অপরিসীম, ইহাদের সকলেরই মেম্বরশিপ কার্ডের বোঝা নিজের বৃষস্কন্ধে বহন করিতেছেন। এই খেলোয়াড়েরা অনেকে জানেনেই না, তাঁহাদের হইয়া চাঁদা আপনিই দেন, এমনকি তাঁহাদের হইয়া প্রয়োজনে ভোট দিবার ক্লেশও স্বীকার করেন। কী অসীম ত্যাগ, গত তিন দশক ধরিয়া নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করিয়া আপনি মোহনবাগান ক্লাবের সেবা করিয়াছেন। মোহনবাগান ক্লাব বাংলা তথা ভারতবর্ষের গর্ব, সুতরাং আপনি বাংলা

ভারতবর্ষেরই সেবা করিয়াছেন। হে দেশমাতৃকার অক্লান্ত সেবক, আপনি আমাদের প্রণতি গ্রহণ করুন।

আজ, এই শুভমুহূর্তে স্মরণ করি ময়দানী কর্মকর্তাগিরির কী কী বিচিত্র নূতন দিগন্ত আপনি উন্মোচিত করিয়াছেন। এমনিতে আপনি নিজেদের পারিবারিক ব্যবসার সাতেপাঁচে থাকেন না, কিন্তু খেলোয়াড়রা টাকা চাইতে গেলেই, আপনার চেম্বারে ঘন ঘন ফাইল আসিতে থাকে। আপনি গভীর অভিনিবেশসহকারে ফাইল দেখিতে থাকেন, এবং ফাইলগুলি গভীর বিস্ময়ে আপনাকে দেখিতে থাকে। ততোধিক বিস্ময় ও অসহায়তায় বিমূঢ় খেলোয়াড় তখন অন্যদিন আসিবার কথা বলিয়া ভগ্নহৃদয়ে ও শূন্যহস্তে প্রস্থান করে। শুনিয়াছি, আপনার টেবিলের নিচে গোপন বোতাম আছে। টিপিলেই টেলিফোনে বেল বাজে। খেলোয়াড় আসিয়া পাওনা টাকার জন্য উত্ত্যক্ত করিলেই নাকি সেই বোতামে আপনার জুতার চাপ পড়ে, দূরভাষযন্ত্র সরব হয় (এই টেলিফোন কানে শুনে কখনই বিঘ্ন ঘটে না। এবং আপনি বলিতে থাকেন : 'হ্যাঁ, বলছি, জ্যাকিদা (সময়ান্তরে মানুদা ইত্যাদি) হুঁ, হ্যাঁ, আচ্ছা, এখনই আসছি!' এইরূপ টেলিগ্রাফিক কথাবার্তা বলিয়া আপনি ঝপ করিয়া গাত্রোত্থান করেন এবং বেচারা খেলোয়াড়কে জানান যে তখনই রাইটার্স বিল্ডিংয়ে ছুটিতে হইবে, চিফ মিনিস্টার (বা মিনিস্টার) তলব করিয়াছেন। শোনা কথা, একবার এক ক্রিকেটারের পিতা তাঁহার পুত্রের পাওয়া টাকা নিতে আপনার কাছে গিয়াছিলেন। আপনি বলিয়াছিলেন, আপনার ক্লাবের কাছে পাওনা টাকাকে ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকার সঙ্গেই তুলনা করা যায় এবং ক্রিকেটারের পিতার উচিত অবিলম্বে পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করা এবং তখন তিনি বুঝিবেন, মোহনবাগানে খেলার সুবিধা কত। হে সুচতুর ময়দানদেবতা, আপনি আমাদের বিমুগ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

হে ময়দানদেব, আপনাকে মাঝে মাঝে অরণ্যদেব মনে হয়, বিশেষত যখন চোখে বিখ্যাত বিচিত্র সানগ্লাসটি দেখি। আপনাকে অরণ্যদেব মনে হয়, যখন আপনাকে কোনও ঘটনাস্থলে অকস্মাৎ আবির্ভূত হইতে দেখি। যে ম্যাচে এক বা দুই পয়েন্ট পাইলেই মোহনবাগান লিগ চ্যাম্পিয়ন হইবে, সেই ম্যাচ চলার সময়ে আপনাকে দেখা যায় না, জনশ্রুতি এই যে তখন আপনি গঙ্গাতীরে বায়ুসেবন অথবা মোটরবিহার করেন। কিন্তু খেলা শেষ হইবার পর, মোহনবাগান চ্যাম্পিয়ন হইলে যেই ফ্ল্যাগ তুলিবার আয়োজন হয়, আপনি অবলীলাক্রমে ফ্ল্যাগপোস্টের নিচে আবির্ভূত ও দণ্ডায়মান হন। সেদিন আপনার গায়ে উজ্জ্বল হাওয়াই শার্ট থাকে। করোটি চিহ্ন এবং মারদাঙ্গার ব্যাপারটি বাদ দিলে আপনাকে অরণ্যদেব ভাবিতে অসুবিধা নাই। হে অরণ্যদেবসম ময়দানদেব, আপনি আমাদের প্রণাম গ্রহণ করুন।

হে কর্মকর্তাকুলচূড়ামণি, আপনি কোনদিনই প্রচারের কাঙাল ছিলেন না। কদাচিৎ সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন, সাক্ষাৎকার দেন না বলিলেই হয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে নিঃসঙ্গ, নিঃস্বার্থ ও নীরব সেবার নজির গড়িতেই আপনি ভালবাসেন। কিন্তু, কী দুর্দান্ত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গেই না আপনি কিছু ব্যতিক্রম মানেন। প্যাঁকে বা প্যাঁচে পড়িলে বাঁচিবার

জন্য কতিপয় সাংবাদিক হাতে রাখেন। টিকিট বিক্রি বাড়াইবার এবং পিঠ তখনকার মতো বাঁচাইবার জন্য খবরের কাগজকে এই মিথ্যা গেলান যে ক্রুক টাউনের হইয়া ববি চার্লটন অবশ্যই আসিতেছেন, এবং আপনার অনুরোধে সেই খবর লন্ডন হইতে প্রাপ্ত বলিয়া ছাপা হয়। প্রচার ভালবাসেন না, কিন্তু ডুরান্ড ফাইনালের দিন সকালে (নিজের ক্লাব উঠিলে) অরণ্যদেবসম ক্ষিপ্রতায় দিল্লি হাজির হন এবং খেলার পর রাষ্ট্রপতির সহিত গ্রুপছবিতে সসম্মানে বিরাজ করেন। হে কর্মকর্তাশ্রেষ্ঠ, আপনি আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

ময়দানে কত কর্মকর্তা হিসাবের গরমিলের কাঁটায় পদ্মযুগল ক্ষতবিক্ষত করিয়াছেন, অডিটের কলার খোসায় পা পিছলাইয়া কতজন ভূমিশয্যা নিয়াছেন। কিন্তু আপনি, ক্রুকটাউন এবং কসমস— দুইটি ফাঁড়া কী অটুট আত্মবিশ্বাসে অতিক্রম করিলেন! কতজন কতরকম খোঁচা মারিল, আরও কতজন কত কী মারিল, আপনি যে আলোকে সেই আলোকেই রহিলেন। হে বীর ময়দান হিসাবশাস্ত্রবিশারদ, আপনি আমাদের অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

অন্য বড় ক্লাবের কুখ্যাত কর্মকর্তারা এত বছর ধরিয়া খেলোয়াড় তাড়াইবার কতরকম চক্রান্ত ফাঁদিয়াছেন, কিন্তু এবার আপনি যে মসৃণ দক্ষতায় শিবাজী-গৌতম-প্রসূনকে বিতাড়িত করিলেন, তাহার তুলনা কোথায়? ওই কর্মকর্তাদের মুখে একেবারে ঝামা ঘষিয়া দিয়াছেন, এবার তাঁহাদের জন্য একটি টিউটোরিয়াল হোম খুলিবার দায়িত্ব হয়ত আপনাকেই নিতে হইবে। খেলোয়াড় বিতাড়নের মতো কঠিন সাবজেক্ট আপনি যেমন অনায়াসে আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহা সব শিক্ষার্থীর মধ্যে আশা করিলে অবশ্যই ধৈর্য হারাইবেন। আপনি অসাধারণ, আপনি তুলনাহীন। হে অতুলনীয় ময়দানকেশরী, আপনি আমাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।

ময়দানের অধিকাংশ কর্মকর্তাই ভিলেন, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা নাটকের অথবা বিংশ শতাব্দীর হিন্দি সিনেমার ভিলেন। আপনার মধ্যে আছে এক মসৃণ চাতুর্য, মোলায়েম চালাকি, সুমিষ্ট অন্যায়প্রবণতা। হে একবিংশ শতাব্দীর আদর্শ ময়দান-ভিলেন, আপনি আমাদের চমৎকৃত অভিবাদন গ্রহণ করুন।

মুগ্ধ, বিস্মিত, চমৎকৃত, পুলকিত, শিহরিত এবং গর্বিত ক্রীড়ামোদীদের পক্ষে—

৬৯

এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে ক্রীড়া সাংবাদিক হিসাবে পাত্তা না পেয়ে আমি হতাশ। অন্তত ছাব্বিশ বছরের বহুমুখী অথচ একাগ্র সাধনা ছাড়া যে প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়া সাংবাদিক হওয়া যায় না, তা জেনেই আমি এ লাইনে এসেছিলাম। আসলে, আমি হতাশ ও বিরক্ত অন্য কারণে। ঠিকমত ধরারও আগে ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করছে খেলার লেখা। এক কথায় ছাড়াও যাচ্ছে না, কারণ আমার মতো নিরেট মাথার পক্ষে স্পোর্টস জার্নালিজমই বেজায় কঠিন। সাবজেক্ট এবং লাইন, অন্য কিছুতে তো রোজ দুবেলা দুকাপ চা-ও জুটবে না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, মাঝেমাঝে মনে হয় খেলা নিয়ে হিজিবিজি লেখা ছেড়ে দিই, তারপর যা হয় তা হবে। জীবনে সফল হবার জন্য যা যা দরকার, ঈশ্বর ঠিক সেই জিনিসগুলিই আমাকে দিতে সযত্নে ভুলে গেছেন। তবু অসফল, অখ্যাত, অপদার্থ মানুষেরও তো আছে বেঁচে থাকার ন্যূনতম আনন্দ, যা কেউ কেড়ে নিতে পারে না, যার জন্য কারও কাছে হাত পাততে হয় না। খ্যাতি, যশ, ঐশ্বর্য, সম্মান, প্রতিপত্তি তোলা থাক সফল মানুষদের জন্য। আমার মতো অখ্যাত মানুষের জন্য আছে কার্পণ্যহীন প্রকৃতি। সেখানে আনন্দ কিনতে হয় না, কেনা যায়ও না। এই আনন্দই এতকাল আমাকে দিয়েছে বাঁচার ইচ্ছা। কিন্তু, গত কয়েক বছরে সেই আনন্দ ক্রমশই বিলীয়মান। এবং এজন্য আমি ক্রীড়া সাংবাদিকতাকেই সরাসরি দায়ী করছি। প্রকৃতি থেকে আনন্দ শুষে নেবার পেশা। পালাবার একটি পথও খোলা থাকলে, আমি সেই পথেই ঝাঁপাতাম।

গত মাসে এক রবিবারে ঘুম ভেঙেছিল একটু অস্বাভাবিক ভোরে, সম্ভবত কৃষ্ণচূড়ার নীরব ডাকে। দরজা খুলে, বারান্দায় প্রায় অর্ধশতাব্দীপ্রাচীন বেতের চেয়ার পেতে বসতেই দেখি, বাড়ির সামনের কৃষ্ণচূড়া গাছটি হাওয়ায় দুলছে, হাসছে। ডালে ডালে লালের সঙ্গীত, নীল রঙের আকাশের ক্যানভাসে কোন মহৎ শিল্পীর দুরন্ত তুলির টানে এমন প্রাণ পেল চেনা লাল রঙ, পাশের গাছের সবুজ পাতায় যেন তারই কানাকানি। ছড়িয়ে পড়ার আগে যেন একটু ভেবে নিচ্ছে সকালবেলার লাবণ্যময় রোদ। বাঁ হাতে ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা, ডান হাতের তর্জনী ও মধ্যমার মাঝখানে স্থাপিত দিনের প্রথম সিগারেট, সামনে

উদ্ধত সুন্দর কৃষ্ণচূড়া। আনন্দ.... জীবন.... নিশ্চয় সারা জীবন টিকে থাকবে না এই আশ্চর্য সময়, তবু কয়েকটা মিনিট.... অন্তত কয়েকটা মিনিট! কিন্তু কে জানে কেন, হয়ত তাঁকে নিয়ে বড় বেশি ভাবছি বলেই হঠাৎই মনে পড়ে গেল মোহনবাগানের সম্পাদক ধীরেন দে-র কথা। মনে পড়ল, তাঁর একটা ইন্টারভিউ নিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে গেল আনন্দের সময়। মুহূর্তের মধ্যে সকালের রোদ্দুর হারাল তার কোমলতা। দুর্ধর্ষ কৃষ্ণচূড়াকেও মনে হল সাধারণ, সব কিছুই যে যার নিজের জায়গায় ফিরে এল। নীল আকাশ, রোদ্দুর, কৃষ্ণচূড়া, চা, সিগারেট, মন— সব কিছু। খেলার লেখা না লিখতে হলে আমাকে ধীরেন দে-র মতো মানুষকে নিয়ে ভাবতে হত না। এই আশ্চর্য সকালটি এভাবে হারাতে হত না।

গত বছর জুনের এক রাত্রে দম বন্ধ হয়ে আসছিল বম্বের সীরক হোটেলে এক হট্টগোলের আসরে। মাথা ঝিমঝিম, সকলের কথা আর উচ্চগ্রাম হাসি যেন হাতুড়ির ঘা মারছিল, ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলাম তিনতলার ছাদে। বাইরে তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি, ছাদের কার্নিশে হাত রেখে ঝুঁকে দেখি, সামনে রাতের মায়াবী উত্তাল কালচে নীল সমুদ্র। ঢেউ আছড়ে পড়ছে সীরক হোটেলের গায়ে, ঠিকরে ওপরে উঠছে সমুদ্রের নোনা জল, সেই জলের ছিটে লাগছে মুখে, মাথার ওপর ঝিরঝিরে বৃষ্টি। আর ছিল আরব সাগরের উত্তাল হাওয়া মুহূর্তটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য। আরব সাগরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, দুর্দান্ত আনন্দকে দু-হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে ধরতেই মনে পড়ল পুরীর সমুদ্রের কথা। শেষবার পুরী গিয়েছি কটক (এবং রাউরকেল্লা) ন্যাশনালের সময়। এবং সমুদ্রের আয়নাতেই যেন ভেসে উঠল আই এফ এ সম্পাদক অশোক মিত্রর মুখ। আর আনন্দ থাকে?

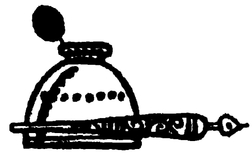
এই তো সেদিন, দিল্লি যাওয়ার পথে ঘুম ভেঙেছে কাকভোরে, আর সবাই গভীর ঘুমে, এয়ারকন্ডিশন্ড কামরার অভিশাপ— কাচ তোলা যাচ্ছে না, তবু পর্দা সরিয়ে চোখ মেলে দেখি সামনের বিস্তৃত মাঠের শেষে, দিগন্তে সূর্যোদয়। নির্মল আকাশে উঠে আসছে উজ্জ্বল বলের মতো আশ্চর্য সুন্দর সূর্য। ভারতবর্ষের এক নাম-না-জানা জায়গার নির্জন মাঠে এমন আনন্দ রাখা ছিল আমার জন্য, শুধু আমারই জন্য? লাল পূর্বাকাশের দিকে তাকিয়ে আরও কত কিছুই ভাবা যেত, কিন্তু ওই সূর্য আমাকে ফুটবলের কথা মনে করাল এবং কে জানে কেন, ফাঁকা মাঠের ওপর যেন ইস্টবেঙ্গলের সুবিখ্যাত সাধারণ সম্পাদক নিশীথচন্দ্র ঘোষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। উদীয়মান সূর্য, নির্জন প্রান্তর, সুন্দর ভোর— সব মিথ্যা হয়ে গেল। আমি রাগে দুঃখে আবার শুয়ে পড়লাম। হায় আনন্দ।

গত বছর পুজোর ঠিক আগে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন। কতবার গেছি, তবু প্রতিবারই মুগ্ধ করেছে অজস্র কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া, আরও কত নাম-না-জানা ফুল, রামকিঙ্করের উদাস ভাস্কর্য, এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা কত তালগাছ, ছাতিমতলা, উত্তরায়ণ....

এবার, এক বিকেলে ট্যুরিস্ট লজের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কৃত্রিমতা থেকে ছিটকে বেরিয়েছিলাম আমরা কোপাই নদী দেখার জন্য। শ্রীনিকেতন ছাড়িয়ে বেশ কিছুদূর

যাওয়ার পর হঠাৎই ঘন মেঘে আকাশ গেল ছেয়ে, চারদিক কেমন যেন থমথম, আমাদের কি ফিরে যাওয়াই উচিত, যেহেতু সঙ্গে রয়েছে একটি দুই বছরের শিশু। কোপাই সেদিন চুম্বকের মতো টেনেছিল আমাদের। নিতান্তই ছোট সে নদী বর্ষায় নাকি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। সরু জলের স্রোতের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম, আশেপাশেই ছড়ানো আছে হাসুলি বাঁকের উপকথা। তারাশঙ্করের প্রেরণা...। ফেরার পথে আরও কালো হল আকাশ, বৃষ্টি নামল ঝমঝমিয়ে। শ্রীনিকেতনের মুখে যখন পৌঁছেছি, রিকশ অসহায়, আমরা বৃষ্টিস্নাত, শুধু শিশুটিকে কোনরকমে শুকনো রাখা গেছে। রিকশচালক থামলেন এক ছোট্ট বাড়ির সামনে, কোনও এক খুদে অফিসারের কোয়ার্টারের গেটে। ছুটে উঠে গেলাম সেই ছোট্ট বাড়ির এক ফালি বারান্দায়। গৃহস্বামী একা থাকেন, এবং সিউড়ি গেছেন। পাহারায় ছিলেন একজন, তিনি পরম মমতায় দুটি মোড়া এনে দিলেন। সামনে অঝোর বৃষ্টি, ঠান্ডা হাওয়া, তবু তারই মধ্যে পারিবারিক সান্নিধ্যের উষ্ণতা, বাতাসে দুলছে বৃষ্টিভেজা গাছ— জীবনের আনন্দ আর কাকে বলে? হঠাৎই চোখে পড়ল, পাহারায় নিযুক্ত কর্মীটি খবরের কাগজ পড়ছেন, প্রথম পৃষ্ঠায় ছিলেন তিনি, শেষ পৃষ্ঠা দেখা যাচ্ছে, বেশ বড় অক্ষরে ক্রীড়ামন্ত্রী বুটা সিংয়ের নাম— কী যেন তিনি বলেছেন। বুটা সিংয়ের মুখ মনে পড়ল, ঝুটা সিংয়ের হাজার ভাষণ মনে পড়ল। বীরভূমের দুর্ধর্ষ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও আমাকে বেশিক্ষণ আনন্দ দিতে পারল না। প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, আপনাদের মধ্যে কেউ কি আমাকে অন্য কোনও জীবিকার রাস্তা দেখাতে পারেন?

৭০



এই প্রথম সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলকে পৌর সংবর্ধনা জানানো হল। উত্তর বনাম দক্ষিণ, দেশবন্ধু বনাম দেশপ্রিয় লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত দক্ষিণই জেতে এবং দেশপ্রিয় পার্কে মেরুন-সাদা কাপড়ের মণ্ডপ বাঁধা হয়, বাংলার জার্সির রঙ মিলিয়ে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত ভাষণ দেন পুরমন্ত্রী শ্রীপ্রশান্ত শূর। 'কলকাতাকে কল্লোলিনী তিলোত্তমা করার জন্য সি এম ডি এ এবং কলকাতা কর্পোরেশনকে সাহায্য করুন, বিশ্বব্যাঙ্কের ঢালাও সাহায্য ছাড়া কলকাতার এই উন্নয়ন সম্ভব ছিল না— তবে ইম্পিরিয়ালিস্টদের বিরুদ্ধে আমাদের জেহাদ অব্যাহত রাখতে হবে, রাজ্যের বিরুদ্ধে কেন্দ্রের হীন চক্রান্ত রুখতে হবে, গার্ডেনরিচ এবং আন্ত্রিক রোগ নিয়ে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য অপপ্রচার রুখতে হবে, আর হ্যাঁ, আর একটা কী যেন বলার কথা ছিল, সন্তোষ ট্রফি জেতার জন্য বাংলার ফুটবলার কমরেডদের সংগ্রামী অভিনন্দন।'

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী ভুল করে মাথায় পানামা ক্যাপ পরে এসেছিলেন। স্পোর্টসের ডেপুটি সেক্রেটারি অশোক ভট্টাচার্য কানে কানে মনে করিয়ে দিলেন, সল্টলেক স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়েছিল দুপুরে এবং মাথার ওপর কিছু ছিল না। কিন্তু বাংলার ফুটবল দলের এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হচ্ছে সন্ধেবেলায় এবং ভাল প্যান্ডেল বাঁধা হয়েছে। টুপিটা না থাকাই ভাল। মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর ক্রমহ্রাসমান বিপ্লবী কেশরেখাকে উন্মুক্ত করে টুপি ডেপুটি সেক্রেটারির মাথায় উঠল। আফটার অল, অনারেবল মিনিস্টারের টুপি, ভরসন্ধেয় সামিয়ানার নিচে ঘনকেশী অশোক ভট্টাচার্য টুপি মাথায় নিয়েই বসে থাকলেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী প্রথমে বাংলার কোচকে বক্তব্য রাখার আহ্বান জানালেন। তার আগে একটা খবর দেওয়া দরকার : 'সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি প্রভৃতিদের মাল্যদান করা সম্ভব হয়নি (আহা, কিছু ফুল বেঁচেছে), কারণ নির্দিষ্ট মাল্যদানকারিণী বালিকা তিনজনই অকস্মাৎ আন্ত্রিক রোগে আক্রান্ত হয়।

শান্ত মিত্র স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'এই নিয়ে তিনবার আমি বাংলার কোচ, তিনবারই বাংলা সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন। বলতে পারেন— হ্যাটট্রিক (তুমুল করতালি)।

গতবার গোয়ার সঙ্গে জয়েন্ট চ্যাম্পিয়ন থাকায় কেউ কেউ অবশ্য আড়াইবার ধরে হ্যাটট্রিক মানছেন না। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে (গলায় প্রশান্ত শূরের সুর এনে) রুখে দাঁড়ানো দরকার। আপনারা জানেন, তিন বছর ধরেই আমি আগে থেকে বিবৃতি দিয়েছি, নিয়মিত প্র্যাকটিসে না এলে টিমে নেব না এবং সিনিয়র ফুটবলারদের ওপর নির্ভর করব না। কিন্তু বাংলার স্বার্থে, কোচ হিসাবে নিজেকে সাকসেসফুল প্রমাণ করার বৃহত্তর স্বার্থে আমি বিবৃতি হজম করে মানি-অমলরাজকে একদিন প্র্যাকটিসে পেয়েও টিমে রেখেছি এবং সিনিয়র ফুটবলাররা ভাল না খেলতে পারলেও তাদের ওপর ভরসা রেখেছি। অলোক মুখার্জি যেতে চাইল না, তারপরও শ্যামল ব্যানার্জিকে টিমে নিইনি। কারণ শ্যামল গতবছর ন্যাশনালের পর আমার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানিয়ে ইন্টারভিউ দিয়েছিল। শ্যামলকে টিমে নিলে সবাই আমার বিরুদ্ধে কথা বলার উৎসাহ পেত এবং তাতে টিম স্পিরিট নষ্ট হত। টিম স্পিরিটই হল আসল জিনিস, তাই শ্যামলকে নেবার কথা আমি সিলেক্টরদের বলিনি। বিক্ষুব্ধ হয়ে বিবৃতি দেবার ব্যাপারে প্রসূনের নাম আছে। তাই ওকেও নিইনি। বাংলার সঙ্গে গোয়া-পাঞ্জাবের পার্থক্য এখন খুবই কম, তাই ফুটবলারদের কখনই আত্মসন্তুষ্টির শিকার হতে দিইনি। সিনিয়র ফুটবলাররা যদিও বারবার বলেছে যে পাঞ্জাবকে দু-তিন গোল মারবে, আমি সেকেন্ড লেগ সেমিফাইনালের আগের দিন পাঁচজন প্রোব্যাবল পেনাল্টি কিকারকে দিয়ে দেড় হাজার পেনাল্টি কিক মারিয়েছি। ট্রাইব্রেকারে তাই কোনরকম অসুবিধা হয়নি। বাংলার পাঁচজন সহজেই গোল করেছে। একথা মানছি যে বিদেশ বসুই এখনও ভারতের সেরা লেফট উইঙ্গার। কিন্তু টিমের চেয়ে কেউ বড় নয়, টিম স্পিরিটই হল আসল ব্যাপার। বিদেশ প্রথমে যেতে চায়নি, পরে কেন নিতে যাব? আই এফ এ ওকে পাঠানোর চেষ্টা করছে— এ খবর পেয়েই মাদ্রাজে বসে স্টেটমেন্ট দিলাম, বিদেশকে আর দরকার নেই, ও এলে বরং টিম স্পিরিট নষ্ট হবে। বিদেশ যায়নি। টিম স্পিরিট নষ্ট হয়নি। বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। সিনিয়র প্লেয়াররা প্রথম দিকে খেলতে পারছিল না। সেমিফাইনালের আগে হুমকি দিলাম : 'টিম হারলে কিন্তু আমি ভয়ঙ্কর স্টেটমেন্ট দেব। এইট্টি ওয়ানে ইস্টবেঙ্গলের কোচ হিসাবে মজিদ-জামশিদের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর স্টেটমেন্ট দিয়েছিলাম এবং মোহনবাগান ম্যাচ হারার পর আর মাঠে যাইনি। এবারও, বাংলা যদি হারে, আর বাংলার কোচ হব না এবং তোমাদের বিরুদ্ধে কাগজে ভয়ঙ্কর স্টেটমেন্ট দেব। সাবধান!' ওতেই কাজ হল। সিনিয়ররা ভাল খেলল, বাংলা চ্যাম্পিয়ন হল। মাননীয় পুরমন্ত্রীর কাছে আমি কৃতজ্ঞ এই সিভিক রিসেপশন দেবার জন্য। আমি গত তিন বছর ধরেই বলে আসছি, সন্তোষ ট্রফি জিতলে বাংলা দলকে সিভিক রিসেপশন দেওয়া উচিত। বেটার লেট দ্যান নেভার।'

নীল জিনসের ওপর গরদের পাঞ্জাবি পরা সদ্য বিবাহিত বাংলা অধিনায়ক প্রশান্ত ব্যানার্জি বললেন, 'শানুদা ঠিকই বলেছেন, টিম স্পিরিটই আসল ব্যাপার। এত টেনশনের মধ্যেও এয়ারলাইন্স ক্লাবের ব্লেজার বিতরণ অনুষ্ঠানে আমি সাতান্ন সেকেন্ডের জন্য গিয়েছিলাম, শুধু টিম স্পিরিটই রাখার জন্য। টিম স্পিরিট রাখার জন্যই আমি হাওড়া স্টেশনে অন্যদের সঙ্গে টিমে উঠিনি, মোহনবাগানের অফিসিয়াল আর ঝটিকা বাহিনীর সঙ্গে খড়্গপুর গিয়ে মাঝপথে ট্রেনে উঠেছি। টিম স্পিরিট বাড়ানোর জন্য আরও অনেক

কিছু করতে পারতাম, করিনি। কারণ, সবই শানুদা করে ফেলেছেন। আমার অধিনায়কত্বে বাংলা চ্যাম্পিয়ন হওয়ায় কত ভাল লাগছে, বোঝাতে পারব না। সেভেন্টি নাইনে আমার অধিনায়কত্বে ইস্টবেঙ্গল কোনও ট্রফি পায়নি— সঞ্জয় গান্ধী বা দার্জিলিং গোল্ড কাপও নয়। সেই দুঃখ এবার ঘুচল।'

বিশেষ আমন্ত্রিত বিদেশ বসু বললেন, 'একথা কখনই লুকোতে চাইনি যে এবার বাংলার অধিনায়ক না হওয়ায় আমি মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ। একজন মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ ফুটবলার টিমের সঙ্গে গেলে টিম স্পিরিট নষ্ট হতে পারে— এই আশঙ্কাতেই মাদ্রাজে যেতে চাইনি। অশোক ঘোষের অনুরোধে মত পাল্টাবার দিকে যাচ্ছিলাম। কিন্তু পুরী থেকে ফিরে শুনলাম, বাংলার কোচ বলেছেন আমি গেলে টিম স্পিরিট নষ্ট হবে। জোর করে আর মাদ্রাজ যাইনি। টিম স্পিরিটই আসল কথা কিনা। অনেক খেটে খেলতে হয়। একটুও না খেটেও, না খেলেও যে টিম স্পিরিট বাড়াতে পেরেছি, তাতে আমি ধন্য। সন্তোষ ট্রফি আনার জন্য প্রশান্তকে অভিনন্দন। আশা করি সামনের বছর প্রশান্ত এইভাবেই আমাকে অভিনন্দন জানাবে।'

আই এফ এ সম্পাদক অশোক মিত্র : 'খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম। বাংলা হারলেই আমার ছেরাদ্দ হত। 'খেলা'র এডিটর লিখত, আমার জন্যই বেঙ্গল হেরেছে। বিদেশ গিয়ে যদি বেঙ্গল হারত, লিখত— কেন অশোক মিত্র অনিচ্ছুক বিদেশকে পাঠিয়ে টিম স্পিরিট নষ্ট করলেন? সিলেকশন নিয়ে আমি কখনও এক ইঞ্চির বেশি নাক গলাই না, তবু লিখত— প্রসূন বা শ্যামলকে বাদ দেবার জন্য আমিই দায়ী। লিখত— মানি-অমলরাজ একদিন প্র্যাকটিস করেই টিমে ঢুকল, সেজন্যও আমি দায়ী। আনন্দের কথা বাংলা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দের কথা, আমি বেঁচেছি।'

সভাপতি সুভাষ চক্রবর্তী বললেন, 'বামফ্রন্ট সরকার খেলাধুলোর উন্নতির জন্য বরাবরই তৎপর। তাই বাংলা প্রতি বছর সব স্টেটকে হেসে খেলে হারিয়ে সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলছে, তাই কলকাতা ময়দানে গট-আপ ম্যাচ বন্ধ হয়ে গেছে, তাই টেস্টের টিকিট নিয়ে অসততা আর কালোবাজারি বন্ধ হয়ে গেছে, তাই সুব্রত কাপে এখন আর বয়স ভাঁড়ানো অ-ছাত্ররা বাংলার কোন স্কুলের হয়ে খেলে বাংলার মুখে চুনকালি দেয় না, তাই কাবাডি টাইগ্রেস মণিকা নাথকে বাংলায় চাকরি না পেয়ে মহারাষ্ট্রে চলে যেতে হয়, তাই মস্কো অলিম্পিক দেখার জন্য যুবনেতা এবং আমলারা যায়, কিন্তু রীতা সেন সুযোগ পায় না। তাই রাইটার্স বিল্ডিং থেকে ক্লাব হাউসের হাজার কার্ড বিলি হলেও প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ফুটবলারদেরও সাধারণ গ্যালারিতে বসে নেহরু কাপের খেলা দেখতে হয়। বন্ধুগণ, আমাদের একটু সময় দিন। বাংলার খোলধুলোয় বিপ্লব আনব। এমনকি ময়দানে ধান চাষও করাব।'.... হঠাৎই মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী দেখলেন, মাননীয় পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী মণ্ডপে ঢুকে পড়েছেন এবং মঞ্চের দিকে এগিয়ে আসছেন। এই সুযোগটা ক্রীড়ামন্ত্রী হাতছাড়া করলেন না। 'ধান চাষও করাব' বলে দেড় সেকেন্ড থেমেই ঘোষণা করে দিলেন, 'আজকের সভা এইখানেই সমাপ্ত হল।'

৭১

মাত্র একুশ জনের মিটিং, এজন্য নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম বুক করার কী দরকার? করতে হয়েছে মাত্র দুটি কারণে। প্রথমত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা প্রচণ্ড ঠাণ্ড মাথায় হওয়া দরকার এবং ঠাণ্ডা মাথার জন্য ঠাণ্ডা জায়গা চাই এবং ইনডোর স্টেডিয়ামের এয়ার কন্ডিশনিং খুব ভাল। দ্বিতীয়ত, একটা ছোট্ট ঠাণ্ডা ঘর হলেই চলত না, গোটা ব্যাপারটা বোঝার এবং বোঝানোর জন্য মাঝে মাঝে ডেমনস্ট্রেশনও জরুরি।

ঠিক মাথার ওপর বসা মন্ত্রীদের চোখে পড়ার জন্য অফিসিয়ালবা যেখানে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝেই ভলান্টিয়ারদের নির্দেশ-উপদেশ দেন, সেখানেই কালো ভেলভেটের ফরাস, মাত্র এগারটা তাকিয়া, ফার্স্ট কাম ফার্স্ট টেক বেসিসে এগারজনের হাতে চলে গেছে! পিছনে কাল সাটিনের ব্যাকড্রপ, তাতে দগদগে সাদায় লেখা— ৩ : ১।

প্রৌঢ় সভাপতি মহোদয় পাঞ্জাবির হাতায় ঘাম মুছে (মাঠের অভ্যেস, খুব ঠাণ্ডাতেও এবং পাঞ্জাবি না' থাকলেও হাত ঘোরান) শুরু করলেন : 'ভাইসব, আর্থিক অনটন বড় ক্লাবের চাপ, ঝড়বৃষ্টি, খবরের কাগজ--- এই সব প্রাকৃতিক দুর্গতি সত্ত্বেও আমরা বেঁচে আছি। গড়াপেটার পীঠস্থান হিসাবে কলকাতাকে, এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যেও, আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি। কম্যুনিস্ট চায়নার টেবিল টেনিস স্টার জাই সাইকে আর ফ্যাং চ্যাং মাও পর্যন্ত গ্রাঁ প্রি ফাইনালে গট-আপ ম্যাচ খেলে গেলেন। কলকাতার বুকে অন্য কিছু করার চিন্তাই তাঁরা করেননি। কিন্তু, এসব হল প্লাসপয়েন্ট। আজ আমরা এখানে বসেছি আর একটা বড় সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে। বসেই হোক আর দাঁড়িয়েই হোক, একটা রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে। চোখের সামনে বাঘা বাঘা সব মাথা দেখতে পাচ্ছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটা সলিড সলিউশন পাওয়া যাবেই।'

এই মিটিংয়ের বিবরণ এক কর্মকর্তা ভালবেসে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন একটি শর্তে— স্পিকার এবং লিডারদের নাম প্রকাশ করা চলবে না। এই সামান্য লিমিটেশনের জন্য ক্ষমা করবেন। শেকসপীয়রই না বলেছেন— 'নামে কী এসে যায়?'

ইকনমিক্সের অধ্যাপক, ময়দানের লেটেস্ট গট-আপ গ্র্যান্ডমাস্টার উঠলেন বাঁহাতে

ক্যালকুলেটর নিয়ে। বললেন : 'আপনারা নিশ্চয় জানেন, সরি, কাকে কী বলছি, আপনারা হয়ত জানেন, দূর— এটাও মিথ্যেকথা হয়ে যাচ্ছে, আপনারা নিশ্চয় জানেন না যে আজকের ইকনমিক্স দাঁড়িয়ে আছে ম্যাথমেটিক্সের ওপর। ম্যাথমেটিক্সের ব্যাপারে, গট-আপের অঙ্কর ব্যাপারে আমার ওপর আপনারা ভরসা করতে পারেন। তবে, আমি কিনা অধ্যাপক, ঝট করে কিছু করতে পারি না। মোটা মোটা বই জড়ো করেছি, হাতে ক্যালকুলেটর, এবার একটা লেটেস্ট গট-আপ স্ট্র্যাটেজি লিখে ফেলব। টেবিলের সামনে অন্তত সাড়ে তিন ফুট বই না জমালে আমার টেম্পো আসে না, তাই রেখেছি। এমনিতে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, নাকে ডাবল রিফাইনড রেপসিড তেল দিয়ে ঘুমুতে পারেন, আমার স্ট্র্যাটেজি পেপার, ময়দানের এক্সপিরিয়েন্স এবং বিশেষ অবস্থার কথা মনে রেখেই তৈরি করব। এই ক্যালকুলেটরটা দেখুন। সুইডেন থেকে আনিয়েছি। সেকেন্ড হ্যান্ড। সেভেন্টি থ্রিতে স্টকহোমের একটা সেকেন্ড ডিভিশন টিম লিগের প্রত্যেকটা ম্যাচ গট-আপ খেলেছিল। ইয়েস, ফ্রম দি ভেরি ফার্স্ট ম্যাচ। সেই টিমে এই ব্যাপারটা দেখাশোনা করতেন যে ভদ্রলোক, তাঁর নাম জোসেফ ল্যান্ডকুইস্ট। তিনি এখন কাঠমুন্ডুতে রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছেন। এটা তাঁরই ক্যালকুলেটর। প্রবীণরা আশীর্বাদ করুন, সবাই শুভেচ্ছা জানান, আমি যেন এই পবিত্র ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ক্যালকুলেটরের উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারি।'

অনেকক্ষণ ছটফট করছিলেন ময়দানের বাস্তুঘুঘু গড়াপেটাবীর, অধ্যাপক থামতেই ছিটকে উঠলেন : 'ধ্যার মশাই, রাখুন আপনার ক্যালকুলেটর। ইকনমিস্ক (অধ্যাপক : মিস্ক না, মিক্স, মিক্স) ফিকনমিস্ক আমাদের শেখাবেন না। হাফপ্যান্টের এজ থেকে গট-আপ করছি মশায়, যাদব চক্রবর্তীর পাটীগণিতই যথেষ্ট, তবে কিনা, সেটাও বেশিকাল চর্চা করিনি ক্লাস এইটে স্কুল ছাড়ায়। তবে, মাঠের অঙ্ক বুঝি। কী হলে কত পয়েন্ট পাওয়া যাবে, সেটা যখন জানাই আছে, হিসেব করতে অসুবিধে কোথায়? আমি মোটামুটি অঙ্ক কষে ফেলেছি, এবারের সেভ পয়েন্ট— তেইশ। (অধ্যাপক : আমরা যদি সেভ পয়েন্টকে 'এক্স' ধরি ..) ধ্যার মশাই, চাপুন তো, এই জন্যে মাঠের কাজে বেশি পড়াশুনো জানা লোক নিতে নেই। বলছিলুম কি, তেইশ পয়েন্ট দরকার। টার্গেটটা ঠিক করে ফেলুন, তারপর কী করে আমাদের সবাব কম করে তেইশ পয়েন্ট হয়, দেখা যাবে।'

পুরু লেন্সের চশমা মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালেন গম্ভীর গড়াপেটা বিশারদ · 'আমি বুঝতে পারছি না, সমস্যাটা কোথায়? আই এফ এ বলেছে, জিতলে তিন পয়েন্ট, ড্র করলে এক। জেতার জন্য দুয়ের বদলে তিন পযেন্ট দিচ্ছে বলে এত ঘাবড়ানোর কী আছে? বেসিক ব্যাপারগুলোও সব এক। সেই টার্গেট ঠিক করা। সেই সিন্ডিকেট করা। সেই গট আপ অর্গানাইজ করা. গোলমেলে প্লেয়ার বসিয়ে দেওয়া। সেই রিলে সিস্টেম ' অমুক আমাকে দুয়ের বদলে তিন দেবে, আমি তমুককে দুয়ের বদলে তিন দেব। কোন ঝামেলা নেই। জিতলে তিন পয়েন্ট পাওয়া যাবে বলে আমরা সব ম্যাচে জেতার চেষ্টা করব, আমাদের পাঁঠা ভেবেছে নাকি?' চোখ থেকে চশমা খুলে আবার রুমালে মুছতে মুছতে

বক্তব্য শেষ করলেন ভদ্রলোক : 'ধৈর্য হারাবেন না, রিঅ্যাকশনারি ফালতু খবরের কাগজের লোকেদের লেখায় লজ্জা পাবেন না, মন্ত্রীর ফাঁকা আওয়াজে ভয় পাবেন না, বিবেকের চিমটিতে কষ্ট পাবেন না, জয় আমাদের অনিবার্য।'

এক কোণে বসেছিলেন গড়াপেটার বেস্ট অর্গানাইজার! সভাপতি মহোদয় তাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এবার আপনি।'

অসংখ্য গড়াপেটার নায়ককে কেমন যেন ম্রিয়মাণ মনে হল : 'অনেকেই জোর দিলেন, ভরসা দিলেন, তবু আমি কেন যেন সাহস পাচ্ছি না। বিশ্বাস করুন, যারা একথা রটায় যে আমি উনিশবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে থেমেছিলাম— তারা ঘোর মিথ্যুক। আমি মাত্র সাতবারের পরই ময়দানে গট-আপ অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। তবে একথা সত্যি যে অঙ্কেও আমি একটু কাঁচা ছিলাম, কেরিয়ারে হায়েস্ট মার্কস— টুয়েন্টি টু। গত তিরিশ বছর ময়দানে গড়াপেটা বাঁচাতে আর বাড়াতে আমি সব করেছি। বলা যায়, গড়াপেটার পুজোয় নিজেকে উৎসর্গ করেছি। কিন্তু, আজ মনে হচ্ছে, তিন-একের অঙ্কের ধাক্কা আমি সামলাতে পারব না। তবু, আমি সবার সঙ্গে, সবার মধ্যে আছি। টেন্টে টেন্টে ঘুরে গট-আপ অর্গানাইজ করব, প্লেয়ারদের ম্যানেজ করব, সব জায়গায় ধরাধরি করব, যা করতে বলবেন সব করব, শুধু দয়া করে আমাকে অঙ্ক সাব-কমিটিতে রাখবেন না।'

প্রবীণ গড়াপেটা-নায়কের মর্মস্পর্শী বক্তব্য শুনে সভা এক মিনিট স্তব্ধ থাকল। তারপর এক উদীয়মান কর্মকর্তা : 'আর একটা ঝঞ্ঝাটের কথা আপনারা কেউ ভাবছেন না। এই যে প্রথম পনেরটা টিম নিয়ে নেক্সট ইয়ার 'এ' গ্রুপ করা হবে, এজন্য আমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্ট্রেট খেলতে চাইলে কী হবে?' ভয়ঙ্কর হইচই শুরু হল। কে বা কারা সেই বিশ্বাসঘাতক, প্রশ্ন উঠল। সবাইকেই 'বিশ্বাস করুন, আমরা কিছুতেই স্ট্রেট ম্যাচ খেলব না' বলতে শোনা গেল। সভাপতি মহোদয় ঘোষণা করলেন : 'ছি ছি, জীবনের শুরুতেই, ফার্স্ট মিটিংয়েই এমন স্ট্রেট ম্যাচ খেলবেন না! আমরা কেউ বিশ্বাসঘাতক নই। আমরা সবাই ভাল। আমরা সবাই ভাল আমাদের এই গট-আপ রাজত্বে।'

৭২

উনিশশ চুরাশির ফুটবল মরসুম ভালয় ভালয় শেষ হল। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশন লিগে মোট তিনশ একান্নর মধ্যে মাত্র একশ চুরানব্বইটি ম্যাচ গট-আপ ছিল। রেফারি গট-আপের ঘটনা আরও কম— মাত্র সাতাত্তর। বড় টিমের ফুটবলারদের অবশ্যই লাল কার্ড দেখানো হয়নি, ছোট টিমের ফুটবলারদের মাত্র একচল্লিশবার। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ম্যাচে টিকিট ব্ল্যাক এবং জাল করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন মাত্র সাতাত্তর জন। এই ম্যাচের সময় গ্যালারিতে খণ্ডযুদ্ধে একশ তেত্রিশজন আহত হলেও কেউ মারা যাননি। তিন বড় টিমের মোট আটাত্তর ম্যাচে মোট মাত্র সাড়ে একুশ হাজার ঢিল এবং পৌনে তিন হাজার আদা-চায়ের ভাঁড় পড়েছে। লাইন্সম্যানের মাথা ফেটেছে মাত্র দশটি ক্ষেত্রে। আই এফ এ শিল্ড ফাইনাল ছাড়া আর কোনও ম্যাচের রেফারিকেই টানা সাতদিনের বেশি হাসপাতালে থাকতে হয়নি। গোটা সিজনে আই এফ এ-র বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে মাত্র এগারটা। কলকাতার বাইরে কলকাতার বড় টিমগুলোর মধ্যে দেখা হয়েছে মোট দশবার, এর মধ্যে মাত্র সাতবার পুলিসকে মাঠে নেমে গণ্ডগোল থামাতে হয়েছে। খেলা পণ্ড হয়েছে মাত্র তিনবার। শান্তিতে, নির্বিঘ্নে মরসুম চলায় ফুটবল-রসিকরা ফুটবল নিয়ে তুলনামূলক এবং বিতর্কময় আলোচনায় কালাতিপাত করার সুযোগ পেয়েছেন। চুরাশির ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বসে, আসুন, আমরা সেই ফুটবল-বিতর্কগুলিকে স্মরণ করার চেষ্টা করি।

চুরাশির দলবদল শেষ হতেই মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গলের সমর্থকেরা প্রচণ্ড বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন : কার ফরোয়ার্ড লাইন বেশি ভাল? মোহনবাগান সমর্থকরা যুক্তি রাখেন, চিরকালের ফুটবলেই খেলার ভাগ্য গড়ে দেন দুর্ধর্ষ উইঙ্গাররা। তাঁরাই ভাঙচুর করেন, বিপক্ষ রক্ষণভাগে ভয় আর ফাটল ধরান, ডিফেন্ডারদের ছুটিয়ে এবং খাটিয়ে মারেন, মাঝেমাঝে গোলও করেন। মনে নেই, আটাত্তরের শিল্ড ফাইনাল? আরারাতের বিরুদ্ধে বিদেশের ঝড় আর মানসের গোল? আটাত্তরের ডুরান্ড ফাইনাল? মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সুরজিতের ঝড় এবং গোল? এবার মোহনবাগানকে রোখাব ক্ষমতা কারও নেই। ভারতের সবচেয়ে দ্রুতগামী রাইট এবং লেফট উইঙ্গার--- বাবু মানি আর বিদেশ বসু

যে টিমে, সেই টিমকে রোখে কে? এমনিতে মানির চেয়েও দক্ষ রাইট উইঙ্গার মানস ভট্টাচার্য— মোহনবাগানেই থেকে গেছেন। অভিজ্ঞ উলগানাথনও আছেন, দরকার হলে খেলার জন্য। যার উইং আছে তার সব আছে। মোহনবাগান ফরোয়ার্ড লাইন সেরা, সন্দেহ নেই।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের যুক্তি ছিল, উইং ফুইং কোন ব্যাপাব নয়, আসল কথা হল গোল। গোল ইজ দি সল্ট অফ ফুটবল। বিশ্বজিৎ-মনোজিৎ হল জাত গোলগেটার। মোহনবাগান বুঝবে কত ধানে কত চাল, এই দুজনকেই ছেড়ে দিল বা রাখতে পারল না। কার্তিক শেঠও দারুণ গোলগেটার। এশিয়াডে দু-দুটো গোল করেছেন। আর আছেন শ্যাম থাপা। মরা হাতি লাখ টাকা। আর শ্যাম থাপা তো এখনও বেশ জ্যান্ত। বছরে পাঁচটা দুর্ধর্ষ গোল করবেনই। এই টিমকে কে বোখে। উইঙ্গাব যতই খেলুক, গোল না করলে জেতে কেউ? গোল করে যে ম্যাচ জেতে সে। ইস্টবেঙ্গল গোল কববে, ম্যাচ জিতবে, ট্রফি তুলবে।

এই আলোচনা চলতে চলতেই নাগজি ট্রফি এবং ফেডারেশন কাপ শেষ হয়। নাগজি ফাইনালে মোহনবাগান এবং ফেডারেশন ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকে হারিয়ে মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন হয়।

এরপর প্রবল বিতর্ক শুরু হয়, কে বেশি বড় কোচ— অমল দত্ত না পি কে ব্যানার্জি? ইস্টবেঙ্গলেব সমর্থকরা বলেন, অমল দত্ত যে বেটাব কোচ, তা ফেডাবেশন কাপেই প্রমাণ হয়ে গেছে। ফার্স্ট লেগ সেমিফাইনালে প্রশান্ত দুর্দান্ত খেলেছিল। সেকেন্ড লেগে গৌতম সবকাবকে স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হয প্রশান্তকে অকেজো করার জন্য। ট্যাকটিক্যাল মুভ। অমল দত্তই একমাত্র কোচ, বড় টিমে জুনিয়ব প্লেয়াবকে খেলিযে দেবাব বুকের পাটা যাঁর আছে।

মোহনবাগান সমর্থকবা বলেন, এখনও পি কে ব্যানার্জিই সেবা কোচ। সেভেন্টি টু থেকে সেভেন্টি নাইন এত ট্রফি তুলেছেন যে এখন এইট্টি সিক্স পর্যন্ত ট্রফি না পেলেও একই পজিশনে থাকবেন! সিনিযব স্টাব প্লেযাবদেব সামলে বাখতে, বাগে আনতে পি কে-ব মতো আব কে পাবে? এই বিতর্ক প্রবলভাবে চলে দীর্ঘ চার মাস। এবং এব মধ্যেই, লিগ চ্যাম্পিয়ন হয মহমেডান স্পোর্টিং।

লিগেব শেষ দিক থেকেই ইস্টবেঙ্গল সমর্থকবা আওযাজ তোলেন, কাগজে কলমে যা-ই দেখা যাক, আসলে ইস্টবেঙ্গলেব মিডফিল্ডই সেরা। গৌতম আব মিহির প্রমাণ করেছেন, অভিজ্ঞতা আব পবিশ্রমেব কোন বিকল্প নেই। মাঝমাঠে অন্য সব টিমের মিডফিল্ডারদেব এই দুজন চূর্ণ করেছেন। সুযোগ পেলেই চমৎকার খেলেছেন সুনির্মল চক্রবর্তী

মোহনবাগান সমর্থকদেব বক্তব্য ছিল, শুধু কাগজে কলমে নয়, মাঠেও তাঁদেব মিডফিল্ডই সেরা। অন্য টিম থেকে মোহনবাগানে এসে 'সেট' হতে একটু সময লাগে, তাই প্রশান্ত-অমলবাজ ফর্মে আসেনি। আস্তে আস্তে আসছে। আসবে!

এই বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখনই আই এফ এ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয মহমেডান স্পোর্টিং।

পুজোর ছুটিতে বাঙালি ফুটবল নিয়ে আলোচনা করে না, শুধু পুজো সংখ্যা পড়ে, মোগলাই পরোটা খায়, ফালতু ঘোরে, নতুন জুতো পায়ে ফোস্কা বাধায় আর ঘুমায়। কালীপুজোর সময় থেকেই আলোচনা দানা বাঁধে, কার ডিফেন্স ভাল— মোহনবাগান না ইস্টবেঙ্গল? ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা বললেন, ডিফেন্স না থাকলে শুধু অফেন্স দিয়ে কী হবে? দু গোল দিয়ে কী লাভ— যদি তিন গোল খেয়ে যেতে হয়? সুদীপ, মনোরঞ্জন, তরুণ, অলোক— এটা তো ইন্ডিয়ান ডিপ ডিফেন্স। সুস্থ থাকলে বলাইও কারও চেয়ে কম যায় না। সমীর চৌধুরি দারুণ উঠে এল। প্রয়োজনে চিন্ময় এখনও বাঘের বাচ্চা। আর গোলে— ওয়ান অ্যান্ড ওনলি ভাস্কর গাঙ্গুলি। কোন সন্দেহ নেই, ইস্টবেঙ্গলের ডিফেন্সই সবচেয়ে ভাল।

মোহনবাগান সমর্থকরা বললেন, যে টিমে সুব্রত ভট্টাচার্য আছেন, সেই টিমের চেয়ে ভাল ডিফেন্স আর কারও থাকতে পারে, একথা আমরা মানিই না। শ্যামল-কম্পটন-কৃষ্ণেন্দুর মতো আর কোন ব্যাক অ্যাটাকে যায়? সত্যজিৎ ঘোষের মতো বুকের পাটা কতজনের আছে? সমর ভট্টাচার্য কম কিসে? স্বপন সাহা রায় কি দারুণভাবে উঠে আসছে না?

এই সব কথাবার্তা চলতে চলতেই রোভার্স কাপের আসর বসে এবং মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন হয়।

রোভার্সের পরই এশিয়া কাপের জন্য তিন বড় টিমের অনেক ফুটবলারকে ছেড়ে দিতে হয়। ইন্ডিয়া টিমের জন্য প্লেয়ার ছাড়তে হবে জানাই ছিল। শেষের দু-একটা টুর্নামেন্টের (এবং লিগের কিছু ম্যাচ— চীন আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফরের জন্য) কথা ভেবে যে ক্লাব আগে থেকে বাড়তি প্লেয়ার নিয়ে রেখেছে, তাদের কর্মকর্তারাই বেশি বুদ্ধিমান।

মোহনবাগান সমর্থকদের মতে, তাঁদের কর্তারাই বেশি বুদ্ধিমান, কারণ, তনুময় বসু, স্বপন সাহা রায়, কৃষ্ণগোপাল চৌধুরি, অরূপ দাস, উলগানাথন, সুযশ বেরা, জয়দীপ মজুমদার প্রভৃতি নবীন ও প্রবীণ ফুটবলারদের টিমে রাখা হয়েছে, ক্যাপ্টেন শ্যামল ব্যানার্জি আছেন, সবার ওপর সুব্রত ভট্টাচার্য তো আছেনই।

ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা অবশ্য তাঁদের কর্মকর্তাদেরই বেশি বুদ্ধিমান বিবেচনা করলেন। কারণ, প্রদীপ ঘোষ, সুনির্মল চক্রবর্তী, সমীর চৌধুরির মতো উদীয়মান নক্ষত্রদের নেওয়া ছাড়াও, ইস্টবেঙ্গল এ আই এফ এফ-এর সঙ্গে চার ফুটবলারের মামলাটাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। ফলে ভাস্কর-মনোরঞ্জন-মিহিরকে ছাড়তে হয়নি। কর্মকর্তাদের বিচক্ষণতা নিয়ে এই তর্কবিতর্ক চলতে চলতেই ডুরান্ড কাপের খেলা শেষ হয় এবং মহমেডান স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন হয়।

৭৩

চুরাশির জুনের প্রথম সপ্তাহটা মনে থাকবে। কে কতটা ডুবেছিলেন জানি না, কিন্তু সবাই নিশ্চয় সমান কষ্ট পেয়েছেন। আহা, বাঙালি বড় পরবিশ্রীকাতর জাতি। আমার আস্তানাতেও জল এসেছিল, মৃদু পদক্ষেপে। খাট চেয়ার টেবিল আলমারি সব কিছুর পায়ার নিচে একের পর এক ইঁট ফিট করে গেছি, নিজের পায়ে কিছু ফিট করা যায়নি বলে উঁচু খাটে উঠে বসেছি। জল যেন অভিসারে এসেছিল, কোনরকমে দেখা করে ফিরে গেছে। আর তারপর, বাড়ির বাইরে এক হাঁটু জল রেখে, বাড়ির মধ্যে প্রচুর চাল ডাল আলু পেঁয়াজ ডিম বিস্কুট মুড়ি কাঁচা লঙ্কা চা কফি মজুত রেখে, টানা তিনদিন তিলজলা বাঙ্গুর গার্ডেনরিচের জলবন্দী বা গৃহহারাদের জন্য কষ্ট পেয়েছি। জমেনি, জমেনি, কিছুই জমেনি। মিইয়ে যাওয়ায় মুড়ি জমেনি, ভাল পার্টনারের অভাবে তাসের আড্ডা জমেনি, লোডশেডিংয়ে ঘুম জমেনি, ঘি কিনে রাখতে ভুলে যাওয়ায় খিচুড়ি জমেনি। তবু, এরই মধ্যে, খাটের ওপর বসে চা কফি খেতে খেতে তিলজলা বাঙ্গুর গার্ডেনরিচের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা করেছি।

তিনদিনের মধ্যে জল এতটাই সরে বা নেমে গেল যে বাইরে বেরতেই হল। খাটে বসে অন্যের দুঃখে কাতর হবার সুযোগ থাকল না। রাস্তায় নেমেই মনে হল, সাংবাদিক হলেই অন্যের জন্য ফিলিং থাকবে না, এই নিয়মটা আমি মানব না। মাঠের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই তিনদিন কতটা কষ্টে ছিলেন, তার খবর নেওয়া দরকার।

মোহনবাগানের কর্মকর্তার বাড়ির ড্রইং রুমে বসে শুনলাম, ভিতরে গুনগুন করে গান গাইছেন। ড্রইংরুমে আবির্ভূত হতেই জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই তিনদিন কেমন ছিলেন?’ ভদ্রলোক সহাস্যে ধনুক থেকে তীরের মতো ছিটকে বেরলেন : ‘তিনদিন কী বলছেন মশাই? এক হপ্তা নিশ্চিন্ত। খেলা নেই। দুটো ম্যাচ পিছিয়ে গেল, আমাদের বাছাই বাছারা পরে খেলবে। এতগুলো ছেলেকে মিলোভান ডেকে নিয়ে গেল, বড় ঝামেলায় পড়েছিলুম। যা হোক, দুটো ম্যাচ উল্টোপাল্টা প্লেয়ার নিয়ে খেলতে হবে না। পি কে সুরজিৎকে নেবার জন্য আঁকুপাঁকু করছিল, আপাতত ঠাণ্ডা। মশাই, বৃষ্টি যে এত উপকারী জিনিস— আগে জানতুম না।’

মোহনবাগানের আর এক কর্মকর্তা ক্লাবটেন্টের মধ্যে বড় টেবিলের ওপর বসে পাঞ্জাবি শুকোচ্ছিলেন। আমার প্রশ্ন শেষ হবার আগেই জবাব ধরলেন : 'আহা, কী ভাল বৃষ্টি। শিবাজীর কেসটা আর একটু হলেই আমরা গিলে ফেলেছিলুম, বুঝলেন। বৃষ্টিতে চাপা পড়ল। ভাগ্যিস পড়ল। এমন বৃষ্টি যেন বছর বছর হয়।'

ইস্টবেঙ্গল টেন্টে একসঙ্গে দুই কর্মকর্তাকে পাওয়া গেল। একজন হেসে হেসে কেটে কেটে বললেন, 'বেশ হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে। দুটো ম্যাচ কেটে গেল।' দ্বিতীয় কর্মকর্তা একটু দূরে টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'আপনাকে গোপন কথা বলছি দাদা, ছাপবেন না। উনি মোটেই দুটো ম্যাচ কেটে যাওয়ার জন্য খুশি নন। সাতাশ হাজার টাকার হিসেব দিতে পারছিলেন না। আজ ক্লাবটেন্টে এসে বললেন, 'বানের জল দোতলার ঘরে ঢুকেছিল, সাতাশ হাজার টাকার প্যাকেটটা ভেসে গেছে। 'ক্লাবের আসল কর্তারা ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছেন।'

মহমেডান টেন্টে ঢুকতেই এক কর্মকর্তা জড়িয়ে ধরলেন। প্রচুর দুধ-চিনি দেওয়া কফি খাওয়ালেন। তারপর বললেন, 'আল্লা যা করেন, ভালর জন্যই করেন। এবার আবার ড্রয়ে দু পয়েন্ট লস। একটা ডিফিটের চেয়ে দুটো ড্রয়ে লস বেশি। মহমেডান সাপোর্টাররা দশ দিন ধরে আমাদের মাথা খারাপ করত। জল বাঁচিয়ে দিয়ে গেল। পয়েন্ট তো আর ফিরবে না, আমরা বাঁচলাম।' আর এক কর্মকর্তা পাশে এসে বসলেন : 'খবর জানেন, ক্লাবের ফান্ডটান্ড নিয়ে যাঁরা হই-চই করছিল, তাঁদের মধ্যে দুজনের গোডাউনে জল ঢুকেছে। বৃষ্টি খুব ভাল জিনিস। এখন তিন মাস আর কথা ফুটবে না।'

ইডেনের দিকে যেতে যেতে ছোট ক্লাবের দুই কর্মকর্তার সঙ্গে দেখা, পাশাপাশি হাঁটছেন। আমার প্রশ্ন শুনে একদম তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন : 'আহা, এক সপ্তাহ খেলা বন্ধ, ময়দান বন্ধ— এটা যে কত জরুরি ছিল! তিন দিন শুধু সিগারেট ফুঁকেছি আর শুয়ে শুয়ে 'তিন-এক'-এর নতুন মানসাঙ্ক ভেজেছি। থার্ড ডে মাঝরাতে সলিউশন পেয়েছি।' দ্বিতীয় জন জানালেন, 'এই দাদারা আছেন, অঙ্ক করবেন, আমাদের চালাবেন। তবে এই বৃষ্টিটা আমার ক্লাবের একটা ছোট্ট উপকার করে গেল। এর মধ্যে বন্ধু টিমের সঙ্গে ম্যাচ পড়েছিল, এখনও স্ট্রেট খেলতেই হত। পরে সুবিধে মতো ব্যবস্থা করা যাবে।'

ইডেনে এ আই এফ এফ অফিসে কাউকে পাওয়া গেল না। সল্টলেক স্টেডিয়ামে একজনকে পাওয়া গেল। 'বৃষ্টিতে কেমন ছিলেন?' এ আই এফ এফ কর্মকর্তা বললেন, 'ভাল, ভাল, দারুণ ছিলাম। মনার বাদ যাওয়া নিয়ে ফালতু কাগজটা লেখালেখি শুরু করেছিল। বিশেষ কিছু আর হয় না আমাদের, তবু চামড়ায় সুড়সুড়ি তো একটু লাগে। বৃষ্টিতে মেশিনে জল ঢুকল, নিউজপ্রিন্ট ভিজল, অফিস ডুবল, দু'দিন কাগজই বেরল না। এই বৃষ্টিতে কি পাবলিক খেপানো যায়? এরপর কলকাতায় নেহরু কাপ হলে ভরা বর্ষায় করব। সুব্রত ভাস্করের বেলায় যা জ্বালিয়েছে।'

পাশে দাঁড়ানো মাঝারি কর্মকর্তা প্রায় চোখ বুজে মাথা নাড়ছিলেন। বড় থামতে চোখ এবং মুখ খুললেন। 'তাছাড়া, ইয়ে, দুটো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গেল। খেলা হলে

ছোট ক্লাব টিমের বিরুদ্ধেও ইন্ডিয়া টিম জিতত না। তাতে মনোবল নষ্ট হত। বাইরে গিয়ে ভাল খেলতে হবে তো!'

বড় কর্মকর্তা বললেন, 'হ্যাঁ বাইরে। তখন ট্যুরই আসল। টিম ট্যুর করলে ইন্ডিয়া টিমের ইমেজ বাড়বে, আমাদের ইমেজ বাড়বে। কলকাতার ফুটবল, দেশের সব জায়গার ঘরোয়া ফুটবল মাথায় উঠুক, আমরা শুধু ইন্টারন্যাশনাল টুর্নামেন্ট আর ফরেন ট্যুর দিয়ে ইমেজ বাড়াব। এই ব্যাপারটা আমরা মহান নেত্রী শ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী এশিয়ার মুক্তিসূর্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে নিয়েছি। জয় আমাদের অনিবার্য। হেভি বৃষ্টি যুগ যুগ জিও।'

রাইটার্স বিল্ডিংয়ে মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি ভয়ঙ্কর ব্যস্ত, কিন্তু মুখে ঝলমলে হাসি। চেয়ারে বসতেই বললেন, 'এই যে দেখুন, প্রোজেক্ট তৈরি করছি। তখনও খুব মশকরা করেছিলেন। বৃষ্টির জলে যেদিন ময়দান ভেসে যায়, সেদিনই সোবিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির প্যাডি সাব কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান কমরেড শাখারিন কলকাতায় এসেছিলেন। হেলিকপ্টারে চড়ে ময়দান দেখেছেন। সেই যে আমি ময়দানে ধান চাষ করাবার কথা বলেছিলাম, কমরেড শাখারিন সেই প্রোপোজাল রেকমেন্ড করেছেন। ময়দানে ধান চাষ হবেই। ভাগ্যিস কমরেড শাখারিনের আসার দিন বৃষ্টিতে মাঠ ভাসল।'

মাঠের সকলেই, দেখা গেল, এই ভয়ঙ্কর বৃষ্টিতে খুশি। না, সকলে নন। ক্রীড়াপ্রেমিক পূর্তমন্ত্রীর ঘরে ঢুকে বুঝলাম, অন্তত একজন খুশি নন। বিরক্ত মুখে চুরুট রেখে পায়চারি করছেন। কাছে দাঁড়াতেই বললেন, 'কী করি, আমি কী করি? চারদিনে একুশটা ফাংশান ভেসে গেল, আমার বক্তৃতাগুলো ভিতরে গজ গজ করছে। বসতে পারছি না, খেতে পারছি না, ঘুমোতে পারছি না, এমন কি ছবির জন্য পোজও দিতে পারছি না। মেজাজ নেই। কিস্যু ভাল লাগছে না।' নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে শচীনদেব বর্মণের ভঙ্গিতে জ্যাকিদা উচ্চারণ করলেন : 'কী করি, আমি কী করি?'

৭৪

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, সম্প্রতি কোন কোন সপ্তাহে আমার অনুপস্থিতি যদি লক্ষ্য করে থাকেন, তার কারণটা শুনুন। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছি। অনেক গবেষণা এবং তর্কবিতর্কের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেছে যে, ভারতীয় ফুটবলের অনুন্নতির মূল কারণ একটিই— মনোবলের অভাব। চিরিচ মিলোভান যুগোস্লাভিয়া থেকে গিল্ড সোশ্যালিজম-মার্কা তরল মনোবলের একশ পঁচাত্তরটা শিশি এনেছিলেন বটে, কিন্তু, দেখা যাচ্ছে, দু-তিন দিনের মধ্যেই এর ঝাঁঝ নষ্ট হয়ে যায়। যেহেতু সপ্তাহে দুবার নতুন শিশি আনার জন্য মিলোভানকে যুগোস্লাভিয়া পাঠানো সম্ভব নয়, একটা পার্মানেন্ট সলিউশন খোঁজা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই মহৎ প্রয়োজনেই ভাফুমক (ভারতীয় ফুটবল মনোবল কমিটি) গঠিত হয়েছে। এই কমিটির সভাপতি হিসাবে মনোবল-বিশেষজ্ঞ চিরিচ মিলোভানের কথা প্রথমে ভাবা হয়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটায় স্বদেশি গন্ধ আনার জন্য শেষ পর্যন্ত খলিফা জিয়াউদ্দিনকেই চেয়ারটা দেওয়া হয়। কমিটিতে আরও আছেন দুই বিখ্যাত দেশপ্রেমিক কর্মকর্তা, এক বিখ্যাত দেশপ্রেমিক প্রাক্তন ফুটবলার, এক বিখ্যাত দেশপ্রেমিক স্বদেশি কোচ, চিরিচ মিলোভান এবং খাঁটি আগমার্কা দেশপ্রেমিক সাংবাদিক— বাবুরাম সাপুড়ে। এই প্রথম একটা ভয়ঙ্কর কমিটিতে জায়গা পেলাম, দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনায় আমার চোখে দিনে আধ ঘণ্টার বেশি ঘুম নেই।

প্রথম তিনটি সভাতেই অ্যাজেন্ডায় ছিল 'মনোবল বাড়ানোর ক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কর্তব্য।' এ ব্যাপারে একটি প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। সব পয়েন্টেই আমরা প্রায় একমত হতে পেরেছি। অবশ্য কোন কিছু নিয়ে পরে যদি ঝামেলা বাঁধে, লেখাফেখা হয়, আমি বিবৃতি দেব, 'ভাফুমক'-এর সভায় আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের চাপে অসহায় ছিলাম। ভারতীয় ফুটবল দলের মনোবল বাড়ার জন্য সাংবাদিকদের কর্তব্য হিসাবে আপাতত পাঁচটি জিনিসের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

(এক) সাংবাদিকদের সুবিধার জন্য একটি জাতীয় সঙ্গীত থাকবে। এই বিশেষ সঙ্গীত রচনা এবং সুরারোপের জন্য একটি সাব কমিটি গড়া হয়েছে। সাংবাদিক হিসেবে এই সাব-কমিটিতে একজন বিধ্বংসী জাতীয়তাবাদী লেখককে রাখা হয়েছে, সাব-কমিটির

চেয়ারম্যান প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সির নেতৃত্বে যিনি ভয়ঙ্কর ভাষায় সঙ্গীতটি রচনা করবেন। অনেক ভাবনাচিন্তার পর সুরকার হিসাবে সাব-কমিটিতে রাহুল দেববর্মনকে রাখা হয়। ফুটবল মাঠে ম্যাড়মেড়ে সুর চলবে না, সেদিক দিয়ে রাহুল দেববর্মনের পপুলারিটি তুলনাহীন, তাছাড়া পেডিগ্রির কথাও ভাবা হয়েছে। রাহুলের বাবা প্রয়াত শচীন কর্তা যে প্রচণ্ড ফুটবল প্রেমিক ছিলেন— এই তথ্য ভুলে যাওয়া হয়নি। প্রত্যেক আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টের পনের দিন আগে থেকে সব কাগজকে এই জাতীয় ফুটবল সঙ্গীত ছাপতে হবে, উইথ স্বরলিপি। ইন্ডিয়ার প্রত্যেক ম্যাচের আগে এবং হাফটাইমে প্রেস বক্সে দাঁড়িয়ে এই সঙ্গীত কোরাসে গাইতে হবে। মাইক্রোফোন স্ট্রেপসিল, ডেকোয়াডিন, আদা চা— এসবের ব্যবস্থা এ আই এফ এফ করবে। হুঁ হুঁ স্পনসরশিপ।

(দুই) দল নির্বাচনের ব্যাপারেই সাংবাদিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সবচেয়ে কঠিন-কঠোর। প্রথমে যখন ট্রায়ালে একানব্বইজনকে ডাকা হবে, সাংবাদিকরা এই কথাটাই বিভিন্ন কাগজে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে লিখবেন যে, ভারতবর্ষে যখন প্রতিভাবান ফুটবলার থিকথিক করছে, তার মধ্যে থেকে মাত্র একানব্বইজনকে বাছার দুরূহ কাজটা যাঁরা এত সহজে করলেন, সেই অফিসিয়াল-স্পটার কোচরা মহাপুরুষ। এই সময়ে অথবা চূড়ান্ত নির্বাচনে যোগ্য দু-একজনকে অতি অবশ্যই বাদ দেওয়া হবে। দেশের এবং কর্মকর্তাদের স্বার্থে এ ব্যাপারে কিছু লেখা চলবে না। রোজ লিখতে হবে, এত ভাল ভারতীয় দল আগে দেখা যায়নি। তাহলেই টিমের মনোবল বাড়বে। যদি প্রি-অলিম্পিক ম্যাচ থাকে, লিখতে হবে— ভারতের এই টিম অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন না হয়ে পারে না। যদি ওয়ার্ল্ড কাপের প্রিলিমিনারি ম্যাচ হয়, চোখ বুজে লিখে ফেলতে হবে, এই টিম ওয়ার্ল্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হবেই।

(তিন) শুধু ফুটবলারদের মনোবল বাড়ানোর কথা ভাবলেই হবে না। কর্মকর্তাদের মনোবলও উঁচু পর্দায় বাঁধা থাকা চাই, যাতে তাঁরা ফুটবলারদের মনোবল বাড়াতে পারেন। কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্যই সংগঠনের স্বাস্থ্য, সংগঠন, মানে এ আই এফ এফ-এর স্বাস্থ্যই ভারতীয় ফুটবলের স্বাস্থ্য। তাই, কর্মকর্তাদের সমালোচনা করে মানসিক আঘাত দেওয়া চলবে না। তাতে তাঁদের স্বাস্থ্যহানি হতে পারে এবং তার ফলে ভারতীয় ফুটবলের সমূহ ক্ষতি হতে পারে। তাছাড়া, আমাদের কোনরকম ঝুঁকি নেওয়াও উচিত নয়। এইসব সমালোচনার ফলে এই কর্মকর্তারা যদি রেগে গিয়ে পদত্যাগ করে ফেলেন, এদেশের ফুটবলের কী হবে? আহা, তখন অনাথ ভারতীয় ফুটবলকে কে দেখবে? এটা সাংবাদিকদের বোঝা উচিত, যে প্রবল আত্মত্যাগ ও নিষ্ঠা দেখিয়ে কর্মকর্তারা ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি করে রাখেন, তারপর সমালোচনা সয় না, স[illegible] না।

(চার) দেশি বিদেশি চিফ অ্যাসিস্ট্যান্ট— সব রকম কোচের মনোবলও বাড়াতে হবে। অতনুকে স্ট্রাইকার, বিদেশকে স্টপার এবং প্রশান্তকে গোলকিপার খেলানোর কথা ভাবলেও, হাততালি দিতে হবে। এক্ষেত্রে হাততালি মানে, হাত খুলে প্রশংসা করতে হবে। চিফ কোচকে ভগবান লিখতে হবে। অ্যাসিস্ট্যান্টদেরও অবশ্যই মিনোত্তি-বিয়ারজোত ভাবতে হবে। কোচ মিথ্যা কথা বললে চেপে যেতে হবে। প্রতি ম্যাচে নয়জন ক্যাপ্টেন

(পার হেড দশ মিনিট) করলেও সমর্থন জানাতে হবে।

(পাঁচ) এ পর্যন্ত যে চারটি নির্দেশ দেওয়া হল, তা যদি কোন উটকো সাংবাদিক বা ফালতু কাগজ না মানে— তাহলে কী হবে?

এজন্য একটি অ্যাকশন-কাম-পারসুয়েশন সাব-কমিটি গড়া হয়েছে। এখনও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি, তবে কিছু প্রস্তাব এসেছে। ময়দানের গুণ্ডাদের দিয়ে পেটাতে হবে। সব রকমের ভয় দেখাতে হবে। প্রচুর কমপ্লিমেন্টারি কার্ড আর টিকিট দিতে হবে। খুব করে খাওয়াতে হবে, যাতে মোটা হয়ে যায়, আর নড়াচড়া না করতে পারে। যেভাবে হোক অলস করে দিতে হবে। ভীরু আর উদ্যমহীন করে দিতে হবে। 'ভাফুমক'-এর সদস্যদের দৃঢ় বিশ্বাস, এই মহৎ কাজটি সমাধা করতে খুব বেশি সময় লাগবে না, যদি সচেতন ক্রীড়ামোদীদের সক্রিয় সমর্থন পাওয়া যায়।

৭৫

যুগোস্লাভিয়া তথা ভারত তথা কী কী যেন দেশের সরল সফল কোচ চিরিচ মিলোভান, আপনি আবার আসিবেন। কোন্ চ্যাংড়া রিপোর্টার কী লিখিল, কোন্ বেআদপ ফুটবলার কী বিবৃতি ঝাড়িল, তাহাতে মনঃক্ষুণ্ণ হইবেন না। কর্ণাটকের কোলারে (অতি সামান্য পরিমাণ) ছাড়া ভারতবর্ষে আর কোথাও সোনা পাওয়া যায় না। তথাপি জানিবেন, এ দেশ সোনার দেশ। আমরা দারিদ্রেও মহান. এই শব্দটিকে আর একটু প্রলম্বিত করিয়া ওজন বাড়াই— সুমহান। আমরা নিজেরা আলু সিদ্ধ ভাত খাইয়া অতিথিকে পক্ক রোহিত মৎস্য খাওয়াই, আমরা নিজেরা বিড়ি ফুঁকিয়া অতিথিকে লম্বা সিগারেট অফার করি. আমরা নিজেদের দেশের ক্লাব ফুটবলের রক্ত শোষণ করিয়া অন্য দেশে শুভেচ্ছা সফরে যাই। হে মহান চিরিচ, আমরা যে কী মহান চীজ— আপনি ধীরে ধীরে বুঝিবেন। তাড়াহুড়ার কিছু নাই। আপনি দীর্ঘকাল থাকিবেন, নিশ্চিন্ত থাকুন। শুধু ভুল করিয়া কখনও অভিমান করিবেন না। অভিমানবশত অথবা ট্যাকটিক্স খাটাইয়া কখনও কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন বিবৃতি দিবেন না। বাকি জীবনটা ভারতীয় ফুটবল নামক মুরগির ডিম্ব (অবশেষে মাংস) সেবন করিয়াই কাটাইতে পারিবেন।

লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। ভারতীয় ফুটবলের জমিদার-নায়েব-লেঠেলেরা প্রথম দর্শনেই আপনার প্রেমে পড়িয়া যান। কেনই বা পড়িবেন না? ধপধপে সাদা চামড়া, বাংলা ইংরেজি হিন্দি কিছুই কহিতে পারেন না, প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বয়স আর নাই, তদুপরি শ্বেতগাত্রে গঙ্গাজলের ছিটার মতো গিল্ড সোশিয়ালিজমের সুবাস আছে। কর্তারা আপনার প্রেমে বিভোর, আপনি কর্তাদের প্রশংসায় বিভোর। আদর্শ বন্ধনের এমন উৎকৃষ্ট নমুনা আর কোথায় মিলিবে?

মহান মিলোভান, আপনি ঘাবড়াইবেন না। আপনার প্রশিক্ষণে গড়া ভারতীয় দল দুইটি বিদেশে গোহারান হারিল কেন, এই নিয়া ক্রীড়ামোদীদের অসন্তোষের কোন সম্ভাবনা নাই। আমরা দশটি ম্যাচ হারিলে কাঁদি না। একটি ম্যাচ জিতিলে নাচি। চীনে শেষ ম্যাচে আলজিরিয়াকে হারাইয়াছেন, আবার কী চাই? আলজিরিয়া গত বিশ্বকাপে খেলিয়াছে, এই আলজিরিয়া দলে সেই দলের দুই-চারিজন ছিল, আর কী চাই? ধরা যায় আমরা বিশ্বকাপ

খেলিয়া ফেলিয়াছি। এখন অবশ্য আমরা স্বাদ বদলের জন্য যুগোস্লাভিয়া-পূর্ব সাহেবদের দিকে ঝুঁকিতেছি, আসলে তো আমরা সাহেব চাটা হইয়াছি ইংরেজদের কল্যাণেই। খাঁটি নীল রক্তবান ইংরেজ ক্রিকেট অধিনায়ক ডেভিড গাওয়ারের সাম্প্রতিক মন্তব্য জানেন? —'যাহাদের হারিতেই হইবে, তাহাদের পরাজয়ের মধ্যেই সম্মান খুঁজিতে হইবে।' আমরা তো তবু দুই সফরেই একটি করিয়া ম্যাচ জিতিয়াছি। দেশের মাটিতে নেহরু কাপ টুর্নামেন্টে শুধু এক আধটি শক্তিধর বিদেশি দলের বিরুদ্ধে আমাদের বীর বালকেরা প্রবল লড়িয়া ভাল খেলিয়া হারিলেই আমরা আপনার, হে সরল সাহেব আপনার জয়গানে মুখর থাকিব। সমবেত সঙ্গীতে দুনিয়ায় আমরাই পয়লা নম্বর জাতি। এমন চিৎকার করিব যে, অন্তত আঠার দিনের জন্য গলা ভাঙিয়া যাইবে। পরে কোন ম্যাচে তিন চার গোল খাইলেও এতই ভাঙা গলায় কাঁদিব যে ফাইভ স্টার হোটেলে বসিয়া আপনি শুনিতেই পাইবেন না। এত বেশি হারিবার জন্য মুষড়াইয়া পড়িবেন না, আপনার কথায় আমরা বিশ্বাস করিতে চাহিতেছি, এদেশীয় ফুটবলের প্রভূত উন্নতি হইতেছে। নিজে ভাঙিয়া পড়িয়া, বেলুন চুপসাইয়া বা কেস গুবলেট করিয়া দিবেন না, প্লিজ। আপনি সাহেব, আপনি ভাঙিয়া পড়িলে আমাদের কী হইবে? কে আমাদের দেখিবে এবং স্বপ্ন দেখাইবে?

তবে সাহেব, চীনে আপনি দুই-একটি নিতান্ত কাঁচা কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, ফুটবলারদের বলিয়াছেন, তাঁহারা যেন দেশে ফিরিয়া বলে, 'আমরা দারুণ খেলিয়াছি, চীনা দর্শকেরা বিস্তর প্রশংসা করিয়াছে, দুর্ভাগ্যবশত ফল ভাল হয় নাই।' আপনি ভাবিয়াছেন, ইহার ফলে আমরা খুশি হইব এবং খুশি হইয়া অভিনন্দন জানাইব এবং আপনার, পার্মানেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কোচের, একাধিক পার্মানেন্ট কর্মকর্তার এবং সব এক্সট্রা টেম্পোরারি ফুটবলারের মনোবল বাড়িবে। প্রণালীবদ্ধ বিস্তার উৎকৃষ্ট এ উদাহরণ। কিন্তু, ফুটবলারদের বিশ্বাস না করিলেই পারিতেন। আপনি তো সবই জানেন, ইহারা সব 'বারবণিতাদের মতো।' যখন যাহার তখন তাহার। দেশে ফিরিয়া আপনার শিখানো মিথ্যা বুলির পরিবর্তে, নিজেদের ক্লাব কোচের কাছে ইহারা সত্য কথা বলিতে শুরু করিয়াছে। বলিতেছে, 'আমরা জঘন্য খেলিয়াছি। আলজিরিয়া ম্যাচে ভাগ্যের এবং ভগবানের জোরে জিতিয়াছি। সেই ম্যাচের ভগবানের নাম— অতনু ভট্টাচার্য।' কেহ কেহ আপনার নিন্দাও শুরু করিয়াছে।

ফুটবলাদের কথা অবশ্য না ধরিলেও চলে। দরকার পড়িলে আপনার প্রশংসা আবার করিবে। বেশি তেড়িবেড়ি করিলে বাদ পড়িবে, বড় জোর বাজে কাগজে ঝাল ঝাড়িবে। কিন্তু, এ আপনি কী করিলেন চিরিচদাদা, খোদ এ আই এফ এফ ভাইস প্রেসিডেন্টকে চটাইলেন? যাঁহার ইনসাইড পকেটে হার ডেমোক্র্যাটিক হাইনেসের স্বহস্ত ও শ্রীহস্তলিখিত পত্র, সেই প্রিয়রঞ্জনকে শত্রু বানাইলেন? মহান মিলোভান, আমরা আপনাকে ভালবাসি। আপনি আমাদের ভাল খেলিয়া বেশি গোলে হারিতে শিখাইয়াছেন, কূপমন্ডূক ভারতীয় ফুটবলকে আন্তর্জাতিক ফুটবলের চন্দ্রালোক দেখাইয়াছেন, আপনার এবং আপনার সাদা চামড়ার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমরা হারিতে হারিতে আপনার বন্দনা করিব, গোল খাইতে খাইতে নাচিব। কিন্তু আগেই বলিয়াছি, দয়া করিয়া কর্তাদের, ভারতীয়

ফুটবলের জমিদার-নায়েব-গোমস্তাদের চটাইবেন না। সাফ কথা বুঝিয়া রাখুন, আমাদের সমবেত প্রশংসাসঙ্গীত আপনাকে বাঁচাইতে পারিবে না। মাসিক তিরিশ হাজার টাকার চাকরি বলিয়া কথা, আপনার আরও সতর্ক থাকা উচিত, সাহেব। মাথা গরম করিলেই ঠকিবেন। আপনার পেটেন্ট সাদা হাওয়াই শার্ট-কাম-আলখাল্লার প্রশস্ত পকেটে মিনি আইসব্যাগ রাখিবেন।

চীন সফরে আপনি নাকি মধ্যে মধ্যে দেখানোর চেষ্টা করিয়াছেন, আপনি ভারতীয় ফুটবলের দাদু, পিতা, মাতা, জ্যাঠামশাই, অভিভাবক— সব কিছু। দেখাইবেন, নিশ্চয় দেখাইবেন। এমন একটি মুরগি অথবা ট্যাড়স অথবা সাহেবচাটা চাকর দেশ যখন পাইয়াছেন, একশ এক বার দেখাইবেন। কিন্তু, আমাদের দেশে তাবড় তাবড় খাণ্ডারনি মহিলারাও ভাসুর ঠাকুরের সম্মুখে বিবাহের পর অন্তত এক বৎসর ঠাণ্ডা থাকেন। ভারতীয় ফুটবলের সহিত শুভবন্ধনে আবদ্ধ হইবার মাত্র দশ মাসের মধ্যেই দাপট দেখাইবার চেষ্টা করিয়া আপনি ঠিক করেন নাই। এমনিতে আপনার কোন দোষ নাই। ভারতীয় ফুটবলাররা একটি রেস্তোরাঁয় খাইতেছিল, অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণের পর যেই সুপক্ক ফল হাতে নিয়াছে, আপনি অর্ডার দেন— কেউ ফল খাইবে না! মাঝে মধ্যে এইরূপ আজগুবি অর্ডার না ঝাড়িলে নেটিভেরা ঠিক সমীহ করে না। কিন্তু, রেস্তোরাঁয় যে প্রিয়বাবুও ছিলেন, তাহা খেয়াল করেন নাই। ফুটবলাররা মানিতে পারে আপনার ফালতু দাপট, এ আই এফ এফ ভাইস প্রেসিডেন্ট মানিবেন কেন? এখন ঠ্যালা বুঝুন। প্রিয়বাবু দেশে ফিরিয়া বলা ধরিয়াছেন, 'মিলোভান দেখাইতে চান তিনিই ভারতীয় ফুটবলেব ফাদার মাদার। আসলে, তিনি নূতন কিছুই দেন নাই, মাসে ত্রিশ হাজার টাকা জলে যাইতেছে। পি কে ব্যানার্জিই ঠিক ছিল।'

ভিসার কাগজপত্র, সম্পূর্ণ প্রস্তুত না থাকায়, দেশে ফিরিবার পূর্বে দমদম এয়ারপোর্টে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াও ঠিক করেন নাই। প্রিয় চিরিচ মিলোভান, মাথা গরম করিবেন না। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবেন না। এমন সরেস চাকুরি হারাইবেন না। আমাদের অনাথ করিবেন না। হারিতে হারিতে হাসিবার নাচিবার গাহিবার সুযোগ হইতে আমাদের বঞ্চিত করিবেন না। প্লিজ!

৭৬

প্রিয় পাঠক, আপনি কি নিয়মিত গড়ের মাঠে যান? আপনার কান দুটি কি যথেষ্ট সজাগ— যাতে মৃদু শব্দও ধরা দেয়? যদি দুটি প্রশ্নেরই জবাবে 'হ্যাঁ' বলতে পারেন, তাহলে আমার তৃতীয় প্রশ্ন। আপনি কি ইদানীং ময়দানের ঘাসে ঘাসে এক ব্যথা ও শোকের গুঞ্জন শুনতে পাচ্ছেন না? না পেলে, ই এন টি স্পেশালিস্টের কাছে যান। কান দেখান। আমি তো এই মৃদু হাহাকারে এতই বিমর্ষ ও কাতর যে, নিয়মিত ময়দানেই যাই না। মাঠে যাওয়া দু-দণ্ড মজা পাওয়ার জন্য, তদুপরি আমার হার্ট রমেশ কৃষ্ণানের সার্ভিসের চেয়েও উইক। তাই হাহাকার, আর্তনাদ, দুঃখ কষ্ট শোকের ওজন সইতে পারি না।

কিন্তু, প্রিয় পাঠক, আপনি যদি নিয়মিত গড়ের মাঠে যান, যদি আপনার কান এবং হার্ট সতেজ সবল থাকে, নিশ্চয় প্রত্যহ ঐ শোকার্ত গুঞ্জন শুনছেন। ঘাসের গোড়ায় জুলাই-শেষের বিখ্যাত ময়দানী কাদা থিকথিক, সেই ঘাসে শোকাপ্লুত সজল ক্রন্দন— তিনি চলে যাচ্ছেন। তিনি বিদায় নিচ্ছেন। তিনি আর থাকছেন না। কিছু গাড়ল জার্নালিস্ট যাই বলুক, ময়দানের ঘাস বুঝেছে, আহা, সহজ সরল নরম ঘাস, এই বছরের পর অশোক মিত্র আই এফ এ সম্পাদকের পদ থেকে বিদায় নিলে ময়দানের, কলকাতা ফুটবলের, বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলেরও সর্বনাশ হয়ে যাবে। তবু, তিনি আর থাকবেন না। নিষ্ঠুর অশোক মিত্র, কলকাতা ফুটবলকে কাঁদিয়ে ভাসিয়ে বিদায় নেবেনই। ময়দানের কাদাজড়ানো ঘাসেরা কান্নাকাটি করুক। আমি জার্নালিস্ট, আমাকে কাজ করে যেতে হবে। আই এফ এ কর্মকর্তা অশোক মিত্রর বিদায় উপলক্ষে মানপত্র রচনার দায়িত্ব আমি এড়িয়ে যেতে পারি না। 'খেলা'র সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় আমার হামলা আর কতদিন সহ্য করবেন জানি না। হয়ত, অশোক মিত্রর বিদায়ের সময় আমি একটা পৃষ্ঠায় যা খুশি লেখার সুযোগ আর পাব না। তাছাড়া, বুঝলেন কিনা, রিসেন্টলি আমি খুব ব্যস্তও হয়ে পড়েছি। ব্যস্ততা আরও বাড়বে। বয়স বাড়লে এবং দক্ষতা কমলে ব্যস্ততা বাড়ে। তাই, মানপত্র রচনা এবং প্রকাশের কাজটা এখনই সেরে রাখছি। যথাসময়ে, অর্থাৎ বিদায় সংবর্ধনা সভায় কেউ এই মানপত্র কিঞ্চিৎ নাকি সুরে পড়ে দেবেন। ব্যাকগ্রাউন্ডে করুণ সুরে বেহালা বা হুইসিল

বাজবে।

'হে মহান ক্রীড়া প্রশাসক আপনি আমাদের অষ্টাঙ্গ প্রণাম গ্রহণ করুন। বহু সুধীজন বহুবার বলিয়াছেন যে, কলিকাতা একটি ঝঞ্ঝাট নগরী এবং অধিকাংশ ঝঞ্ঝাটের প্রধান কেন্দ্র কলিকাতা ময়দান— যেখানে রাজনৈতিক জনসভা, ফুচকা ও আদা-চা বিক্রয়, গাঁজা ও অন্যান্য অবৈধ ব্যবসা, পাতাল রেলের শতবর্ষব্যাপী কাজ, কুস্তির দঙ্গল, জুয়া ও মদ্যপান প্রভৃতি ছাড়াও মাঝে-মধ্যে ফাঁকে ফোকরে খেলাধুলার চর্চা হয়। অন্য এত কিছুকে নিয়া কোনও ঝঞ্ঝাট নাই, যত ঝঞ্ঝাট পোড়ামুখী ফুটবল নিয়া। ঐই ঝঞ্ঝাট হইতে কল্লোলিনী কলিকাতাকে মুক্ত করিবার জন্য গত কয়েক বছরে আপনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন, এই মহানগরীর ইতিহাসে তাহা হীরকাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকিবে। আপনি লিগ শিল্ডও বন্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, মাঠে লোক কমাইয়াছেন, খেলার মান নামাইবার চেষ্টায় ক্লান্তিহীন থাকিয়া ফুটবলের উন্মাদনা হ্রাস করিয়াছেন। বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় দিলেও, একথা আমরা সহর্ষে স্বীকার করিব যে, কাজ আপনি অনেকটাই সারিয়া গিয়াছেন। একটি সুস্থ সবল সতেজ যুবককে মৃত্যুশয্যায় ফেলিয়াছেন, উত্তরসুবিদের দায়িত্ব বা কাজ খুব অল্প। শেষ কয়েকদিন ভুল চিকিৎসার ধারা অব্যাহত রাখিয়া মৃত্যু ত্বরান্বিত করা। হে নির্বিকার পরিচালক, আপনি আশীর্বাদ করুন, আপনার পরবর্তী সম্পাদক যেন আপনার মতোই উপযুক্ত হয়ে কলিকাতা ফুটবলের ধ্বংসকার্যে প্রবৃত্ত থাকিতে পারেন।

হে প্রখর বুদ্ধিধর ফুটবল-নায়ক, আপনি যথার্থই বুঝিযাছিলেন যে জাতীয় ফুটবলে বাংলার আধিপত্য ভারতীয় ফুটবলের স্বাস্থ্যের পক্ষে সমূহ ক্ষতিকব। তাই, ক্ষমতায় আসীন হইয়াই দলাদলি ও স্বজনপোষণের এমন কড়া ডোজ দিলেন যে ওড়িশা ন্যাশনালে পরাজয় বরণ করিয়া বাংলা দল ভারতীয় ফুটবলের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাইতে বাধ্য হইল। মহামতি লেনিনই না বুঝিয়াছেন— 'দুই পা আগে এক পা পিছে'? গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। লেনিন না পড়িয়াও এই আগুপিছু চিন্তা আপনার ছিল, সেজন্যই তীব্র সমালোচনার ফলে এক পা পিছাইয়া পরের বছর যথাসম্ভব সেরা দল গড়িলেন এবং কোজিকোড়ে ভারতীয় ফুটবলের স্বাস্থ্যের উন্নতি ব্যাহত করিয়া বাংলা আবার সন্তোষ ট্রফি ঘরে তুলিল। কিন্তু, আপনি আদর্শ জাতীয়তাবাদী, প্রাদেশিক শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন আপনি সহিতে পারেন না, সন্তোষ ট্রফি আপনার দুই চক্ষুর বিষ— পরের বছরই এই আপদকে আপনি বিদায় করিলেন। কলিকাতার মাটিতেও বাংলার শার্দূলেরা গোয়াকে ফাইনালে হারাইতে পারিল না, জয়েন্ট চ্যাম্পিয়ন গোয়া ট্রফি নিয়া পশ্চিমে ফিরিল, বিস্তর খানাপিনা ও নৃত্যগীত করিল। ভারতীয় ফুটবল পুনরায় চাঙ্গা হইল। এইবার আর সমালোচনা আপনাকে স্পর্শ করিল না। হে সর্বংসহ ফুটবলশাসক, সমালোচনা হজম করিবার জন্য যে ট্যাবলেট আপনি খাইতেন, অন্তত তাহার নাম লিখিয়া যাইবেন। উত্তরসূরিরা এমনিতেই আপনার নখের যোগ্য হইবে না, তদুপরি সমালোচনার হজমি ট্যাবলেট না পাইলে নাকানিচোবানি খাইবে।

হে কীর্তিমান ময়দানস্তম্ভ, আপনার তুলনা আপনি নিজেই। আই এফ এ-র সহকর্তা এবং কর্মীদের আপনি যেভাবে আদালত চিনাইয়াছেন, তাহা সকলেই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ

করিবে। একের পর এক বেআইনি কাজ করিয়া আপনি যেভাবে মামলার সংখ্যা বাড়াইয়াছেন, লিগ লাটে তুলিবার যে রাস্তা দেখাইয়া গিয়াছেন, যথাযথভাবে সেই পথ অনুসরণ করিতে পারিলে ভাবী কর্মকর্তারাও প্রাতঃস্মরণীয় হইবেন।

হে বিপুল ব্যক্তিত্বহীন যুগ্মসচিব, আই এফ এ এবং কলিকাতার ফুটবলকে কান ধরিয়া রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পৌঁছাইয়া দিবার জন্যও আপনি আমাদের সংগ্রামী অভিনন্দন গ্রহণ করুন। আপনার অক্ষয় কীর্তি— ষোলই আগস্টের কথা মনে পড়ে? বড় ম্যাচের যাবতীয় সাংগঠনিক দায় দায়িত্ব অনভিজ্ঞ আমলাদের হাতে তুলিয়া না দিলে, সেদিন অমন শোচনীয় বিপর্যয় ঘটিত না, এই বিশ্বাস আমাদের আছে। অতএব, ষোলই আগস্টের নায়ক হিসাবে আমরা আপনাকে মনে রাখিবই। স্বভাবসুলভ বিনয়বশত আপনি যদি বা এই স্বীকৃতি লইতে অস্বীকার করেন, আমরা ছাড়িব না। অনন্যোপায় হইয়া আপনাকে সম্পাদকের চেয়ার ছাড়িতে দেখিতেছি, সব কিছু ছাড়িতে বলিবেন না।

হে বিচিত্র প্রশাসক, আপনার আমলে গড়াপেটার চাষবাস ময়দানে যেরকম প্রবলভাবে বাড়িয়াছে, গড়ের মাঠের তাঁবুতে তাঁবুতে বড় ফ্রেমে বাঁধানো অন্তত আপনার পাসপোর্ট সাইজের ছবি ঝুলিবে। নিশ্চিন্ত থাকুন, দুই ম্যাচে একশত চুরানব্বই গোলের রোমহর্ষক রেকর্ড ভবিষ্যতের কোনও সম্পাদক সহজে স্পর্শ করিতে পারিবে না। গড়াপেটার উপর একটি অথেন্টিক গ্রন্থ রচনার কথা ভাবা হইতেছে। ভূমিকা আপনাকেই লিখিতে হইবে। কোট-টাই-পরা সাতাশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে হাস্যমুখের যে ছবিটি আপনি প্রেফার করেন, ভূমিকার সঙ্গে তাহাই ছাপা হইবে।

হে বিদায়ী ফুটবল-বন্ধু, আপনি গেলে অনেক কিছুই যাইবে। কে আর অস্বীকার করিবে যে, তাহার আমলে গড়াপেটা ব্রণ হইতে ক্যানসারে পরিণত হইয়াছে? কে আর রাম গাঙ্গুলির মতো অনুচর পুষিয়া জনগণকে আমোদ এবং জার্নালিস্টদের লিখিবার রসদ দিবে? কে আর টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে দুপুরকে 'দুখুর' কহিবে? হায়, যাহা যায়, তাহা যায়। এই বিদায় মুহূর্তে আপনি আমাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের প্রণতি গ্রহণ করুন।'

৭৭

আপনারা সবাই দেখছেন। নিশ্চয় পছন্দও করছেন, নাহলে খবরের কাগজের বাঘা বাঘা সব এডিটর এ জিনিস দিচ্ছেন কেন? আমি ওই টেলিভিশন থেকে তোলা ছবির কথা বলছিলাম। মেজর ইভেন্টের ছবি, ফোটোগ্রাফ কবে হাতে আসবে কে জানে, এডিটররা পরদিনের কাগজেই বাজিমাত করছেন— টেলিভিশনের পর্দা থেকে ছবি তুলিয়ে। হয়ত অর্ধেক পাঠক-পাঠিকা টেলিভিশনেই সব দেখেছেন, হয়ত ঝাপসা ছবিতে জিমনাস্টকে দেখাবে কসমোন্যাটের মতো, হয়ত আরও অনেক কিছু, তবু ওই ছবি চাই। লোকে দেখছে, যাকে বলে, রিডাররা খাচ্ছে, পাবলিক নিচ্ছে। ধীরে ধীরে এমন দিন নিশ্চয় আসবে যখন আমাদের দূরদর্শনে অনেক চ্যানেল থাকবে এবং দুনিয়ার যাবতীয় ইম্পর্ট্যান্ট খেলাধুলোর ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট করা হবে। নিশ্চয় এমন দিনও আসবে, যখন টেলিভিশন থেকে তোলা ছবি মাঠ থেকে তোলা ছবির মতোই পরিষ্কার হবে। তখন আর খবরের কাগজকে কোথাও ফোটোগ্রাফার পাঠাতে হবে না। অফিসে বসেই টেলিভিশন থেকে ছবি তুলে টাটকা টাটকা পাঠক-পাঠিকাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া যাবে। খরচ বাঁচবে। সময় বাঁচবে। অমিয় তরফদারের অফুরন্ত ছোটাছুটি থামবে। লস এঞ্জেলেস বা অন্য কোনও জায়গা থেকে কলকাতায় রেডিওফটো করা যায় না বলে ফোটোগ্রাফারদের হাহুতাশ থাকবে না।

এই সব ভাবতে ভাবতেই আমার মাথায় কিছু অরিজিনাল আইডিয়া এল— জিনিয়াসদের যেমন আসে আর কি। খবরের কাগজের খরচ আরও কমানো যায়। সময় আরও বাঁচানো যায়। ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট হলে, খেলা শেষ হওয়ার ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ম্যাচ রিপোর্ট পাওয়া যাবে। জার্নালিস্টদেরও আর স্পটে পাঠানোর দরকার নেই। অফিসে বসে টেলিভিশনে ম্যাচ দেখে তখনই ম্যাচরিপোর্ট নামিয়ে দেওয়া যাবে। বাড়িতে বসেও দেখে ফেলা যায়। বাইরে গিয়ে ঝক্কি ঝামেলাও তো কম নয়। অনভ্যস্ত পরিবেশ, অচেনা খাওয়াদাওয়া, টেলেক্স লাইন পাওয়ার ঝঞ্ঝাট। কপি কাগজের অফিসে পৌঁছতে মাঝরাত, কখনও কখনও বিরাশি লাইনের রিপোর্টের সাড়ে উনআশি লাইনই ডেস্কের লোকেদের ম্যানেজ করে দিতে হয়। আমার প্রস্তাব, এর পর থেকে, যে সব ক্ষেত্রে টেলিভিশন

কভারেজের ব্যবস্থা থাকবে, ফোটোগ্রাফার তো বটেই জার্নালিস্টদেরও পাঠানো বন্ধ করে দেওয়া হোক। কোন দরকার নেই। টেলিভিশন প্লাস এজেন্সি কপি— মোর দ্যান এনাফ। পৃষ্ঠার ডগায় একটা নাম দরকার, সেটা অফিস থেকেই পাওয়া যাবে। আমার বিশ্বাস, এই প্রস্তাব গৃহীত হবে এবং এদেশের খবরের কাগজের ইতিহাসে আমার নাম লেখা থাকবে। খবরের কাগজের ফিনান্স ঘুঘুরা আমার পিঠ প্রচুর চাপড়াবেন। আয়োডেক্স জওয়াব নেহি।

সামনেই ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্তান সফর। লাইভ টেলিকাস্ট থাকবে। এক্সপেরিমেন্টটা তখনই করা যেতে পারে। কাউকে যেতে হবে না। টেলিভিশন থেকে ছবি তুলবেন অমিয় তরফদার, তারাপদ ব্যানার্জি, শ্রেণিক শেঠ।

ম্যাচ রিপোর্ট কী রকম দাঁড়াতে পারে, ভেবে দেখেছি। আশা করি, ভালই হবে। জার্নালিস্টদের সারা দিন মাঠে ঠায় বসে ক্লান্ত হয়ে পড়ে লিখতে হবে না। কিছু নমুনা পেশ করছি, মানে এইরকম হতে পারে :

মতি নন্দী (আনন্দবাজার) : আজ লাহোরের কুয়াশা কাটানোর জন্য তেজস্বী সূর্য ছিল না, কিন্তু জহির অব্বসের ব্যাট ছিল। তেজ ছিল কপিলদেবের বোলিংয়েও, কিন্তু মাত্র সাড়ে পাঁচ ওভারের জন্য। চৌত্রিশ, পঁয়ত্রিশ এবং ছত্রিশ নম্বর বলকে জহির বেছে নেয় নিজের অস্ত্রাগার খুলে এবং তুলে ধরার জন্য। ঝাঁড়পোছ অবশ্য শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় ওভারেই, যখন কপিলের লেট আউট সুইঙ্গারে জহিরের ব্যাট ছোবল মারে এবং স্কোয়ারিশ থার্ডম্যান রজার বিনি ফেন্সিং থেকে বল কুড়িয়ে আনে। এই সময়েই স্লিপে দাঁড়ানো গাওস্করকে দুবার মাথা ঝাঁকাতে দেখা গেল। আমরা বুঝলাম, সিরিজের দ্বিতীয় ওভারেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা হতাশ হবার রাস্তা খুঁজছে। আমরাও হতাশ হলাম, ক্যামেরা সেই মুহূর্তে গাওস্করের মুখে থমকে না দাঁড়ানোয়। এক পলকেই গাওস্করের শার্টের থামস আপ লোগো অবশ্য দেখা গেছে। থামস আপ এই ক্রিকেট পাইরেটদের যত টাকা দেবে, বোর্ড কি তার চেয়ে বেশি জরিমানা চাওয়ার সাহস দেখাবে?

অজয় বসু (যুগান্তর) : ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে সাত সকালেই নিজেকে জাহির করলেন জাহির আব্বাস। মাত্র চার ঘণ্টাতেই হাঁকালেন রাজসিক সেঞ্চুরি। সত্যিই এ এক নজর-কাড়া নজির! কপিলদেব মেহনৎ কম করেননি। মেহনতের পুরস্কার হিসাবে তিনটি উইকেটও পেয়েছেন। কিন্তু জাহির আব্বাসকে দমিয়ে রাখতে পারেননি। অকৃপণ মেজাজে মারের ফুলঝুরি দেখিয়েছেন জাহির, দর্শকরা ক্ষণে ক্ষণে উল্লাসে মুখর হয়েছেন। জাহিরের ব্যাটিংয়ে জয়ের তাগিদ ছিল, ছিল অকৃপণ মেহনতের অফুরন্ত প্রতিচ্ছবি। কপিলের দ্বিতীয় ওভারে জাহিরের সুন্দর কাট, পরিভাষায় আমরা যাকে বলি লাহোরিয়ান কাট— দেখে লাহোরের হাজারো দর্শক 'কেয়া বাৎ কেয়া বাৎ' বলেছেন। থার্ডম্যানে দাঁড়ানো ফিল্ডসম্যানও (মদনলাল অথবা শিবলাল যাদব) কিছু বলেছেন। টেলিভিশনে তাঁর ঠোঁট নড়তে দেখা গেল। কপিলের ষষ্ঠ ওভারে গদ্দাফি স্টেডিয়ামের বাদশা জাহির গুণে গুণে হাঁকালেন তিনটি বাউন্ডারি। আর পরের ওভারে মেহনতী শিবলালের বলে আকাশছোঁয়া ছক্কা। প্রথমে ভাবা গিয়েছিল বাউন্ডারি। স্লো মোশনের ব্যবস্থা নেই, আম্পায়ারের সঙ্কেত

দেখে বোঝা গেল— ছক্কা।

সরোজ চক্রবর্তী (আজকাল) : সকালে ভারতীয় ক্রিকেটাররা মাঠে ঢোকেন থমথমে মুখ নিয়ে। মণিন্দার সিংকে না নিয়ে শিবলাল যাদবকে কেন টিমে নেওয়া হল? মণিন্দার প্রাক্তন অধিনায়ক সানি গাভাসকারের প্রিয় পাত্র, কপিলদেব কি তার শাস্তি দিলেন? টেলিভিশনে পরিষ্কার বোঝা গেছে, গাভাসকার এবং কিরমানি সহ ভারতের অন্তত সাড়ে পাঁচজন ক্রিকেটার এই অবিচারে ভেঙে পড়েছেন। মদনলালের বলে কাশিম ওমরের সহজ ক্যাচটা গাভাসকারের মাটিতে ফেলে দেবার আর কী কারণ থাকতে পারে?

গভীর রাতে পঙ্কজ রায়কে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'আমরা সেরা টিম বেছে দিয়েছি। কোন্ এগারজন খেলবে সেটা ট্যুর কমিটির ব্যাপার।' গোপাল বসুর মতে, 'কপিলদেব ঠিকই করেছে। মণিন্দারের বয়স, টেস্ট আর উইকেট— কোন্টা কত আমি গুলিয়ে ফেলি, সবই কুড়ির কাছাকাছি। অ্যাট লিস্ট শিবলালের বয়সটা অনেক বেশি।'

সেঞ্চুরি করার পর জাহির আব্বাসের ব্যাট যখন সবে মাথার ওপর উঠছে— 'সরি ফর দি ইন্টারাপশান!' এই ধরনের গুরুমুহূর্তে মাইক্রোওয়েভ লিঙ্ক কেন ছিঁড়ে যায়? কলকাতা দূরদর্শনের অধিকর্তা এ ব্যাপারে মুখ খুলতে রাজি হননি। তবে, নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কর্মী জানালেন, 'সবই কেন্দ্রের ব্যাপার। দিল্লির ব্যাপার। চক্রান্ত।'

যাই হোক, ব্যাপারটা মনে হয় খারাপ দাঁড়াবে না। মাঠ থেকে ম্যাচরিপোর্ট অথবা টেলিভিশন দেখে ম্যাচরিপোর্টের মধ্যে কীসের তফাত? তফাত শুধু খরচের। রিপোর্ট একটু ঝাপসা মনে হলেও ক্ষতি নেই, টেলিভিশন থেকে তোলা ছবিও তো একটু ঝাপসা থাকে। আর, আমাদের এডিটরের মতো জার্নালিস্টরা মাঠে থাকলেই বেশি ঝাপসা লেখেন। আমার প্রস্তাব সাইক্লোটাইল করিয়ে খেলাধুলোর জগতের গণ্যমান্যদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। মাত্র একজনের কাছ থেকেই জবাব এসেছে। একেবারে অশোকস্তম্ভের সবুজ ছাপ মারা লেটার হেডে চিঠি। সাঁপুড়ে বানানটা ভুল লিখেছে। লিখুক। ভুল ইংরেজি, ভুল বানান লেখা নর্থ ইন্ডিয়ার বার্থরাইট। ক্রীড়ামন্ত্রীর স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট লুটা সিং লিখেছেন : 'মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় আপনার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছেন। আপনার প্রস্তাব তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সাংবাদিক এবং আলোকচিত্রীদের ঘটনাস্থলে না পাঠালেও চলে, একথা আপনি প্রমাণ করে দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী জানতে চান, খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রেও এটা সম্ভব কিনা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ব্যয়সঙ্কোচের মহান ডাক দিয়েছেন। বিদেশি মুদ্রার ঘোর সঙ্কট। অলিম্পিক, এশিয়াড বা এই জাতীয় যে কোন প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগী না পাঠিয়েও অংশগ্রহণ করা যায় কিনা এবং টেলিভিশন এ ব্যাপারে কতটা সাহায্য করতে পারে, এই সব প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আপনার বিস্তারিত প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আহ্বান করছেন। মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আগামী তিন সপ্তাহ পাঞ্জাব সমস্যা নিয়ে বিব্রত থাকবেন। তারপব সাড়ে তিন সপ্তাহ বিদেশ সফর। এক সপ্তাহ বিশ্রাম। তারপর নির্বাচন। আপনি পঁচাশির ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রস্তাব পাঠাবেন।

৭৮

নিরহঙ্কার, নিরভিমান, নির্বিকার ও নির্পদক ভারতীয় অলিম্পিক স্কোয়াডকে রিসিভ করার জন্য গর্বিত ও ব্যস্ত বুটা সিং পালাম এয়ারপোর্টে হাজির থাকতে পারেননি। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে ক্রীড়া দপ্তরের উপ-সচিব আনপঢ় সিং থাকবেন, এইরকম কথা নাকি ছিল। উপসচিবের মাথা ধরায় ক্রীড়ামন্ত্রীর একান্ত সচিবের খাস বেয়ারা লক্কর সিং পালাম বিমানবন্দরে এসেছিলেন। সাদা সাফারি স্যুটে তাঁকে দেখাচ্ছিল চমৎকার, শরীর এবং মাথা আর একটু মোটা হলে মন্ত্রী হিসাবেও দিব্যি মানিয়ে যেত। পালাম এয়ারপোর্টেও 'খেলা'! বাংলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য সাংবাদিক হিসাবে ওইদিন পালামে হাজির ছিল আপনাদের উপেক্ষাধন্য এই বাবুরাম সাপুড়ে, হুঁ হুঁ। পালামে ঢোকার জন্য সেদিন কোন স্পেশাল আইডেন্টিটি কার্ড লাগেনি, তাই তেমন কিছুর ফোটোস্ট্যাট কপি ছাপতে পারলাম না, মাপ করবেন।

লক্কর সিং জানতে চাইলেন, এই যে ইন্ডিয়ার সব প্লেয়ারটেয়ার ফিরছে, এরা জিতে ফিরছে না হেরে? আমি জানালাম, এরা সবাই জিতে ফিরছে। তুচ্ছ মেডেল নিয়ে কাড়াকাড়ি না করে ওরা জয় করেছে অন্য দেশের প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীদের কঠোর হৃদয়। একটিও মেডেল ছিনিয়ে নেয়নি কারও কাছ থেকে, নিঃস্বার্থ অংশগ্রহণের এমন পবিত্র উদাহরণ হিসাবে ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য কোনও দেশের নাম ভাবাই যায় না। এজন্যই আগেভাগে এদেশের, অবশ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অলিম্পিক অর্ডার অফ কী যেন দিয়ে রাখা হয়েছে।

আমার পরের কথাগুলো লক্কর সিং শুনলেন বলে মনে হল না। শুধু 'জয়'টা শুনেছিলেন। বললেন, 'বড় সাইজের মালা যে আনা হল না!'

লক্কর সিংয়ের পাশে পাশেই থাকায় প্রতিদ্বন্দ্বীদের হৃদয়জয়ী ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলার সহজ সুযোগ পাওয়া গেল। দিল্লির এজেন্সিওয়ালারা অবশ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তেইশ মিনিট আমাকে মুখ বা খাপ খুলতেই দিল না। জনৈক এজেন্সিওয়ালার প্রশ্নের জবাবে নিদারুণ হতাশ করলেন পি টি উষা। কেরলের এই মেয়েটার কিস্যু হবে না, কেরানীগিরিতেই ঘষটাতে হবে। অলিম্পিকে ফোর্থ হবার পর যদি নেক্সট অলিম্পিকে

তিনটে গোল্ডের কথা নাই বলতে পারে, এদেশে জন্মানো কেন বাপু? বলল, দু-বছর পর সিওল এশিয়াড থেকে দুটো গোল্ড আনবে। ধুস! মেয়েটার কোন অ্যাম্বিশন নেই। কোন কাণ্ডজ্ঞানও নেই। আটশ মিটারের সেমিফাইনালে ওঠার সুবাদে সাইনি আব্রাহাম যে শাইনিং স্মাইল দিল, তার কাছাকাছিও কিছু দিতে পারল না। ব্রোঞ্জ পায়নি ঠিক হয়েছে, ফোটোগ্রাফাররা বেঁচেছে। ভিক্টরি স্ট্যান্ডে উঠে মেয়েটা ঠিকঠাক হাসতে পারত কিনা সন্দেহ।

অধিনায়ক চাঁদরামকে অবশ্য হাসিমুখেই পাওয়া গেল। বুদ্ধিমান মানুষ। জানেন, আমরা তাঁর কাছে অন্তত একটি সিলভার আশা করেছিলাম, ইফ নট গোল্ড। দিল্লির এক দৈনিকের সাংবাদিকের দিকে উজ্জ্বল হেসে বললেন, 'পেয়েই যেতাম বুঝলেন। খুব খারাপ রেজাল্ট হয়নি, টুয়েন্টি সেকেন্ড। ওয়েদার খারাপ না থাকলে রেজাল্ট অনেক ভাল হত।

এজেন্সি এবং দৈনিকের মাঝখানে নাক গলিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বলেছিলেন সুরেশ যাদব-আদিল সুমারিওয়ালা-বলবিন্দার সিং ইত্যাদিদের না নিলে অলিম্পিক স্কোয়াডের সঙ্গে যাবেন না, তারপর সেই কথা থেকে সরে গেলেন কেন?'

দিল্লি এশিয়াডে সোনা পাওয়ার পর রাজীব গান্ধীর পদধূলি নেওয়া ব্যক্তিত্ববান ভারতীয় অধিনায়ক বললেন, 'এসবই আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার। আমি একটুও সরে আসিনি, আসছি না। আবার আমি ঠিক এই কথাই বলব। সিওলে টিমের ক্যাপ্টেন হলে, ঘোষণা করব: যোগ্যদের টিমের সঙ্গে না নিলে আমি যাব না। একই ভাষায় বলব। আমার কথা থেকে কিছুতেই সরব না, দুই বা চার বছর পরেও নয়, কোনদিনই নয়। ভদ্দরলোকের এক কথা, হ্যাঁ বাবা।'

এজেন্সি আর ডেইলির ভিড় একটু পাতলা হতেই পি টি উষার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'একথা কি সত্যি যে আপনাকে মারুতি গাড়ি উপহার দেওয়া হচ্ছে?'

— 'না। কেরল গভর্নমেন্ট কিছু টাকা দিচ্ছে। একটা মোপেড নেব ভাবছি।'

— 'মোপেডের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট থেকে আপনি কত টাকা পাবেন, মিস উষা?'

— 'বিজ্ঞাপন? না, না। আমি মোপেড কিনব, ট্রেনিং গ্রাউন্ডে তাড়াতাড়ি পৌঁছনোর জন্য। রোজ দশ বার মিনিট নষ্ট হয়।'

— 'আপনি সিওল থেকে দুটো গোল্ড আনবেন বলেছেন। নিশ্চয়ই সিওল অলিম্পিক?'

— 'সে কি, আপনি এতক্ষণ এখানে ছিলেন না? আমি তো সিওল এশিয়াডের কথা বলেছি।'

ধুস! অ্যাম্বিশন নেই, পাবলিসিটি সেন্স নেই। হতাশ চিত্তে অন্যদের দিকে গেলাম। উদীয়মান জ্যাভেলিন থ্রোয়ার লস এঞ্জেলেস যেতে না পারা অফিসিয়ালদের ব্যাজ বিলি করছিলেন। প্রতিশ্রুতিবান এই ভারতীয় অ্যাথলিট বললেন, 'উন্নতি হচ্ছে, প্রভূত। আমার জুতো নিয়ে প্রথমেই আপত্তি ওঠায় মনটা ভেঙে গেল। তবু গ্রুপে তিনজন আমার চেয়ে কম ছুঁড়েছে। আমার গ্রুপে চব্বিশজন আমার চেয়ে বেশি ছুঁড়েছে। আর একটা গ্রুপের

হিসেব ধরলে আমার পোজিশন ছাপ্পান্নর মধ্যে একান্ন। পাঁচজনকে যখন বিট করতে পেরেছি, ওই একান্নজনকেই বা পারব না কেন? শুধু একটু সময় দরকার। এইট্টি এইট অলিম্পিকে গোল্ড আনবই। জ্যাভেলিনে দুটো গোল্ড থাকলে দুটোই আনতাম।'

গীতা জুৎসি বললেন, 'তিন হাজার মিটারে সবে শিফট করেছি, বয়েসও সবে তিরিশের কাছাকাছি। এখনই ফল আশা করবেন না। আমি লড়ে যাচ্ছি। আমেরিকায় ট্রেনিং নিয়ে সময় বাড়িয়ে ফেলেছি। এবার ইন্ডিয়ায় বসে থেকে সময় কমিয়ে ফেলব। সিওল অলিম্পিকে গোল্ড পাবই। আগের অলিম্পিকে হিটেই ন-জনের মধ্যে এইটথ হওয়া মেয়ের এই পারফরমেন্সে সিওলে হই চই পড়ে যাবে, দেখবেন।'

মেয়েদের আটশ মিটার সেমিফাইনালে গ্রুপে সবার শেষে আসা সাইনি আব্রাহাম বললেন, 'আগেই বলেছি প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসাবে অলিম্পিক ইভেন্টের সেমিফাইনালে উঠতে পেরে আমি ধন্য। সেমিফাইনালে লাস্ট থেকে ফাইনালে ফার্স্ট— কতটুকু তফাত? সেই তুলনায় চার বছর অনেক বেশি সময়। সিওল অলিম্পিকে একটা গোল্ড আশা করতে পারেন। অবশ্য, জোলা বাডের মতো কেউ যদি পিছন থেকে ল্যাং মেরে না দেয়। যোগ্যের তো শত্রুর অভাব হয় না।'

সাদা দাড়িতে হাত বুলোচ্ছিলেন হকি দলের বিচক্ষণ কোচ বালকিষেণ সিং। কাছে যেতেই বললেন, 'আওয়ার গোল ইজ গোল্ড, ইফ নট ইন লস এঞ্জেলেস, দেন অফকোর্স ইন সিওল। গোল অ্যাভারেজে মার খেয়ে গেলাম, বুঝলেন। সব নিয়ম আমাদের প্যাঁচে ফেলার জন্য করা হয়, বুঝলেন। রোমীয় যদি অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে অ্যাট লিস্ট তিনটে গোল বাঁচাতে পারত, আর বিনীত কুমার যদি অ্যাট লিস্ট আরও তিনটে পেনাল্টি কর্নার কনভার্ট করতে পারত, আমরা অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারতাম। সেন্টার হাফ হরদীপ যদি অ্যাট লিস্ট অজিত পাল সিংয়ের মতো খেলত, তাহলেও টিমটা দাঁড়িয়ে যেত। আর একটা কী যেন খুঁজে বার করেছিলাম, ওই যে, ধুস মনে থাকে না, ও হ্যাঁ, অ্যাস্ট্রো টার্ফে বড্ড বেশি জল দেওয়া হয়েছে। এটা কিন্তু একদম টেকনিক্যাল অজুহাত, বুঝলেন। বুটা সিং-বলীন্দার সিং-উমরাও সিংয়ের আশীর্বাদ থাকলে, আমি বালকিষেণ সিং বলছি, সিওল অলিম্পিকে হরদীপ সিংয়ের অধিনায়কত্বে ভারত সোনা জিতবেই। আওয়ার গোল ইজ গোল্ড।'

চাঁদরামের পাশে বসেছিলেন চার্লস বোরোমিও। চাঁদরাম বললেন, 'আমি তো এবারই আর একটু হলে সিলভার পাচ্ছিলাম, মানে, ওই ওয়েদারটা একটু বেটার থাকলেই। সিওলে ওয়েদার ভাল থাকবে। আমি গোল্ড পাব। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দের কথা, চার্লিও কথা দিয়েছে সিওল অলিম্পিকে গোল্ড পাবে। এবার হিটে ছাঁটাই হয়েছে প্রথম বত্রিশজনের মধ্যে না থাকায়, তাই জেদ বেড়ে গেছে। ব্রোঞ্জ-সিলভারে এই জেদ ঠাণ্ডা হবে না। গোল্ড চাই। ও গোল্ডই আনবে।' চার্লি বেশ বড় করে হাসলেন। আটশ মিটারে সময় এবং মুখে হাসি— দুটোরই মাপ আমেরিকায় দীর্ঘদিন থেকে বাড়াতে পেরেছেন চার্লস বোরোমিও।

বক্সিংয়ে লাইট ওয়েল্টার বিভাগে প্রথম রাউন্ডে পরাজিত যশপাল প্রধান বললেন, 'আমি নিজের পারফরমেন্সে খুশি। মাত্র পাঁচটা ম্যাচ জিতলেই গোল্ড, খুব কঠিন কিছু নয়। ইন্ডিয়ায় এমন কত পাঁচ ম্যাচ আমি জিতি। এবার প্রথম অলিম্পিকে গেলাম। এক্সপিরিয়েন্স হল। সিওলে গোল্ড কে মারে?'

শুটিং টিমের তারকা রণধীর সিং বললেন, 'কুড়ি মাসেও কাঁধের ব্যথাটা গেল না। সেই যে এশিয়াডের মার্চপাস্টে ইন্ডিয়ার ফ্ল্যাগ কাঁধে নিয়েছিলাম! শ্যুটিং শোল্ডার বলে কথা। ট্র্যাপশ্যুটিংয়ের আমি আর মানসের সিং জয়েন্ট থার্টি ফিফ্‌থ হয়েছি। মানসের সিলভার পাবে কিনা জানি না, তবে সিওলের গোল্ড আমার পকেটে। ভিজ র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে রাজিন্দর (এবার বত্রিশতম), র‍্যাপিড ফায়ার পিস্তলে মহিন্দার লাল (এবার চৌত্রিশতম), ফ্রি পিস্তলে বলজিৎ সিং (এবার বত্রিশতম), স্মলবোর রাইফেলে ভগীরথ সামই (এবার পঁয়তাল্লিশতম) এবং স্কিট ইভেন্টে হরি সিংয়েরও (এবার সত্তরের মধ্যে তেষট্টিতম) গোল্ড পাওয়া উচিত।' সমবেত শ্যুটাররা সম্মতি জানালেন।

ভারোত্তোলন কোচ এস এন সালওয়ান বললেন, 'একজন ওভারওয়েট আর অন্য-একজন স্ন্যাচেই বাতিল হলেও দুজন দারুণ লড়েছে। মহেন্দ্র আর দেবন ইলেভেন্থ হয়েছে, এই দুটো গোল্ড সিওলে জেতা হয়ে গেছে, ধরে নিতে পারেন।'

কুস্তির কোচ সুদেশ কুমার বললেন, 'আওয়ার গোল ইজ গোল্ড। জগমিন্দার, জয়প্রকাশ, গিয়ান আর কর্তার সিওলে গোল্ড পাবেই। মেডেল আর কী করে বাড়ানো যায়, সেই চিন্তা করছি।'

মনে মনে গুনে দেখলাম, উনিশটা গোল্ড হয়ে গেছে। এবার চীন পেয়েছে মাত্র পনেরটা গোল্ড। আমেরিকার পরেই আছে রুমানিয়া— উনিশ। আর একটা গোল্ড হলেই এবারের সেকেন্ড টিমের মেডেল সংখ্যা ছাড়ান যায়, মোর ওভার, গোল্ডটা বেশ রাউন্ড ফিগারে আসে। ছুটে গিয়ে উষাকে বললাম, 'প্লিজ, আপনি সিওল অলিম্পিকে একটা গোল্ডের কথা দিন!' উষা বললেন, 'অসম্ভব। আমি শুধু আরও একটু ভাল ফলের চেষ্টা করতে পারি।' ধুস! এদেশের কিস্যু হবে না। উনিশটা গোল্ডের ব্যবস্থা হয়ে গেছে, আর একটা গোল্ডের কথা দিতে পারে না যে মেয়ে তাকে বয়কট করা উচিত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এই মেয়েকে কখনও 'অর্জুন' বা 'পদ্মশ্রী' দেওয়া হবে না।

৭৯

ওই যে বলে না, 'পাবলিকের ইচ্ছায়'— ব্যাপারটা অনেকটা তা-ই। অনেকেই বহুদিন ধরে চিঠিচাপাটি ছাড়ছিলেন, যাতে খলিফা জিয়াউদ্দিনের সঙ্গে আমার একটা অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার পড়তে চান। কিন্তু কি ইন্টারভিউ দেব তাঁর, যিনি একই সঙ্গে প্রাতঃ এবং রাতঃস্মরণীয়? গত পঞ্চাশ বছরে যাঁর উত্থানের সঙ্গে কি করে যেন মিলেমিশে গেছে ভারতীয় ফুটবলের হাজার অন্যায় ও দুর্নীতির ঝলমলে পথ।

কী আশ্চর্য, ব্যাপারটা নিয়ে একটু একটু ভাবতেই মনে হল, সকলে ঠিকই চাইছেন, জিয়ার একটা খোলামেলা ইন্টারভিউ নেওয়া দরকার। সুতরাং, ইন্টারভিউটা নিয়ে খেলতে হল।

স্থান এ আই এফ এফ সভাপতির ঘর। কাল : আগস্টের যেন কত তারিখ, ভোর চারটে একুশ থেকে সকাল ছ'টা পাঁচ। প্রসঙ্গ : বিচিত্র। টেপ রেকর্ডার চালু হল না।

■ একটা প্রসঙ্গ দিয়ে শুরু করতে হয়, তাই এই প্রসঙ্গ দিয়ে করছি : আপনার এ আই এফ এফ-এর লাইফ প্রেসিডেন্ট হবার প্রপোজালটা ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে কেন?

জিয়া : আপনি সবজান্তা, সবই জানেন। তবু, সবার সুবিধের জন্য বলছি। তিন-চার বছর আগে থেকেই ভাবছিলাম ফুটবল-রাজনীতির খেলা ছেড়ে দেব কিনা। তবু খেলে যাচ্ছিলাম। অতি সম্প্রতি সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছিলাম, আর নয়। কিন্তু আপনার মত কিছু গুণগ্রাহী চাইলেন আমি যেন খেলাটা চালিয়ে যাই। তখন ঠিক করলাম, সবাই আন্তরিকভাবে চাইলে, ভারতীয় ফুটবলের যথাসাধ্য ক্ষতি করার যথার্থই ভাল কাজটা চালিয়ে যাব।

■ আপনার সঙ্গে কে কথা বলবেন?

জিয়া : আই এফ এ-র অশোক... অশোক... কী যেন?

■ মিত্র।

জিয়া : হুঁ, অশোক মিত্র। তিনিই বললেন, কলকাতা ফুটবলের মক্কা, বাংলা ভারতীয় ফুটবলের মাতৃভূমি। তাই আই এফ এ থেকেই প্রস্তাব তোলা হবে, যাতে ফিফার স্যার স্ট্যানলি রাউজের মত আপনিও এ আই এফ-এর সভাপতি হয়ে যান।

■ তারপর?

জিয়া : বোম্বাইয়ে ফেরার জন্য একদিন ম্যাড্রাস এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেখি— অশোক...অশোক...অশোক মিত্র আর বরুণ...বরুণ...বরুণ কি যেন?

■ এটা আমি বলেই বলতে পারছি, বেশি লোকে নাম জানে না— বরুণ পাল।

জিয়া : হুঁ, বরুণ পাল। ওঁরা বললেন, আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে কথা বলার জন্য মুম্বাই না গিয়ে ম্যাড্রাস এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে থাকতে হল কেন, তা অবশ্য বুঝলাম না। বরুণ পাল বললেন, 'আমি যে অসাধারণ কর্মকর্তা, তা আপনি জানেন না। কখনও পাশে পাননি কিনা। আমি আর অশোক মিত্র আই এফ এ-র জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমরা কাজ ভাগ করে নিয়েছি। নন্তু শুধু সেক্রেটারি, আমি শুধু জয়েন্ট।' অশোক মিত্র বললেন, 'আপনি লাইফ প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন, এটা কাউকে বলবেন না। তাহলে প্রিয় দাসমুন্সি বিগড়ে যাবেন। আগে ওঁকে লাইনে আনার কাজ শেষ হোক, তারপর। আপনি লাইফ প্রেসিডেন্ট হতে রাজি তো?' আমি বললাম, 'দেশের ফুটবলের অবনতির জন্য আমি গোটা লাইফ খরচ করে ফেললাম, আমাকে এই প্রশ্ন করে ছোট করবেন কেন? ইচ্ছা করলে আমাকে একই সঙ্গে লাইফ প্রেসিডেন্ট, লাইফ সেক্রেটারি, লাইফ ট্রেজারার— সব করতে পারেন। তবে কাগজপত্রে সই করার আগে আমি অশোক ঘোষের সঙ্গে কথা বলতে চাই, সবার সামনে।

■ তারপর আর ওঁরা এলেন না কেন?

জিয়া : জানি না। হয়ত ওঁরা অশোক ঘোষের সঙ্গে কথা বলে আসেননি। অথবা, সবার সামনে আমার সঙ্গে কথা বলতে হবে, ব্যাপারটাকে হয়ত অশোক ঘোষ অস্বস্তিকর মনে করেছেন। অথবা... থাক। জানার কি দরকার? এমন কিছু বড় ব্যাপার তো নয়।

■ এবার এ এফ সি-র ব্যাপারটা। আমরা শুনেছিলাম, আপনি এশিয়ান ফুটবল কনফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট হতে পারেন। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল না কেন?

জিয়া : প্রথম দিকে তো এ এফ সি আমাকে বিশেষ পাত্তা দিত না। কিন্তু সঙ্কটের সময় আমার দুর্বুদ্ধি ছাড়া ওরা বাঁচার পথ পায়নি। এবার পিটার ভেলাপ্পানের সঙ্গে কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছিল। শুনলাম, দাত্তু হামজা নাকি আমাকে চান না।

■ কিন্তু জিয়া সাহেব, এ আই এফ এফ-এর চেয়ে এ এফ সিতে আপনার পারফরমেন্স কিন্তু অনেক বেশি ভাল। এতদিন এ আই এফ এফ-এর মাথায় থেকেও আপনি কখনও সতের জনের স্কোয়াডে তেরজনের বেশি অযোগ্য খেলোয়াড় ঢোকাতে পারেননি। কিন্তু এ এফ সি-তে? এ এফ সি আপনার কাছে কখনই বেশি কিছু আশা করেনি, তেমন পাত্তাও দেয়নি। কিন্তু যখনই প্রয়োজন হয়েছে, দুর্বুদ্ধি অথবা সূক্ষ্ম বাঁশ, সে যাই হোক, আপনি দিয়েছেন। তবু যে এই অপেক্ষা, কখনও এর প্রতিবাদ করেননি কেন?

জিয়া : আপনি প্রতিবাদ করেননি কেন? দেখুন, এখন আর আমার নিজের ওপর অবিচারের কথা বলা সম্ভব নয়। তাছাড়া নুরুল আমিন প্রেসিডেন্ট আর বিজয় রঙ্গম সেক্রেটারি থাকার সময় ওই যে কিছুদিন বনবাসে যাবার উপক্রম হয়েছিল, তখন এ এফ

সি-ই কিছুটা দেখেছিল। সেই সময়টাকে মনে রেখেও এ এফ সি-র বিরুদ্ধে গালাগালি মুলতুবি রেখেছি। ঠিক যে অ্যাপ্রোচটা আমি চাই, ঠিক তাই পেয়েছিলাম কিনা।

■ আপনার নীরবতার আর একটা ব্যাখ্যা আমার কাছে আছে। দু-তিন বছর আগে থেকেই আপনি বুঝতে থাকেন, কর্মকর্তাদের সংগঠিত করার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। নিজেদের স্বার্থে এঁরা পরস্পরকে এতই ল্যাং মারায় ব্যস্ত থাকে যে মাঝে মাঝে যোগ্য প্লেয়ার টিমে চান্স পেয়ে যায়, মাঝে মাঝে প্লেয়ার্স বেনেভোলেন্ট ফান্ড খোলার মত বাজে কাজ করে ফেলা হয়। আপনি ঠিক কবে বুঝলেন যে সঙ্গীদের মধ্যে সকলেই ভারতীয় ফুটবলের সর্বনাশের জন্য আন্তরিক নন?

জিয়া ঃ আপনি আমাকে ইমোশনাল করে দিচ্ছেন সাঁপুড়ে...আমি...

■ ইমোশন? এবং আপনি? ইয়ে, একটু খুলে বলুন না, কেন সব খেলায় কুচক্রী কর্মকর্তাদের একটা কেন্দ্রীয় সংগঠন গড়ে তোলা গেল না?

জিয়া ঃ সব কথা কী করে বলি? কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলা কি আমার উচিত?

■ নেতৃত্বের একটা দিকে আপনি কিন্তু ব্যর্থ। এখনও পর্যন্ত উদীয়মান এমন কাউকে দেখা যাচ্ছে না, যিনি আপনার মতই অর্ধশতাব্দী ধরে ভারতীয় ফুটবলের অক্লান্ত ক্ষতি করতে পারেন। কারও এত দম নেই।

জিয়া ঃ ঠিক। এই যে কুচক্রী কর্মকর্তাদের একটা সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন করা গেল না, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এজন্য আমি অপরাধী থাকব। আমি যা পারলাম না, ভবিষ্যতে নিশ্চয় কেউ তা পারবে। আমার আশীর্বাদ থাকবে।

■ এবার একটু খেলার রাজনীতিতে, আই মিন, ল্যাং মারামারির খেলায় ঢুকছি। এখনকার কর্মকর্তাদের মধ্যে এই খেলায় কার দক্ষতা আপনাকে মুগ্ধ করে?

জিয়া ঃ মুগ্ধ হওয়ার ব্যাপারটা তো কমেই যাচ্ছে... তবু, মগন সিংয়ের ল্যাং মারা এবং ভাল ফুটবলার বাদ দেবার ট্যালেন্ট, অশোক ঘোষের ভুল লোক বাছাই, প্রিয় দাসমুন্সির তীব্র অথচ নির্বিষ প্রতিবাদ— যাতে পোস্ট এবং ইমেজ একই সঙ্গে বাঁচে, ভিট্টলের মিথ্যা ট্যুর রিপোর্ট, খলিলের ফুটবল বিদ্বেষ, আবদুল্লার হিসাব জমা না দেবার সঙ্কল্পে অটল থাকা, ভুতো বিশ্বাসের পাওয়ারে থাকার ঝঞ্ঝাটে না গিয়েও পাওয়ারের কাছাকাছি থাকার চমৎকার লাইন, লক্ষ্মণনের প্রেসার পলিটিক্স, বার্ধক্যের ভাবে নুয়ে পড়েও ট্যান্ডনের ট্রেজারার থাকার দুর্মর ইচ্ছা— এসবই মুগ্ধ করে, মাঝে মাঝে।

■ আপনার পরে সেরা ফুটবল কর্মকর্তা কে?

জিয়া ঃ অফ কোর্স, মগন। ব্যাড টেস্ট, ব্যাড উইল, ব্যাড টাং, ব্যাড ফুটবল সেন্স— এত ব্যাড আমি এখনকার আর কারও মধ্যে দেখিনি। ওর কাছে যতটা আশা করেছি, ঠিক ততটাই পৌঁছেছি।

■ ল্যাং মারায় আপনার দেখা সেরা এক্সপার্ট কে?

জিয়া ঃ তাহলে তো প্রথমেই এম দত্তরায়ের নাম করতে হয়।

■ এম দত্তরায় আপনার চেয়ে একটু সিনিয়র।

জিয়া ঃ একটু সিনিয়র এবং একটু বড়...একটু বেশি হার্মফুল কর্মকর্তা। আঃ কী সব প্যাচ!

■ আচ্ছা, এই যে এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনি মনোরঞ্জনকে বাদ দিয়ে রাখতে পেরেছেন, এজন্য অস্বাভাবিক আনন্দ হয়নি?

জিয়া ঃ না। আর পঞ্চাশটা যোগ্য প্লেয়ার বাদ দেবার মতই খুশি হওয়া।

■ এত হই চই, তারপরেও বাদ রাখা, তবু নয়?

জিয়া ঃ না হলে কি করব!

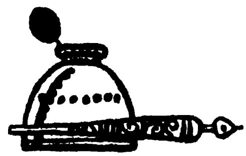
■ ঠিক তখনই মনে হয়নি, তবে এখন মনে হয় পর পর তিনটে অকেশনে সুব্রত-ভাস্কর-মনোরঞ্জনের মত টপ ফুটবলারদের বাদ দেবার সাফল্য দেখাবার পরই আপনার রিটায়ার করা উচিত ছিল। ব্যাপারটা নাটকীয় হত। আসলে, এদেশে কেউ গদি ছাড়তে চায় না কিনা।

জিয়া ঃ অন্য দেশে রিটায়ার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ। 'ভাল কিছু করতে শুরু করেছি' বুঝলেই কর্মকর্তারা রিটায়ার করতে পারেন। তাছাড়া কবে ছাড়ছি সেটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় ল্যাং মেরে এবং বাঁশ দিয়ে আনন্দ পাওয়া এবং দেওয়াটাই বড় কথা। যদি দেশের ফুটবলের দু-একটা পার্মানেন্ট সর্বনাশও করে থাকি লোকে সেটাই মনে রাখবে।

■ রাখবে, নিশ্চয়ই রাখবে। আচ্ছা জিয়া সাহেব, শেষ প্রশ্ন। কর্মকর্তা জীবনে যে সব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা করেছেন, তা নিয়ে কোন ক্ষেত্রে কি আপনার কোনরকম অনুশোচনা আছে?

জিয়া ঃ সত্যি সাঁপুড়ে, আমার কোন অনুশোচনা নেই। দু-একটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা অবশ্য থাকতেই পারে। ধরুন, হঠাৎ মাথা গরম করে দুঃস্থ ফুটবলার পরবের জন্য চার হাজার টাকা স্যাংশন করে ফেলা অথবা ওই জাতীয় কিছু। আমি কর্মকর্তা না হলেও এমন দু-একটা বিচ্যুতি জীবনে ঘটতে পারত। কিন্তু যাকে বলে অনুশোচনা, তা আমার নেই। ওই আরও একটু সর্বনাশ করতে না পারার ব্যথাটুকু আছে, থাকবে, আর কিছু নয়।

৮০



‘খেলা’র আবার পাঠক, পাঠিকাগণ, আপনারা টোস্ট সহযোগে চা-পানের মত, অনুপস্থিতির জন্য মার্জনাভিক্ষাসহ আমার শুভবিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন। কয়দিন বড়ই খাটাখাটনি গেল, বুঝিলেন। উত্তমেরা আরও উত্তম সব কার্যে অভিনিবিষ্ট থাকায় এই অধমকেও একটি বৃহৎ কার্যের কিঞ্চিৎ দায়িত্ব লইতে হয়। খাটিয়া খাটিয়া জুতা ছিঁড়িল, জামা ফাঁসিল, কাজের হাটে গলা এবং হাঁড়ি ভাঙিল, পঁচাত্তর গ্রাম ওজন কমিল। এত সবেও দুঃখ ছিল না। দুঃখ কেবল এই যে ‘হিং টিং ছট’ ভাঁজিবার সময় মিলিল না। ইহাতে দেশের ও দশের যে সমূহ ক্ষতি হইল, সেজন্য আমার দুঃখ ও ক্লেশের অবধি নাই। আপনারা আমাকে মার্জনা করুন। তবে, ঘটনা এই যে, এই একটি পৃষ্ঠার জোরে আমার এখন এতটাই নামডাক ফাটিয়াছে যে খেলার জগতের কোন শুভকাজই বাবুরাম সাঁপুড়েকে বাদ দিয়া ঘটিতে চাহে না, ঘটিতে ঘটিতেও থমকিয়া দাঁড়ায়— গোলমুখে ভারতীয় ফরোয়ার্ডদের মত, অথবা বল ডেলিভারির আগের মুহূর্তে সুপার স্লো মিডিয়াম পেসার মহিন্দার অমরনাথের মত। সুতরাং, পাবলিক ডিম্যান্ড যতই বাড়িতে থাকুক, আমার পক্ষে প্রতি সংখ্যায় ভাঁড়ামি করা অসম্ভব। টাইম নাই। আহা, শেষ পর্যন্ত আমিও বলিতে পারিতেছি : ‘টাইম নাই!’ জীবনে সফল হওয়া আর কাহাকে বলে?

আমার সাম্প্রতিক অনুপস্থিতির সময়ে খেলার মাঠে তিনটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। দুঃখের কথা এই যে, আমার অনুপস্থিতির ফাঁক কেহই পূরণ করে নাই, নামী রিপোর্টারগুলি শুধু মাসে মাসে মোটা মাহিনা নিয়া একই সঙ্গে পকেট ও মাথা উত্তরোত্তর মোটা করিবার ব্যবস্থা করে। তিনটি অবিস্মরণীয় ঘটনারই বিশদ ও যথাযথ বিবরণ পেশ করা আমি কর্তব্য বিবেচনা করি।

ঘটনা এক : কলিকাতার ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব সল্ট লেক স্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য সমাধা করিবার মহান ব্রতে অংশগ্রহণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। এক অবিস্মরণীয় সভায় সংস্থার মাননীয় সভাপতি মহোদয়, পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর হস্তে পঁচিশ হাজার টাকার চেক তুলিয়া দিয়াছেন। সংস্থার তাঁবু সেই সন্ধ্যায় শুধুমাত্র

হলে, ভিজিটিং ক্যাপ্টেনরা মাথায় চড়বে। নিউট্রাল আম্পায়ারের ব্যাপারটা চালু করার দাবি জোরদার হবে। খুব মুশকিল।'

ধনুক থেকে তীরের মত বেরুলেন অস্ট্রেলিয়ার মেল জকসন : 'কীসের মুশকিল মশাই? নিউট্রাল আম্পায়ারের মধুটা বোঝেন না। নয় নয় করে একুশটা টেস্টে আম্পায়ারিং করেছি। কিন্তু, সবই অস্ট্রেলিয়ায়, চেনা জায়গায়। কোনও ট্যুরের ব্যাপারই নেই। আর আলতু ফালতু ক্রিকেটারও তিন চারটে দেশ বিনে পয়সায় ঘুরে আসছে। নিউট্রাল আম্পায়ারের ব্যাপারটা চালু হলে, আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজ যাব, খিজার অস্ট্রেলিয়ায় আসবে, ঘোটসকার ইংল্যান্ডে আসবে, কনস্ট্যান্ট অস্ট্রেলিয়ায় যাবে, লেন পাকিস্তানে যাবে। সবাই সব জায়গায় যাবে। বছর পাঁচেক ফর্মে থাকলেই কত দেশ ঘোরা হয়ে যাবে। আর, ভেবে দেখুন, দেশপ্রেমিক আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আমাদের কতটা মানসিক চাপের মধ্যে থাকতে হয়। নিজের দেশের বোলাররা যখন ব্যাটসম্যানের প্যাডেও বল লাগাতে পারে না, তখনও এল বি ডব্লু দিতে হবে। ব্যাটে না লাগলেও কট বিহাইন্ডের ডিসিশন দিতে হবে। নিজের দেশের ব্যাটসম্যান প্লাম্ব লেগ বিফোর হলেও উদাস হয়ে শূন্য দৃষ্টি মেলে রাখতে হবে— কম ঝঞ্ঝাট নাকি? সানির স্টেটমেন্টে যদি কিছু কাজ হয় খুব ভাল। আমাদেরও খিজার-শকুরের বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দেওয়া উচিত। নিউট্রাল আম্পায়ারের দাবিটা জোরাল হোক। মেলা দেশপ্রেম দেখিয়েছি, এবার একটু দেশ বেড়াতে চাই।'

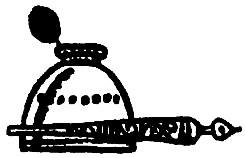
ডিকি বার্ডের মৃদু নির্দেশে ইংল্যান্ডের পক্ষে বক্তব্য পেশ করতে উঠলেন ডেভিড কনস্ট্যান্ট। 'সানি তো এইট্টি টুতে স্টেটমেন্ট দিয়েছিল, আমাকে ওদের বিরুদ্ধে টেস্টে আম্পায়ার করা চলবে না। ওই সিরিজে চান্স পাইনি। কিন্তু পরে পেয়েছি, অনেক পেয়েছি। ভিজিটিং ক্যাপ্টেনের কমপ্লেইনে কি এস যায়? বড় জোর একটা সিরিজ রেস্ট। কর্মকর্তারা দেশপ্রেমিক আম্পায়ারদের কদর বোঝেন, সুযোগ পেলেই ফের ডেকে নেন।

আমরা চিরকালই সংযম এবং কৌশলে বিশ্বাস করি। হাঁকপাঁক করলে চলবে না। বেশি উল্টোপাল্টা ডিসিশন নিলেও চলবে না। মাত্র দু-একটা বাজে ডিসিশনেই ভিজিটিং টিমকে ঘায়েল করার জন্য চাই বুদ্ধি, কৌশল। আমাকে এ ব্যাপারে এক্সপার্ট বলা হয়। কিন্তু আমি মানতে বাধ্য, এ ব্যাপারে সভাপতি মহোদয় সমেত ইংল্যান্ডের অধিকাংশ আম্পায়ারই এক্সপার্ট। আমরা ফর্মে থাকা বথামকে বাষট্টির মাথায় পরিস্কার কট বিহাইন্ড দিই না, বথাম দেড়শ করে ম্যাচ জেতায়। আমরা বিশ্বনাথেকে আসল সময়ে ভুল ডিসিশনে প্যাভেলিয়নে পাঠাই, ইন্ডিয়ার ওভাল টেস্টে জেতা হয় না। ভারতীয় বন্ধু রামস্বামী পাঁচটার লিমিটের কথা বলছিলেন। আমাদের এতও লাগে না। একবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ড টেস্টে ছাত্র তিনটে ভুল ডিসিশন দিয়েছিলাম। ইয়ান চ্যাপেল আর ডগ ওয়াল্টার্সকে ভুল আউট দেওয়া আর জিওফ বয়কটের ক্লিন কট বিহাইন্ড না দেওয়া। অস্ট্রেলিয়ার মাজা ভেঙ্গে গিয়েছিল। তাই বলছিলাম, যতদিন পর্যন্ত নিউট্রাল আম্পায়ারিং না আসে, আমাদের সংযমী এবং সুকৌশলী হতে হবে। একদিনেই আমাদের মত পারবেন না, তবে চেষ্টা শুরু করুন। ফল

পাবেন। অসংযমী হয়ে উঠে হইচই বাঁধিয়ে ফেলার জন্য শকুর রানা আর খিজার হায়াতের বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দেওয়া দরকার। নিউট্রাল আম্পায়ারের ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ নয়। ইন্ডিয়া পাকিস্তানের জয় আমার কিছুতেই সহ্য হবে না।'

আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট নরম ও গরম আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাব পাশ করা হয়। 'আন্তর্জাতিক আম্পায়ারদের এই জরুরী সভা (পাকিস্তানের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন না) গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছে যে পাকিস্তানের দুজন আম্পায়ার তাঁদের কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হয়েছেন। আন্তর্জাতিক স্তরে আম্পায়ারিংয়ের জন্য যে সংযম, কৌশল এবং সাহস দরকার, তা তাঁরা দেখাতে পারেননি। এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ এবং সমাধানের পথ নির্দেশ করার জন্য এই সভা একটি একজনের কমিটি নিয়োগ করছে। মাননীয় ইদ্রিস বেগকে এক মাসের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেওয়ার অনুরোধ জানান হচ্ছে।'

৮২



আপনারা কেউ কেউ হয়ত লক্ষ্য করেছেন, 'স্বল্পপ্রচারিত' দৈনিকপত্র 'আজকাল'-এ সুনীল গাভাসকারের একটি একান্ত সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে। পাকিস্তান সফর থেকে ফেরার সময় আই সি দুশ একত্রিশ ফ্লাইটে, তিনি আজকালের প্রতিবেদককে যা বলেন, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথাটাই হেডিং হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে : 'বোলারদের ব্যর্থ বলতে রাজি নই।' তিনি কিছু যুক্তিও পেশ করেছেন। একথা বুঝিয়ে আর কি বলব, আপনারা বুদ্ধিমান, নিষ্চয় বোঝেন, সম্প্রতি আমি বিস্তর ক্রিকেট বুঝছি। গাভাসকারের ইন্টারভিউ পড়ে মনে হল তাঁর আর একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া উচিত। সম্পাদকের অনুমতি চাইতেই বললেন, 'একমাসের ছুটি দিন।' কেন? এডিটর সাহেব বললেন, 'সম্প্রতি ব্যস্ততা শুধু আপনার বাড়েনি, সুনীল গাভাসকারেরও বেড়েছে। মাসখানেক সময় হাতে নিয়ে না গেলে ইন্টারভিউ পাবেন না। এক মাস তো আর অন ডিউটি বম্বেতে রাখা যায় না, তাই ছুটি নিতে বলছি। যাতায়াতের ভাড়ার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, থাকার জন্য চিন্তা কী, আপনার প্রিয়জন জিয়াউদ্দিন সাহেবের গেস্ট হয়ে যাবেন।'

বম্বে পৌঁছে গেলাম ৯ নভেম্বর রাতেই। সকালে গাভাসকারের ওরলির বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, দাদারের বাড়িতে বাবা-মার সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। দাদারে গিয়ে শুনি, সানি অফিসে গেছেন। নিরলনে গিয়ে জানা গেল তিনি বাড়ি ফিরেছেন। বাড়িতে গিয়ে শুনলাম তিনি সেইমাত্র ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে গেছেন। ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম... থাক, দুর্গতির একঘেয়ে কথা লিখে লাভ নেই, এইরকম চলল ১২ তারিখে বিকেল পাঁচটা এগার মিনিটে নিরলন অফিসের সামনে হঠাৎই তাঁকে পেলাম। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। সরাসরি জিজ্ঞেস করলাম, 'একটা ইন্টারভিউ দেবেন?'

—'দেব।'

—'কবে?'

'এইটা খুব ভাল প্রশ্ন, কবে?'

—'মিঃ গাভাসকার, আমার মাথা বেশ মোটা, ঠাট্টা করবেন না, প্লিজ। কবে কথা বলবেন? কাল সকালে?'

—'কাল সকালে 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেটার' -এর এডিটোরিয়াল লিখব। তারপর দুটো দরকারি চিঠি।'

—'কাল দুপুরে?'

—'অফিসে থাকব। তিনটে মিটিং আছে। একটা লাঞ্চ। এসবের ফাঁকে সাতাশটা ফাইলও দেখতে হবে।'

—'কাল সন্ধ্যেয়?'

—'দাদার ক্লাবে ইনডোর ক্রিকেট সেন্টারের মিটিং। সরি।'

—'পরশু সকাল?'

—'পরশু সকালে ডাক্তারের কাছে যাব, আমার চোখ চেকআপ করাতে। লম্বা সিরিজ আসছে কিনা। দুপুরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন, আর জিমখানায় একটা ইম্পর্ট্যান্ট গেট-টুগেদার, আর ফাঁকে ফাঁকে অফিস। বিকেলে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে প্রভু দেশাই আর রাজ সিংয়ের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। তারপর সন্দীপ আর দীপিকা বাড়িতে আসছে, ওদের খেতে বলেছি। তারপর রাতে 'সানি ডেজ'-এর থার্ড পার্টের...'।

—'মিঃ গাভাসকার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী সাতদিন সকাল, দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে, রাত্রি আপনি এইরকমই ব্যস্ত থাকবেন, যার বিবরণ শুনতে চেয়ে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না। এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

—'ওহ, খুব টায়ার্ড, বাড়ি যাব, তার আগে অবশ্য একবার কমলা নেহরু পার্কে যেতে হবে, মিসেস গান্ধীর জন্য একটা কনডোলেন্স মিটিং।'

—'খুব ভাল। আমি যদি আপনার গাড়িতে যেতে যেতে কিছু প্রশ্ন করি, আপত্তি আছে?'

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহই নেই যে এই দীর্ঘ পথে সানি গাভাসকার আমাকে সহ্য করতে চাইবেন না। তবু, নিপাট ভদ্রলোক কিনা, বললেন, 'না, না, আপত্তি কীসের, ইটস আ প্লেজার।'

মারুতির দরজা খোলার কায়দাই আলাদা। উল্টোপাল্টা টানাটানির পর সানিই দরজা খুলে দিলেন। আমি গম্ভীর মুখে বলে ইন্টারভিউ শুরু করলাম।

—'মিঃ গাভাসকার, আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে পাকিস্তান ট্যুরে ভারতীয় বোলাররা ব্যর্থ নয়?'

—'ব্যর্থতার কথাই ওঠে না।'

—'কেন?'

—'ওই পিচে শেষ পর্যন্ত বল করে যেতে পারাটাই বড় কথা। হাজার হাজার রান উঠল, এর পরেও বুঝলেন না?'

—'কিন্তু স্কিপার, আজিম হাফিজ লাহোরে একশ ষাট রানে সাতটা উইকেট পেয়েছেন। তাঁর জন্য আলাদা পিচ ছিল না নিশ্চয়ই?'

—'তা ছিল না, কিন্তু আম্পায়ার ছিল। ওদের খিজার হায়াৎ-শকুর রাণা ছিলেন, আমাদের সঙ্গে তো আর রামস্বামী-ঘোটসকার ছিল না। লাহোরের কথা বাদ দিন।'

মুখ্যমন্ত্রীর নয়, অন্য আরও বিস্তর নক্ষত্রের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়। মণিমাণিক্য খচিত এই সভায় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংস্থা এক অবিস্মরণীয় নজির স্থাপন করিল। সভার শেষে মুখ্যমন্ত্রীর অ্যাডিশনাল পলিটিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে বলেন, 'ফুটবলার আসিবে, ফুটবলার যাইবে।' মানে, ফুটবলার জন্মাইবে, খেলিবে ও হয়ত অনাহারে মরিবে। ক্রিকেটার আসিবে, ক্রিকেটার যাইবে। অ্যাথলিট আসিবে, অ্যাথলিট যাইবে। সব খেলার ওস্তাদেরাই এইরূপে আসিবে এবং যাইবে। কিন্তু স্টেডিয়াম আসিয়াছে, কিন্তু যাইবে না। থাকিবে। এই রাজ্যের মুখ চিরকালের জন্য উজ্জ্বল রাখিবে। সেজন্য, অন্য কোন দিকে নজর না দিয়া স্টেডিয়াম বানাইবার কাজ শেষ করিতে হইবে। এই কাজে যাহারা হাত লাগাইবে, অথবা মাথা, সকলেই 'অবিস্মরণীয়' কাজের অংশীদার হইবার কৃতিত্ব অর্জন করিবেন।'

আপনারা একটি ম্যাগাজিনে হাস্যময় সংস্থা সভাপতি কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রীর হস্তে চেক-প্রদানের অবিস্মরণীয় ছবি দেখিয়া থাকিতে পারেন। কোন কাগজই এই অবিস্মরণীয় ঘটনার বিবরণের জন্য পাঁচশত শব্দের বেশি বরাদ্দ করে নাই। আমার হাতে কাগজ এবং ক্ষমতা থাকিলে, এই অবিস্মরণীয় ঘটনাকে প্রথম পৃষ্ঠায় প্রথম লীড করিতাম, তিনজন এক্সপার্ট এবং সাতজন রিপোর্টারকে দিয়া কভার করাইতাম। ধুস, ইহারা খবরের গুরুত্ব বোঝে না।

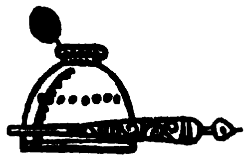
ওই মহতী অনুষ্ঠানেই ক্যালকাটা ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের সভাপতি মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর করকমলে বিশ হাজার টাকার চেক তুলিয়া দেন। তৎকালে যে বিপুল হর্ষধ্বনি জাগিল ও করতালি বাজিল, (পরে মুখ্যমন্ত্রী নাকি পি এ-কে বলিয়াছেন) তাহা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের 'বিশাল জনসভায়' যোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী এই দানকেও 'অবিস্মরণীয়' আখ্যা দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কেনই বা হইবেন? কিছু উদ্যোগী প্রাক্তন ফুটবলার নিজেদের সুনাম এবং 'কানেকশনস'-এর জোরে অঢেল বিজ্ঞাপন জোগাড় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করেন, এবং তদ্দারা বিদেশ ভ্রমণে যান। অনেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিজ্ঞাপন মারফত সংগ্রহ করিবার চেষ্টায় মাঝ পথে ক্ষান্তি দেন... তাহাতে কিছু থাকে, কৃচ্ছসাধনের মাধ্যমে আরও কিছু বাঁচে। এই অর্থের অংশ যখন একটি মহৎ উদ্দেশ্যে দান করা হয় এবং সব সংবাদপত্রে পাবলিসিটি পাইবার জন্য যখন ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের অনুষ্ঠানেই সেই কার্য সমাধা করার অত্যুজ্জ্বল পরিকল্পনা নেওয়া হয়— এই ঘটনাকেও 'অবিস্মরণীয়' না মানিবার রাস্তা কোথায়? খুবই দুঃখের ও পরিতাপের কথা যে সংবাদপত্রের খেলা'র পৃষ্ঠাগুলি নিজেদের ক্লাবের কথা বলিতে গিয়া এই দ্বিতীয় ও যুগ্ম অবিস্মরণীয় ঘটনার জন্য দুই-চার লাইনের বেশি বরাদ্দ করে নাই, ছবি তো ছাপেই নাই। দু-একটি কাগজ ও পত্রিকা অবশ্য প্রায়শ্চিত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু, না, মাত্র এইটুকু পাবলিসিটির জন্য কেহ এত অসাধারণ পরিকল্পনা রচনা করে না।

ঘটনা দুই : কাঠমান্ডুতে অনুষ্ঠিত সাউথ এশিয়ান স্পোর্টস কনফেডারেশন গেমসে সোনার ভারত দিস্তা দিস্তা সোনার মেডাল জিতিয়াছে। কোন কোন হতভাগাদের অবশ্য

রূপা অথবা ব্রোঞ্জ জুটিয়াছে, ভারতবর্ষে ফিরিয়া সেগুলি লুকাইতে তাহারা হিমশিম খাইবে। এখন যদি কেহ পার্লামেন্টে ক্রীড়ামন্ত্রী বুটা সিংহর। বহুল প্রচারিত ও মাস্টারমশাই দৈনিকে জৈল সিং বুটা সিং ইত্যাদি কিছুকাল জৈল সিংহ বুটা সিংহ ইত্যাদি হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই অতিরিক্ত 'হ' গিয়াছে এক্ষণে আসর ফাঁকা দেখিয়া আমি 'হ' জুড়িলাম। সমালোচনা করিবার সাহস করে, বুটা সেই হতভাগ্যকে ল্যাজেগোবরে করিয়া ছাড়িবেন। এত স্বর্ণ সংগৃহীত হয় যে কাঠমান্ডু হইতে ফিরিবার সময় ভারতীয় প্রতিযোগী-প্রতিযোগিনীরা মেডালগুলি সঙ্গে আনেন নাই। সেগুলির জন্য পৃথক চাটার্ড ফ্লাইটের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছে। কাঠমান্ডুতে আরও অনেক কান্ড ঘটিয়াছে। খাজান সিং মার্ক স্পিজ হইয়াছেন। আরও অনেকে অনেক কিছু হইতেন, কিন্তু অধিকাংশ পত্রিকা প্রতিনিধি প্রেরণ না করায় এবং বিরল দুই-একজন প্রতিনিধির দম ফুরাইয়া যাওয়ায় তাহা সম্ভব হয় নাই। যাহাই হউক, আমরা প্রচুর সোনা পাইয়াছি এবং উনিশশ নব্বুই সাল পর্যন্ত আমাদের আর সোনার প্রয়োজন নাই। দরকার পড়িলে আর একটি সাউথ এশিয়ান গেমসের ব্যবস্থা দেখিব।

ঘটনা তিন : সম্প্রতি প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলার, কিছু সাংবাদিক এবং ফুটবলপ্রেমীর উদ্যোগে 'এই ডবলু এ' নামে একটি সংস্থা গঠিত হইয়াছে এবং এই সংস্থার উদ্যোগে গত ১৩ সেপ্টেম্বর মোহনবাগান মাঠে দুটি 'অভিনব' ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিবার চাপে ও প্রয়োজনে তৃতীয় খবরটির জন্য বেশি জায়গা বরাদ্দ করা সম্ভব হইল না। তবে, সর্বদা মনে রাখিবেন, আমি এবং আমরা সৎ, নিরপেক্ষ এবং নির্ভীক। শুধু মনে রাখিবেন না, জপও করিবেন এবং চিঠি লিখিবেন। না লিখিলে, আমরাই লিখিয়া ছাপিব। নমস্কার।

৮১



সম্প্রতি সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী আম্পায়াররা যেরকম নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব করেছেন, তাতে সব দেশের আম্পায়াররাই মর্মাহত। গত ২৬ অক্টোবর লর্ডসে ডিকি বার্ডের সভাপতিত্বে আন্তর্জাতিক আম্পায়ার সংস্থার এক জরুরী অধিবেশন বসে। সব দেশের প্রতিনিধিরাই বক্তব্য রাখেন। এই সভায় সংক্ষিপ্ত বিবরণী 'খেলা'র সর্বভূক পাঠক পাঠিকাদের অবগতির জন্য পেশ করা হচ্ছে।

ডিকি বার্ড শুরুতেই বলেন, 'প্রথমেই আমাদের ঠিক করে নিতে হবে কার বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেব। যদি ভয়ঙ্কর আক্রমণের জন্য সানি গাভাসকারের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে হয়, সকলে সেই লাইনেই যুক্তিফুক্তি দিন। আর যদি শকুর-রাণা-খিজার হায়াৎ-মেহবুব শাহদের বিরুদ্ধে স্টেটমেন্ট দিতে হয়, তাহলে সেই লাইনেই বলুন। এই নিয়ে কন্ট্রোভার্সি হলে বেকার সময় নষ্ট হবে, আবার সন্ধ্যে আটটার মধ্যেই আজকের মিটিং নিয়ে 'দি সান'-এ এক্সক্লুসিভ লেখা দেবার কথা। হারি আপ।'

টগবগ করে ফুটছিলেন ভারতের রাজস্বামী : 'সানি গাভাসকারের বিরুদ্ধে কিছু বললে ফাটাফাটি হয়ে যাবে। স্টেটমেন্ট দিতে হবে পাকিস্তানী আম্পায়ারদের বিরুদ্ধে। টানাটানি একটু আধটু সবাই করে, আমিও করি, আমরাও করি, কিন্তু দিনে ডাকাতি করি না। পাঁচ দিনের ম্যাচে পাঁচটা গোলমেলে ডিসিশন যথেষ্ট। এর বেশি পারমিট করা যায় না। কিন্তু লাহোরে আমার দুই ফ্রেন্ড এগারটা বাজে ডিসিশন দিলেন। সানি খুব ঠান্ডা মাথার ছেলে, পাঁচটার জায়গায় সাতটা ভুল ডিসিশনও হজম করে নিত, কিন্তু ইলেভেন ইজ টু মাচ। আজকের সভায় লিখিতভাবে এই নিয়ম বেঁধে দেওয়া হোক যে হোম টিমকে এক ম্যাচে পাঁচটার বেশি বেনিফিট দেওয়া চলবে না। ওই যে এইটি ওয়ানে কিথ ফেচার আমাদের বিরুদ্ধে এত রাগ দেখিয়ে গেল, তখনও পাঁচটার লিমিট ক্রস করিনি। ফাইভ ইজ এনাফ, এটা অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। আম্পায়ারিং কমরেডস, লিমিট বেঁধে দিন। শকুর-খিজার-মেহবুবকে স্ট্রিকচার দিন।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজের গোসেন বললেন : 'এসব লিমিট ফিমিট আমি মানি না, আমরা মানি না। ভিজিটিং টিমের ক্যাপ্টেনের কাজ ভিজিটিং টিমের ক্যাপ্টেন করবে, জিততে

না পারলে আম্পায়ারদের গালাগালি দেবে, তাতে আমাদের বিচলিত হলে চলবে না। হোম টিমকে জেতানোর জন্য দেশপ্রেমিক আম্পায়ারদের মেলা ঝুঁকি নিতে হয়, চিরকালই নিতে হয়েছে। সিক্সটি থ্রিতে একবার ভিজিটিং টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন অফিসিয়াল ডিনার পার্টিতে আমার মুখে থুথু দিয়েছিল। পরে বলেছিল— 'হাই হয়ে গিয়েছিলাম, ডোন্ট মাইন্ড।' ধুস, অত মাইন্ড করলে কি আম্পায়ারিংয়ের মাধ্যমে দেশসেবা করা যায়? সানি গাভাসকারের স্টেটমেন্টের বিরুদ্ধে আমাদের কোনরকম স্টেটমেন্ট দেবার প্রয়োজন নেই। এমন কিছু গুরুতর অভিযোগ নয়। শকুর আর খিজার পাকিস্তানকে জেতানোর পরিকল্পনা নিয়ে আম্পায়ারিং করেছে, এই তো? বেশ করেছে। আম্পায়ার হোম টিমকে জেতানোর চেষ্টা করবে না তো কি ভিজিটিং টিমকে হেল্প করবে। আবদার! আমার প্রস্তাব, শকুর-খিজারের বিরুদ্ধেই স্টেটমেন্ট দেওয়া হোক। ওরা কেন পাকিস্তানকে ম্যাচটা জিতিয়ে দিতে পারল না? এ থিং হাফ ডান ইজ নট ডান। লাহোরে দুই আম্পায়ারের ব্যর্থতা শুধু তাঁদের ব্যক্তিগত ব্যর্থতা নয়, সামগ্রিকভাবে দেশপ্রেমিক আম্পায়ার সম্প্রদায়েরই ব্যর্থতা। আমি অপমানিত বোধ করছি। এইরকম ভিতু হাফ হার্টেড আম্পায়ারদের টেস্ট ক্রিকেট থেকে ঝেঁটিয়ে (গোসেন ইংরেজিতে 'সুইপ' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন) বিদায় করা উচিত।'

কাশি এবং হাসি চেপে উঠে দাঁড়ালেন নিউজিল্যান্ডের লেন কুপার: 'সানি নাবালক! মাত্র এগারটা উল্টো ডিসিশনে যার মাথা গরম হয়, তার ইন্টারন্যাশনাল সাইডের ক্যাপ্টেন না হওয়াই ভাল। একবার ওয়েলিংটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একত্রিশটা ভুল ডিসিশন দিয়েছিলাম। মাইকেল হোল্ডিং আমার পেটে গুঁতো মেরেছিল কনুই দিয়ে, ভিভ রিচার্ডস পিঠে বল ছুঁড়ে মেরেছিল, গর্ডন গ্রীনিজ বাবা, মা তুলে গালি দিয়েছিল, ম্যালকম মার্শাল আমার একমাত্র স্ত্রীকে বিধবা করে দেবার হুমকি দিয়েছিল। আমি ভেঙ্গে পড়িনি। পরের টেস্টেও আম্পায়ারিং করি এবং এবং সতেরটা বাজে ডিসিশন দিই, খেলা একটু তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ায় আর দিতে পারিনি। একটা রান আউট দিয়েছিলাম— ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। ব্যাটসম্যানরা রান নেবার চেষ্টাই করেনি। ক্রিজই ছাড়েনি। সবচেয়ে বড় কথা, কোনও ফিল্ডার উইকেটও ভাঙ্গেনি। অ্যাপীলটা শুধু করেছিল জন পার্কার, আমার পার্সোনাল রিকোয়েস্টে। এসবের তুলনায় শকুর-খিজারের কাজ তো নস্যি। ওদের উচিত ছিল, পরের টেস্টও খেলানোর সুযোগ দেবার জন্য দাবি তোলা। এবং দাবি মানা হলে, ইন্ডিয়ানদের আরও ট্রাবলে ফেলা। আমার প্রস্তাব, শুধু এই দুজন আম্পায়ার নয়, পাকিস্তানের সব আম্পায়ারের সমালোচনা করেই স্টেটমেন্ট দেওয়া হোক, ওঁরা কেন তাঁদের দুই সঙ্গীর পাশে দাঁড়িয়ে দাবি তুলতে পারলেন না যে, বাকি দুটি টেস্টেও অভিযুক্ত দুজনকেই খেলাতে দিতে হবে। ভিজিটিং টিমের ক্যাপ্টেনের বদমাইশি বন্ধ করার জন্য পরের টেস্টের আম্পায়াররাও কিছু ব্যবস্থা নিতে পারতেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, ইন্ডিয়ার গোটা ইনিংসে মাত্র দুজন ভুল ডিসিশনে আউট। পাকিস্তানী ব্যাটসম্যানরা আউট হয়েও উইকেট থেকে যাবার সুযোগ পেয়েছে মাত্র তিনবার। এইরকম উইক আম্পায়ারিং

ম্যাচে থাকলে এরকম বলতে হবেই) তবে পরে স্পিনাররাও সাহায্য পেতে পারে। তবে ব্যাটসম্যানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।

খেলা গড়াবে। ব্যাটিং টিম প্রচুর রান পেলে বলতে হবে 'আগেই বলেছিলাম, ব্যাটসম্যানদের ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' ফাস্ট বোলাররা উইকেট পেলে বলতে হবে, 'আগেই বলেছিলাম, ফাস্ট বোলাররা সাহায্য পাবে।' স্পিনাররা সাফল্য পেলে বলা যাবে, 'আগেই বলেছিলাম, পরে স্পিনাররাও সাহায্য পেতে পারে।' স্পিনারদের সাফল্য পেতে একটু দেরি হবেই!

চার : নিজে স্ট্যাটিসটিক্স মনে রাখলে কমেন্টেটরের প্রেস্টিজ থাকে না। সব কিছু স্ট্যাটিস্টিশিয়ানকে জিজ্ঞেস করতে হবে। যথা : আজ খেলা শুরুর সময় রান ছিল, রান ছিল, কত যেন...থ্যাঙ্কু, তিন উইকেটে একাত্তর। এখন রান দাঁড়িয়েছে... তিন উইকেটে একশ তের। এক ঘন্টায় আজ রান উঠেছে, কত যেন, থ্যাঙ্কু। আমাদের স্ট্যাটিস্টিশিয়ান জানালেন এক ঘন্টায় চুয়াল্লিশ রান উঠেছে। মুদাপ্পার আজ সকালে শুরু করেছিলেন চল্লিশ রান নিয়ে। এখন ছেষট্টি। এক ঘন্টায় মুদাপ্পর একাই করেছেন (?), ...কত যেন (?) ছাব্বিশ, থ্যাঙ্কু। মুদাপ্পার কি বম্বেতে আগে সেঞ্চুরি করেছেন? ওহ্, ঠিকই, করেনি থ্যাঙ্কু, নাউ ওনলি থার্টি ফোর শর্ট অফ হিজ হানড্রেড।

পাঁচ : সহযোগী ভাষ্যকার বা বিশেষজ্ঞের পিঠ চুলকোতে হবে। যথা : 'আপনারা সকলে হয়ত জানেন না যে, আমার পাশে বসা মিঃ এক্স রণজি ট্রফিতে মিডিয়াম পেসার হিসাবে সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছেন, আজ সকালের এই ভারি আবহাওয়া পেলে তিনি নিশ্চয় বোলার হিসাবে খুশি হতেন। অথবা : এজন্য আমি গর্বিত যে আজ আমার পাশে বসে যিনি ভাষা দিচ্ছেন, তিনি মরিশাসের এই ফ্যানটাস্টিক স্টেডিয়াম গড়ার পিছনে অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা।

ছয় : ধরা যাক, মাঠের মধ্যে নাটকীয় কিছু ঘটছে। যথা : জাভেদ মিয়াঁদাদ দিলীপ দোশিকে পরামর্শ দিচ্ছেন ওয়েস্ট এন্ড হোটেলে দুজন ফিল্ডার রাখতে, অথবা কিথ ফ্লেচার আউট ও ক্ষুব্ধ হয়ে ব্যাট দিয়ে উইকেট ভেঙ্গে দিচ্ছেন, অথবা ইয়ান বথাম বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি করে বিদায়ী ব্যাটসম্যানকে প্যাভিলিয়ন দেখাচ্ছেন। তখন ভাষ্যকার যেহেতু মানুষ, সেই দৃশ্য অবশ্যই দেখবেন। কিন্তু মুখে অন্য বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। এটা খুব মন দিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। নাটকীয় দৃশ্য দেখতে দেখতে সকালের সেশনের একটা শট বা ম্যাচের আলোচনা করা চাট্টিখানি কথা নয়।

সাত : কমেন্টেটরদের গলায় একটি করে রেগুলেটর লাগিয়ে দিতে হবে, এটা ইম্পোর্টেড আইটেম, কিছু করার নেই। রেডিও কমেন্ট্রির অভ্যেসে এবং উৎসাহ-উত্তেজনার আতিশয্যে অধিকাংশ কমেন্টেটর এত চেঁচান যে অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়। কারও কানের পর্দা ফাটে, কারও টেলিভিশনের। ভোরবেলা থেকেই কোল্ড ড্রিঙ্কস দেওয়া উচিত, যাতে কিছুক্ষণের মধ্যে গলা কিছুটা বসে যায়। বসা গলায় টেলিভিশন কমেন্ট্রি ভাল হয়।

আট : ছোটবেলায় চোর-পুলিস খেলার প্র্যাকটিস থাকলে ভাল হয়। এটাকে

অ্যাডিশনাল কোয়ালিফিকেশন মানতে হবে। ম্যাচ শেষ হবার পরই দুই ক্যাপ্টেনকে প্যাভেলিয়নের ভিড়ের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে। গায়ে কিছুটা জোর থাকা চাই। রেডিও এবং খবরের কাগজের লোকের চাপ থেকে ক্যাপ্টেনকে ছিনিয়ে বক্সে আনতে হবে। এবং হাঁপাতে হাঁপাতেই ইন্টারভিউ আরম্ভ করে দিতে হবে। অবিরাম প্রশ্ন করে যাবে এবং শেষ পর্যন্ত 'ব্যাক টু স্টুডিও' করে দেবে। খুব সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণভাবে কনুই ব্যবহার শিখে নিতে হবে, নাহলে ফেলো কমেন্টেটারকে কখনই থামানো যাবে না।

নয় : লাস্ট বাট নট দি লিস্ট, স্টেনলেস স্টীলের জুতো পরতে হবে। এদেশেরে অভিজ্ঞতা থেকে বলা যায়, রেগুলার কমেন্টেটর হতে গেলে, টেলিভিশন কর্তাদের কাছে অন্তত সাতশ একানব্বুই বার যেতে হবে। চামড়ার জুতো এত ধকল নিতে পারবে না।

৮৪

এটা এমনিতেই কম্পিটিশনের যুগ। আর খবরের কাগজে তো তুলকালাম কম্পিটিশন। সফরকারী ইংল্যান্ড দলের ক্যাপ্টেন গাওয়ার আর ম্যানেজার ব্রাউনের ইন্টারভিউ কোন কোন কাগজে ছাপা হচ্ছে। কোথাও বড় কোথাও ছোট। কোথাও ঢাকাচাপা কোথাও একটু খোলামেলা। সফর যখন শেষ হবে, তখনও বেরবে। সব কাগজে বেরবে। এত কম্পিটিশনের মধ্যে যে আগে পরাজিত সাহেব দলের কর্ণধারের বক্তব্য ছাপতে পারবে, তার তত ক্রেডিট। সবে একটা টেস্ট শেষ হয়েছে, সেকেন্ড টেস্ট শুরু হবার আগেই ইন্টারভিউ লিখে ফেলেছি— ম্যানেজার টনি ব্রাউনের। আপনারা ডিসেম্বরের মাঝামাঝিই পেয়ে যাচ্ছেন। সিরিজ শেষ হবে ৫ ফেব্রুয়ারি। গোটা সিরিজের ওপর পরাজিত ম্যানেজারের ইন্টারভিউ ডিসেম্বরের মাঝামাঝির আগে কেউ দিতে পারবে বলে মনে হয় না। ভাই ও বোন সব, তালি লাগান।

আমাদের এক কোয়ার্টার সাহেব রিপোর্টার শিখিয়েছিল, সাহেবদের ফার্স্ট নেম ধরে ডাকাই ভাল, তাতে ভাল সাড়া পাওয়া যায়। বম্বের ওবেরয় টাওয়ার্সের চারশ তিন নম্বর ঘরে উঁকি মেরেই কাঁধ ঝাঁকালাম। 'হাই টনি!' টনি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলেন। আর ঝঞ্ঝাট না বাড়িয়ে খাঁটি বাংলা অ্যাকসেপ্টে ইংরেজি বললাম। 'গুড আফটারনুন মি ব্রাউন, আই'ম সাপুড়ে ফ্রম খেলা, ক্যালকাটা।' ইন্টারভিউ শুরু হল।

■ প্রথম প্রশ্নটাই মূল প্রশ্ন, মিঃ ব্রাউন, সিরিজে আপনারা হারলেন কেন?

ব্রাউন : দেখুন, আমরা খাঁটি ক্রিকেট জাতি। আমাদের মধ্যে কোনরকম গোঁড়ামি নেই। আমরা হেরেছি আমাদের চেয়ে অনেক ভাল টিমের কাছে। স্বীকার করব না কেন? তবে ইন্টারভিউ নিচ্ছেন যখন, ইয়ে, ছাপা থাকবে যখন, মানে সত্যি কথা তো বলাই উচিত, বথাম থাকলে আমরা হারতাম না।

■ বথাম কিন্তু এইট্টি ওয়ান-টু সিরিজে ছিলেন এবং আপনারা হেরেছিলেন। তাছাড়া, বথাম এখন তেমন ফর্মেও তো নেই, মিঃ ব্রাউন?

ব্রাউন : বথাম যখন তেমন ফর্মে থাকে না, তখনই হঠাৎ ম্যাচ উইনিং বোলিং-ব্যাটিং করে ফেলে। এবার ইন্ডিয়ায় এরকমই ঘটত বলে আমার ধারণা। এইটি ওয়ান-টু সিরিজের

কথা বলতে পারব না, আমি ছিলাম না। (একটু আস্তে) বাঁচা গেছে।

■ বথাম না থাকাটা অবশ্যই দুঃখজনক, যেমন আপনার টিমের পক্ষে, তেমনই ভারতের দর্শকদের পক্ষে।

ব্রাউন : হুঁ, দর্শকদের কথাটাও ভাবা দরকার। আমরা হেরেছি, স্বীকার করতেই হবে, ইংরেজরা হার মানতে দ্বিধা করে না। কিন্তু, দর্শকদের কী দুঃখ, এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের সেরা ব্যাটসম্যান গ্রাহাম গুচকে তারা দেখতে পেল না। গুচ থাকলে আমরা হয়ত হারতাম না।

■ গুচও এইট্টি ওয়ান-টুতে ছিল।

ব্রাউন : ছিল, কিন্তু এরকম ফর্মে ছিল না।

■ সিরিজে হারার বিশেষ কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছেন?

ব্রাউন : দেখুন, অজুহাত দেখানো ইজ নট ক্রিকেট। বেটার টিম জিতেছে, এইরকমই ভাবতে হয়। তবে হ্যাঁ, জিওফ থাকলে ব্যাপারটা এত সোজা হত না। কেন যে ও সাউথ আফ্রিকায় খেলতে গেল। যদি বা গেল, কেন যে টি সি সি বি ওদের সাসপেন্ড করতে গেল। লাস্ট দুটো লাইন ছাপবেন না। পরে ঝামেলায় পড়লে আমি কিন্তু বলে দেব, বলিনি, বানিয়ে লিখেছে।

■ তাহলে, বনাম-গুচ-বয়কট না থাকার জন্য আপনার টিম হেরেছে, ইন্ডিয়া জিতেছে?

ব্রাউন : ছিঃ আমরা ইংরেজ, অমন কথা বলি না। ওভাবে তো বলিই না। কিন্তু বিশ্বাস করুন, এমবুরি এবার ফ্যান্টাস্টিক ফর্মে ছিল। আপনি তো আবার এখনই এইট্টি ওয়ান-টুর কথা তুলবেন। সেবার জন প্রথম এসেছিল। এবার ইন্ডিয়ান কন্ডিশন কাজে লাগাতে পারত। পোককই কিছু উইকেট পেয়ে গেল, বম্বেতে এমবুরি মাথা খারাপ করে দিত। যাক গে। নেক্সট কোয়েশ্চেন।

■ তাহলে তো আন্ডারউডের কথাও বলতে হয়?

ব্রাউন : অফ কোর্স। স্পিনাররা নাকি উৎকৃষ্ট মদের মত, যত পুরনো তত ভাল হয়। আন্ডারউড এখন পেকে টুসটুসে। স্টিল মাইলস এহেড অফ এডমন্ডস। আন্ডারউডের অভাব আমরা প্রতি ম্যাচে অনুভব করেছি। হায়, সাউথ আফ্রিকা! হায়, ব্যান!

■ যারা থাকলে আপনারা সিরিজ জিততেন, তাদের সবার নাম গুছিয়ে বলার জন্য ধন্যবাদ।

ব্রাউন : এভাবে বলবেন না। ভারত ইংল্যান্ডের চেয়ে এখন শক্তিশালী, তাই জিতেছে, এটাই বারবার বলতে চাই। তবে, এই যে বলছিলেন গুছিয়ে সবার নাম না, এখনও সবার নাম বলিনি।

■ এখনও বাকি আছে?

ব্রাউন : ইয়েস। গডফ্রে ইভান্স বলেছেন, বব নিজে বলেছে, আমিও বলছি, বব টেলর ইজ স্টিল দি বেস্ট কিপার ইন ইংল্যান্ড। গাড়ল সিলেক্টররা ওকে বাদ দিয়েছে। বম্বের ইজি স্টাম্পিং চান্সটা— আহা, ম্যাড্রাজে রবির ইজি কট বিহাইন্ডটা— আহা...

—'ফৈজলাবাদে আপনার কোনও স্পিনার দুটো উইকেট পায়নি, আবদুল কাদির কিন্তু চারটে উইকেট পেয়েছেন।'

—'আম্পা...না, এটা তো ফৈজলাবাদ। ওদের কাদির একা চারটে উইকেট পেয়েছে, আমাদের শিবলাল রবি অংশু মিলে প্রায় সমান— তিনটে উইকেট পেয়েছে। দুই দলের স্পিনিং ডিপার্টমেন্ট কী করেছে, ব্যাপারটা এইভাবে দেখুন, সহজ হয়ে যাবে।'

—'মুদাস্সর নজর প্রথম সারির বোলার নন। তাঁর হিসেব দেখুন : পঞ্চান্ন পয়েন্ট তিন ওভারে একশ চল্লিশ রানে তিন উইকেট।'

—'ম্যান উইথ দি গোল্ডেন আর্ম'কে আন্ডার এস্টিমেট করবেন না। ওকে হিসেবের বাইরে রাখুন। ও সব পিচে উইকেট পায়, শকুর রানা আর নো শকুর রানা।'

—'বোলাররা ব্যর্থ নয় বলছেন। আপনি কি বলতে চান যে এই ট্যুরে কপিল ব্যর্থ নয়?'

—'ডেফিনিটলি নট। লাহোরে ন্যাড়া পিচে ওর কিছু করার ছিল না। ফৈজলাবাদে তো ব্যথার জন্য বলই করতে পারল না।'

—'ওই লাহোরেই হাফিজ, আচ্ছা হাফিজের কথা থাক, চেতন শর্মা তিনটে উইকেট তুলে নিয়েছে কিন্তু।'

—'চেতনকে ওরা আন্ডার এস্টিমেট করে উইকেট দিয়েছে। তাছাড়া, ক্রিকেট অনেকটাই ভাগ্যের খেলা। ভাল বল করেও মাঝে মাঝে উইকেট পাওয়া যায় না। তাছাড়া, কপিলের হাঁটুটা একটু কষ্ট দিচ্ছিল। তবু, কপিল ইজ কপিল।'

—'ইয়েস, কপিল ইজ কপিল। কিন্তু নতুন বলেও ওর বল সবাই মনের আনন্দে খেলে যাচ্ছে কেন? ফৈজলাবাদে কপিল পাঁচ ওভারের পরই বেরিয়ে গেলেন। আপনাকে না বলে মাঠের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন কেন?'

—'বাজে কথা বলবেন না। কপিল ইজ কপিল। আমার সঙ্গে কপিলের ঝগড়া বাঁধানোর চেষ্টা করবেন না। লাভ হবে না।'

—'তার মানে, একশ ছাব্বিশ রানে এক উইকেটকেও ভাল পারফরমেন্স বলতে হবে।'

—'ইয়েস। উইকেট কিন্তু ছিল না। কপিলের কাঁধে, পিঠে, হাঁটুতে চোট ছিল। কপিল ইজ কপিল।'

—'কপিল কি অসহযোগিতা করেছেন?'

—'এবার গাড়ি থেকে নামিয়ে দেব।'

—'ঠিক আছে, ঠিক আছে। মদনলাল ডিফেন্সিভ বোলার। তিনিও প্রচুর মার খেয়েছেন। একটা উইকেট। ভাল পারফরমেন্স?'

—'ইয়েস। মদন ইজ আ ফাইটার। ফাইট করে মার খেয়েছে। ওইরকম পিচ, ওদের ব্যাটসম্যানরা ভাল ফর্মে ছিল, ব্যাড লাক, আরও অনেক কিছু বলা যায়। মদন ব্যর্থ নয়।'

—'অলরাউন্ডার বিনি প্রথম টেস্টে খেলে মাত্র আট ওভার বল করেছেন। এমন বোলিং যে আর ডাকতে পারেননি। ব্যর্থ নয়?'

—'বিনিকে এখন শুধু ব্যাটসম্যান হিসাবেই দেখা হচ্ছে। ব্যর্থ হবার কোয়েশ্চেন ডাজ নট অ্যারাইজ।'

—'আর এক মিডিয়াম পেসার সাধু টেস্টে চান্স পাননি, একটা ওয়ান ডে-তে চান্স পেয়ে বেধড়ক মার খেয়েছেন। ব্যর্থ নয়?'

—'বেচারা টেস্ট খেলার চান্সই পেল না, ওকে ব্যর্থ বলে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?'

—'রবি একশ ঊননব্বুই রানে চার উইকেট। অ্যাভারেজ : ৪৭.২৫।

চেতন শর্মা দুশ তেত্রিশ রানে চারটে উইকেট। অ্যাভারেজ : ৫৮.২৫। সাকসেসফুল? চেতন নতুন ছেলে, স্লো পিচ, ঠিক আছে। রবি এখন স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান, ঠিক াছে। কিন্তু স্পিনারদের ব্যর্থ বলবেন না? মনিন্দার? টেস্ট প্রতি একটা করে উইকেট— এটা ভাল পারফরমেন্স?'

—'ভাল নয়। তবে খারাপও নয়। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, ভারতীয় বোলাররা বোধহয় আর কখনও উইকেটই পাবে না।

মনিন্দার যে প্রতি টেস্টে একটা করে উইকেট পাচ্ছে, এটা এনকারেজিং। তবে, মনিন্দারের চেয়েও ভাল বল করেছে শিবি, শিবলাল যাদব।'

—"কী বলেন! মনিন্দার লাহোরে চল্লিশ ওভারে নব্বই রান দিয়েছেন, ওভার পিছু ২.২৫। শিবলাল ফৈজলাবাদে টিমে এসে চুয়াত্তর ওভার পিছু ২.৬৫। দুজনেরই একটা করে উইকেট। এই হিসেবের পরেও বলেছেন আপনার শিবি সাকসেসফুল, শিবলাল মনিন্দারের চেয়েও ভাল বল করেছেন?"

নেভিল কার্ডাস বলেছিলেন, স্কোরবোর্ড হল গাধা। আমি বলছি, আপনিও একটি গাধা। এসব দিয়ে কি ক্রিকেট বোঝা যায়? শিবি চুয়াত্তর ওভার ধরে পাকিস্তানী ব্যাটসম্যানদের বেঁধে রেখেছে, না হলে ওরা হাজার খানেক রান তুলে ফেলত। আমি বিশ্বাস করি, দেশের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচটি টেস্টেই চান্স পেলে ও অন্তত সাতটা উইকেট পাবে।"

—"টিমে কি দুজন অফ স্পিনার রাখা হবেই?"

—"কেন, দুজন কেন।"

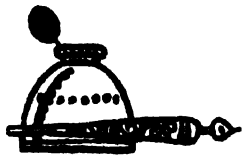
—"এক নম্বর অফ স্পিনার অংশুমান গাইকোয়াড় পাকিস্তানকে আঠাশ ওভারে ঊনআশি রান দিয়ে দুটো উইকেট পেয়েছেন। তা ছাড়া ব্যাটেও কিছু রান পেয়েছেন। তাঁকে নিশ্চয়ই বাদ দেওয়া হবে না। তারপর আর একজন অফ স্পিনার নেওয়া হবে কি? তাছাড়া অশোক প্যাটেল উঠে আসতে পারে।"

—"এখনও শিবলাল যাদব দুনিয়ার সেরা পঁচাত্তর জন অফ স্পিনারের একজন। ওকে ছোট করে দেখা অন্যায়।"

—"সরি, মিঃ গাভাসকার। দেখা যাচ্ছে বোলারদের ওপর আপনার যথেষ্ট আস্থা আছে। আপনি টেস্ট জেতার আশা করছেন?'

—"আশা তো করছিই। শুধু কপিলকে একটু ফর্মে ফিরতে হবে। জিততে হলে একটা ম্যাচে কুড়িটা উইকেট ফেলা দরকার। সতেরটা কপিল পেয়ে গেলে, বাকি তিনটে চেতন আর আমার যোগ্য স্পিনাররা তুলে নেবে, এই বিশ্বাস আমার দৃঢ়ভাবেই আছে।

৮৩



নভেম্বরের হালকা শীতের সকাল। ভোর সাড়ে আটটা। ঘুম চোখে দরজা খুলে দেখি, আমার বাল্যবন্ধু সুধীন, ওরফে টুকু। একটুও অবাক হলাম না। টুকুর সঙ্গে এর আগে দেখা হয়েছে নাইন্টিন সিক্সটি টু-তে। বাইশ বছরে যতটা চেঞ্জ আসা উচিত, তাই এসেছে। লম্বায় ফুটখানেক বেড়েছে, চওড়াতে ফুটখানেক, তদনুযায়ী চর্বি ইত্যাদি। চুল সেই অনুপাতে বাড়েনি। কিন্তু বাইশ বছরে টুকুর যেভাবে পাল্টে যাওয়ার কথা, সেইভাবেই পাল্টানোয় আমি একটুও অবাক হলাম না। কিন্তু টুকু বোকার মত ফালতু হেসে বলল, 'বাচ্চু, তুই খুব পাল্টে যাচ্ছিস।' অর্ডিনারী মর্টাল, বাইশ বছরে আমার কতটা পাল্টানোর কথা, সে ধারণা নেই। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার ঠিকানা কোথায় পেলি, এতদিন পরে?' টুকু খেজুরের মত মিষ্টি হেসে বলল, 'তুই এখন বিখ্যাত লোক, ঠিকানা পাওয়া কঠিন নয়।' এটাতেও অবাক হলাম না, ঠিকই বলেছে। কিন্তু টুকুর পরের কথাটায় অবাক হতে হল : 'তুই তো জানিস না, আমি বছর দশেক আগে মরিশাসে মাইগ্রেট করেছি, এখন ওখানকার টেলিভিশনের স্পোর্টস ডাইরেক্টর। রিসেণ্টলি একটা ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। এখন তুই যদি বাঁচাতে পারিস।'

হে বাবুরাম সাপুড়ে, তুমি আর কত ওপরে উঠবে? স্বপ্নেও কি ভেবেছিলে যে একদিন একটি দেশের টেলিভিশন স্পোর্টস ডাইরেক্টর তোমার সাড়ে সাত ভাই সাড়ে পাঁচ ড্রইং রুমে বসে বাঁচার জন্য তোমার সাহায্য চাইবে?

এমন কিছু ঠান্ডা পড়েনি। তবু গম্ভীর হয়ে বসার জন্য হালকা ছাই রঙের প্রাগৈতিহাসিক শালটা নিয়ে এলাম। গলা যতটা সম্ভব ভরাট করে জানতে চাইলাম, 'বুঝিয়ে বল, তোর জন্য আমি কী করতে পারি।'

সুধীন ওরফে টুকু ওরফে মরিশাস টেলিভিশনের স্পোর্টস ডাইরেক্টর ওরফে সম্প্রতি ঝামেলায়-পড়া আমার বাল্যবন্ধু সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃত করল। মরিশাসে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা অনেকটা বেড়েছে। ঘরোয়া ক্রিকেট তো আছেই, স্পেন, কুয়েত প্রভৃতি দেশের শক্তিশালী ক্রিকেট টিমের যাওয়া আসাও শুরু হয়েছে। এখন মরিশাসের নবজাগ্রত ক্রিকেট পাবলিক চাইছে টেলিভিশন কভারেজ। এর মধ্যে একদিন সাতজন অত্যুৎসাহী এই দাবিতে

টেলিভিশন সেন্টার ঘেরাও করেছিল, একুশ জন ক্রিকেট অনুরাগীর এক বিরাট মিছিল ক্রীড়ামন্ত্রীর বাগানবাড়িতে গিয়েছিল এবং দিন চারেক আগে অর্ধশতাধিক ক্রিকেট প্রেমিকের এক বিশাল জনসভায় এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে টেলিভিশনে আসন্ন স্পেন-মরিশাস ক্রিকেট সিরিজের খেলা না দেখালে, প্রচন্ড আন্দোলন শুরু করা হবে। এই অবস্থায় সুধীন ওরফে টুকু ওরফে টেলিভিশন স্পোর্টস ডাইরেক্টর ওরফে ামার বাল্যবন্ধুকে ডেকে মরিশাসের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রীর একান্ত সচিবের প্রথম সহকারী শ্রীযুক্ত সোমরঙ্গম বলেছেন, 'টিভি কভারেজ করতেই হবে, দরকার হলে বিদেশে যান, আপনার আগের দেশ ইন্ডিয়ায় যান, দরকারি 'নো হাউ' নিয়ে আসুন। হিন্দি ইংরেজি দুটোতেই করতে হবে।'

তাই টুকু এসেছে। আমার সাড়ে সাত বাই সাড়ে পাঁচে বসেছে। সাহায্য চাইছে। আমি প্রথমেই আশ্বস্ত করলাম, 'খুব বেশি চিন্তার কিছু নেই। তুই যদি বলতিস যে বাংলায় রেডিও কমেন্ট্রির ব্যবস্থা করতে হবে, আমি কিছু করতে পারতাম না। বাংলা কমেন্টেটর জোগাড় করা দু-চার মাসের কাজনয়। ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজ, একটু তোতলা ভাব, কিছু 'স'-এর দোষ, মোটামুটি আড়ষ্ট জিভ, খেলা সম্পর্কে খাঁটি অজ্ঞতা, ভুল স্ট্যাটিসটিক্স অম্লানবদনে পরিবেশন— এত গুণের সমাবেশ চাইলেই দেখা যায় না। বহু বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং নির্ভেজাল আন্তরিকতায় আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্র এমন ভাষ্যকারদের একটি টগবগে টিম গড়ে তুলতে পেরেছে। হিন্দি আর ইংরেজির কেসটা অনেক সহজ। তুই কি কিছু কমেন্টেটর নিয়ে যেতে চাস?'

—'না। মরিশাস গভর্নমেন্ট সব রকম ইমপোর্ট যথাসম্ভব কমাতে চাইছে। আর নতুন কোন আইটেম যোগ করার সম্ভাবনা নেই। হিন্দি ইংরাজী বলাব লোক আছে, হাতে সময়ও বিশেষ নেই। তুই কিছু টিপস দে, ঘন্টাখানেকের একটা কনডেন্সড কোর্স দে, কালই ফিরে গিয়ে কাজে নেমে যাব।'

প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, মরিশাসের ভাষ্যকারদের জন্য নিম্নবর্ণিত গাইডলাইন দিয়েছি।

এক : ভাষাকারকে অতি অবশ্যই টাই বাঁধতে জানতে হবে। এই ব্যাপারটি নিখুঁত না হলে টেলিভিশন কমেন্ট্রি বক্সেই বসতে দেওয়া উচিত নয়। চেহারা যতই আনস্মার্ট হোক, রঙচঙে ঝলমলে অতিস্মার্ট জামা পড়তে হবে।

দুই : ফিক করে ক্যাবলা হাসি হাসার ক্ষমতা থাকা চাই। দিনের শুরুতে, যে কোন সেশনের শুরুতেই এই অর্থহীন লবঙ্গহাস্য দূরদর্শকদের উপহার দিতে হবে। খেলার দিন সকালে প্রত্যেক কমেন্টেটরকে এক টিউব টুথপেস্ট শেষ করে ফেলতে হবে। এজন্য মরিশাস দূরদর্শন কর্তৃপক্ষের অন্তত পনের টিউব টুথপেস্ট এবং তিনটি ভাল ব্র্যান্ডের টুথব্রাশ রেডি করতে হবে।

তিন : পিচ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ হবার ভান করতেই হবে। প্রথমে 'হ্যাঁ' ও হয়, 'না' ও হয়— এই গোছের একটা বক্তব্য রাখতে হবে। যথা : পিচ দেখে মনে হচ্ছে, ফাস্ট বোলাররা সাহায্য পাবে (ওয়েস্ট ইন্ডিজের মত টিম বা ওই জাতীয় ফাস্ট বোলার এই

■ আহা, আহা। *আপনি নিশ্চয়ই, ক্রিস ট্যাভার, জন লিভার, ইয়ান গ্রেগ, ডেরেক* প্রিঙ্গল এবং ডেরেক র‍্যান্ডালের কথাও বলবেন?

ব্রাউন : থাক। লেট আস সে, ইন্ডিয়া ভাল টিম, তাই জিতেছে।

■ অন্য কোন অসুবিধা?

ব্রাউন : অসুবিধা কীসের? সব ব্যবস্থাই ভাল ছিল। তবে, মিসেস গান্ধী খুন হওয়ায় ট্যুর প্রোগাম পাল্টাল। আমাদের মাঝে শ্রীলঙ্কা যেতে হল। চেঞ্জ অফ ক্লাইমেট, রবিনসনের সর্দি হল, অ্যালটের ফ্লু। সস্তার লবঙ্গ বেশি খেয়ে তিনজনের পেট খারাপ হল।

■ আহা।

ব্রাউন : প্লিজ ভাববেন না যেন, এসব অসুবিধার জন্য হেরেছি বলছি। তবে অসুবিধা হলে জেতার চান্স, ভাল রেজাল্ট করার চান্স কমে যায়, এটা তো মানবেনই। আমাদের মনও খুব খারাপ ছিল, বুঝলেন। বিগ বব রিটায়ার করায় আমাদের টিম আর হার্ট— দুটোই উইক হয়ে গেছে। তারপর, বম্বে টেস্ট শুরু হবার আগে আমাদের ডেপুটি হাই কমিশনার খুন হলেন, বম্বেতেই। সিরিজের শুরুতেই এই আঘাত, এরপর ভাল খেলা যায়?

■ আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ করছি, মিঃ ব্রাউন।

ব্রাউন : ধন্যবাদ।

■ আপনাদের অসুবিধের ফিরিস্তি আমার কাগজেই প্রথম ছাপা হচ্ছে। ধন্যবাদ।

ব্রাউন : ফিরিস্তি শেষ হয়নি কিন্তু। অজুহাত দেখান, একে ওকে দোষ দেওয়া খুব খারাপ জিনিস। ইংরেজরা কিনা খাঁটি ক্রিকেট-জাতি। এসব না-পসন্দ। তবে, ইফ ইউ পারমিট, স্বরূপ কিষেণের জঘন্য আম্পায়ারিংয়ের কথাটা তুলি। বম্বেতে অ্যাট লিস্ট এগারটা বাজে ডিসিশন দিয়েছেন।

■ আহা। আর কিছু?

ব্রাউন : আমরা খারাপ খেলেছি তাই হেরেছি। ইন্ডিয়া ভাল খেলেছে তাই জিতেছে। কিন্তু এত স্লো পিচ করার মানে হয়? আমাদের এখন বব নেই বলে কি কেউ নেই? নর্মান কাউয়ান্স ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ফাস্ট বোলারদের মতই ফাস্ট। বম্বেতে একটু ফাস্ট উইকেট পেলেই ও একা ম্যাচ জিতিয়ে দিত। সিরিজের ফার্স্ট টেস্টটা তুলে নিতে পারলে আর ধরতে পারতেন মনে করেন?

■ না, না, কিছুতেই মনে করি না। এবার তাহলে বলি মিঃ ব্রাউন, ইন্টারভিউয়ের জন্য ধন্যবাদ, কফির জন্য ধন্যবাদ।

ব্রাউন : আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ জানাব, তবে আমার কিছু কথা বলা বাকি আছে, বলা হলে জানাব। বসুন।

■ বলুন।

ব্রাউন : ম্যাড্রাস, কটক আর জলন্ধকে ঝাল রান্নার জন্য আমাদের টাং অ্যান্ড স্টমাক অ্যাপসেট হয়েছে। রাজকোটে মশা এবং গৌহাটিতে ছারপোকা কামড়েছে। অ্যালটের

পায়ে কমলা লেবুর খোসা পড়েছে। সব টেস্টে অতি বাজে বলে খেলা হয়েছে। দিল্লিতে অটোগ্রাফ নিতে এসে দুটি বাচ্চা মেয়ে গাওয়ারকে চিমটি কেটেছিল, কানপুর টেস্টের প্রথম দিন অ্যালান ল্যাম্বের বুটের ফিতে খুঁজে পাওয়া যায়নি, ক্যালকাটা টু কটক ফ্লাইটে বড্ড বেশি ঝাঁকুনি ছিল, ব্যাঙ্গালোরে ওয়েস্ট এন্ড হোটেলে একদিন ভাল চীজ পাওয়া যায়নি। এরকম আরও একশ তিনটে পয়েন্ট আছে, রিপোর্টে সব রাখব। তবে, রিপোর্টের হেডিং কী থাকবে এখনই বলে দিচ্ছি : 'আমরা খারাপ খেলেছি, তাই হেরেছি।' আমরা ইংরেজ, ক্রিকেট আমাদের রক্তে, আমরা কারও কৃতিত্বকে ছোট করে দেখি না, অজুহাতও দেখাই না, বুঝলেন।

■ বুঝলাম। ধন্যবাদ।

ব্রাউন : এবার আপনাকেও ধন্যবাদ।

৮৫

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম গিয়েছিলাম বরোদার অধিনায়ক অংশুমান গায়কোয়াড়ের ইন্টারভিউ নিতে। ভেবেছিলাম, কলকাতায় আঙুলের হাড় ভাঙার ব্যাপারটা গপ্পো, মাদ্রাজে বাদ পড়ার আগে একটা কেস-সেভিং ডিভাইস। কিন্তু সত্যিই হাড়টাড় ভেঙেছে, নাহলে বম্বের সঙ্গে রঞ্জি ম্যাচে খেললেন না কেন? অনেক কোয়েশ্চেন সেট করে রেখেছিলাম, রাজবাড়ির ছেলে হওয়া সত্ত্বেও প্রাইজমানি নিয়ে সাধারণ লোকেদের মত ঝামেলা পাকালেন কেন, কী করে টেস্ট টিমে এলেন, কী করে ছিটকে গেলেন, কী করে আবার ফিরে আসবেন— এই সব। কিন্তু, তাঁকে পাওয়া গেল না। বম্বে-বরোদা রঞ্জি ম্যাচের শেষ দিন মুখ ব্যাজার করে বসে বসে ভাবছিলাম, কার ইন্টারভিউ তাহলে নেওয়া যায়।

মাঠে একশ একুশজন দর্শক ছিলেন। সকাল থেকেই তাঁরা কমলালেবু খাচ্ছিলেন এবং কী আশচয, অমূল্য খোসা গ্যালারির নিচে ফেলে দিচ্ছেন। ওঁদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল, কমলালেবুর ভিতরটাই আসল ব্যাপার, খোসাটা ফালতু। যত সব ফালতু লোক। ক্রিকেট বোঝে না। হঠাৎ এই একশ একুশের চিৎকারে মাঠে তাকালাম। রবি শাস্ত্রী খুব রেগে গেছেন, বল পড়লেই গ্যালারিতে পাঠাচ্ছেন। পাশ থেকে বম্বের এক ফাজিল রিপোর্টার বলে উঠলেন, 'আর দুটো।' কেন তিনটে নয়, দুটো হলে কি হবে, এসব না বুঝে ফ্যাল ফ্যাল করে মাঠেই চোখ রাখলাম। বেচারা রবি, কলকাতায় কলকাতায় গালাগালি খোসা টোসা খেয়ে রেগে গেছে। পাশ থেকে ফাজিল রিপোর্টার, 'আর একটা।' আর একটাও হয়ে গেল। পাশের রিপোর্টার মারফত জানা গেল, নাইনটিন সিক্সটি এইটে একজন ক্রিকেটার, গ্যারি সোবার্স না কি যেন নাম, কাউন্টি লিগে এক ওভারে সব বলে ওভার বাউন্ডারি মেরেছিলেন। রবি শাস্ত্রী সেই রেকর্ড টাচ করলেন। একশ একুশজন এক হাজার একশ জনের সমান শব্দে হাততালি দিলেন। সানন্দে কদলীভক্ষণ করলেন। কী আশ্চর্য, কলার যাবতীয় খোসা গ্যালারির নিচে ফেলে দেওয়া হল। ধুস্, বম্বেতে ক্রিকেট বন্ধ হয়ে যাবে। ফাজিল রিপোর্টার বোঝালেন, আরও কত রেকর্ড রবি ভেঙে ফেলছে। ঠিক হ্যায়, রবি শাস্ত্রীরই ইন্টারভিউ নেব।

কিন্তু, প্রবলেম, শাস্ত্রী ইন্টারভিউ দিতে রাজিই হচ্ছিলেন না। কলকাতায় রিপোর্টারদের নাকি খুব ভয় পান। বুকের ছাতি ফুলে বত্রিশ ইঞ্চি হয়ে গেল। হুঁ হুঁ আম্মো কলকাতার রিপোর্টার। শেষে ভয়টয় দেখিয়ে রাজি করালাম। কথাও দিলাম, ফিফটি পার্সেন্ট-এর বেশি কথা বানিয়ে লিখব না।

• অভিনন্দন, রবিশঙ্কর।

শাস্ত্রী : কেন?

• রেকর্ডের জন্য।

শাস্ত্রী : আমি এজন্য আন্তরিক দুঃখিত ও লজ্জিত। আপনাদের, কলকাতার সাংবাদিকদের সঙ্গে এখন আমি সভয়ে একমত যে, রেকর্ড গড়া-ভাঙা মহাপাপ। যারা রেকর্ড করে তারা দেশদ্রোহী, তারা নিজেদের জন্য খেলে দেশের জন্য নয়, তারা দেশদ্রোহী। যারা রেকর্ড করে না কখনও, তারা দেশের জন্য খেলে, তারা দেশপ্রেমিক। আমার এরকম একটা আবছা ধারণা আছে যে দেশদ্রোহী হওয়ার চেয়ে দেশপ্রেমিক হওয়া সহজ। কথা দিচ্ছি, এবার থেকে কঠোর পরিশ্রম করব যাতে সহজ কাজটা করা যায়। আর কখনও রেকর্ড করব না। এবারের মত ক্ষমা করে দিন।

• ডাবল সেঞ্চুরি পেলেন একশ তের মিনিটে। শুনলাম এটাও ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে এর আগের রেকর্ড ছিল গিলবার্ট জেসপ আর ক্লাইভ লয়েডের— একশ কুড়ি মিনিটে ডাবল সেঞ্চুরি। আজ আপনি...

শাস্ত্রী : প্লিজ, রেকর্ডের কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না। একবার রেকর্ডের বদনাম হয়ে গেলে আর তা মোছা যাবেনা। রেকর্ড করলেই দেশদ্রোহী, তখন আর টিম থেকে বাদ পড়লেও কংগ্রেস-ই'তে জয়েন করতে পারব না।

• রেকর্ডের কথা না তুলেই জিজ্ঞেস করছি, এত ওভার বাউন্ডারি— আজই তেরটা— মারার অনুপ্রেরণা কোথা থেকে পেয়েছেন?

শাস্ত্রী : নো ডাউট, ফ্রম ক্যালকাটা। আঃ কী দুর্দান্ত গালিগালাজ, কী ভয়ঙ্কর কমলালেবুর খোসা। ফিফথ জানুয়ারিই ঠিক করে ফেলেছিলাম, নেক্সট ম্যাচে খুব পেটাব। তাই এত ওভার বাউন্ডারি। ম্যাড্রাস টেস্টেও এইরকম মারব, যদি এডমন্ডস তিলকরাজের মত বল করে, ফাউলাররা বরোদার ছেলেদের মত গোটা চারেক ক্যাচ ফেলে।

• কলকাতার কথা বারবার বলছেন। আপনি কি কলকাতার ওপর চটে গেছেন?

শাস্ত্রী : ছি। আমার ঘাড়ে কটা মাথা? কলকাতা হল গিয়ে ফুটবলের মক্কা, ক্রিকেটের ভ্যাটিকান। ওখানে একসঙ্গে প্রায় সাড়ে উনআশি হাজার নেভিল কার্ডাস খেলা দেখেন। চটলেই হল? আমি ধন্য, কলকাতা আমায় জাতে তুলেছে। গতবার কপিল, এবার সুনীল কমলালেবুর খোসা খেয়েছে। ভেবেছিলাম, এই পুরস্কার পেতে আমাকে অন্তত বছর তিনেক অপেক্ষা করতে হবে। এবারই হয়ে গেল। ভেরি আর্লি রিকগনিশন।

• তাহলে কলকাতা থেকে আপনার আর কিছুই পাবার নেই?

শাস্ত্রী : আশা আছে, আশা নিয়েই বাঁচি। কলকাতার দর্শকরা এবার সুনীলকে জুতোর

মালা দেখিয়েছে। চোদ্দ-পনের বছর দেশের হয়ে খেলার পুরস্কার। আমি অন্তত সতের বছর দেশের হয়ে খেলতে চাই। তারপর আশা, জুতোর মালা দেখিয়ে নয়, সরাসরি জুতো মেরে কলকাতার সমঝদার দর্শকরা যদি আমাকে পুরস্কৃত করেন।

• কলকাতায় খেলেছেন, সেঞ্চুরি পেয়েছেন। কি বুঝলেন, কলকাতার দর্শকরা কী চান?

শাস্ত্রী : ভারতীয়দের কাছ থেকে অল্প সময়ে অনেক রান, ক্যাপ্টেন এবং সিনিয়র ক্রিকেটারের প্রতি অশ্রদ্ধা, মূকাভিনয়, সামারসল্ট। এগুলোর চেষ্টায় থাকব। তবে, ক্লাব হাউসের মাথায় চড়তে পারব না।

• এ কথা কি সত্যি যে আপনিই ভারতের পরবর্তী ক্রিকেট অধিনায়ক?

শাস্ত্রী : শোনা যাচ্ছে। আমার কেরিয়ারের বারটা বাজানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। বাজুক। ক্যাপ্টেন হতে কে না চায়? আমার ক্ষেত্রে অবশ্য না হলেও ক্ষতি ছিল না। একজন ভারতীয় অধিনায়কের জীবনে দুটো পরম প্রাপ্তি— ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাপ এবং কলকাতার দর্শকদের ছোঁড়া কমলা লেবুর খোসা। দুটোই আমার হয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন হবার আগেই।

• সত্যিই, মাত্র সাড়ে বাইশ বছরে আপনি অনেক কিছু পেয়ে গেছেন। জীবনে আরও অনেক রেকর্ড...

শাস্ত্রী : প্লিজ, আমার ক্ষতি করবেন না। রেকর্ডের সঙ্গে আমার নাম জড়াবেন না। আমি কথা দিচ্ছি, কিছুতেই নয় হাজার রান করব না, একশ ক্যাচ ধরব না, তিরিশটি সেঞ্চুরি করব না, একশর বেশি টেস্ট খেলব না, কিছুতেই ক্যাপ্টেন হিসেবে ইন্ডিয়াকে সাত-আটটা টেস্ট জেতাব না। আমি দেশপ্রেমিক হতে চাই।

• ঠিক আছে, ঠিক আছে। আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

শাস্ত্রী : যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেলা ছেড়ে নিরলনের ক্যালকাটা অফিসে ট্রান্সফার নেওয়া।

• কেন?

শাস্ত্রী : টেস্টম্যাচ হলেই একটা টিকিট কিনব। কলা, কমলা, আরও সব ফলের খোসা নিয়ে মাঠে যাব, ছুঁড়ব। মনের সুখে মুখ খারাপ করব। আজহারউদ্দিনকে জুতোর মালা দেখাব, শিবরামকৃষ্ণাণের স্ত্রীকে গালাগালি দেব। একটা টিকিট কাটলেই এসব অধিকার শুধুমাত্র কলকাতাতেই পাওয়া যায়। তাই তো এত ভালবাসি--- কলকাতাকে।

• আর কোনও স্বপ্ন?

শাস্ত্রী : দরকার নেই। মাঠে বসে আবর্জনা ছোঁড়ার আনন্দই যথেষ্ট। তবু, স্বপ্নের কথা যখন বলছেন, আমি কলকাতার স্পোর্টস জার্নালিস্ট হতে চাই। দর্শকদের আবর্জনা ছোঁড়ার মত, দুহাতে আবর্জনা লেখার অধিকার নেই।

৮৬

আব চিন্তা নেই। ভাবতবর্ষেব খেলাধুলোব জগতে স্বর্ণযুগ আগতপ্রায়। প্রভাবশালী বাজনৈতিক পান্ডাবা এতকাল খেলাধুলাকে উপেক্ষা কবেছিলেন, খেলোয়াড়দেব বঞ্চিত কবেছিলেন। খেলা এবং খেলোয়াড়দেব হয়ে বলাব মতো এমন কেউ ছিল না— যে নিজে খেলাধুলোব সঙ্গে লেপ্টে আছে।

কিন্তু এখন একেবাবে অন্যবকম। পালামেন্টে খেলোয়াড়, বাজনৈতিক প্রভাবেব ডগায় খেলোয়াড়। খেলাধুলোব গাছ ঝাকালেই এবপব থেকে ট্রফি পডবে, মডেল কববে। বাচ্চালোগ তালি বাজাও।

পাইপেব মুখ দিয়ে নাক চুলকোতে চুলকোতে এডিটব সাহেব অর্ডাব দিলেন, 'আসন্ন গোল্ডেন-এজ এব লীডাবদেব ইন্টাবভিউ নিন। বেশি ঘোবাঘুবি কবতে হবে না। দৌড়োদৌড়ি কবে এই স্পোর্টিং লীডাবদেব ধবতে পাববেন না। লিস্ট বানান, পালাম এয়াবপোর্টে বসে থাকুন। বাববাব প্লেনে না চডলে লীডাবেব ব্যস্ততা প্রমাণ হয়। যে যত বড লীডাব, সে তত বাব প্লেনে চড়ে। দিল্লিতে বা নিজেব জায়গায় টানা সাতদিন যে বসে থাকে সে কোনও লীডাবই নয়। কোনও কাজ না থাকলেও স্টেট লীডাববা তাই মাঝেমাঝে দিল্লিব প্লেনে চড়ে বসে দিল্লিতে কাজ থাকলেও এখানে ওখানে ঘুবে আসে। পালাম এয়াবপোর্টে বসুন, সবাইকে পাবেন ট্রেনে যাবেন, ট্রেনে ফিববেন, শুধু ইন্টাবভিউগুলো এয়াবপোর্টে নেবেন।

পালাম এয়াবপোর্টে এমন পজিশন নিলাম, যাতে আউট গোয়িং ইনকামিং সব ভি [illegible] কী সৌভাগ্য, প্রথম দিনই প্রাক্তন বাস্কেটবল নক্ষত্র অমিতাভ বচ্চনেব দেখা পেয়ে গেলাম। খেলোয়াড়দেব মধ্যে এমন সুন্দব চেহাবা কমই দেখা যায়। মোটামুটি লম্বাও বটে। সংক্ষেপে পবিচয় দিয়ে বললাম, 'একসময়ে কলকাতায় নাকি দুর্দান্ত বাস্কেটবল খেলতেন, এখন এম পি হয়ে খেলাধুলোব জন্য কী কববেন?' শ্রীযুক্ত বচ্চন আমাব কানেব বেশ কিছুটা ওপব থেকে নিচু পর্দায় জবাব নামালেন, 'খেলাধুলোব জন্য আমাদেব নবীন প্রধানমন্ত্রী নিশ্চিত অনেক ভাল কাজে হাত দেবেন আমাব কাজ সেই হাত শক্ত কবা।' বুঝলাম, এখনও ইলেকশন হ্যাং ওভাব

কাটেনি।

প্রথম দিনই দুপুরে একটু চা ঘুম এসেছিল। সারাটা সকাল কেটেছে শুধুই চায়ে। তবু দুপুরের ঘুম। হায় বাঙালি। কিন্তু বরাবরই দেখেছি, আমার একটা ইলেভেন্থ সেন্স কাজ করে। ঘুম হঠাৎ ভেঙে গেল। চোখ খুলতেই সামনে আর-এক স্পোর্টিং লীডার। অমিতাভবাবুর চেয়ে একটু কম লম্বা, অমিতাভবাবুর চেয়ে একটু কম সুদর্শন, তবে খেলোয়াড় হিসাবে অমিতাভবাবুর কাছাকাছিই। আসলাম শের খান। নিজেই সম্প্রতি বলেছেন, 'অমিতাভ বচ্চন ফিল্মের এক নম্বর আমি হকির এক নম্বর।' ছুটে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এবার তো এম পি হয়ে গেলেন। দেশের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কোনও পরিকল্পনা?' জহর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে আসলাম বললেন, 'ফার্স্ট প্রায়োরিটি টু ভূপাল হকি। জানেন নিশ্চয়, আমাদের ভূপালে দুটো প্যারালাল হকি অ্যাসোসিয়েশন কাজ করে। একটার আমি প্রেসিডেন্ট। এবার অন্যটারও হব। সাড়ে চার বছরের মধ্যে ভূপালের হকির প্রভূত উন্নতি ঘটাবই। নেক্সট ইলেকশনের আগে, বাকি ছ'মাস দেশের খেলাধুলোর কথা ভাবব। সেভেন্টি নাইনে ওয়ার্ল্ড কাপে আমাকে যারা টিমে নেয়নি, সেই ল্যাং-মারা টিমের দু'একজনকে অবশ্য তার আগেই ফিনিশ করব।' ভারতীয় হকির উন্নতির জন্য চিন্তা করবেন না, ওটা ডিউ কোর্সেই হয়ে যাবে।'

রাত আটটা নাগাদ দিনের একুশতম চায়ের কাপ ধরে এবং ছত্রিশতম সিগারেট ধরিয়ে ভাবছিলাম, এবার আস্তানায় ফেরা যেতে পারে। কিন্তু সামনেই আর এক স্পোর্টিং লীডার— মাইকেল ফেরেরা। চা-সিগারেট ফেলে এগিয়ে গেলাম : 'গুড ইভনিং মিঃ ফেরেরা। আপনি তো কংগ্রেস আই-তে জয়েন করলেন। রুলিং পার্টি। এবার নিশ্চয় দেশের খেলাধুলো, পার্টিকুলারলি বিলিয়ার্ডস-এর জন্য অনেক কিছু করবেন?' কেতাদুরস্ত হাসি ছড়িয়ে 'মিঃ ওল্ড মঙ্ক বললেন : 'এখন থেকে সুভাষ আগরওয়াল চ্যাম্পিয়ন হবে, আমি পলিটিক্স করব। যে খেলায় যত পলিটিক্স, সেই খেলা তত পপুলার। ইন্ডিয়া ইজ আ পলিটিকাল কান্ট্রি। তিরিশের দশক থেকে ইন্ডিয়ান ক্রিকেটে পলিটিক্স, তাই এত পপুলার। পলিটিক্স বাড়ছে, পপুলারিটিও বাড়ছে। আপনি নিশ্চয় জানেন, বিলিয়ার্ডসকে পপুলার করার জন্য আমি বহু বছর ধরে লড়ে যাচ্ছি। পারছি না। এবার বিলিয়ার্ডস-এ পলিটিক্স আনব, গ্রামে গ্রামে পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে বিলিয়ার্ডস ছড়িয়ে দেব! টিভিতে বিলিয়ার্ডস লাইভ দেখানোর দাবি তুলব। মিনিস্টারকে বিলিয়ার্ডস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট বানাব।'

লক্ষ্য করিনি ফেরেরার পিছনেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন কারসন ঘাউড়ি। টেস্টে শতাধিক উইকেট এবং বাউন্সারে সাহেবদেরও ভয় দেখাতে পারার জন্য সুবিখ্যাত ঘাউড়ি বললেন, 'মাইক যা-ই বলুক, যতই লড়ুক, ক্রিকেটের মত পলিটিক্স আর পপুলারিটি বিলিয়ার্ডস-এ আনতে পারবে না। সালভে ইজ আউট অফ দ্য ক্যাবিনেট, বাট আই হ্যাভ কাম ইন টু পলিটিক্স। ক্রিকেটে পলিটিক্স আরও বাড়ানোর জন্য আমি একটা ক্রিকেট ম্যাগাজিন এডিট করাও শুরু করেছি। ভারতীয় ক্রিকেটে পলিটিক্স বাঁচাতে, সম্ভব হলে বাড়াতেই

হবে। সেজন্যই কংগ্রেস আই-তে এলাম। অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে টিকিট পাওয়ার কথা আছে। মিটিংয়ের জন্য সাদা টেরি-খদ্দরের কুর্তা-পাজামা-জহর কোট বানিয়ে ফেলেছি। লং লিভ পলিটিক্স, লং লিভ ইন্ডিয়ান ক্রিকেট।'

একদিনে চার-চারজন স্পোর্টিং লীডারের দেখা পেয়ে খিদে বেড়ে গিয়েছিল। সবচেয়ে কাছের ধাবায় রুটি-তড়কা খেয়ে আস্তানার পথ ধরতেই মনে হল, কপিলদেবকে পেয়ে গেলেই কাজ শেষ হয়ে যেত, কলকাতায় ফিরে দুপুরে অফিসে ভাত-ঘুম দেওয়া যেত। কপিলদেবের অপেক্ষায় আমাকে পাক্কা সাড়ে তিন দিন কাটাতে হল। শতাধিক সিগারেট, অর্ধশতাধিক কাপ চা, তিনটি বিনিদ্র দুপুরের পর তাঁকে পেলাম। আগের মতই তেজী এবং প্রাণবন্ত, শুধু গলায় বিশ্বকাপ জয়ের মালার বদলে চারপাশে রাজনৈতিক সঙ্গীরা। অলরাউন্ডার প্রায় ছুটেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, ধরে ফেললাম। টেস্টম্যাচের আগে সি এ বি সেক্রেটারিকে ধরার সময় এই শর্ট স্প্রিন্টটাই কাজে লাগে। শুনেছি, কপিলদেব মিনমিনে লোক পছন্দ করেন না। তাই তেড়েফুঁড়ে গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি তো রাজনীতিতে এলেন। খেলাধুলোর উন্নতির জন্য কী করবেন?' অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে আমার কাঁধে হাত (এই হাতে ছয় তো নস্যি) রাখলেন : 'এখনও এসে গেছি বলা যাচ্ছে না। তবে এলে, দাবি তুলব, যেন সব খেলা থেকে সিলেকশন কমিটির ব্যাপারটা তুলে দেওয়া হয়। পাবলিক ডাইরেক্টলি টিম সিলেক্ট করবে। গুড নাইট।'

সেই রাতেই এডিটর সাহেবকে ট্রাঙ্ককলে ধরলাম, 'এবার তাহলে ফেরা যায়। শুধু দুঃখ হচ্ছে, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স ইত্যাদির জন্য কোনও পলিটিকাল গডফাদার থাকছেন না।' এডিটর : 'কে বলল? অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সী আর অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট বিদ্যাচরণ শুক্লা পার্লামেন্টে আছেন না? এই দুটো লাইনের প্লেয়ারদের পলিটিকাল ফিউচার, সুতরাং জিরো। কিন্তু, আপনি ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন, ফর আ চেঞ্জ। চেষ্টা চরিত্র করুন, যদি বিজয় অমৃতরাজ আর প্রকাশ পাড়ুকোনকে ধরতে পারেন। ওরাও হয়ত পলিটিক্স-এ আসার কথা ভাবছে, আপনি 'স্কুপ' করার চেষ্টা করুন। পেয়ে যেতে পারেন, অপদার্থদের ভাগ্য ভাল হয়।'

সত্যিই তাই। সপ্তম সন্ধ্যায় একইসঙ্গে দুই রত্নকে পেয়ে গেলাম পালাম এয়ারপোর্ট রেস্টোর‍্যান্টে। টেবিলের চা ঠান্ডায় জমে গেছে, জমে গেছে সম্ভবত মুখের কথাও, প্রকাশ-বিজয় মাথা নিচু করে বসে আছেন। দুজনেই অতিশয় ভদ্রলোক হিসাবে বিখ্যাত। সুতরাং, নির্ভয়ে চেয়ার টেনে জানতে চাইলাম, 'আপনারা এখানে?' বিজয় বললেন, 'প্রকাশ বাঙ্গালোর যাচ্ছে, আমি ম্যাড্রাস।'

— 'এত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?'

— 'দেশের খেলাধুলোর উন্নতির জন্য আমাদের রাজনীতিতে আসতেই হবে।'

— 'আসুন, আসুন খবরটা ছাড়ুন!'

— 'আমরা মহা মুশকিলে পড়েছি। লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়, সব খেলোয়াড় কংগ্রেস

আই-তেই জয়েন করছে। রুলি পার্টি ছাড়া পলিটিক্স করার মানে হয় না। কিন্তু, আমরা দুজন কী করব? আমার স্টেটে এ আই ডি এম কে পাওয়ারে, প্রকাশের স্টেটে জনতা। সেন্ট্রালে কংগ্রেস-আই। আমাদের কাছে কোনটা রুলিং পার্টি বুঝতে পারছি না।'

ওঁরা ভাবতে থাকলেন। আমি আমার বাড়ির টেলিফোন নম্বর দিয়ে আবদার জানালাম, 'খবরটা দয়া করে সবার আগে আমাকে জানাবেন— স্কুপ।' এবং, এয়ারপোর্ট থেকে বেরতে বেরতে মনে মনে প্রার্থনা করলাম : ওঁরা যেন সেইদিনই ডিসিশন নেন, মাসের যে দিনটা আমার টেলিফোন চালু থাকে।

৮৭

কিছু কিছু ক্রিকেট, বুঝলেন কিনা, আমিও খেলেছি। পাড়ার টেনিস ক্রিকেটে দুটো হাফ এবং তিনটে কোয়ার্টার সেঞ্চুরি আছে আমার। ময়দানে সেকেন্ড ডিভিশন টিমে টুয়েলফথ ম্যান থেকেছি চারবার। এই বিপুল অভিজ্ঞতা এবং প্রবল কলমের জোরে এখন আমি দেশের টপ ক্রিকেট রাইটার হিসাবে পরিচিত হতে চলেছি; আসলে, হয়েই গেছি। দেশের ক্রিকেট-রসিকদের আমার কাছে প্রত্যাশা অসীম। জানিনা এই প্রত্যাশার যোগ্য আমি হতে পারব কি না। তবে, চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। ক্রিকেট-জনতার বিশেষ চাপাচাপিতে সম্প্রতি একটি কঠিন কাজে হাত দিয়েছিলাম, আজ তার ফল আপনাদের হাতে তুলে দেব। সদ্যসমাপ্ত ভারত-ইংল্যান্ড ক্রিকেট সিরিজে ভারতের অধিনায়ক সুনীল গাভাসকার কী কী ভুল করেছে, তার লিস্টি বানিয়েছি। আপনারা দেখুন, পড়ুন, উপভোগ করুন, হাঃ হাঃ হাসুন। অথবা, কাঁদুন।

এক : মাদ্রাজ টেস্টে টসে জিতে গাভাসকারের ফিল্ডিং নেওয়া উচিত ছিল। প্রথম দিন তাহলে ফস্টার খেলাটা শেষ করে দিতে পারত না। ভারত ফিল্ডিং করলে ফস্টার কিছুতেই সেদিন বল করার সুযোগ পেত না। ইনফ্যাক্ট, দ্বিতীয় দিনেও ফস্টার বল করার সুযোগ পেত না, আমরা বোলিং এবং ফিল্ডিং করেই যেতাম। তৃতীয় দিনের মরা পিচে ফস্টার কিছু করতে পারত না, পঞ্চম দিনের ভাঙা পিচে আমরা ইংল্যান্ডের ঘাড় ভাঙতাম।

দুই : বোম্বাই টেস্টের পর শিবরামকৃষ্ণাণের মুক্তকচ্ছ প্রশংসা করে গাভাসকাব ভুল করেছিল। বাচ্চা ছেলেটার মাথা ঘুরে যায় এবং বল ঘোরা বন্ধ হয়ে যায়। ক্যাপ্টেনের প্রশংসা করার সময় সংযম দেখানো উচিত, বিশেষতঃ প্রশংসিত ক্রিকেটারের বয়স যদি কম হয়।

তিন : কানপুর টেস্টে আজহারউদ্দিন টানা তৃতীয় সেঞ্চুরি করার পর গাভাসকার আজহারউদ্দিনের মুক্তকচ্ছ প্রশংসা না করে ভুল করেছে। বাচ্চা ছেলেটার মন খারাপ হয়ে গেছে এবং অস্ট্রেলিয়ায় সেজন্য ব্যাটিংও খারাপ হয়ে যাবে। ক্যাপ্টেনের প্রশংসা করার সময় উদারতা দেখানো উচিত, বিশেষতঃ প্রশংসিত ক্রিকেটারের বয়স যদি কম হয়।

চার : কলকাতা টেস্টে তৃতীয় দিন চায়ের সময়ই গাভাসকারের ইনিংস ঘোষণা করা উচিত ছিল। রবি শাস্ত্রীর সেঞ্চুরিটা না হলে ক্রিকেটের কোনও ক্ষতি ছিল না। ক্রিকেটের

মহত্ব রেকর্ড গড়ায় নয়, অনিশ্চয়তার সম্ভাবনায়। কে বলতে পারে, দেড়শ রানের মধ্যে ইংল্যান্ডকে প্রথম ইনিংসে শেষ করে দিয়ে ফলো অন করানো যেত না?

পাঁচ : কানপুর টেস্টের শেষ দিনে দেড় ঘণ্টা আর ম্যান্ডেটরি কুড়ি ওভার আগে গাভাসকারের ইনিংস ঘোষণা করা উচিত হয়নি। আজহারউদ্দিনের আর একটি সেঞ্চুরি না হওয়ায় ক্রিকেটের ক্ষতি হল। এই হাস্যকর উচ্চাশা নয়, ক্রিকেটে বেঁচে থাকে রেকর্ড। কে বলতে পারে, এই দ্বিতীয় ইনিংসেই আজহারউদ্দিন ডাবল সেঞ্চুরি পেয়ে যেত না?

ছয় : এটা পরিষ্কার, আমি লিখেওছি, কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন শেষের দিকে গাওয়ার ভারতকে রান উপহার দিচ্ছিল, যাতে তৃতীয় দিন ফিল্ডিং করতে না হয়। গাভাসকারের উচিত ছিল কপিল আর রবিকে আস্তে খেলতে বলা। গাওয়ারের চাল আমাদের মোটা মাথার অধিনায়ক বুঝতে পারেনি। কপিলদেবও বুঝতে পারেনি। দুজনের মাথাই যখন এত মোটা, ওরা ঝগড়া করে কেন?

সাত : কানপুর টেস্টের দ্বিতীয় দিন কপিলকে অনেক আগে ব্যাট করতে পাঠানো উচিত ছিল। যখন দ্রুত রান দরকার, তখন স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যানের বদলে একজন হার্ড হিটারই বেশি কাজে আসে। গাভাসকার বোধহয় কোনওভাবেই কপিলকে ওপরে তুলতে রাজি নয়।

আট : বাঙ্গালোর ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালে শ্রীকান্ত-গাভাসকার উনিশ ওভারে সত্তর রান তোলে। তখন দরকার ছিল দ্রুত রান। কিন্তু, কপিলকে চার নম্বরে পাঠানোর কী মানে হয়? যখন দ্রুত রান দরকার, স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যানদেরই আগে পাঠানো উচিত, কারণ তাদের হাতেই বেশি শট থাকে এবং তারা 'সেট' হতে কম সময় নেয়। গাভাসকার বোধহয় কপিলকে ওপরে তুলেছিল, মাটিতে ফেলার জন্যই।

নয় : কানপুর টেস্টে গাওস্কর বোধহয় আর একটা রেকর্ড করে ফেলল একশ ছেষট্টি ওভার পর নতুন বল নিয়ে। কপিলের ওপর আস্থা না থাকার ব্যাপারটা এমন ঢাকঢোল পিটিয়ে চাউর না করলেই চলছিল না?

দশ : গাভাসকার চাইলেই কানপুর টেস্টে দ্বিতীয় পেসার চেতন শর্মাকে টিমে নেওয়া হত। টেস্টে কেউ একটা পেসার নিয়ে ঢোকে— বিশেষ করে সেই পেসার যদি হয় কপিলদেব, যার এখন ফর্ম বলতে কিচ্ছু নেই? অযথা কপিলের ওপর অতিরিক্ত আস্থা রেখে টিমকে ডোবানোর মানে হয়?

এগার : অভিজ্ঞতাই, সে অভিজ্ঞতা যদি করুণ হয়— তবুও, একজন স্পিনারকে পরিণত করে। অদূর ভবিষ্যতেও ন্যাটা স্পিনার হিসাবে ভারতীয় দলে যখন রবি শাস্ত্রীই থাকবে, গাভাসকার ওকে এত কম ব্যবহার করল কেন? ম্যাচ কন্ডিশনে ক্রমাগত বল করে পরিণত হয়ে ওঠার সুযোগ কি আমাদের অন্যতম প্রধান স্পিনারকে দেওয়া উচিত ছিল না?

বার : আত্মবিশ্বাসই, সে আত্মবিশ্বাস যতই অস্থায়ী হোক, একজন স্পিনারকে বড় করে। আগামী দশ বছরে লেগ স্পিনার হিসাবে ভারতীয় দলে যখন শিবরামকৃষ্ণাণই থাকবে, গাভাসকার ওকে এত বেশি বল করিয়ে 'এক্সপোজ' করল কেন? নির্দয় ইংরেজ ব্যাটিং আক্রমণ থেকে সরিয়ে রেখে এই প্রধান স্পিনারের আত্মবিশ্বাস কি বাঁচিয়ে রাখা উচিত

ছিল না?

তের : প্রচন্ড মারের মুখে কী করে রান ওঠার গতি কমিয়ে রাখতে হয়, গাভাসকার জানে না। ইচ্ছা করে ওভাররেট কমিয়ে দিতে পারে না। ক্রিকেটে জয় শুধু ব্যাটিং-বোলিং-ফিল্ডিংয়েই আসে না।

চোদ্দ : কলকাতা টেস্টে আর একবার প্রমাণিত হয়েছে, গাভাসকার ভারতে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাকে খুন করছে। প্রথম প্রমাণ একাশিতেই পাওয়া গিয়েছিল, ফ্লেচারের টিমের সঙ্গে টেস্ট সিরিজে। বোম্বাইয়ে সিরিজের প্রথম টেস্টে জেতার পর ম্যাচ ড্র রাখার জন্য বাকি সব টেস্টে ওভার রেট কমিয়ে দিয়েছিল। এসব কায়দাকানুন সে ভালই জানে। দিলীপ দোশিই এক ওভার করতে সময় নিত ছয় মিনিট। এটা ক্রিকেট নয়। গাভাসকার এভাবেই ক্রিকেটকে খুন করেছে, বহু বছর ধরে।

পনের : বাঙ্গালোর ওয়ান ডে ইন্টারন্যাশনালে যশপাল এক গাদা 'নো' বল করে ম্যাচ হাতছাড়া করে। যশপাল এর আগে অনেক প্রথম শ্রেণীর ম্যাচে, এমনকি ইংল্যান্ড সফরেও, টাইট বোলিং করলেও এই ম্যাচে ওর হাতে বল তুলে দিয়ে গাভাসকার ভুল করেছে। ঘাই সাত ওভারে সাঁইত্রিশ রান দিয়েছে বলে এত ঘাবড়ে যাওয়া উচিত হয়নি। পরের চার ওভারে সাত রানও তো দিতে পারত।

যোল : টিমে থাকলে গাভাসকারকে ওপেনার হিসাবেই থাকতে হবে, কোনরকমে হলেও নতুন বলটা খেলে দেবার চেষ্টা করতে হবে। গাভাসকার ভয়ে এখন আর ওপেন করতে চাইছে না। নির্বাচকরা সরাসরিই বলে দিয়েছেন, টিমে থাকতে চাইলে 'ওপেন'ই করতে হবে। তবু, নাগপুরে গাভাসকার পাঁচ নম্বরে যায়, রাজপুতকে কাওয়াঙ্গ-ফস্টারের মুখে ঠেলে দিয়ে।

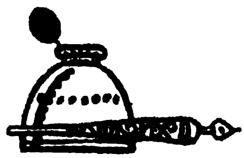
সতের : কটকে এত ভাল ওপেন করল শাস্ত্রী আর শ্রীকান্ত, তারপরই বাঙ্গালোরে গাভাসকার নিজে ওপেন করতে গেল কেন? আসলে নির্বাচকরা চাপ দিয়েছেন এবং সেই চাপে নতি স্বীকার করেছে আমাদের অধিনায়ক।

আঠার : গাভাসকার মানেই নেতিবাচক ক্রিকেট। ক্রিকেটে জয় পরাজয়ের চেয়েও বড় কথা হল মহান অনিশ্চয়তা। গাভাসকার নিরাপত্তা জমাট করতে গিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের কফিনে হাজার দশেক পেরেক পুঁতে ফেলেছে।

উনিশ : টেস্ট ক্রিকেট তারল্য ও উচ্ছ্বাসের জায়গা নয়। ওপেনিং ব্যাটসম্যানের কাজ হল ইনিংস মজবুত করা, ধীরে সুস্থে ব্যাট করা। গাভাসকার এই সিরিজে অযথা মারকুটে হতে গিয়ে অন্তত বার তিনেক উইকেট খুইয়েছে। এই লোকটি কি করে অন্যের দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলে?

কুড়ি : বোম্বাই টেস্টে এত সহজে জেতার পরও, প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড দলকে 'যথেষ্ট শক্তিশালী' বলে ভুল করেছিল গাভাসকার। ওর কথা বিশ্বাস করে মনে জোর পেয়ে যায় ইংরেজরা এবং তার ফল তো আমরা হাতে-হাতেই পেলাম। আমরা তো জানতাম, অধিনায়কের কাজ প্রতিপক্ষ দলের মনোবল নষ্ট করে দেওয়া। বোম্বাই টেস্টের পরই কি গাওস্করের বলা উচিত ছিল না যে 'আমরা ৫-০ টেস্টে সিরিজ জিতব?'

৮৮



ঢের ঢের সম্বর্ধনা সভা দেখিয়াছি, এরূপ কদাপি দেখি নাই। একসঙ্গে ছয় গুণীর সম্বর্ধনা— একই মঞ্চে, কিন্তু একজনের আসন অনেক উচ্চে। ঘন কাল মখমলে মোড়া মঞ্চে পাঁচটি সুদৃশ্য কিন্তু বেঁটে কেদারায় উপবিষ্ট বাংলার পাঁচ বিখ্যাত ও গম্ভীর ফুটবল-নির্বাচক।

আর তাঁহাদের পিছনে, অন্ততঃ সাড়ে তিন ফুট উপরে, উচ্চাসনে মিটিমিটি হাস্যোজ্জ্বল একমেবদ্বিতীয়ম অশোক মিত্র। তিনি একবার চশমা খুলিতেছেন, একবার পরিতেছেন। কখনও নাক চুলকাইতেছেন, কখনও কান, কিন্তু সর্বদাই মিটিমিটি হাসি ধরিয়া রাখিয়াছেন। সৌম্যদর্শন ভদ্র লোক, দেখিলেই মনে হয় সরল ও উদার, নিরীহ ও জ্ঞানী। এই দীপ্তিমান মহাপুরুষের নিচে আসীন পাঁচ নির্বাচক আপেক্ষিক উজ্জ্বল্যে বেধড়ক মার খাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও একেবারে ফেলনা নন। একদা ফুটবল মাঠে তাঁহারা উজ্জ্বল ছিলেন, কেহ নিয়মিত কেহ বা কদাচিৎ বাংলার পক্ষে খেলিয়াছেন। কিন্তু এহো বাহ্য। ফুটবল খেলিয়া কতটা নামই বা তাঁহারা করিতে পারিয়াছেন— তখন তো আর ব্যাঙের ছাতার মত খেলার পত্রিকা গজায় নাই। তখন রঙ্গিন ছবি ছিল না, লক্ষ লক্ষ টাকা ছিল না, বড়-জোর ব্যাঙ্কের চাকুরি এবং হাত-পা খরচ ছিল। সম্প্রতি বিদেশ বসু নামক এক নিরীহ ফুটবলারের মাথায় শৃঙ্খলার ডান্ডা মারিয়া এই 'গ্যাং অফ ফাইভ' বিস্তর নাম কিনিয়াছেন। বড় কাজ করিলে সাধারণ ব্যক্তিরা গর্বিত হয়, অসাধারণেরা লজ্জিত। এই পাঁচ গুণীর মুখে তাই লজ্জার লালিমা 'হেঁ হেঁ এ আর এমন কী করিতে পারিয়াছি'— এইরকম ভাব। ফুটবল কিলার্স সোসাইটি আয়োজিত এই মহতী সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করার জন্য মাননীয় দুগ্ধক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী মহোদয় নির্দিষ্ট সময়ের সওয়া এগার মিনিট পূর্বেই পৌঁছান। শঙ্খ ও উলুধ্বনি সহযোগে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জানান হয়। মাথায় সাদা পানামা ক্যাপ, বুকে কাল মখমলের ঝকঝকে ব্যাজ, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, গলায় রক্তজবার মালা, দুগ্ধক্রীড়ামন্ত্রীকে দেখাইতেছিল চমৎকার। অন্য কোন মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানান হয় নাই শুনিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত রাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় দীর্ঘ বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। একেবারে ঠোঁটস্থপ্রায়। তবে সম্প্রতি নিজের কনস্টিটুয়েন্সি লইয়া বিস্তর দুশ্চিন্তায় থাকায়

অনেক কথা ভুলিয়া যান। তাই টেনশনে ছিলেন। ভাষণটি নামাইয়া ফেলিতে পারিলেই বাঁচেন। 'হ্যালো মাইক টেস্টিং ওয়ান টু থ্রি' ইত্যাদি হইবার পর, সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের অন্যতম আহ্বায়ক, বাংলার ফুটবল দলের প্রাক্তন নির্বাচক, ভারতবর্ষের বিখ্যাত ফুটবল-সমঝদার, কালিঘাট ক্লাবের এবং আই এফ এ-র বিশিষ্ট কর্মকর্তা মৃণাল চক্রবর্তী মহাশয় মাইকে বাজিলেন : 'আজ বড় আনন্দের দিন। মানে, সন্ধ্যা। আপনারা জানিলেও জানিতে পারেন, আই এফ এ একটি অদ্ভুত নিয়ম চালু করিয়া আমার মত ফুটবল বিশেষ-অজ্ঞকে নির্বাচক হওয়ার সুযোগ দিয়াছিল। সেবার আমরা সুব্রত ভট্টাচার্যকে অধিনায়কত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলাম, প্রসূন ও চিন্ময়কে ভাল ফর্মে থাকা সত্ত্বেও বাদ দিয়াছিলাম। কিন্তু বর্তমান নির্বাচকদের মত নির্লজ্জ হইতে পারি নাই। আমরা সমালোচনার কাছে নতিস্বীকার করিয়া পরের বছর নিয়ম পাল্টাইয়া সরিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। সুব্রতকে অধিনায়কত্ব দিয়া আই এফ এ প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিল। কিন্তু এই নির্বাচকরা অকুতোভয়। ইহাদের কান বন্ধ, চোখ বন্ধ। প্রাক্তন ও বর্তমান ফুটবলারদের দাবিকে এই গুণীরা পাত্তা দেন না। মাইরি বলিতেছি, প্রাক্তন ফুটবলারদের কাছে এমন দুঃসাহসিক দাসত্ব আমরা আশা করি নাই। দেশের সব ফুটবলার ইহাদের মত স্বভাব পাইলে আর কোন সমস্যা থাকিবেনা, মাঠে সোনা ফলিবে, কোন ফুটবলার সুবিচার পাইবে না, আজকাল-এর গাড়লগুলি না খাইতে পাইয়া মরিবে। মরুক। উহাদের মরাই উচিত। মরিলে আর লিখিতে পারিবেনা, এইরূপ আশা হয়ত করা যায়।'

সভাপতি তথা দুগ্ধক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয় অতঃপর সুইচ অন করিলেন : 'অশোক মিত্র সম্পর্কে আমার নতুন করিয়া কিছু বলার নাই। এই প্রতিভাবান ও মিটিমিটি হাস্যবান মহামানবকে দেশবাসী সম্যক চিনেন। আজ আমি বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাই বাংলার পাঁচ কৃতী নির্বাচককে। শুধু 'অভিনন্দন' বলিলাম নাকি? এই মুশকিল। মাথায় দুশ্চিন্তা, শান্তি ঘটকের নাম মাথায় আসিলেই সব গুলাইয়া যায়। হ্যাঁ, 'সংগ্রামী অভিনন্দন।' উদ্যোক্তারা এই পাঁচজনকে অপেক্ষাকৃত বেঁটে চেয়ার দিয়া ঠিক করেন নাই। ইঁহারা অশোক মিত্রর তুলনায় কম গুণী নন। সম্বর্ধনা সভায় এই ভেদাভেদ নিতান্তই বুর্জোয়া ব্যাপার। আমি এজন্য উদ্যোক্তাদের কিঞ্চিৎ সংগ্রামী ধিক্কার জানাইতে বাধ্য হইলাম। দয়া করিয়া ব্যাপারটি সিরিয়াসলি লইবেন না। সম্প্রতি অনেক অভ্যাস পাল্টাইয়াছে, বক্তৃতায় একটু-আধটু বৈপ্লবিক রাজনীতির মিকশ্চার না দিলে মন্ত্রীত্ব বাঁচিবে না।

ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে একথা আমি গর্বের সঙ্গেই বলিতে পারি যে এই পাঁচজন নির্বাচক তথা প্রাক্তন ফুটবলারের খেলা আমি কদাচিৎ দেখিয়াছি। সময় পাই নাই। কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী হিসাবে এখন কর্মকর্তা ও নির্বাচকদের কীর্তিকলাপের দিকে নজর রাখার জন্য কিছু সময় দিতেই হয়। কি বলিব, আমি মুগ্ধ। রাজ্য সরকারে থাকিয়া অনেক কিছুই আমরা করিতে পারিতেছি না। সেজন্য চতুর্দিকে সোরগোল, সমালোচনার ঢক্কানিনাদ। কাগজওয়ালারা আমাদের জীবনী ছাপিতে পারে না? যাহাই হউক, এইসব সোরগোলে কখনও কখনও আমাদের কান পাতিতে হয়, মাঝেমাঝে সমালোচনা হজম করিয়া নিজেদের সংশোধিতও

করিতে হয়। কিন্তু এই পাঁচ নির্বাচক ভুল সংশোধনের তীব্র বিরোধী। সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে এই মহান সংগ্রামের জন্য এই 'গ্যাং অফ ফাইভ'কে আমি বৈপ্লবিক অভিনন্দন জানাই। (যে স্ক্রিপ্ট হইতে বক্তৃতা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে এইখানে 'হাততালি' পড়ার কথা ছিল। না-পড়ায়, হতচকিত এবং ক্রুদ্ধ দুগ্ধক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয় বসিয়া পড়িলেন। বসিবার পূর্বে তাঁহার মুখ দিয়া শুধু, এই কথাগুলি বাহির হইল) : ধুস্, এদেশে খেলাধূলার উন্নতি কখনও হইবে না।'

সভাপতি গুম মারিয়া যাওয়ায় সভার সহ-সভাপতি, প্রখ্যাত কর্মকর্তা ভূতনাথ বিশ্বাস মহাশয় পাঁচ সংবর্ধিত নির্বাচককে বক্তব্য রাখিবার অনুরোধ পেশ করিলেন। শৃঙ্খলা এবং ঐক্যের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত হিসাবে পাঁচ নির্বাচক কোরাসে বক্তৃতা করিলেন : 'আমরা সকলে একমত হইয়া বিদেশ বসুকে বাংলা দল হইতে বাদ দিয়াছিলাম। আই এফ এ সম্পাদক মান্যবর অশোক মিত্র আমাদের উপর এক ইঞ্চিও চাপ সৃষ্টি করেন নাই। আমরা কেউ কখনও কাহারও সঙ্গে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এব্যাপারে আলোচনা করি নাই। এই অন্যায়ের সমস্ত কৃতিত্ব আমাদের পাঁচজনের সমান-সমান। এই সম্বর্ধনা আমাদের অনুপ্রাণিত করিল। ভবিষ্যতে আরও অনেক অন্যায় করিব। একমত হইযাই করিব। 'আজকাল'-এর গাড়লগুলির লেখায় এখন যৎসামান্য চিমটিবোধ হয়। ধীরে ধীরে চর্ম পুরু হইবে, সহ্যশক্তি বাড়িবে, সম্বর্ধনার প্লাবনে গায়ে পলিমাটি জমিবে, লিখিয়া আমাদের কি করিবে?'অতঃপব সমবেত জনতার দৃষ্টি সেই উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত মিটিমিটি নক্ষত্রর দিকে নিবদ্ধ হইল। নির্বাচকদের স্কন্ধে পদযুগল স্থাপন করিয়া তিনি মাইকের পশ্চাতে অবতরণ করিলেন। হাস্যময় দিব্যকান্তি মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর ভুল উচ্চারণে গমগম করিল : 'আমি আজকাল পড়ি না, কিন্তু জানি যে 'আজকাল' ইয়েলো জার্নালিজম করে। ইয়েলো জার্নালিজম কাহাকে বলে, তাহা অবশ্য আমি জানিনা।

এই পাঁচ নির্বাচকও কমিটির বাইরে কাহারও সঙ্গে বিদেশ বসুর ব্যাপারে কথা বলেন নাই, কিন্তু কি হইয়াছিল তাহার ভিন্নতর বর্ণনা ঘনিষ্ঠ মহলে পেশ করেন। রতনে রতন চেনে। আমি খাসা নির্বাচক চিনিয়াছি। ফুটবলাররা কর্মকর্তাদের দাসত্ব করিবে— এইরকমই শিখিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি ময়দানে কিছু লোক 'অন্যায অন্যায়' করিয়া হামলা করিতেছে। ছাইভস্ম লিখিয়া লোক খেপাইতেছে। ফলে কিছু ফুটবলারের মাথা ঘুরিয়াছে। ভাস্কর গাঙ্গুলি না কি যেন নাম একজনের— সে বাংলার অধিনায়কত্বর লোভ ছাড়িয়াছে। অবস্থা যখন এতই করুণ, পাঁচ প্রাক্তন ফুটবলারের দাসমনোবৃত্তি এবং ব্যক্তিত্বহীনতায় আমরা নতুন আশার আলো দেখিতে পাইয়াছি। 'আজকাল' নয়, শেষ পর্যন্ত জিতিবে 'বিগতকাল'। জয় আই এফ এ! জয় অন্যায়!'

৮৯

বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা। আই এফ এ-র কর্তাদের মস্তকে বজ্রাঘাত। ফুটবল অনুরাগীদের হাহাকারে ময়দানের বাতাস ভারি, দুঃখের অশ্রুতে ঘাসের ডগা সিক্ত। অভাগা বাংলার, বাঙালির, বাংলা বাঙালির সাধের ফুটবলের কী হইবে? আই এফ এ-র মহামান্য সভাপতি মুক্তকণ্ঠে আবেদন করিলেন, সহ সভাপতিগণ পথসভায় ভাষণ দিলেন, সম্পাদক মহোদয় একচল্লিশটি টেলিফোন, সাতাশিটি হাতচিঠি এবং তেইশটি গোপন সভা খরচ করিলেন, তথাপি সেই চার মহামহিমের মনের চিড়া ভিজিল না। চারজনই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন: 'গতবছর বিস্তর হেনস্থা ঘটিয়াছে, আর বাংলার নির্বাচক হইব না। হইবনা, হইবনা, হইবনা— তিন সত্যি!'

চার প্রাক্তন ফুটবলার তথা প্রাক্তন ভালমানুষ তথা বর্তমান নির্বাচক তথা বর্তমান আরও অনেক কিছুর এবম্বিধ সিদ্ধান্তে বাংলার ফুটবল আকাশে সত্যসত্যই ঘনান্ধকার নামিয়া আসিল। পাখিদের কাকলি থামিল, শিশুদের উচ্ছ্বাস স্তব্ধ হইল, গৃহিণীদের জিহ্বা সংযত হইল, পুলিসেরা ঘুষ খাওয়া বন্ধ করিল— গোটা বঙ্গদেশে সে এক অস্বাভাবিক অভূতপূর্ব অরাজকতা। সংবাদপত্রও নীরব রহিল না। 'তোমা(দে)র আসন শূন্য আজি হে বীর পূর্ণ কর'— ইত্যাদি শ্লোগানে খেলার পৃষ্ঠাগুলি আবেদনমূলক গর্জন করিল। বিজ্ঞ ও সচেতন ক্রীড়ামোদীরা এই চার পাষাণ-হৃদয় নির্বাচক-ঈশ্বরের হৃদয় দ্রবীভূত করার জন্য চিঠিপত্রের কলমে বিস্তর কাঁদিলেন, কাঁদিয়া ভাসাইলেন। শেষতক অ্যাসেম্বলিতেও কথা উঠিল। খেলাধূলার মত গর্হিত ব্যাপারের সহিত চিরকালই সম্পর্কশূন্য, বিচক্ষণ ক্রীড়ামন্ত্রী বলিলেন, 'সল্ট লেক স্টেডিয়াম কমপ্লিট না হইলে এইরূপ সমস্যা আসিতেই থাকিবে।' চার প্রাক্তন ফুটবলার তথা প্রাক্তন ভালমানুষ তথা আর থাকিতে না চাওয়া নির্বাচকের সজল অভিমানের সহিত সল্টলেক স্টেডিয়ামের নির্মাণকার্য সমাপ্তির কি সম্পর্ক থাকিতে পারে--- এই সহজ ব্যাপারটি এক বিরোধী সদস্য বুঝিতে না পারায় মহামান্য ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁহাকে 'গবেট' বলিলেন। অতঃপর বিস্তর মারপিট। স্পিকারের ঝান্ডা এবং মার্শালের ঠান্ডা তৎপর হইল। মোট কথা, ব্যাপারটা বিধানসভায় সমুচিত গুরুত্ব পাইল।

কলিকাতার বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবিগণ (সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রতুল গুপ্ত, সন্তোষ ভট্টাচার্য, অম্লান দত্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অরুণ বাগচী প্রমুখ) সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় আট পয়েন্ট বোল্ডে আবেদন রাখিলেন, বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ফুটবলের স্বার্থে এই চারজনের মত পরিবর্তন করা উচিত। নির্বাচিত কমিটিতে পাঁচজনের থাকার কথা, গত বছরের একজন অন্যদের ডুবাইয়া পদত্যাগ করিয়াচিলেন। তাঁহাকে আই এফ এ একশ পনের বৎসরের জন্য সাসপেন্ড করিয়াছে, এই সময়ের জন্য কোন 'সুবিধাভোগী' কমিটিতে তাঁহাকে দেওয়া হইবে না। তাঁহার বদলে একজন যোগ্য নির্বাচককে পাওয়া গিয়াছে, যিনি একাধারে প্রভূত নামী এবং সুবিধাবাদী। যে কোন প্রশ্নে জবাবে তাঁহার ঠোঁটের ডগায় 'নো কমেন্টস' ঝুলিতে থাকে, যদিচ একান্ত আলোচনায় তিনি সর্বদা এসট্যাবলিশমেন্টের ওকালতি করেন। তাঁহার 'নো কমেন্টস'-এর ক্ষয় নাই। একদা একটি সাক্ষাৎকারে পরপর সাতটি 'নো কমেন্টস' বলিবার পর তিনি এক কান্ডই বাঁধাইয়াছিলেন। ক্রমাগত 'নো কমেন্টস' শ্রবণে বিরক্ত সাংবাদিক অষ্টম প্রশ্ন করিয়াছিলেন— 'আপনার পিতার নাম কী?' সদ্য মনোনীত নির্বাচক মহোদয় নাকি ঝোঁকের মাথায় এক্ষেত্রেও বলিয়াছিলেন 'নো কমেন্টস'। শয়তান রিপোর্টার এই প্রশ্নোত্তর দিয়াই 'হেডিং' প্রস্তুত করিয়াছিল।

কিন্তু, আসল কথা হইল, বাকি চার নির্বাচকের কি হইবে? ওই চারজন রাজি না হইলে কে কর্মকর্তাদের পায়ে তেল মালিশ করিবে? কে যোগ্য ও নিরীহদের বাদ দিয়া শৃঙ্খলা ও নিরপেক্ষতার বুলি কপচাইবে? বাংলার ফুটবলকে রসাতলে পাঠাইবার মহান চক্রান্তে কর্মকর্তাদের সঙ্গী কেইবা হইবে?

শেষপর্যন্ত অসহায় আই এফ এ বিশ্বনাথ দত্ত মহাশয়ের শরণাপন্ন হয় এবং তিনি একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠনের উপদেশ দেন। উপদেষ্টা কমিটিতে তিনজন সদস্যকে রাখা হইল। একজন প্রবীণ ফুটবলার, একজন ক্রীড়া সাংবাদিক এবং একজন আই এফ এ কর্মকর্তা। সমস্যা সমাধানের উপায় খোঁজার দায়িত্ব এই কমিটির উপরই অর্পিত হইল। প্রবীণ ফুটবলার ময়দানে সর্বজনশ্রদ্ধেয়, তাঁহার নাম নিয়া কোন প্রশ্ন নাই। কর্মকর্তাটিও তালেবর, তদুপরি ব্যক্তিগত আক্রোশে খ্যাতিমান। বিদেশ বসুকে বাদ দিবার জন্য তাঁহার মিথ্যা রিপোর্ট কাজে লাগিয়াছিল। নীলেশ সরকার পদত্যাগ করায় তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন, কেননা একদা নীলেশ সরকার তাঁহাকে নাকি এক ম্যাচে আট গোল মারিয়াছিলেন। হ্যাঁ, তিনি গোলকিপার ছিলেন! কিন্তু, তৃতীয় সদস্য হিসাবে বাবুরাম সাপুড়ের নাম ঘোষিত হওয়ায় সকলেই বিস্মিত হইলেন। আই এফ এ সম্পাদক বিবৃতি মারফত জানাইলেন যে যোগ্যতর একশ সাতাশজন সাংবাদিক ব্যস্ততার কারণে কমিটির সদস্য হইতে রাজি না হওয়ায় একজন অখ্যাত সাংবাদিককে কমিটিতে নিতে হইল।

কমিটিতে প্রথম সভাতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হইল, তিন সদস্য একযোগে ওই চারজনের সঙ্গে কথা বলিবেন। তাঁহাদের সমস্যা অনুধাবন করিবেন। সম্ভব হইলে বিহিত করিবেন।

প্রথমে সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় আর থাকিতে না চাওয়া নির্বাচকের অফিসে যাওয়া হইল।

তিনি আমাদের জন্য চা বলিলেন, কেক বলিলেন, হয়ত আরও কিছু বলিতেন— কিন্তু আমরা তাহার আগেই প্রশ্ন করিলাম, 'আমাদের এভাবে ডুবাইয়া ভাসাইয়া চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন, কেন?' শ্রদ্ধেয় প্রাক্তন। 'চিরকাল কি আমরাই ডুবিব? গতবছর যখন হেনস্থা হইতেছিলাম, লোকাল ট্রেনে গালিগালাজের গ্রেনেড সহ্য করিতেছিলাম আপিসে সহকর্মীদের অসহ্য 'আহা' 'উহু' শুনিতেছিলাম, তখন আপনারা কোথায় ছিলেন? আমি আর কিছুতেই থাকিব না। বহুদিন ধরিয়া 'আর থাকিব না, এবার মক্কায় চলিয়া যাইব' জাতীয় বৈরাগ্যধর্মী ডায়ালগ ঝাড়িতেছি, এবার না ছাড়িলে আর মান থাকিবে না। তদুপরি শুনিতেছি, এবার ক্লাবেরও নির্বাচক হইতে হইবে। কতদিকে গালি হজম করিব?'

অনমনীয় প্রাক্তনের অফিস হইতে বিফলমনোরথ হইয়াই ফিরিতে হইল। কিন্তু, গঙ্গাতীরে হতাশা কাটাইবার জন্য যাওয়ার পথেই একসঙ্গে দুই প্রাক্তন গোলরক্ষক তথা বর্তমানে আর-না-থাকিতে চাওয়া নির্বাচকের সহিত দেখা হইল। কিঞ্চিৎ দূর হইতেই দেখিয়াছিলাম একটি ঝকঝকে পুস্তক নিয়া দুজনই বিগলিত হাস্যবিনিময় করিতেছেন। কি ব্যাপার? শেষ পর্যন্ত এই বয়সে ইহাদের কি বিদেশি ফুটবলগ্রন্থ পাঠ করিবার বদভ্যাস জন্মাইল নাকি? কাছে গিয়া দেখি— 'গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস।' লেটেস্ট এডিশনে দুজনের নাম একত্রে উঠিয়াছে। পৃথিবীর ফুটবল-ইতিহাসে এই প্রথম নাকি একটি নির্বাচন কমিটিতে একসঙ্গে দুইজন গোলকিপারের স্থান হইয়াছে!

দুইজনই খুব ভাল মুডে থাকায় কথা বলিতে সুবিধা হইল। কোনরকম ভনিতা ছাড়াই প্রশ্ন ছুঁড়িলাম : 'থাকিব না, থাকিব না— বলিয়া কেন এত ঝামেলা পাকাইতেছেন?' অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ বলিলেন, 'আমি সব কিছু লিখিয়া রাখি, কিন্তু যথাস্থানে যথাসময়ে বলিতে পারি না। বাড়িতে ফিরিয়া সেজন্য, বুক ফাটে, পেট ফোলে, নিদ্রা পলায়ন করে। গত বছর প্রথম সভার খবর আমাকে দেওয়া হয় নাই, দ্বিতীয় সভায় গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ তুলিতে দেওয়া হয় নাই, তৃতীয় সভার আগেই টিম একেবারে টাইপ করা হইয়া গিয়াছিল। কতকিছু নোট করিয়াছিলাম, কত কিছু বলার ছিল, সবই পেটে থাকিল। অবশ্য 'গিনিজ বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস' শুনিতেছি খুব নামকরা পুস্তক, তাহাতে নাম উঠিল,এই সান্ত্বনা, কিন্তু আর পেট ফুলাইবনা, বুক ফাটাইব না, ঘুম নষ্ট করিব না।'

স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রাক্তনের বক্তব্য জলের মত পরিস্কার : 'আমি সাতে পাঁচে নাই। কোন কথা বলি না। কমিটির সভায় না, বাহিরেও না। শুধু ট্রায়ালের সময় মাঝেমাঝে আর এক গোলকিপার-সিলেক্টরের সঙ্গে একান্ত আলোচনা করি। সেই আলোচনার বিষয়বস্তু কেহ জানে না, কারণ আমরা কখনও তাহা ফাঁস করি নাই। হলফ করিয়া বলিতে পারি, আমি সিলেকশন কমিটির মিটিংয়ে বা কোথাও বিদেশের বিপক্ষে কোন কথা বলি নাই, পক্ষেও কোন কথা বলি নাই। কিন্তু আমি শান্তিপ্রিয় লিডারভক্ত মানুষ। আমাদের লিডারের কাছে যান। সে রাজি হইলে, আমরা সকলেই থাকিতে রাজি হইব।'

অতএব, অতঃপর দুরু দুরু বক্ষে সেই দেশবন্দিত নেতার নিকট গেলাম। তিনি তখন সঙ্গীতসাধনায় মগ্ন। প্রবীণ ফুটবলার তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন, কর্মকর্তা মহোদয়

ঘাড়ে হাত রাখিলেন, আমি পদতলে বসিয়া সঙ্গীতরসে নিমজ্জিত হইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিলাম। অনেকক্ষণ পর তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিল। 'হ্যাত' বলিয়া কাঁধ ঝাঁকাইয়া কর্মকর্তা মহোদয়ের হাত সরাইলেন প্রবীণ ফুটবলারকে বিনয়হাস্যে নিশ্চিত করিলেন এবং আমার দিকে শীতল কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া প্রশ্ন করিলেন : 'মহাশয়দের আগমনের হেতু?' বুঝিলাম, হেতু সম্পর্কে ইতিমধ্যেই অবহিত হইয়াছেন। ধীর, কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ী কণ্ঠে বলিলাম, 'যে যা খুশি বলুক, বাংলার ফুটবলের স্বার্থে আপনার বিদায় নেওয়া চলিবে না। চিকিৎসাশাস্ত্রেও এমন সুপণ্ডিত নির্বাচক আর কোথায় মিলিবে?' প্রাক্তন ফুটবলার তথা বর্তমান গায়ক তথা আর থাকিতে না চাওয়া নির্বাচকের মুখমন্ডল ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করিল। প্রচন্ড ক্রোধে উঠিয়া কহিলেন, 'আর একবারও এই অনুরোধ উচ্চারণ করিবেন না।'

—'কেন?'

—'করিলে', গলা সপ্তমে চড়াইয়া বলিলেন, 'থাকিতে রাজি হইয়া যাইব।'

৯০

সব পথ আজ মিশেছে, মিলেছে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে— বাংলায় যাকে বলা হয় সল্ট লেক স্টেডিয়াম। বাস, টেম্পো, রিকশা, ঝাঁকা মুটে— যাবতীয় পরিবহণের সাহায্য নিয়ে এবং অধিকাংশই পদব্রজে ধাবমান যুবাক্রীর দিকে। সব খবরের কাগজে ঢাউস বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, আকাশবাণী ও দূরদর্শন মারফত ঢ্যাড়া পেটান হয়েছে, মুখে মুখে বাসে ট্রামে পাড়ায় পাড়ায় এই বার্তা ছড়িয়ে পড়েছে যে পয়লা এপ্রিল, সোমবার, সন্ধে সাড়ে ছ'টায় আই এফ এ এক অভূতপূর্ব বিজয়োৎসবের আয়োজন করেছে। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধক— মাননীয় রাজ্যপাল উমাশঙ্কর দীক্ষিত। সভাপতি— মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি— মাননীয় সর্বভারতীয় ফুটবলমোহান্ত খলিফা জিয়াউদ্দিন।

আলোকসজ্জা সাবকমিটিতে ছিলেন কলকাতার তিনটি বিশাল কালিপুজো কমিটির কর্তারা। পরিণত শিশু এবং অপরিণত প্রাপ্তবয়স্করা মোহিত হলেন আলোয় আলোয় হাতির সাইকেল নৃত্য, ঘোড়ার তলোয়ার খেলা, মুরগির ডিম পাড়া, গরুর জাবর কাটা, পুলিসের ট্র্যাফিককন্ট্রোল, দর্শকদের কমলালেবুর খোসা ছোঁড়া— ইত্যাদি রোমহর্ষক দৃশ্য। সকলেই একবাক্যে মানছেন, স্মরণকালের মধ্যে কলকাতায় এমন তুলকালাম কান্ড আর ঘটেনি। সবাই খুশি। শুধু রাজ্যপাল মহোদয়কে কেমন যেন চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল। তিনি এক দৃষ্টিতে বৃদ্ধ গরুর জাবর কাটার আলোকসজ্জার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

প্রথমে মাল্যদান। বিশাল সাইজের মালা, সম্ভবত ওগুলি কৃতি হাতিদের গলায় পরানো হয়। আজ অবশ্য মাননীয় উদ্বোধক, সভাপতি এবং প্রধান অতিথির গলাতেই তাঁরা বিশাল মালারা উঠলেন। রাজ্যপাল এবং ফুটবল-মোহান্ত মহোদয় নামলেন, নুয়ে পড়লেন, কিঞ্চিৎ। এই বয়সে, এত ভারি মালা সয়না। তবু ভারি মালা। আমৃত্যু পাবলিক লাইফে থাকার আনুষঙ্গিক জ্বালা। শুধু ক্রীড়ামন্ত্রী সোজা থাকলেন, তাঁর মালা-টেকিং কেরিয়ার সবে শুরু হয়েছে। উদীয়মান নক্ষত্র। এখনও অন্ততঃ চল্লিশ বছর খেলার আশা রাখেন, সভায় সভায়, মঞ্চে মঞ্চে।

উদ্বোধন করার আগে মাননীয় রাজ্যপাল মহোদয় জেনে নিলেন, কেন এই বিশাল

সভার আয়োজন করা হয়েছে। ফুটবল বড় কঠিন বিষয়, তাই তিনি বেশি বোঝার চেষ্টা করলেন না। চমৎকার স্বদেশী ইংরেজিতে তিনি বললেন, 'বাংলা খুব সচেতন রাজ্য। ফুটবলও খুব ভাল খেলা। এই রাজ্যের রাজ্যপাল হয়ে তিনি খুশি। ফুটবল সংক্রান্ত অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হতে পেরে তিনি গর্বিত। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর মহান নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে, বাংলা এগিয়ে চলবে, ফুটবলও এগিয়ে চলবে। জয়হিন্দ।'

সোয়া সাতটায় নিখিলবঙ্গ বন্ধনশিল্পী সঙ্ঘের একাদশ সম্মেলনের প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধান আতিথ্য গ্রহণের কথা থাকায় তাঁর তাড়া ছিল। আই এফ এ-র তিনজন স্বেচ্ছাসেবক এবং রাজ্য সরকারের তিনজন অনিচ্ছাসেবক তাঁকে মঞ্চ থেকে নামায় সাহায্য করলেন।

মাননীয় সভাপতির সংগ্রামী অনুরোধে মাইকে এলেন মাননীয় প্রধান অতিথি খলিফা জিয়াউদ্দিন : 'ভারতীয় ফুটবলে বাংলার অবদানের কথা আমরা চিরকালই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই রাজ্য আমাদের এম দত্তরায়কে দিয়েছে, আরও কত জনকে দিয়েছে, এমনকি কয়েকজন ফুটবলারকেও দিয়েছে। বাংলার বিরুদ্ধে, বাংলার ফুটবলের বিরুদ্ধে আমাদের একটাই অভিযোগ ছিল। বছরের পর বছর জিতে আপনারা সন্তোষ ট্রফিকে আপনাদের স্থায়ী সম্পত্তিতে পরিণত করতে চাইছিলেন। বাংলার মত সচেতন রাজ্যের কাছে এই স্বার্থপরতা আমরা আশা করিনি। আপনাদের গর্ব, এখন আমাদেরও গর্ব, অশোক মিত্র মহাশয় আমাদের কথা দিয়েছিলেন, তিনি এই স্বার্থপরতার অবসান ঘটাবেন, প্রাণপণ পরিশ্রম করে বাংলার ফুটবলের বারটা বাজাবেন। মাত্র পাঁচ বছরের চেষ্টায় তিনি তাঁর মহানব্রতে যেভাবে সাফল্য অর্জন করলেন, ভারতীয় ফুটবলের ইতিহাসে তা প্ল্যাটিনামাক্ষরে লেখা থাকবে। গত পাঁচ বছরে বাংলা সন্তোষ ট্রফি জিতেছে কুল্যে দেড়বার। উন্নতির এই ধারা বজায় থাকলে অদূর ভবিষ্যতেই পাঁচে শূন্য হওয়া সম্ভব। আপনাদের সদিচ্ছার জন্ম হোক।'

সভাপতি তথা ক্রীড়ামন্ত্রী মহোদয় আবেগমথিত কণ্ঠে অশোক মিত্রর নাম ঘোষণা করলেন। টাই এবং টাকে হাত বুলিয়ে তিনি উঠলেন। মুখে ফোটালেন আই এফ এ-মোহিনী হাসি। কাল ফ্রেমের চশমার পিছনে চোখ দুটি সাফল্যের আনন্দে চিকচিক, জনতাও উদ্বেল। জনসমুদ্রে বেদনার তরঙ্গ— ইনি আর সেক্রেটারি থাকছেন না। যেন গাভাসকারের হাতে বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ, সামনে মাইক। 'আজ দুপুর থেকেই শুধু একটা কথা ভাবছিলুম, আমার সেক্রেটারিগিরির শেষ সময়ে সিলেক্টর আর ফুটবলাররা মিলে যে উপহার তুলে দিল, তার চেয়ে ভাল বিদায়-উপহার আর কি হতে পারে? আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। না, আর সিদ্ধান্ত পাল্টানোর প্রশ্ন ওঠে না। তবে, আমি বাংলার ফুটবলকে সেরা করে যেতে চাই, সেক্রেটারি হিসাবে না হলেও একজন সাধারণ কর্মকর্তা হিসাবে, যদি অবশ্য আমাকে সুযোগ দেওয়া হয়।

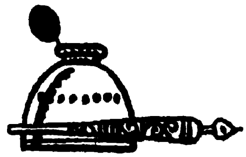
গত পাঁচবছরে আমাকে বারবার সাংবাদিকদের অন্যায় সমালোচনার শিকার হতে হয়েছে। তবু, বাংলার ফুটবলের স্বার্থে আমি কাজ করে গেছি। এক মুহূর্ত বসে থাকিনি। তার ফলও পাওয়া গেছে হাতে নাতে। আমার আমলে, পাঁচবারের মধ্যে তিনবারই

বাংলাকে ফাইনালের আগেই ঘরে ফিরিয়ে আনতে পেরেছি। একবার লিগ শিল্ড বন্ধ করে দিতে পেরেছি। একজিবিশন ম্যাচের ঝামেলায় ষোলজন মারা গেছে আমার টাইমেই। প্রত্যেক দিন দুপুরে আই এফ এ অফিসে এবং সন্ধ্যেয় এরিয়ান টেন্টে বসে ছক করেছি, কিভাবে ময়দানে গড়াপেটার চাষবাস বাড়ানো যায়। তিরাশিকে আপনারা তার ফলও পেয়েছেন, দুই ম্যাচে একশ বিরানব্বই গোল। ইন্টারন্যাশনাল নিউজ। আমার সময়েই কলকাতা মাঠে দর্শক কমেছে, সন্তোষ ট্রফির আসরে মাছি তাড়ানো হয়েছে। এসব কৃতিত্ব আমি একা নিতে চাই না। আমার সঙ্গে, আমার পাশে, আমার পিছনে, আমার ঘাড়ে—আমার সর্বত্র থেকে যাঁরা আমাকে সাহায্য করেছেন, কঠিন কাজকে সহজ করে দিয়েছেন, তাঁদের আজ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। খলিফা জিয়াউদ্দিন সাহেব আমাকে স্নেহ করেন, তাই এত প্রশংসা করলেন। না, না, হেঁ হেঁ, না, আমি এত প্রশংসার যুগ্যি নই। তবে, যা শিখেছি, তাঁর কাছ থেকেই শিখেছি। ইন্ডিয়ার ফুটবলকে ডোবানোর জন্য তিনি যে যে রাস্তা নিয়েছেন, বেঙ্গলের ফুটবলকে লাটে তোলার জন্য আমিও সেই সেই রাস্তাতেই গেছি। আজ আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাতে চাই আমার প্রিয় সিলেক্টর ভাইয়েদের, আমার শেষ কাজটা এদের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই করা যেত না।'

সভাপতি মহোদয়ের পর অনুরোধে মাইকে এলেন স্বনামধন্য 'সুকুমার সমাজপতি (স্কুপ : জিয়াউদ্দিন সাহেব শ্রীযুক্ত সমাজপতিকে অল ইন্ডিয়া সিলেকশন কমিটির আনঅফিসিয়াল চেয়ারম্যান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) : 'উচিত কথা বলি বলে আমার অনেক শত্রু। আমি নিজের মতে চলি, আমার চেয়ে বেশি বোঝে কে? আজকের সভায় পূর্ববর্তী বক্তাদের 'বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। তাঁরা দাবি করেছেন, 'বাংলার ফুটবল ডুবে গেছে। আমি পাল্টা দাবি তুলছি : বাংলার ফুটবল উঠছে, শুধুই উঠছে। এবার বারাণসীতে আমাদের টিম যা খেলেছে সেজন্য আনঅফিসিয়াল চিফ সিলেক্টর হিসাবে আমি গর্বিত। মধ্যপ্রদেশের মত শক্তিশালী টিমকে আমরা ছয় গোলে হারিয়েছি। পাঞ্জাব আর মহারাষ্ট্রর মত দুর্ধর্ষ টিম, যারা ফাইনালে উঠেছে, তাদের কাছে আমরা হেরেছি মাত্র এক গোলের ব্যবধানে। আর ফলাফলই তো সবচেয়ে বড় কথা নয়। আমরা এবার ডিসিপ্লিনের অজুহাতে সম্ভাব্য ক্যাপ্টেনকে বাদ দিয়েছি, সেরা গোলকিপারকে বাদ দিয়ে পরে ডেকে প্রত্যাখ্যানের থাপ্পড় খেয়েছি, একজন কো-সিলেক্টরের রেজিগনেশন হজম করেছি, খবরের কাগজে মিথ্যা বিবৃতি দেবার চেষ্টা করেছি, পাল্টা লেখার চাবুকে ক্ষতবিক্ষত হয়েও মুখে হাসি ধরে রেখেছি। এসবের দাম অন্ততঃ ভাবীকাল দেবে। এখন অবশ্য অফিস বাজার করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে।'

অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যর নাম তিনবার ডাকা হল, তিনি আসেন নি। তাঁর নাকি ধারণা অনুষ্ঠানের পর সুকুমার সমাজপতি এই প্রতিবেদককে বলেন, 'নিশ্চিত জেনে রাখুন, নেক্সট ইয়ার এই অপরাধে মনাকে বেঙ্গল টিমে রাখা হবে না। ডিসপ্লিনারি অ্যাকশন।'

৯১



এবারের দলবদলের বাজার সবদিক দিয়েই অতুলনীয়। এই বাজারে যাঁরা থলি হাতে ঘুরেছেন, টপাটপ মাছ কিনে থলিতে ভরেছেন, যেসব মাছ থলি থেকে পিছলে বেরিয়েছে, আবার ফিরে এসেছে, আবার বেরিয়েছে, আবার...... ইত্যাদি, যাঁরা নানাভাবে এই উচ্চগ্রাম যাত্রার আসর জমিয়েছেন— সকলের কাছেই আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি আরও বেশি কৃতজ্ঞ, কারণ, রুই-কাতলা-কই-মাগুরেরা এবং মাছ-কিনিয়েরা— সবাই আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন ইয়োর্স ট্রুলি বাবুরাম সাপুড়ের সঙ্গে।

বুদ্ধির্যস্য, ফলং তস্য। যেখানে বুদ্ধি, সেখানেই ফল। আমি ঠিকঠাক বুদ্ধি খাটিয়ে একজন ফুটবলারের বাড়ির সামনে তাঁবু খাটিয়েছিলাম, হাতেনাতে ফল পেয়েছি। এবারের দলবদলের ক্রিম তুলে এনেছি। আসলে বুদ্ধিমান আপনারা, ঘরে বসে থেকেই মাত্র এক টাকা আশি পয়সা খরচ করে এই ক্রিম খাচ্ছেন। তা খান। আর সব বাঘা লেখকেরা যা সব ছাইভস্ম লেখেন, আমার লেখা পড়ে যতটুকু দাম উসুল হবার, হোক।

মডার্ন ডেকরেটর্সের সমীর রায়চৌধুরিকে ধন্যবাদ, বিশিষ্ট ফুটবলারের বাড়ির সামনে ছোট্ট ছিমছাম তাঁবুটি তাঁর সৌজন্যেই পেয়েছি। তাঁবুর মধ্যে ছিল ওয়াটারকুলার, মাঝে মাঝে মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালার জন্য। একটি স্পেশাল অ্যালার্ম ক্লক, যাতে দশ মিনিট অন্তর ঝনঝন হয়। ঘুমিয়ে পড়লে মুশকিল, ঘনঘন অফিসিয়ালরা আসা যাওয়া করেন, পাছে ঘুমিয়ে পড়ে কিছু মিস করি— তাই এই ব্যবস্থা। গোটা নাটক আপনাদের শোনাতে হলে টানা বছর দেড়েক সময় দরকার। আপনারা চাইলেও, সম্ভব নয়। আমার অন্য কাজ আছে। কিছু দৃশ্য দিচ্ছি, 'খেলা'র বিজ্ঞাপনের ভাষায়— 'উপহার দিচ্ছি।'

দৃশ্য এক : সকাল। ফুটবলারের বাবা বারান্দায় খবরের কাগজ পড়ছেন। ফুটবলার গেঞ্জি-পাজামায় সজ্জিত হয়ে একবার ঘর একবার বারান্দা করছেন। দাদা ঘর থেকে বারান্দায় এসে বাবাকে বললেন, 'সাড়ে আটটা তো বেজে গেল!' অভিজ্ঞ পিতা খবরের কাগজ কোলের ওপর রেখে আশ্বস্ত করলেন, 'আসবে, আসবে। কলকাতার রাস্তাঘাট!' ফুটবলার রোজ একবার অফিসে যায়, আজ যাবে না। আসবেন। আজ তাঁরা আসবেন।

কিন্তু, এখনও ক্লাব অফিসিয়ালরা আসছেন না কেন, সাড়ে আটটা বেজে গেল, কথা ছিল!

হঠাৎ, পিঁ-প, পিঁ-প। খয়েরি অ্যাম্বাসেডর। আঃ। কথা শুরু হল :

রিক্রুটিং অফিসার— একটু দেরি হল, আধ ঘণ্টা। আমাদের রিক্রুটিং কেরিয়ারে এটাই প্রথম লেট হবার ঘটনা।

বাবা : তাতে কি, তাতে কি। বসুন। চা, না ঠাণ্ডা? আপনাদের কথা মেলা শুনেছি, এই দেখলাম।

প্রথম কর্মকর্তা : এখনও কিছুই দেখেননি, মেসোমশাই। এবার আপনার ছেলে আমাদের ক্লাবে সই করুক, তখন সব দেখবেন। তাহলে, কাজের কথা শুরু হোক?

দাদা : আপনাদের কাছে এসব নিয়ে কী বলব? টিমটা ভালভাবে করুন। ওর জন্য চিন্তা করবেন না। টাকাটা বড় কথা নয়। টাকা......

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : হ্যাঁ, টাকা ভালই দেব। থোকে এক লাখের কম দেওয়া যায় না। খুশি তো?

বাবা : হ্যাঁ, হ্যাঁ। ও সই করবে। নিশ্চয় করবে।

দুই কর্মকর্তা চলে যাবার পর ফুটবলার আমাকে ডাকলেন, 'চা খেয়ে যান বাবুদা।' দাদাকে বললাম, 'কথাবার্তা তো ও নিজে বলল না, সব আপনারাই বললেন।' ফুটবলারের বাবা বললেন, 'নিশ্চয়, ফুটবলটা ছেলে খেলছে, কিন্তু এটা ফ্যামিলি বিজনেস, সবাইকে মিলেমিশে দেখতে হবে। ফরেনে বড় বড় ফুটবলারদের শুনেছি সেক্রেটারি-সেক্রেটারি থাকে, এখানে ওসব পোষায় না। তাই আমাদেরই করতে হয়, থ্যাঙ্কলেস জব।'

—'যাক, ছেলের ব্যাপারটা ফাইনাল হয়ে গেল!'

—'ধ্যার মশাই। এই তো সবে শুরু। নিলাম শুরু হল, এক লাখ দিয়ে। এবার উঠবে, উঠবে......উ...।'

দৃশ্য দুই : অন্য ক্লাবের তিন কর্মকর্তা হাজির, সন্ধে সাতটা। সেই চা না ঠাণ্ডা? ফুটবলার সজ্জিত— গেঞ্জি-পাজামার বদলে টি-শার্ট আর জিনস-এ। বাবা টেলিভিশন সেটের সামনে।

প্রথম কর্তা : হেঁ হেঁ, হুঁ হুঁ, আমাদের ক্লাবের ট্র্যাডিশনই আলাদা। আমরা প্লেয়ার নিয়ে টানাটানি করি না, গায়ের জোর দেখাই না, মেছোবাজার বসাই না। ভদ্দরলোকের এক কথা, আপনার ছেলে সোনার টুকরো, সত্তর হাজার টাকা দেব, এই হল কথা।

বাবা চুপ। দাদা চুপ। ফুটবলার চুপ। টিভিও চুপ! শেষ পর্যন্ত বাবা নীরবতা ভাঙলেন : 'ওরা এক লাখ বলেছে।'

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : এক লাখ? ইয়ে, আমাদের ট্র্যাডিশন। আমাদের বাজেট। আমাদের......

তৃতীয় কর্মকর্তা : ঠিক আছে, ঠিক আছে। ওটার বাবস্থা হয়ে যাবে। ক্লাব যা দেবার দেবে, বাকিটা আমি দেখব। এক লাখেই ডান।

বাবা : আমার ছেলে তো আপনাদের টিম ছাড়া অন্য কিছুই ভাবতে চায় না। কোন

চিন্তা করবেন না।

দৃশ্য তিন : পরদিন সকাল। আবার প্রথম ক্লাবের দুই কর্মকর্তা, পাঁচ হাফ-কর্মকর্তা। নীল অ্যাম্বাসেডর। দুই কর্তা কথা বলতে ঢুকলেন, বাকি পাঁচজন ছড়িয়ে ছিটিয়ে গাড়ির বনেট আর ডিকির ওপর, অনেকটা বেনসন হেজেস ফাইনালের পর ক্রিকেটারদের অডি-চড়ার ভঙ্গিতে।

প্রথম কর্মকর্তা : অনেক ফুটবলারের বাড়ি গেছি, এমন ফুটবল লাভার বাড়ি দেখিনি। এই বাড়ির ছেলে বড় ফুটবলার হবে না তো কে হবে?

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : আজকালকার ফুটবলারদের কথার দাম নেই। ওদের বাড়ির লোকেদেরও কথার ঠিক নেই। কিন্তু, আপনারা একেবারে অন্যরকম। ইয়ে, তাহলে অ্যাডভান্সটা কবে দিয়ে যাব? কত অ্যাডভান্স, পঁচাত্তর?

বাবা : এক লাখ।

প্রথম কর্মকর্তা : অ্যাঁ! পুরোটাই অ্যাডভান্স?

বাবা : না। অ্যাডভান্স এক লাখ। বাকি দশ হাজার পরে দেবেন, সুবিধা মতন। ক্লাবের ফান্ডের কথাটাও তো ভাবতে হবে।

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : গতকাল তো এক লাখে রফা হল।

দাদা : কাল ওরা এসেছিল, এক লাখই দিতে চায়।

প্রথম কর্মকর্তা : ঠিক আছে, ওই এক লাখ দশই দেব। কাল আসব, অ্যাডভান্স নব্বই হলে হয় না?

দাদা : না। মানে, একটা বিশেষ দরকারে এক লাখ......

প্রথম কর্মকর্তা : ঠিক আছে, ঠিক আছে।

দৃশ্য চার : সেই বিকেল। সাড়ে পাঁচটা। অন্য ক্লাবের দুই কর্মকর্তা, তিন কোয়ার্টার কর্মকর্তা। বাবা কফি খাচ্ছেন। দাদা ছাদের ওপর বসে আনমনে সিগারেটে রিং বানাচ্ছেন। ফুটবলার টেপ-রেকর্ডারে নাজিয়া হাসান শুনছেন।

প্রথম কর্মকর্তা : আপনার ছেলে আমাদেরও ছেলে, আমাদের ক্লাবের ঘরের ছেলে। কাগজগুলো উল্টোপাল্টা লিখছে, ও নাকি অন্য ক্লাবে খেলবে। আরে, সবাই কি আর শাটল কক? তাহলে, হাজার পঞ্চাশেক অ্যাডভান্স দিয়ে যাই?

দাদা : কী বলছেন মশাই? এক লাখ, এক লাখ।

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : দোব, দোব। এখন পঞ্চাশ নিন।

দাদা : এক লাখ অ্যাডভান্স। ওরা মোট এক লাখ দশ বলে গেছে। এই টাকাটাই দিলে আপনাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স।

প্রথম কর্মকর্তা : ঠি...ঠিক আছে। এক লাখ দশ। তবে অ্যাডভান্স আশির বেশি পারব না।

বাবা : এক লাখ।

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : (বাবার গলার আকস্মিক গাম্ভীর্যে থতমত খেয়ে) : আ-আচ্ছা, এক

লাখ।

দৃশ্য পাঁচ : তৃতীয় দিন প্রায়-দুপুর। বাবা স্নান সেরে দ্বিতীয়বার খবরের কাগজ পড়ছেন। দাদা সর্ষের তেল মাখছেন। ফুটবলার অফিস গেছেন। ছাদের কার্নিশে তিনটে শালিখ। থ্রি ফর হোয়াট ? প্রথম ক্লাবের একজন কর্মকর্তা এবং দুজন উদীয়মান ভলান্টিয়ার এলেন।

কর্মকর্তা : আপনাদের বাড়িতে এলেই শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মনে হয়, এখানেই বসে থাকি সারাদিন। খেলা, ক্লাব— এসব সামান্য ব্যাপার। সম্পর্কটাই আসল। অ্যাঁ, ইয়ে, ও কোথায় ? ওকে দেখছি না।

বাবা : অফিস।

কর্মকর্তা : অ্যাডভান্সটা কিন্তু আজই বিকেলে দিয়ে যাচ্ছি।

দাদা : একটা কথা ছিল। আপনারা লাকি—কে নিচ্ছেন ?

কর্মকর্তা : এখনও ঠিক করিনি।

বাবা : নিলে, আমার ছেলেকে পাবেন না। এক দাঁড়ে দুটো কাকাতুয়া বসে না।

কর্মকর্তা : বসে বসে। টাকা পেলে বসে।

দাদা : টাকাটাই কি সব ? তবে হ্যাঁ, ওই এক লাখ দশে হবে না, একটু বাড়াতে হবে। ওরা বড় চাপাচাপি করছে, আরও বেশি দিতে চাইছে। আপনারা বেশি অ্যামাউন্ট দিলে আপনাদেরই সুবিধে। যেই বলব, শুনে ওরা পালাবে।

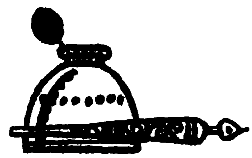
কর্মকর্তা : ঠিক হ্যায়। এবার টাকার শ্রাদ্ধ হচ্ছে, হোক। এক লাখ কুড়ি। গুড বাই। কাল বিকালে আসব।

দৃশ্য ছয় : দ্বিতীয় ক্লাবের কর্মকর্তারা এসেছেন। কথা বলা শুরু করার আগেই, প্রথম ক্লাবের কর্তারা এসে গেলেন। দুই ক্লাব মিলিয়ে চারটে অ্যাম্বাসেডর। ফুল, হাফ, কোয়ার্টার মিলিয়ে মোট সাতাশজন কর্মকর্তা। গাড়ির বাইরে অপেক্ষমাণ অধীর জনতা। দুই ক্লাবেরই ফ্ল্যাগ দুলছে। মাঝে মাঝে স্লোগান শোনা যাচ্ছে। আমার টেন্ট ডেইলি পেপারের রিপোর্টাররা দখল করে নিয়েছেন। ওটাই প্রেস সেন্টার। ফুটবলারের বারান্দার সামনে ছোট্ট কিন্তু চমৎকার মঞ্চ বানিয়ে দিয়েছে মডার্ন ডেকরেটার্স। মাইকে ঘোষণা করা হল, এবার শুরু হচ্ছে, সাইলেন্স প্লিজ!

গত কয়েকদিনে অনেক টেনশন গেছে। কাগজে চোদ্দরকম বেরিয়েছে। ফুটবলার সাত দিনে একচল্লিশ রকম স্টেটমেন্ট দিয়েছে। প্রথম ক্লাবের প্রতিনিধি মাইকে উঠে বললেন : 'এক লাখ একুশ।' দ্বিতীয় ক্লাবের কর্মকর্তা তড়াক করে লাফালেন : 'এক লাখ সাড়ে একুশ !' এইরকম চলতে লাগল। তৃতীয় ক্লাবের এক কর্তা হঠাৎ মাইকে উঠে 'এক লাখ ছাব্বিশ' হেঁকে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন। হাঁকাহাঁকি চলছে। ডাকাডাকি চলছে। জনতার চেঁচামেচি চলছে। বাবা মঞ্চের কোনায় ঘাম মুছছেন। দাদা আড়ালে সিগারেট ধরাচ্ছেন। ফুটবলার জল খাচ্ছেন। চারিদিকে থমথমে টেনশন। এই লেখা পাঠাচ্ছি স্পট থেকে— রাইট ফ্রম দি ব্যাটলফিল্ড। ডেসপ্যাচ পাঠানোর সময় পর্যন্ত দর

উঠেছে এক লাখ তেত্রিশ হাজার সাতশ আটাত্তর টাকা। শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াল, এই সংখ্যায় জানানো গেল না বলে দুঃখিত। শেষ খবরটা ডেইলি পেপারেই পড়ে নেবেন। এখন তো আমার টেন্টে সব রিপোর্টারই ঢুকে পড়েছে। আগের দৃশ্যগুলো এক্সক্লুসিভ, আর কেউ পায়নি।

৯২



সম্প্রতি সারা বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিক সঙ্ঘের জরুরি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল শৈলগঞ্জ মিরিকে। আপনারা জেনে আহ্লাদিত হবেন, 'খেলা'র পক্ষ থেকে এই উত্তমকেই (রীতি একটা আছে বটে, কিন্তু নিজেকে অধম বলার কোন মানে হয় না) নির্বাচিত করা হয়েছিল। এই পাগলা গরমে মিরিক ভ্রমণে উৎসাহ ছিল অনেকেরই, এডিটর সাহেব চক্ষুপাত করেননি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী। কিছু স্থানীয় তরুণ ঝাণ্ডাসহযোগে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন : তরুণ ক্রীড়ামন্ত্রী থাকতে প্রবীণ পূর্তমন্ত্রীকে এই সম্মান দেওয়া হল কেন? জবাব দাও, জবাব দাও! জবাব দেন সঙ্ঘের এক কর্মকর্তা : 'জ্যাকিদা নামকরা স্পোর্টসম্যান ছিলেন, এখনও আছেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রেস বক্সে এসেও বসেন। তাছাড়া ক্রীড়ামন্ত্রী এখন দুধ এবং যুভাক্রী (সল্টলেক স্টেডিয়াম) নিয়ে বেজায় ব্যস্ত।' বিক্ষুব্ধদের নেতাকে আমি কানে কানে আরও বললাম 'মশাই, জ্যাকিদার বিকল্প নেই। দেখেন না, ওনাকে কোন জার্নালিস্ট কখনও ফ্ল্যাট করতে পারেন না, উল্টে উনিই সবাইকে ফ্ল্যাট দেন।'

সম্মেলনের শুরুতেই সভাপতি মহোদয় বলেন : 'এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে পেরে আমি গর্বিত। আলোচনার বিষয় খুবই গভীর এবং গম্ভীর : 'কলকাতার ফুটবল এবং ফুটবলারদের আমরা কী চোখে দেখব?' এটা গভীর পরিতাপের বিষয় যে কিছু সংবাদপত্র এবং 'নির্বোধ ও রুচিহীন' খেলার পত্রিকা ফুটবলারদের বাঁশের মাথায় এবং ফুটবলকে লাটে তুলেছে। এরা অসাধারণ ক্লাব ফুটবলে লোক জমাতে পারছে না, এমনকি সামান্য ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলেও বিচ্ছিরি খেলছে। এই ফুটবল দেখা যায় না— হায়, তবু আমি মাঠে যাব। এই ফুটবলারদের মুখ দেখা উচিত নয়— হায়, তবু আমি এদের মধ্যে কারও কারও 'হাফ গডফাদার' হব। যাই হোক, এই জঘন্য ফুটবল এবং ফুটবলারদের নিয়ে কী করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা এবার শুরু হবে। আশাকরি, আপনারা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবেন।'

বিস্তর আলোচনা হল। কিছুটা মিরিকের কোমল আবহাওয়ার গুণে, কিছুটা সাংবাদিকদের চিন্তার ঐক্যের কর্মে, তর্কবিতর্ক বাধেনি বললেই হয়। এক মধ্যবয়সী

সাংবাদিক খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় একটা আইটেমে কী যেন কাটাকুটি করছিলেন। পাশে বসে দেখলাম, 'জন্ডিস ছড়াচ্ছে : কী করবেন, কী করবেন না।' তিনি বললেন, 'ভায়া, কম খাটনিতে বেশি কাজ, এই হল গিয়ে সাকসেসের গোপন রহস্য। এই আইটেমটাতেই একটু কাটাকুটি করে আজকের মূল প্রস্তাব তৈরি করে ফেললাম।' অতঃপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্তাব পেশ করলেন : 'কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের উদ্দেশ্যে এই ইস্তেহারটি নিখিল বঙ্গ ক্রীড়া সাংবাদিক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে প্রচারিত হোক।

বাজে ফুটবলের দুর্গন্ধ এবং জীবাণু ছড়াচ্ছে : কী করবেন, কী করবেন না-- জেনে নিন। করবেন : (এক) যে কোন টিম মাঠে নামার সময় হাততালির বদলে উলু দেবার অভ্যাস আয়ত্ত করবেন এবং আনুষঙ্গিক গালিগালাজ ছাড়বেন। (দুই) ঢিলের মাপ ও ওজন বাড়াবেন। (তিন) টিকিট কেটে মাঠে ঢুকে চেঁচিয়ে বলবেন, ওই সাব-স্ট্যান্ডার্ড ফুটবল দেখা উচিত নয়। (চার) জল ফুটিয়ে খা— সরি, এটা কাটা হয়নি, ইয়ে, ফুটবলারদের কথার পিন ফুটিয়ে জ্বালিয়ে মারবেন। করবেন না : (এক) গোল হলেও হুল্লোড় করবেন না। (দুই) ভাল পাস বা ড্রিবল বা ট্যাকল বা সেভ দেখলেও খুশি হবেন না। (তিন) ভাজাভুজি যথাসম্ভব কম খা— ধ্যেৎ তেরি, এটাও কাটা হয়নি, ইয়ে, হাততালি যথাসম্ভব কম দেবেন, পারতপক্ষে দেবেন না। (চার) টিম হেরে গেলে শুধুশুধু কর্মকর্তাদের গাড়ির কাচ ভাঙবেন না, পারলে ফুটবলারদের মাথা ভেঙে বা ফাটিয়ে দেবেন।

এই চমৎকার প্রস্তাব বিনা প্রতিবাদে গৃহীত হল। শুধু এক উদীয়মান সাংবাদিকের সংশোধনী জুড়ে দেওয়া হয়। তিনি প্রস্তাব দেন, মূল প্রস্তাবে যেখানে যেখানে ফুটবলারদের কথা বলা হচ্ছে, সেখানে সেখানে ঠিক তার আগে আগে 'ঘৃণ্য' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হোক।

সভা শেষ হওয়া উপলক্ষে চুরুট ধরাতে গিয়ে বাধা পেলেন মাননীয় পূর্তমন্ত্রী তথা সভাপতি মহোদয়। বুক চিতিয়ে মাইকের দিকে ধেয়ে এলেন এক ঝানু ও তেজস্বী রিপোর্টার : 'কনফারেন্স এখনও শেষ হয়নি স্যার, চুরুটটা একটু পরে ধরালে ভাল হয় স্যার। শুধু ফুটবল রসিকদের জ্ঞান দিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। আমাদের নিজেদের সম্পর্কেও গাইডলাইন বেঁধে দেওয়া দরকার। সাড়ে তিন লাখ সার্কুলেশনের কাগজে ফুটবলারদের সমালোচনা করছি, কিন্তু সাড়ে তিন হাজার সার্কুলেশনের কাগজ উল্টো গেয়ে সব ভণ্ডুল করে দিচ্ছে। এটা বন্ধ হওয়া দরকার। মাথায় যদি তুলতেই হয়, কর্মকর্তাদের তোলা হোক, ফুটবলারদের নয়। আমি সব খবরের কাগজ এবং ম্যাগাজিনের জন্য একটা গাইডলাইন দিচ্ছি। এটা যাতে ঠিকঠাক ফলো করা হয়, তা দেখার দায়িত্ব আমাদের নিজেদের হাতে নিতে হবে। একথা বলে তিনি নিজের সুদৃঢ় বাহু এবং আমার ক্ষীণ দেহের দিকে তাকালেন। কেন, জানি না।

তিনি প্রস্তাব পেশ করলেন : (এক) আমরা কলকাতার কোন ফুটবলারের ছবি ছাপব না, জায়গা বাড়তি হলে অফিসিয়াল রেফারি বা পূর্তমন্ত্রীর ছবি ছাপব। (দুই) ফুটবলাররা যে সব সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত— যথা এফ ডব্লু এ, সে সবের কোন খবর ছাপব না। (তিন)

বড় তিন টিমের ম্যাচরিপোর্টের জন্য সাড়ে পাঁচ লাইনের বেশি জায়গা দেব না, গুরুত্ব দিয়ে ছাপব ছোট টিমের সব খেলার রিপোর্ট, (চার) বড় ম্যাচের আগে কোন স্পেশাল রিপোর্টিং করব না; কোচ বা ক্যাপ্টেনের ভাষণ ছাপব না, টিকিটের জন্য লাইনের ছবি ছাপব না, আগের দিন সকালে পি কে বা অমল দত্ত বা সাত্তার কীভাবে প্র্যাক্টিস করাচ্ছেন— সেই ছবিও ছাপব না। (পাঁচ) বড় টিমের খেলার কোন ছবি ছাপা হবে না। ফটোগ্রাফাররা বেকার হবেন না, তাঁরা ছোট ম্যাচের ছবি তুলবেন এবং সব কাগজ তা ছাপবে। (ছয়) বড় টিমের হয়ে কে কে খেলছে, তা ছাপা হবে না। ছোট টিমের রিজার্ভ প্লেয়ারদেরও নাম ছাপা হবে। (সাত) আমরা কেউ কেউ ফুটবলারদের বরাবরই তাচ্ছিল্য করে 'সে' লিখি, অন্য সবাই 'তিনি' লেখেন। এটা বন্ধ করতে হবে। আঠার বছরের যুবনেতাও 'তিনি', কিন্তু বত্রিশ বছরের ফুটবলার 'সে'। হ্যাঁ, ফুটবলারদের, মানে ঘৃণ্য ফুটবলারদের এভাবেই ছোট করা উচিত। (আট) এই সব ঘৃণ্য ও সাবস্ট্যান্ডার্ড ফুটবলারদের জঘন্য 'বড় ম্যাচ'-এর রিপোর্ট আর কোন এক্সপার্টকে দিয়ে লেখানো হবে না। (নয়) কলকাতার ফুটবলারদের বাদ দিয়েই যাতে বেঙ্গল টিম গড়া হয়, সেজন্য গঠনমূলক লেখা সবাইকে লিখতে এবং ছাপতে হবে। (দশ) ইন ফ্যাক্ট, আমার আর কোন পয়েন্ট নেই। তবে, আমি বরাবরই রাউন্ড হেডেড এবং রাউন্ড ফিগারে বিশ্বাসী— তাই ব্যাপারটা দশে টানছি। আমরা প্রেস বক্সের সামনে বড় তিন টিমের ম্যাচের সময় ব্যানার ঝোলাব : 'কলকাতার ফুটবল বর্জন করুন, কলকাতার ফুটবলারদের ঘৃণা করুন।'

প্রস্তাব হাফবাক্যে সমর্থিত হল, মানে, গোটা এক বাক্যেরও দরকার হয়নি। অনেকেই আমার দিকে কটমটিয়ে তাকালেন। মনে ভয় এবং মুখে মিহি হাসি ফুটিয়ে কনফারেন্স রুম থেকে ডাইনিং রুমের দিকে গেলাম। কিছু করার নেই, প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেছে। কলকাতার ফুটবলারদের জন্য দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু আমি একা কীইবা করতে পারি। প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, এবার খবরের কাগজে অনেক কিছু আপনি পাবেন না, হারাবেন। কিন্তু হারানোর দুঃখ ভুলে যাওয়া উচিত, কারণ আপনারা একটি মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য ত্যাগস্বীকার করছেন। ত্যাগ স্বীকার করুন, ত্যাগ স্বীকার করুন। মেলা চেঁচাবেন না। উল্টোপাল্টা কিছু বলবেন না। আমরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট। আমাদের কলমের জোর না থাক, মাস্‌লের জোর আছে।

৯৩

অনেক গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন রজনী এবং তন্দ্রাপ্লুত দুপুরের ফসল এই ব্লু প্রিন্ট— নয়া ক্রীড়া সাংবাদিকতার ম্যানিফেস্টো। সাতাত্তর-আটাত্তরে কিছু নির্বোধ, রুচিহীন এবং গর্দভ (নাহলে অনর্থক এত খেটে মরে?) এই লাইনে এসে গিয়ে বিস্তর ঝামেলা পাকিয়েছে, এবার শুরু হবে সাফাই অভিযান। জঞ্জাল হটাতে হবে। স্পোর্টস জার্নালিজমকে চটকের ফাটক থেকে মুক্ত করতে হবে। সব রকমের চমককে ধমকে তাড়াতে হবে। প্রতিবাদকে একেবারে বাদ দিয়ে ফেলতে হবে। ফুটবলারদের ফুটবল বানিয়ে লাথি মারতে হবে। খেলার লেখায় ময়দানী ভাষা আনতে হবে। বাঙালি হয়ে বাঙালি ফুটবলারদের ছোট করার মহান আর্টে দক্ষ হতে হবে। কত কম পরিশ্রমে স্পোর্টস জার্নালিজম করা যায়, তার পরীক্ষানিরীক্ষা করতে হবে। আশির দশক পরিশ্রম থেকে মুক্তির দশক। প্রতিবাদ থেকে দূরে থাকার দশক। মাঠের ভাষা লেখার ভাষা এক করে ফেলার দশক। ফুটবলারদের ফুটবল বানানোর দশক। এই দশকের হাফ টাইম হয়ে গেছে। আর সময় নেই, মাত্র পাঁচ বছর বাকি। এখনই কাজ শুরু করতে হবে! চাই ব্লু প্রিন্ট, গাইড লাইন। সচেতন ক্রীড়া সাংবাদিকেরা এই কঠিন দায়িত্ব আমার ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন। 'খেলা'র এডিটর চটকদারি জার্নালিজমের দফারফার আশঙ্কায় আমার ওপর চটিতং। কিন্তু কী করবে, এখন আমিও কিঞ্চিৎ কেউকেটা তো বটিতং!

'আমরা, বাংলার সুস্থ সচেতন নিরপেক্ষ ক্রীড়া সাংবাদিকরা আশির দশকের হাফটাইমে চিউইংগাম মুখে নিয়ে এবং কিঞ্চিৎ জিরিয়ে নিয়ে এই প্রতিজ্ঞা করছি যে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার চেহারা বিলকুল পাল্টে দেব। চটকদারি জার্নালিজমের মুখে নীরব গাম্ভীর্যের ঝামা ঘষে দেব। প্রতিবাদ-ফ্রতিবাদের গুড়ে বালি ঢেলে দেব। এই সব মহৎ উদ্দেশ্য ঘিলুতে রেখে নিম্নলিখিত ম্যানিফেস্টো তথা গাইডলাইন প্রণয়ন করছি।

এক : এবার থেকে কোন বর্তমান বা প্রাক্তন ফুটবলারকে দিয়ে ম্যাচ রিপোর্ট করানো হবে না। ওরা খেলার কিছু বোঝে না, শুধু থিওরি কপচায় অথবা একে অন্যের পিঠ চুলকোয়। ম্যাচ রিপোর্ট করবেন কর্মকর্তারা। এঁরা সবাই ভাল। এঁরা যেচে টেলিফোন

করে খবর দেন, চাইলে টিকিট দেন, না চাইলেও তেল দেন, এঁরা থিওরি কপচান না কারণ, থিওরি জানেনেই না— সুতরাং ম্যাচ রিপোর্ট অফিসিয়ালরাই করবেন। ফেডারেশন কাপে মোহনবাগানের সেমিফাইনালের ম্যাচ রিপোর্ট করবেন সজল ওরফে হুঁহুঁ গজু বসু। ইস্টবেঙ্গলের সেমিফাইনাল ম্যাচের রিপোর্ট করবেন 'হেঁ হেঁ আমার নামটা মনে রাখবেন— আর পি ভৌমিক। মহমেডানের ম্যাচ রিপোর্ট করবেন টিম হারতে শুরু করলেই গায়েব-হওয়া তায়েব আলি। লোকে এসব লেখা খাবেই। অন্য কিছুই না পেলে খালি পেটে থাকবে নাকি? খেতেই হবে।

দুই : খেলার পত্রিকাগুলোয় ফুটবলারদের আর ক্রিকেটারদের ইন্টারভিউ ছাপা বন্ধ করতে হবে। তার বদলে অফিসিয়াল আর দর্শকদের ইন্টারভিউ ছাপতে হবে। কলকাতার ফুটবলাররা এশিয়ায় লাস্ট। কলকাতার দর্শকরা দুনিয়ায় ফার্স্ট। তাহলে কাদের ইন্টারভিউ ছাপা উচিত? খেলার কাগজগুলোর কভারে ফুটবলার আর ক্রিকেটারদের ছবি ছাপা চলবে না, চলবে না। তার বদলে, ঐ অফিসিয়ালদের ছবি। কাশী মণ্ডল মোহনবাগান লনে বসে চা খাচ্ছেন, অরুণ ভট্চায্ ইস্টবেঙ্গল টেন্টে অফিসে বসে চিঠি লিখছেন, গোলাম মুস্তাফা গুলাবি টী-র অফিসে টেবিল বাজাচ্ছেন— এইসব প্রাণবন্ত ছবি রঙিন হয়ে কভারে ফুটবে। ভ্যারিয়েশন আসবে। টিম হারলে কর্মকর্তাদের পালানোর ছবিও জমতে পারে। বড় টিম গোল না পেলে, শেষের দিকে বিশেষ বিশেষ কর্মকর্তার ছোট টিমের অফিসিয়ালদের হাতে পায়ে ধরার ছবিও আসবে। তখন আর একটু ভ্যারিয়েশন— দু-একজন ছোট ক্লাবের কর্মকর্তাও কভারে চলে আসবেন।

তিন : বাংলার, কলকাতার ফুটবলারদের যথাসম্ভব ছোট করতে হবে। ওদের পেড়ে গালাগালি দিতে হবে। ওদের বাড়িঘরদোর নিয়ে টানাটানি করতে হবে। কেউ যাতে ওদের 'চিফ গেস্ট' না করে সেজন্য জনমত গড়ে তুলতে হবে। এ লাইনে অবশ্য পাইওনিয়াররা অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছেন। কীভাবে বাংলার ফুটবলারদের ছোট করতে হবে, তার উদাহরণ এই ফেমাস পঁচাশিতেই আছে। সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা হেরে গেল। প্রথম সারির দশজন ছিল না। সারা বছর টানা ফুটবল খেলে অনেকে ক্লান্ত এবং কেউ কেউ অসুস্থ ছিল। ফেডারেশন কাপে পাঞ্জাবের এক নম্বর জে সি টি গোহারান হারল। দুটো ব্যাপারকে পাইওনিয়াররা কীভাবে ট্রিট করলেন, তা দৃষ্টান্ত হিসাবে জ্বলজ্বল করুক। বাংলার প্রথম সারির দশজন না থাকাটা কোন ব্যাপার নয়, ক্লান্তি-চোটও কোন ব্যাপার নয়, ফুটবলাররা দল বদলের কথা না ভেবে পা বাঁচিয়ে খেলেছে! আর জে সি টি প্রথম ম্যাচ বাজে খেলেছে ফার্স্ট টিমের দুজন না থাকায়, সেকেন্ড ম্যাচ বাজে খেলেছে পারমিন্দার চোট নিয়ে খেলায় আর টুর্নামেন্টে মার খেয়েছে ফুটবলাররা সারা বছর খেলে ক্লান্ত থাকায়! এইভাবেই, ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আমদানি করতে হবে। বিদেশের মেলা বয়স হয়েছে বলে ওকে বাদ দেওয়া সমর্থন করতে হবে, পারমারকে এখন টিমে রাখা হচ্ছে বলে পাঞ্জাবের সিলেক্টরদের প্রশংসা করতে হবে।

চার : 'চমক' চলবে না। 'চটক'ও চলবে না। গঠনমূলক লেখা চাই। লেখার মধ্যে একটা কনস্ট্রাক্টিভ ব্যাপার থাকতে হবে, যেন পড়তে পড়তে ইট কাঠ, লোহা, বিম—

এসবের বাজনা মাথার মধ্যে ঝমঝম করে। দরকার হলে, এবং দরকার না হলেও, বিদেশে যেতে হবে। সোবিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানি প্রভৃতি উন্নত দেশগুলির ক্রীড়া ব্যবস্থার বর্ণনা লিখে ভারতবর্ষের খেলাধুলোর উন্নতি ঘটাতে হবে। তাছাড়া, ভ্রমণকাহিনী খুব স্বাস্থ্যকর জিনিস। রাইট ফ্রম টেক অফ টু অ্যারাইভাল ব্যাক টু দমদম। দরকার হলে ফেরার পথে ভি আই পি রোডের, যুভাক্রীর, মেট্রোপলিটান বাইপাসের বর্ণনা। কলকাতার, বাংলার ভারতের নোংরা খেলাধুলোর জগৎ থেকে দূরে... বহু দূরের পাঠকপাঠিকাদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে হবে।

পাঁচ : প্রতিবাদের লাইনে যে হাঁটতে চাইবে, কলমের ডাণ্ডা দিয়ে তার ঠ্যাং ভেঙে দিতে হবে। সামনের বছর থেকে বাংলার কোচ বা ক্যাপ্টেনের বদলে সিলেক্টরদের বড় ইন্টারভিউ ছাপতে হবে। সিলেক্টররা ভুল বা অন্যায় করলে চোখে ঠুলি এবং কানে তুলো দিয়ে রাখতে হবে। যে দু-চারটে ঠিক ঠিক সিলেকশন থাকবে, তার প্রশংসা করতে হবে। ইন্ডিয়া টিমের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যে প্রতিবাদ করবে, তাকেই এক ঘরে করা হবে। নিখিল বঙ্গ ক্রীড়া সাংবাদিক সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। টেন্টে ঢুকতে গেলে 'কুকুর' লেলিয়ে দেওয়া হবে।

ছয় : ফুটবলার বা ক্রিকেটারদের বাড়ি-অফিসে ঘোরাঘুরি চলবে না। খবরের পেছনে ছোটাছুটি চলবে না। এতে সবার খাটনি বাড়বে। বয়স বাড়লে খাটনি কমাতে হয়। আমাদের সবার বয়স বাড়ছে, সুতরাং খাটনি কমাতে হবে। এবার থেকে বিশেষ করে ফুটবলারদের আমাদের কাছে আসতে হবে। মেলা লাফাচ্ছে একটু খাটুক। ময়দানে আমাদের টেন্টে রোজ বিকেল চারটেয় রোল কল হবে, ফুটবলারদের এসে 'প্রেজেন্ট স্যার' 'ইয়েস প্লিজ' বলতে হবে। সিক্সটি পার্সেন্টের কম প্রেজেন্স থাকলে ডিসময়দানেট হয়ে যাবে।

সাত : ক্রীড়া সাংবাদিকতার দরজা খুলে ময়দানের বাতাস ঢুকতে দিতে হবে। ময়দানের প্রাণবন্ত ভাষা ছাপার অক্ষরে লেখায় লেখায় তুলে আনতে হবে। ধরা যাক, পি কে বললেন যে ফেডারেশন কাপে টিম সেট না হলেও শেষের দিকে সব ট্রফি ইস্টবেঙ্গল পাবে। তখন হেডিং দিতে হবে 'পি কে-র ঢপ।' ধরা যাক, মোহনবাগানে খুব কোন্দল লেগে গেল। তখন হেডিং হবে— 'মোহনবাগানে কিচাইন'। ধরা যাক, দারুণ খেপে অবহেলিত মজিদ ইব্রাহিম আলি মোল্লাকে অপমান করলেন, তখনকার হেডিং— 'মোল্লা খাস্তা।' কেউ খারাপ খেললে 'ব্যর্থ' বা এই জাতীয় ম্যাড়মেড়ে শব্দ ব্যবহার না করে লিখতে হবে 'মাল ছড়িয়েছে' বা 'দুয়ানি কুড়িয়েছে।' কোন কোন খেলার পত্রিকায় 'মন্তব্য' উদ্ধৃতি— এই ধরনের ফিচার আছে। এগুলোর নাম দেওয়া যেতে পারে 'বাতেলা'।

আমাদের হারানোর কিছু নেই, কারণ আমাদের কিছুই নেই। কিন্তু জয় করার জন্য আছে গোটা বাংলা ক্রীড়াসাংবাদিকতার জগৎ। সুস্থ, সচেতন, নিরপেক্ষ, পরিশ্রমবিমুখেরা এক হও!

৯৪

তবুও 'খেলা' যে ভারতীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত খেলাধুলোর সাপ্তাহিক— তারও নিশ্চয় 'অসংখ্য' কারণ আছে, তাই না? একটি কারণ, 'খেলা'য় বাবুরাম সাপুড়ের মতো জবরদস্ত রিপোর্টার আছে। ডেইলি পেপারের ঘাঘু সব রিপোর্টার যা পারেনি, বাঙ্গালোরে এই শর্মা তাই করে এল। এ আই এফ এফ মিটিংয়ের পর, অফিসিয়াল প্রেস কনফারেন্সের পর, কর্মকর্তাদের একসঙ্গে একেবারে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ নেওয়া গেল। এঁদের মধ্যে যে কোন একজনকে পাওয়াই কঠিন, একসঙ্গে ছয়জনকে পেয়ে গেলাম— ভেবে দেখুন! আমার ব্যাকিং নেই, তাই দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ সাক্ষাৎকার-এর লেবেল মেরে ইন্টারভিউটা চার পাঁচ পৃষ্ঠা জুড়ে ছাপা হল না। হলে মার-মার কাট-কাট হয়ে যেত। 'সম্পাদকের কাছে'তে অন্তত দেড় ডজন, মুগ্ধ অভিভূত অভিনন্দন ছাপা হত।

গোটা ইন্টারভিউটা আমি একটি মাত্র চ্যানেলে নিয়ে গেছি। আপনারা নিশ্চয় অবগত আছেন, 'আজকাল' দৈনিক এই বিষয়ে জনা তিরিশেক প্রাক্তন ফুটবলারের ইন্টারভিউ ছেপেছে— কীভাবে ভারতীয় ফুটবলের উন্নতি করা যায়। ভূমিকায় রোজই ঘোষণা করা হয়েছে, এই সিরিজের সব সাক্ষাৎকারের ইংরেজি অনুবাদ, আমার হিসেবে অ্যাট লিস্ট সাড়ে চার বস্তা কাগজ, এ আই এফ এফ দপ্তরে পেশ করা হবে— যদি কিছু হয়! 'আজকাল'কে টেক্কা মারার এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। দুঃখের বিষয় 'খেলা'র এডিটর পুরোপুরি 'খেলা'র লোক নন, তিনি 'আজকাল'-এরও কিছু একটা বটে। কিন্তু ইয়োর্স ফেইথ ফুলি শুধু 'খেলা'র লোক। হাঁটুর ব্যথায় কাতর এডিটর মহোদয় একদিন অফিসে এলেন না, এই সুযোগে 'আজকাল'কে ল্যাং মারা এই ইন্টারভিউ পাচার করে দিচ্ছি। 'আজকাল' দিস্তা দিস্তা বস্তা বস্তা কাগজ এ আই এফ এফ দপ্তরে পেশ করার আগেই এ আই এফ এফ কর্তাদের রিঅ্যাকশন সংগ্রহ করে আমি ছেপে দিচ্ছি। 'আজকাল' এবং ওই দিস্তা বস্তা কাগজের এই দুর্দশার জন্য আমি দুঃখিত। দুঃখিত, কিন্তু নিরুপায়!

প্রাক্তন ফুটবল নক্ষত্ররা প্রায় সকলেই এ আই এফ এফ-এর রুই-কাতলা এমনকি পাবদা-ট্যাংরাদেরও বিস্তর ঠুকেছেন। এটা জানাই ছিল যে কর্তারা ততোধিক বিস্তর চটে থাকবেন। কিন্তু, কিমাশ্চর্যং, আমি ওই সাক্ষাৎকার সিরিজের প্রসঙ্গ তোলার সঙ্গে সঙ্গে

তাঁরা সকলেই মিটিমিটি হাসলেন।

আমার প্রথম প্রশ্ন : আপনারা কি আজকাল-এর ভারতীয় ফুটবলের বিশল্যকরণীসন্ধানী ইন্টারভিউ সিরিজ সম্পর্কে অবহিত আছেন?

খলিফা জিয়াউদ্দিন জবাব দিলেন : 'আছি, আছি। ইংরেজি অনুবাদ পেশ করার কী দরকার? 'আজকাল'-এ যা যা ছাপা হয়, মুখে মুখে বা চিঠিতে চিঠিতে তার অনুবাদ আমি দু-চার দিনের মধ্যে পেয়ে যাই। কলকাতায় আমার লোক হ্যাজ। দিস্তা দিস্তা কাগজ আমি থোড়াই পড়তে যাব!'

দ্বিতীয় প্রশ্ন : শুধু জুনিয়রদের নিয়েই এখন শুরু করা উচিত কিনা, এব্যাপারে আপনাদের বক্তব্য?

অশোক ঘোষের জবাব : 'প্রাক্তন ফুটবলারদের মতামতকে আমরা উড়িয়ে দেব না। ফুটবলারদের ততদিনই আমরা অপছন্দ করি, যতদিন তারা বর্তমান থাকে। নো অ্যালার্জি ফর প্রাক্তনস। ওঁদের মধ্যে কেউ কেউ ইন্টারভিউতে বলেছেন, পুরনোদের একেবারে বাদ দিয়ে ফেলা উচিত। কেউ কেউ মনে করেন এই টিমটাকেই রেখে দু-চার জন জুনিয়র নেওয়া উচিত। কেউ কেউ বলেছেন, এই টিমটাকে রেখে তিন-চারজন বাদ পড়া স্টারকে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমরা কোন না কোন প্রাক্তন ফুটবলারদের বক্তব্য নিশ্চয় মানব। হয় পুরনো সবাইকে বাদ দিয়ে সব নতুন আনব, নয় এখনকার টিম রেখে দু-চারজন নতুন ঢোকাব, অথবা এই টিমের সঙ্গে বিদায়-নেওয়া দু-চারজনকে ফিরিয়ে আনব। এর বাইরে কিছু হবে না, কথা দিচ্ছি। প্রাক্তন ফুটবলার বলে কথা, তাঁদের মতামতকে সম্মান না দিলে হয়?'

তৃতীয় প্রশ্ন : দীর্ঘমিয়াদী শিবির সম্পর্কে আপনাদের বক্তব্য কী?

কেরলের পি লক্ষ্মণন জবাব দিলেন : 'এ ব্যাপারেও প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে কারও না কারও মতকে সম্মান জানানর সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি। কেউ কেউ বলেছেন, নির্দিষ্ট টুর্নামেন্টের আগে মাত্র কয়েকদিনের ক্যাম্প করলেই ফুটবলাররা চাঙ্গা থাকবে। কারও কারও ধারণা, দু মাসের ক্যাম্পই ভাল। আবার কেউ কেউ মনে করছেন, দীর্ঘমিয়াদী শিবিরই উন্নতির একমাত্র রাস্তা। আমরা এই তিনটি মতের যে কোন একটি মানব। হয় দু-এক সপ্তাহের ক্যাম্প হবে, নয়ত দু-তিন মাসের ক্যাম্প হবে, অথবা দীর্ঘমিয়াদী ক্যাম্প হবে। এর বাইরে কিছু হবে না। নেভার।'

চতুর্থ প্রশ্ন : বিদেশি কোচ আনার ব্যাপারে আপনারা কিছু ভেবেছেন?

সোনার বাংলার প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি : 'এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। গভীরভাবে খতিয়ে দেখে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তবে, এ আই এফ এফ-এর ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, প্রাক্তন ফুটবলারদের মতামতের প্রভাব আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর থাকবে। কিছু বিশিষ্ট প্রাক্তন ফুটবলার বলেছেন, বিদেশি কোচের আদৌ কোন প্রয়োজন নেই, আমাদের দেশের কোচেরাই যথেষ্ট যোগ্য। কারও কারও অভিমত, বিদেশি কোচরা যেহেতু অনেক বেশি দক্ষ এবং অভিজ্ঞ, তাঁদের মধ্যে কাউকে না কাউকে আনতেই হবে। দু-তিনজন অবশ্য এমনও বলেছেন যে, একজন বিদেশি কোচ এনে তাঁর সঙ্গে দু তিন জন স্বদেশি কোচ রাখা উচিত। এই তিনটি মতের মধ্যে সবচেয়ে সুবিধাজনক

একটি আমরা গ্রহণ করব। হয় বিদেশি কোচ দায়িত্বে থাকবেন, নাহয় বিদেশি কোচ আনা হবে না, অথবা বিদেশি কোচ ও স্বদেশি কোচ দায়িত্ব ভাগাভাগি করে নেবেন। আমরা যা-ই করি না কেন, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কিছু না কিছু বিশিষ্ট প্রাক্তন ফুটবলারের মতামতকেই মানা হবে।

পঞ্চম প্রশ্ন : আমাদের কি আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে এখন কিছুদিনের জন্য সরে থাকা উচিত?

বাঙ্গালোর-হিরো কে আর খলিল : 'এব্যাপারেও প্রাক্তন ফুটবলারদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দেবার ব্যাপারে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে এই বিষয়ে পরিষ্কার দুটি মত। একদল মনে করছেন, এখন যা হাল, তাতে দু-চার বছর ইন্টারন্যাশনাল ফুটবলে না থাকাই ভাল। অন্যদল বলছেন, খারাপ খেললেই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে দূরে সরে থাকতে হবে— এটা কোন সমাধান নয়। আমরা দুটির মধ্যে একটি মত মেনে চলব। হয় আপাতত আর ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলব না, নাহয় খেলে যাব। এই দুটো রাস্তার বাইরে যাব না, কথা দিচ্ছি।'

ষষ্ঠ প্রশ্ন : ঠিক কোন বয়স থেকে ফুটবলারদের জন্য ভাল ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থার কথা ভাবছেন?

কেরলেরই টি আবদুল্লা : 'এখন জুনিয়র টিমের ক্যাম্পে আঠার-উনিশের ছেলেরা আসে, কেউ কেউ বাইশ-চব্বিশের। প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে কেউ কেউ জানিয়েছেন যে আঠার-উনিশের আগে আমাদের দেশের ছেলেদের শরীর ভাল ফুটবল খেলার উপযোগী হয় না, সুতরাং আঠার বছর বয়স থেকেই সিস্টেমেটিক ট্রেনিং শুরু হওয়া উচিত। অধিকাংশ স্টারই অবশ্য চান ব্যাপারটা চোদ্দ থেকে ষোল বছর বয়সীদের নিয়ে শুরু হোক। কেউ কেউ আরও গোড়ায় ধরতে চেয়েছেন, একেবারে দশ-বার থেকেই। আমরা ঠিক করেছি, হয় এখনকার মতো আঠার-উনিশ থেকে শুরু করার সিস্টেম চালু থাকবে, না হয় পনের-ষোল, না হয় তের-চোদ্দ, না হয় দশ-বার বছর বয়স থেকে শুরু করব। দশের কমে কিছুতেই শুরু করব না। প্রাক্তন ফুটবলারদের মত মানবই মানব।'

সপ্তম প্রশ্ন : 'স্কিল' বাড়ানো এবং 'পাওয়ার'কে গুরুত্ব দেবার কথা ভেবেছেন?

মহারাষ্ট্রের সুবিখ্যাত মগন সিং : 'আমরা ভাবার কে? বিখ্যাত প্রাক্তন ফুটবলাররা যে পথ বাতলাচ্ছেন, আমরা সেইমত চলব। অনেকে বলেছেন, ব্যক্তিগত স্কিল না বাড়ালে কিছু হবে না, এইদিকে জোর দিতে হবে। অন্যরা বলেছেন, এখন 'পাওয়ার' ছাড়া আন্তর্জাতিক ফুটবলে কিছু করা কঠিন। আমরা ঠিক করেছি, পরবর্তী কোচকে বলে দেব হয় 'স্কিল'-এর ওপর জোর দিন নয়ত 'পাওয়ার'-এর ওপর জোর দিন। তবে, এক্ষেত্রেও কথা আছে। কেউ কেউ কোচকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চেয়েছেন, কেউ কেউ কর্মকর্তাদেরই সব দায়িত্ব নিতে বলেছেন, এনিওয়ে, আমরা এটা দেখে খুশি যে, যে কোন পয়েন্টে আমরা যে কোন ডিসিশনই নিই না কেন, তাতে প্রাক্তন ফুটবলারদের মধ্যে কারও না কারও মতকেই মেনে নেওয়া হবে। এই মূল্যবান ইন্টারভিউ সিরিজ ছাপার জন্য 'আজকাল'কে অভিনন্দন!

খেলা • ২৪ মে ১৯৮৫

৯৫

আমাদের মেদবহুল এবং মেধাহীন এডিটরের সুদৃঢ় বিশ্বাস, প্রতি সংখ্যায় অন্তত পাঁচটি পৃষ্ঠায় 'গাভাসকার' না থাকলে কাগজ চলবে না। যেহেতু গাভাসকারকে বেচার ব্যাপারে তাঁর বিশেষজ্ঞতার দাবি আন্তরিক এবং তিনি আফটার অল এডিটর, এব্যাপারে বিশেষ প্রতিরোধ নেই। 'দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ' অথবা 'দীর্ঘ ও খোলামেলা' সাক্ষাৎকার একাই একশ (মাইনাস পঁচানব্বই)— পাঁচ পাতা জুড়ে। গাভাসকার এগার মিনিটের জন্য কলকাতায় এলেও পাঁচ পাতার ব্যাপারে নিশ্চিন্তি। অন্য সময়ে লেখা অন গাভাসকার, লেখা বাই গাভাসকার, লেখা ফর গাভাসকার, লেখা টু গাভাসকার ইত্যাদি.... কিন্তু এতদ্দ্বারা সর্বদা পাঁচ পৃষ্ঠার গতি হয় না। কাগজ চালাতে হবে না? আমাদের প্রিয় কোমল হৃদয় এডিটরের গাত্রচর্মে ইনজেকশন নিডল সহজে বিদ্ধ হয় না, সুতরাং, কেউ নিশ্চয় পেরেক ঠুকেই তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছে যে, কোন অলৌকিক ব্যাপার ছাড়া তাঁর মতো ব্যক্তিদ্বারা কাগজের বিক্রি বাড়ানো সম্ভব নয়।

সেই অলৌকিক ব্যাপার, সেই অত্যাশ্চর্য আলো, সেই চিরঞ্জীব বনৌষধি, সেই গরম কেক— সুনীল মনোহর গাভাসকার। অধিনায়কত্ব থেকে ছাঁটাই, অধিনায়কত্বে পুনর্বহাল, ঊনত্রিশ নম্বর সেঞ্চুরি, তিরিশ নম্বর সেঞ্চুরি, কমলালেবুর খোসা, বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ, রথম্যানস কাপ— ঘটনার ঘনঘটায় পাঁচ পৃষ্ঠার ব্যাপারটা কোন সমস্যাই ছিল না। কিন্তু স্কুলের ছেলেদের টেলিভিশন থেকে সামান্য ছুটি ও পড়াশুনোয় কিঞ্চিৎ মনোনিবেশের বিবেচনাময় সুযোগ দিয়ে একসময়ে অবশেষে ক্রিকেট মরসুম সমাপ্ত হল। পুষ্টমস্তিষ্ক এডিটরের চোখের সামনে ঘনান্ধকার নেমে এল। অতঃ কিমঃ? গম্ভীর চর্বণে তিনি দেড়খানি পাইপ ভাঙলেন, তিন দিস্তা কাগজে ক্রুদ্ধ কাটাকুটি খেললেন, লম্বা আলপিন খুঁজে আটান্নবার কান খোঁচালেন, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে দুজন সহকর্মীর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে ফেললেন, কিন্তু কোনও আলো দেখতে পেলেন না। অবশেষে, অকস্মাৎ আলো এল বোম্বাই থেকে হীরের দ্যুতি ছড়িয়ে— মীনাল গাভাসকারের 'হীরের ছেলে', দুপৃষ্ঠার বাঁধা ব্যবস্থা হয়ে যেতেই টেনশন চলে গেল। বাকি দু-তিন পৃষ্ঠা ঠিক হয়ে যাবে!

সম্প্রতি অনিদ্রারোগে আক্রান্ত হওয়ায় আমাদের এডিটর দিনরাত মিলিয়ে মাত্র সাড়ে যোল ঘণ্টা ঘুমান। বাকি সময়ের অন্তত এক-চতুর্থাংশ কাগজের চিন্তায় ব্যয় করেন। সুতরাং, তাঁর চিন্তা অনিঃশেষ ও সুদূরদর্শী। গত এক সপ্তাহ তিনি এই চিন্তায় ক্লিষ্ট 'হীরের ছেলে' ফুরোলে কী হবে? গাভাসকার বৃক্ষ ঝাঁকিয়ে আর কী ফল পাওয়া যাবে? এই চিন্তা দেখে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে আমি আরও আড়াইশ বছর বেঁচে থাকলেও এবং ফর্মে থাকলেও এডিটর হতে পারব না। এডিটর হতে গেলে চিন্তা করতে হয় এবং হাজার চিন্তা করেও সমস্যার সমাধান খুঁজে না পাওয়ার মতো বুদ্ধি রাখতে হয়। আমি অযোগ্য। আমি চিন্তা করে সমাধান খুঁজে পাই।

গম্ভীর হেসে এডিটরকে বললাম, 'ওই গাভাসকারের পাঁচ পৃষ্ঠা নিয়ে ভাববেন না। থ্যাঙ্কস টু মীনাল গাভাসকার অ্যান্ড হীরের ছেলে।' মিষ্টি হেসে মার্জিত গলায় এডিটর বললেন, 'আপনি একটি গাড়ল। 'হীরের ছেলে' কি দশ বছর চলবে নাকি?'

অতঃপর মাথায় পেরেক ঠুকে বোঝাতে হল : দশবছর কেন, দশটা ইস্যুই চলুক। 'হীরের ছেলের' পর আসবে 'সোনার ছেলে'। লেখক— মনোহর গাভাসকার। তাতেও থাকবে অসংখ্য ইনসাইড স্টোরি। সানি স্কুলে কোন সাবজেক্ট-এ কাঁচা ছিলেন, এ সি সি আর নিরলনের চাকরিতে ঢোকার আগে কী কী ব্যাপার ঘটেছিল, আগে সানির কোন কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট ছিল, সানির জীবনের প্রথম ঘড়িটি কবে কেনা হয়েছিল এবং কীভাবে, মার্শেনিলকে বিয়ে করার কথাটা বাবা-মার সামনে সানি কীভাবে পেড়েছিলেন— এই জাতীয় শতাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে এই রচনা বোঝাই থাকবে। প্রথম কিস্তির সঙ্গে একটি এক্সক্লুসিভ ছবি থাকবে। একাত্তরের ওয়েস্ট ইন্ডিজ ট্যুর থেকে ফিরে, এয়ারপোর্টে নেমেই নিজের ইন্ডিয়া ব্লেজার বাবার হাতে তুলে দিচ্ছেন সানি গাভাসকার।'

সুদূরদর্শী এডিটর শুধোলেন 'তারপর?'— 'তারপর রোহন গাভাসকার : 'রুপোর বাবা'। সানি কীভাবে তাঁর একমাত্র পুত্রকে আদর করেন, খুব রেগে গেলে কীভাবে বকেন, কখনও থাপ্পড় মেরেছেন কিনা, কেন গরমের ছুটিতে তাকে তার বাবা অস্ট্রেলিয়ায় পাঠিয়ে দেন, টার্জান এবং গ্রেগ চ্যাপেলের মধ্যে কে তার বেশি ফেবারিট এবং এব্যাপারে তার বাবার বক্তব্য কী, খুব ছোটবেলায় বাবা তাকে কী কী নামে ডাকতেন, মফতলালের বিরুদ্ধে লাইফের প্রথম সেঞ্চুরি করে বাড়ি ফিরে তার পিতৃদেব খুশিতে কী কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন। স্কুলে তাকে বন্ধু এবং শিক্ষকদের কী ধরনের প্রশ্নের সামনে পড়তে হয়— এইসব অত্যাবশ্যক বিষয়ের ওপর সুবিস্তৃত আলোকপাত রোহন জয়বিশ্ব গাভাসকারের রচনায় পাওয়া যাবেই এবং লেখাটি দীর্ঘদিন চালু থাকবেই। প্রথম সংখ্যায় এক্সক্লুসিভ ছবি— উনআশির ইংল্যান্ড সফরের পর এয়ারপোর্টে নেমেই সানি তার ইন্ডিয়া ক্যাপ রোহনের মাথায় পরিয়ে দিচ্ছেন।'

আবেগ ও কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত চোখে ঘুম রুখে এডিটর : 'তারপর?'

— 'তারপর মার্শেনিল গাভাসকার। 'প্ল্যাটিনামের স্বামী'। সানির মেজাজ কখন এবং কেন ভাল থাকে, কখন তিরিক্ষি, এখন সানির কোন কোন ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট আছে, কপিলের স্ত্রী রোমি এবং বেঙ্গসরকারের স্ত্রী মানালি সানিকে কতখানি শ্রদ্ধা করেন, সানি

কোন পারফিউম পছন্দ করেন, পাজামা এবং লুঙ্গির মধ্যে কোনটা সানির বেশি পছন্দ, চায়ে কতটা চিনি নেন, কী রঙের তোয়ালে সানির পছন্দ, অফিস থেকে বাড়ি ফিরেই সানির প্রথম পছন্দ চা, কফি না কোল্ড ড্রিঙ্কস, স্ত্রীর জন্মদিন সানি মনে রাখেন কিনা— এইসব চিত্তাকর্ষক বিষয়েই যাবতীয় তথ্য পামি গাভাসকারের মূল্যবান রচনায় পাওয়া যাবে। প্রথম কিস্তির সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ছবি— আটাত্তরের অস্ট্রেলিয়া সফরের পর এয়ারপোর্টে নেমেই সানি তাঁর পুলওভার স্ত্রীর হাতে তুলে দিচ্ছেন।'

অভিভূত এডিটর সিগারেটের ফিল্টারের দিকে আগুন লাগিয়ে ফিসফিস করলেন: 'তারপর?'— 'তারপর কবিতা ও নূতন। 'ইউরেনিয়ামের দাদা।' খুব ছোটবেলায় দাদা তাদের কখনও মারধোর করেছে কিনা, দাদার স্ট্রেট ড্রাইভ বা পুল কখনও তাদের কানে বা চোখে লেগেছে কিনা, দাদা দুজনের মধ্যে কাকে বেশি ভালবাসতেন বা বাসেন, দাদা নানা দেশ থেকে কবে কী এনে দিয়েছেন, কোন রঙের রাখি এবং রুমাল সানির পছন্দ, ভাগ্নে-ভাগ্নীকে সানিমামা কতখানি ভালবাসেন, মা কবিতা-নূতনের চেয়ে সানিকে কত পার্সেন্টি বেশি ভালবাসতেন— এই জাতীয় অসংখ্য জরুরি বিষয়ে নিখুঁত তথ্য হবে এই রচনার প্রধান আকর্ষণ। প্রথম কিস্তির সঙ্গে থাকবে এক্সক্লুসিভ ছবি— বিরাশির ইংল্যান্ড ট্যুরের পর এয়ারপোর্টে নেমেই সানি তাঁর গ্লাভস কবিতার হাতে এবং প্যাড নূতনের হাতে তুলে দিচ্ছেন।'

টেবিলেই প্রায় শুয়েপড়া সু-দূ-র-দ-র্শী এডিটর কোনরকমে উচ্চারণ করলেন : 'তারপর?'— 'তারপর হেমন্ত ওয়েইঙ্গেঙ্কার 'রেডিয়ামের কলিগ'। সানি কখন অফিস যান, কখন ওঠেন, কতবার চা খান, কটা ফাইল দেখেন, কটা দেখেন না, কটা চিঠিতে সই করেন, কটা করেন না। কটা টেলিফোন ধরেন, কটা ধরেন না, কতজন ভিজিটরের সঙ্গে দেখা করেন, কতজনের সঙ্গে করেন না, বাড়িতে কতবার ফোন করেন, সামারস্যুট পরেন কিনা, লাঞ্চ-এ চিকেন স্টু লাইক করেন না মশলা দোসা— এইসব প্রয়োজনীয় বিষয়ে সম্পূর্ণ তথ্যে ভরপুর হবে এই রচনা। প্রথম কিস্তির সঙ্গে এক্সক্লুসিভ ছবি— তিরাশির প্রুডেনশিয়াল কাপ খেলে ফিরে এয়ারপোর্টে নেমেই সানি তাঁর বিশাল ভি আই পি সুটকেস হেমন্তের হাতে তুলে দিচ্ছেন (হেমন্ত খানিক পরেই সুটকেসটি সানির গাড়ির ডিকিতে তুলে দেন— এটা অবশ্য ছবিতে নেই)।'

টেনশন মুক্ত এডিটর নিদ্রালু কণ্ঠে আর একটি 'তারপর'-এর 'তা'টুকু উচ্চারণ করতে না করতেই বললাম, 'তারপর, সানির ভাগ্নেভাগ্নী লিখতে পারে— 'চাঁদের মামা'। বাবুর্চি লিখতে পারে 'মধুর মনিব'। এইসব চলতে চলতেই রোহন বড় হয়ে যাবে, তার বিয়ে হবে, এবং নববধূ শুরু করতে পারবে অনবদ্য ধারাবাহিক রচনা— 'মাটির শ্বশুর'। দুর্ভাগ্যবশত এক্সক্লুসিভ ছবি নিয়ে মুশকিল হবে। এয়ারপোর্টে নেমেই লেখিকার হাতে কিছু তুলে দেবার ছবির জন্য সানির কোন ক্রিকেটট্যুর তখন পাওয়া যাবে না।'

৯৬

চিমা ওকোরি নামে কালো ভাল ঝাঁঝাল যে ফুটবলারের পদধ্বনিতে এই মুহূর্তে গড়ের মাঠ সচকিত, আপনারা যদি ভেবে থাকেন যে তাতে অভিভূত বাবুরাম সাপুড়ের মতো প্রবল বোদ্ধাও— তাহলে ঠিকই ভেবেছেন। নির্জীব হলুদ শুকনো ঘাসে যদি লাগে টগবগে সবুজের ঘন ছোঁয়া, নেতিয়ে পড়া ফুটবলে যদি কেউ আনে উদ্ধত শ্যুটিংয়ের মধুর গর্জন, সাফল্যে উচ্ছল ও ব্যর্থতায় বিপর্যস্ত হবার মতো সরল সুন্দর কোন স্পোর্টসম্যান যদি সবুজ ঘাসে ধরায় কৃষ্ণচূড়ার রক্ত, অভিভূত না হয়ে কীইবা করা যায়? চিমা ওকোরি ঠিক কত বড় ফুটবলার, তার বিচার করবেন বিখ্যাত কোচ এবং বিশিষ্ট প্রতিবেদকরা। বোদ্ধার আলখাল্লা পরে থাকলেও আসলে তো আমি ঘোলা ফুটবল ফ্যানই। তাই উনিশশ আশিতে মজিদ বাসকার নামে এক মধুর বিস্ময়ের ধাক্কায় টানা তিনটি মুগ্ধ বিনিদ্র রজনী যাপন করেছি। অপেক্ষাকৃত কম শিল্পময় কিন্তু বেশি প্রাণবন্ত চিমা ওকোরির পদধ্বনিতে সীমাহীন চাঞ্চল্য অনুভব করছি। এই ধরনের পরিস্থিতিতে মহৎ লেখকেরা কী করেন? যা তাঁদের আন্দোলিত ও আলোড়িত করে, তাকে লেখার বিষয়বস্তু করে তোলেন। আমি যে মহৎ লেখক তার আর-একটি বড় প্রমাণ এই যে চিমাকে নিয়েই আপাতত একটি রচনা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

অবশ্য আপনাদের উপেক্ষাধন্য বাবুরাম সাপুড়ের রচনাবলীর উৎস নিজের মস্তিষ্ক নয়, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক ও বক্তব্য।

অফিস থেকেই শুরু করা গেল। কাজের খাতিরে সামান্য নিষ্ঠুর অবশ্য হতে হল। আমাদের হাউসের ডেইলি পেপারের নিদ্রালু ফুটবল রিপোর্টার দুপুর পৌনে দুটো নাগাদ পাউরুটি-ঘুম মারছিলেন। আলসেমি অ্যাভয়েড করার জন্য উনি ভাত কদাপি ছোঁন না। প্রথমে সুড়সুড়ি পরে কুচো চিমটি তারও পরে স্বকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে তাঁর ঘুম ভাঙ্গিয়ে শুধোলাম, 'চিমাকে কেমন লাগছে ভাই?' কাঁচা পাউরুটি-ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ক্যান্টিনের বিখ্যাত স্টু-র মতো গম্ভীর মুখে রিপোর্টার ভাই পাল্টা জানতে চাইল, 'কে চিমা?'

একথা অবশ্য সত্যের খাতিরে স্বীকার করা প্রয়োজন যে মিনিট সাতেকের মধ্যেই

সে ধাতস্থ হয়ে নিদ্রা থেকে ফুটবলজগতে ফিরে আসে এবং নিটোল ইংরেজিতে জবাব দেয় : 'চিমা ইজ এ ভেরি গুড প্লেয়ার।' ছয় শব্দের এই মহামূল্যবান মন্তব্যে আমি সন্তুষ্ট হতে না পারায় আমাদের রিপোর্টার একটি সিগারেট ধরায় এবং সাতবার ধোঁয়া ছাড়ার পর জানায় 'চিমা ইজ এ প্রবলেম। সারাদিন এত খাটনি যে, বিকেলে ম্যাচের সময় প্রেস বক্সে গিয়ে চোখ বন্ধ করে একটু ঝিমোই। পাবলিকের প্রচণ্ড চিৎকার হলেই চোখ খুলি। হয় গোল, না হয় গোল মিস, না হয় দারুণ সেভ— যখন যা হয়, পাশের রিপোর্টারের কাছে তা শুনে নোটবুকে টুকে নিই। বাট চিমা ইজ এ প্রবলেম। ও আসায় মহমেডান ম্যাচে খুব ডিসটার্বড হচ্ছি। প্রচণ্ড চিৎকারে চোখ বুজে জানছি, চিমা ঠিক পাস করায় সেই চিৎকার, কখনও মিসপাস করায়, কখনও পড়ে যাওয়ায়, কখনও বল ট্র্যাপ করার জন্যও। এসব ম্যাচরিপোর্টে লাগে না, চোখ খোলারও দরকার নেই। কিন্তু মহমেডান সাপোর্টারদের অকারণ কন্টিনিউয়াস চিৎকারে আমাকে ঘন ঘন চোখ মেলতে হচ্ছে, ইন ফ্যাক্ট, কখনও কখনও আমি চোখ বন্ধ করারই টাইম পাচ্ছি না। ওকুপেশনাল হ্যাজার্ড!'

আমাদের ফোটোগ্রাফার সহকর্মী দারুণ ইউজফুল। ছবি তোলা ছাড়াও ওর ইউটিলিটি স্বীকৃত। যে রিপোর্টারের ম্যাচ কভার করার কথা, বাইচান্স সে মাঠে যেতে না পারলে এই ফোটোগ্রাফারের সাহায্য নিয়ে ম্যাচরিপোর্ট ম্যানুফ্যাকচার করা হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হয় কে কে বাজে খেলেছে? সে নাম বলে। রিপোর্টে তাদের ভাল খেলার কথা লেখা হয়। কে কে দারুণ খেলেছে? সে নাম বলে। তাদের জঘন্য খেলার কথা লেখা হয়। নিখুঁত ব্যাপার। অনেকটা কলকাতার আবহাওয়া অফিসের মতো। সুতরাং, ফোটোগ্রাফার বন্ধুর মতামত মূল্যবান। চিমা সম্পর্কে সে জানাল : 'চিমা ইজ ডেঞ্জারাস। অ্যাটাক করার সময় বড্ড বেশি হুড়মুড় করে আসে, গোলের পাশে বসে আমাদের বুক কাঁপে— এই বুঝি ঘাড়ে পড়ল। বুক কাঁপায় সামান্য হাতও কাঁপে এবং তাতে আমার ছবি এবং এডিটরের মেজাজ নষ্ট হয়। চিমার হাইটটাও মুশকিলের, ঘাড় উঁচিয়ে ছবি নিতে গিয়ে যন্ত্রণা হয়, অ্যাঙ্গেলে আমরা একটুও অভ্যস্ত নই কিনা।'

চিমার আবির্ভাবে রিপোর্টার ও ফোটোগ্রাফার বিব্রত— একথা শুনে বিস্মিত হলেন কলকাতার এক রেফারি। তিনি বললেন, 'চিমাকে নিয়ে ওদের কোন প্রবলেম হবার কথা নয়। ফটাফট লিখবে, ঠকাঠক শাটার টিপবে— কীসের প্রবলেম? আসল প্রবলেম আমাদের। ব্যাটার স্টেপিং এত বড় যে দৌড়ে কাছাকাছি যাওয়া যায় না। কুপার্স টেস্ট-ফেস্ট ভুলে যান। যা শটের জোর, কোনদিন নেটও ছিঁড়বে। দূর থেকে গোল কিনা বোঝাও মুশকিল। ন্যায্য গোল বাতিল হলে মাঠে মার খাব। অন্যায্য গোল দিয়ে দিলে পরদিন কাগজে ঝাড় খাব। চিমা ইজ রিয়েলি এ প্রবলেম।'

বিখ্যাত স্টপারের সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাকে এক পাও হাঁটতে হয়নি। নিন্দুকেরা ফুটবলারদের যতই পায়াভারী বলে রটান না কেন বিখ্যাত স্টপার নিজেই এসেছেন প্রেস বক্সে। রিপোর্টারদের প্রতি অসাধারণ সৌজন্য দেখিয়ে সে নিজেই সবার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে খবর দিচ্ছিল, কথা বলছিল। আমার কাছে এসে কিছু বলার আগেই ঝপ করে প্রশ্ন করে ফেললাম : 'চিমাকে কেমন লাগছে?' মাঠের দিকে চোখ রেখে বিখ্যাত স্টপার উদাসীন হলেন : 'হি ইজ এ প্রবলেম, হি উইল বি এ প্রবলেম। কলকাতা ফুটবলের

ছকটাই ও ভেঙে ফেলতে পারে। চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। এতকাল আপনারা কী দেখেছেন? মাঝমাঠ থেকে অথবা টাচলাইন থেকে উঁচু উঁচু বল ফেলা হয় বক্সে এবং অপনেন্ট স্ট্রাইকারকে গুঁতিয়ে স্পট জাম্প নিয়ে আমরা বল বার করে দিই, আপনাদের ভাষায় বল বিপদসীমার বাইরে পাঠাই। মাটিতে খেলা কলকাতায়, ফরচুনেটলি হয় না। তেমন জোরে শটও নেয় না কোন ফরোয়ার্ড। মানে, নিত না। চিমা ডিসিপ্লিন ভেঙে মড়মড় করে বেড়া ভাঙার মতো ঢুকতে চাইছে, গোলার মতো শট নিচ্ছে। এতকাল আমরা ফরোয়ার্ডদের শট নেওয়া আটকানোর রাস্তা খোঁজার চেষ্টা করিনি, দরকার ছিল না, সে সব বল ছোট টিমের গোলপোস্টের পিছনে বসা ফোটোগ্রাফার দাদা অথবা গ্যালারির সাপোর্টার ভাইয়েরা ধরে ফেরত দিত। তাই, এখন, চিমা ইজ এ প্রবলেম।'

নামী ফরোয়ার্ডকে ধরার জন্য আমাকে অবশ্য নিউমার্কেটে যেতে হল। আখরোট চিবোতে চিবোতে সে বলল, 'এখন ভাল শট নিলে পাবলিক বলছে প্রায় চিমার মতো শট, না নিতে পারলে বলছে আর কবে চিমার মতো হব? মাঠে আছাড় খেলে বলছে চিমার আছাড় কত এলিগ্যান্ট।

ভাল গোল করে লাফালে পর্যন্ত সমালোচনা— চিমার লাফ কত সুন্দর! গোল মিস করলেই আওয়াজ ছাড়ছে: 'মহমেডানের চিমা, আমাদের কিমা। গোলার মতো শটের কথা ভুলেই গেছিলাম, এ ব্যাটা মনে করিয়ে দিয়েছে। হি ইজ এ প্রবলেম।'

বড় গোলকিপারের বক্তব্য খুব পরিষ্কার। কফির ভাঁড়ে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, 'ছোটবেলা থেকেই আমাকে শেখানো হয়েছে, গোলকিপারের সবচেয়ে বেশি দরকার মনের জোর। নানারকম ব্যায়াম করে মনের জোর বাড়িয়েছি। এক কথায়, পেশিবহুল মন বানিয়েছি। কিন্তু কোন কোচ কখনও হাতের তালুর এবং আঙুলের জোর বাড়াতে বলেননি, সেইসব ব্যায়াম বাতলাননি। দরকার হয়নি। গত পাঁচ বছরে ঘণ্টায় তিন কিলোমিটারের বেশি স্পিডের শট পেয়েছি মোট সাড়ে তিনখানা, দেড়খানা লড়ে গিয়ে রুখেছি, দুখানা জালে লটকেছে। এবার হঠাৎ এ কী উপদ্রব। এর চেয়ে ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসের টেনশন অনেক ভাল, দলবদলের ব্যাপারটায় এখন দারুণ কন্ডিশনে আছি। পাঁচ বছর চিমা কলকাতায় থাকলেই সব শেষ। এই সময়ের বেশ কিছুটা যদি চিমার টিমে থাকা যায়, তবেই ভাল। জানি না সেই সৌভাগ্য হবে কিনা। চিমাকে নিয়ে ভাবনায় আছি। ইয়েস, চিমা ইজ এ প্রবলেম।'

প্রবীণ নির্বাচক মহোদয়ের এই রচনায় থাকার কথা ছিল না। কিন্তু থাকছেন। একলা বসে ছিলেন মাঠের ধারে, মহমেডানের ম্যাচ বহুক্ষণ শেষ হয়ে গেছে। তাড়া ছিল, তবু এগিয়ে গিয়ে ভদ্রতা করলাম: 'এনি প্রবলেম?' প্রবীণ নির্বাচক আকাশে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছুঁড়ে উচ্চারণ করলেন: 'চিমা! নির্বাচক হওয়ার সুখ সবচেয়ে বেশি অনুভব করা যায় যোগ্য প্লেয়ারকে বাদ দিয়ে। নাইজিরিয়ার সিটিজেন হওয়ায় চিমাকে বেঙ্গল টিমে এমনিতেই রাখা যাবে না। সুতরাং ওকে বাদ দিয়ে আনন্দ পাবার সুযোগ পাব না। হি ইজ এ প্রবলেম!

৯৭

এ কথা জেনে আপনারা নিশ্চয় পরম স্বস্তি অনুভব করবেন যে আমি স্পোর্টস জার্নালিজম ছেড়ে দিতে চাই। বছর কয়েক আগে এই লাইনে এসেছিলাম লাইনেরই কয়েকজন বন্ধুর এই আশ্বাসে যে এখানে বুদ্ধিশুদ্ধির দরকার নেই। কিন্তু, ক্রমশই বুঝছি দরকার, ভীষণভাবে দরকার। স্পোর্টস জার্নালিজমে হই হই করে এসে গেছে থিওরাইজেশনের যুগ। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর কোন কিছুই বিনা মন্তব্যে প্রকাশিত হবে না, সঙ্গে থাকতেই হবে থিওরি, আপ্তবাক্য। এসবই যদি ঝাড়তে পারব, তাহলে আর এ লাইনে এসেছি কেন? সময় চটপট পাল্টাচ্ছে। স্পোর্টস জার্নালিজমও হয়ত বুদ্ধিমান লোকেদের লাইন হয়ে উঠতে চাইছে। চাক। হয়ে উঠুক। আমাকে পালাতেই হবে।

এবং এটাই প্রথম ধাক্কা নয়। থিওরাইজেশনের আগেই এসে গেছে সাঙ্ঘাতিক স্পেশালাইজেশন। বাঘা রিপোর্টাররা কোন না কোন দিকে স্পেশালাইজ করেছেন। ধরন, যাঁর কাজ গত দশ-বিশ বছর রেজাল্ট-টেজাল্ট স্কোরটোর লেখা আছে, তিনি সব ম্যাচরিপোর্টে স্ট্যাটিসটিকস ছড়াবেন। 'গোল তখন দেবাশিসের বাঁ পা থেকে বড় জোর *সাড়ে সাত মিটার দূরে, গোলকিপার অসিত অসহায়। দেবাশিস সেই বল সেকেন্ড* পোস্টের পৌনে এগার মিটার বাইরে মারল। বড় ক্লাবে ছয় বছরের ফুটবল জীবনে অসহায় গোলকিপারকে একা পেয়েও এই নিয়ে সতেরবার গোল মিস করল দেবাশিস রায়।' অথবা ধরুন এইরকম : 'কলকাতা ময়দানে বড় ক্লাবের হয়ে দ্বাদশ মরসুমে ফুটবল জীবনের একাত্তরতম গোলটি করে গেল প্রসূন, কলকাতা লিগে সাবিরের একান্নতম ফাইনাল পাস থেকে।'

কেউ আবার চিকিৎসাশাস্ত্রে স্বীকৃত স্পেশালিস্ট। নমুনা এক : 'খেলার শুরুতেই মোহনবাগানের স্পাইনাল কর্ডে শিহরন জাগায় টালিগঞ্জের আশিস দত্তর দুর্দান্ত হাফভলি। এবং এগার মিনিটের মাথায় একটা চমৎকার ট্যাকল করার পরই যখন শ্যামল ব্যানার্জির অ্যাডেক্টর মাসল-এ টান ধরে, বুঝতে অসুবিধা হল না, দিনটা মোহনবাগানের নয়। হ্যামস্ট্রিং ইনজুরি নিয়েই মাঠে নেমেছিল ফরিদ, শ্যামল মাঠ ছাড়ায় মোহনবাগান রক্ষণ

ও মধ্যমাঠের বাঁ দিকটি আরও দুর্বল হয়ে পড়ে।'

নমুনা দুই : 'গতবছর অস্বস্তিকর জিয়ার্ডিয়ায় ভোগা বিদেশকে কোচ অমল দত্ত মাঠে আনেন সদ্য ম্যালেরিয়া থেকে ওঠা সুবীর সরকারের জায়গায়। পেশিতে টান ধরায় বিদেশকেও মাঠ ছাড়তে হয় প্রতি বছর অ্যামিবাইসিসে আক্রান্ত পায়াসকে জায়গা করে দিয়ে।'

বাঘা রিপোর্টাররা ইদানীং যে কোন ব্যাপারে থিওরাইজ করছেন। সবচেয়ে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার, একই লোক একই সপ্তাহে পরস্পর বিরোধী লিখছেন জুৎসই থিয়োরিসহ।

ধরুন, সপ্তাহের প্রথমার্ধে : 'আজ শূন্যে একটি বলেও মাথা ছোঁয়াতে পারেনি সাবির। সেই স্পট জাম্প কোথায় গেল? বয়স, বয়স বড় নির্মম। বয়স সাবিরকে ধরে ফেলেছে, বেঁধে ফেলেছে। আধুনিক ফুটবলে তাজা ক্ষিপ্রতার কোন বিকল্প নেই।'

এবং সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে : 'আজ সাবির শুধু চমৎকার হেডে মহমেডানের দ্বিতীয় গোলটিই করেনি, বারবার দুর্দান্ত স্পট জাম্পে ডিফেন্ডারদের পরাস্ত করে নিখুঁত হেডে বল নামিয়ে দিয়েছে সতীর্থদের পায়ে। বয়স কোন বাধা নয়, যদি প্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয় অদম্য মানসিকতা। ফুটবলে দক্ষতার কোন বিকল্প নেই।'

ধরুন, সপ্তাহের প্রথমার্ধে : 'আজ দর্শকদের মাতিয়ে গেল চিমা ওকোরি। দুটি গোলের একটি ডান পায়ে আর একটি বাঁ পায়ে এবং দুটিই বুলেট। প্রচণ্ড শক্তি এবং গোলক্ষুধা এই স্ট্রাইকারটিকে দিনে দিনে আরও ভয়ঙ্কব করে তুলবে। কলকাতার নতুন স্টারের নাম চিমা ওকোরি।' শক্তি, গতি এবং গোলক্ষুধা যার আছে, আধুনিক ফুটবলে তার জয়যাত্রা কে রুখবে?

এবং, হয়ত সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে : 'আজ চিমাকে মনে হয়েছে বোতলবন্দী দৈত্য। সারাক্ষণ গোল করার জন্য ছটফট করেছে, লাথি চালিয়েছে, এর ওর দিকে তেড়ে গেছে তীরবেগে, কিন্তু গোল পায়নি। শুধুমাত্র গতি আর শক্তিকে মূলধন করে ফুটবলে বেশিদূর এগোন যায় না, আজ তা প্রমাণ করার জন্যই বাহান্ন মিনিট মাঠে ছিল চিমা। দক্ষতাহীন গোলক্ষুধা শুধু হিংস্রতাই বাড়ায়, সাফল্যের দরজা খুলে দেয় না।'

ধরুন, সপ্তাহের প্রথমার্ধে : 'আজ বারবার উঠে এসেছে সুব্রত এবং মোহনবাগানের আক্রমণ গড়ে উঠেছে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মতো। আধুনিক ফুটবলে স্টপারকে হতে হয় কতখানি সচল এবং আক্রমণাত্মক, সুব্রত আজ তাই দেখিয়েছে অনায়াস দক্ষতায়। বয়স, এইজন্যই হয়ত বলা হয়, অন্তত দক্ষতায় মরচে ধরায় না।'

হয়ত, কে বলতে পারে, ওই সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে : 'আধুনিক ফুটবলের একটি মূল শিক্ষা আজ মোহনবাগান মাঠে মূর্ত হল : দক্ষতাও বয়স নিরপেক্ষ নয়। বারবার আক্রমণে উঠে আসার চেষ্টা করেছে সুব্রত এবং বারবারই লোকাভাবে বিপদে পড়েছে মোহনবাগানের অন্য তিন ডিফেন্ডার। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বল জমা পড়েছে প্রতিপক্ষ ডিফেন্ডারের পায়ে এবং পাল্টা আক্রমণ সামলানর জন্য দ্রুত নেমে আসার ক্ষমতা সুব্রতর

ছিল না। বয়সবৃদ্ধি একটি ঘটনা। ঘটনাকে স্বীকার করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।'

হয়ত সপ্তাহের প্রথমার্ধে : 'কোন সন্দেহ নেই, ভাস্কর এখনও ভারতসেরা। গোলকিপারকে হতে হয় কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিক, নাহলে কী করেইবা সে হবে বেপরোয়া, ঝুঁকি নিতে উৎসুক? সাহস, বিচারবুদ্ধি আর শারীরিক সক্ষমতার তুঙ্গে থাকা ভাস্কর আজ অন্তত তিনবার বুঝিয়ে দিয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ফুটবলে আত্মপ্রকাশের আট বছর পরেও সে একইরকম তরতাজা, তাকে উপেক্ষা করায় ক্ষতিই হয়েছে ভারতীয় ফুটবলের।'

এবং কিচ্ছু বলা যায় না, হয়ত ওই সপ্তাহেই দ্বিতীয়ার্ধে : 'আট নয় বছর আগে যে ছেলেটিকে দেখে দেশের সেরা ফরোয়ার্ডরা গোল করার বুট হারিয়ে ফেলত, সেই ভাস্কর গাঙ্গুলিকেই আজ একটি অপ্রত্যাশিত গোল খেয়ে প্রমাণ করতে দেখা গেল যে, সে আর শারীরিক ক্ষিপ্রতা ও দক্ষতার তুঙ্গে নেই। বিচারশক্তিরও অভাব দেখা গেল ভাস্করের গোলরক্ষায়, যা ওকে সেরা ফর্মেও কখনও নিখুঁত হয়ে উঠতে দেয়নি। ভাস্কর নিঃসন্দেহেই ভারতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছে।'

হয়ত সপ্তাহের প্রথমার্ধে : 'একবার নয়, বহুবার অপেক্ষাকৃত অনামীদের দিয়ে তিনি গড়ে নিয়েছেন প্রাণবন্ত বাহিনী। একজন নয়, অনেক অখ্যাত ফুটবলারকে তিনি তুলে এনেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। আজ অমল দত্তর মোহনবাগান শুধু তেলখাওয়া মেশিনের মতো চালুই ছিল না, মধ্যমাঠে এবং দুই প্রান্তে আজ কখনও কখনও ফুটে উঠেছে ফুটবলের দুরন্ত প্যাটার্ন— হারজিত ছাড়িয়ে যা নিয়ে ফুটবলের গর্ব। নবাগত স্বপন বসুকে প্রথম দলে আনার সাহসও দেখালেন অমল দত্ত, যা শুধু তিনিই পারেন। সৃষ্টিশীলতা, নিরীক্ষাপ্রবণতা এবং তারুণ্যনির্ভরতা— আধুনিক ফুটবলের এই তিন স্তম্ভের ওপর আজ স্থাপিত ছিল অমল দত্তের মোহনবাগানের ফুটবলমিনার।'

এবং, বলা যায় না, সম্ভবত সেই সপ্তাহেরই দ্বিতীয়ার্ধে : 'প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতাময় কলকাতা লিগ যে যথেচ্ছ পরীক্ষানিরীক্ষার উপযুক্ত নয়, এই চরম সত্যটি কোচ অমল দত্ত কবে উপলব্ধি করবেন? ব্যর্থ শিশির ঘোষকে মোহনবাগান আক্রমণের কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে স্থাপিত করে তারুণ্যের প্রতি অনুরাগের দৃষ্টান্ত কি স্থাপন না করলেই নয়? অমল দত্তর 'সৃষ্টিশীলতা'য় আজ শুধু মোহনবাগানকে দুটি পয়েন্ট খোয়াতে হয়নি, সবদিক দিয়েই হতবাক হতে হয়েছে তথাকথিত ছোট দলের কাছে।'

হয়ত সপ্তাহের প্রথমার্ধে : 'সত্তরের দশকের গৌরববৃত্তে পুনঃপ্রবেশে উন্মুখ ইস্টবেঙ্গল আজ ঝলমল করেছে ঝাঁঝে এবং সৌন্দর্যে। মাঠের সর্বত্র আজ ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা তৈরি করেছে অনুসন্ধানী ত্রিভুজ, কখনও কখনও ভেদশক্তিময় চূড়ান্ত আক্রমণ। ভারতীয় ফুটবলের মান যেখানেই পৌঁছে যাক না কেন, অন্তত এখনকার সেরা ভারতীয় ফুটবলাররা যে এবারে লাল-হলুদ জার্সিই পরছেন, আজ তা বুঝতে অসুবিধা হয়নি। প্রায় নিখুঁত গতিময় ইস্টবেঙ্গল আজ জানিয়ে দিয়ে গেল যে, পঁচাশির যাবতীয় ট্রফি তাদেরই তাঁবু আলো করার অপেক্ষায়।'

এবং, কে বলতে পারে, হয়ত ওই একই সপ্তাহের দ্বিতীয়ার্ধে : 'তফাত যে বড় জোর উনিশ আর বিশের— এই তথ্য কি ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরা আজ প্রথম জানলেন? ভারতের সেরা ফুটবলারদের পেয়ে সব ট্রফি জেতার স্বপ্নে মশগুল ইস্টবেঙ্গল জনতা ভুলে গিয়েছিল যে এখনকার সেরারাও এতই সাধারণ মানের যে, অন্যদের সঙ্গে তাদের তফাত ওই উনিশ-বিশের। উদ্দেশ্যহীন, অপরিচ্ছন্ন ও গতিহীন ফুটবল খেলে ইস্টবেঙ্গল আজ সত্তর মিনিট ধরে একথাই বুঝিয়ে দিয়ে গেল যে যাবতীয় ট্রফি মরসুমের শেষে বিখ্যাত টক আঙুর হিসাবে প্রতিভাত হতে পারে।'

৯৮

গত শুক্রবার রাইটার্সে অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী বিনয় চৌধুরির ঘরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক ছিল অত্যন্ত উত্তপ্ত, যদিও এয়ারকন্ডিশনার চালুই ছিল। ক্রীড়ামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিস কমিশনার, ডি জি, জয়েন্ট সি পি, ডি সি হেড কোয়ার্টার্স, ডি সি ডি ডি ওয়ান, চব্বিশ পরগনার এস পি এবং আরও অনেকে এক ঘণ্টা চুয়াল্লিশ মিনিটের আলোচনাতেও কোন পথ খুঁজে পাননি। ঘর থেকে প্রথম বেরিয়ে আসেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরতেই তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের সঙ্গে বলেন, 'যা বলার অ্যাক্টিং চিফ মিনিস্টারই বলবেন।' একে একে পুলিস নক্ষত্ররা বেরিয়ে আসেন মুখে কুলুপ এঁটে। এঁরা সকলেই শৃঙ্খলাপরায়ণ পুলিস অফিসার। রাতে খবরের কাগজে নিজের নিজের লোকদের ছাড়া প্রকাশ্যে প্রেসকে কিছু বলেন না। অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রী সাধাসিধে লোক। সরাসরি জানালেন, 'সমস্যাটা গভীর। আপনারা জানেন, বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেবার চক্রান্ত চলছেই। এখন চিমাকে নিয়ে কলকাতার ল অ্যান্ড অর্ডার যদি ভেঙে পড়ে এবং সেই গণ্ডগোল যদি গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই দাঙ্গায় যদি প্রচুর লোক মারা যায়, প্রেসিডেন্টস্ রুল জারি করতে দেরি করবেন জৈল সিং, আই মিন রাজীব গান্ধী? আমি বলেছি, এটা শুধু ল অ্যান্ড অর্ডার প্রোবলেম নয়, এটা একই সঙ্গে পোলিটিক্যাল প্রোবলেম। পোলিটিক্যাল দিকটা আমরা পার্টি এবং ফ্রন্ট স্তরে মোকাবিলা করব, পুলিস আইনশৃঙ্খলার দিকটা দেখুক। পুলিস অফিসাররা বলছেন, সিক্সটি সিক্সের মাস মুভমেন্টের পর এত বড় সমস্যায় এ রাজ্যের পুলিস আর পড়েনি। চিমা এমনিতে ফরেন সিটিজেন, থাকে ক্যালকাটা পুলিস এরিয়ায় এবং দাঙ্গা বাধাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিস এরিয়ায়। ওর চেহারাও আমাদের পুলিসের পক্ষে অস্বস্তিকর। হিন্দিতে ধমকালেও বোঝে না। এই দাঙ্গাবাজ......।'

সুভদ্র অস্থায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে এই সময়ে সন্তর্পণেই জিজ্ঞেস করেন এক রাইটার্স-রিপোর্টার : 'এই চিমা কোন কমিউনিটির লোক? কীভাবে এত বড় দাঙ্গা বাধাতে চলেছে?' অ্যাক্টিং চিফ মিনিস্টার বিস্মিত কণ্ঠে জবাব দেন— 'আপনি দেখছি কোন খবরই রাখেন না। চিমা সল্ট লেক স্টেডিয়ামে আর ময়দানে দাঙ্গা বাধিয়ে বেড়াচ্ছে, ফুটবল খেলার নাম করে,

ওর গায়ে নাকি তখন জার্সিও থাকছে। যাই হোক, আমি কাল আবার টপ লেভেল মিটিং ডেকেছি। উই মাস্ট ফাইন্ড আউট এ সলিউশন।'

১১ জুলাই, বৃহস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সি মহাশয়ের দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার হয়। তাঁকে জিজ্ঞেস করি, 'ইস্টবেঙ্গলের কলম্বো যাওয়ার ব্যবস্থা কি পাকা করে এসেছেন?' মুখের একপাশে সাফল্যের হাসি অন্যপাশে দুশ্চিন্তার রেখা ফুটিয়ে প্রিয়বাবু বললেন, 'দিল্লিতে গিয়ে খুরশিদ আলম খানের সঙ্গে কথা বলে সব ব্যবস্থাই পাকা করে ফেলেছিলাম। কিন্তু এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স মিনিস্ট্রি একটা নতুন ফ্যাচাঙে জড়িয়ে পড়ায় ব্যাপারটা একটু আনসার্টেন হয়ে গেছে। হঠাৎই ইন্ডিয়ার সঙ্গে নাইজিরিয়ার রিলেশন খারাপের দিকে মোড় নিয়েছে। নাইজিরিয়ার একজন সিটিজেন কলকাতায় এত বড় দাঙ্গা বাধাচ্ছে— এ ব্যাপারে উত্তেজিত গোটা পররাষ্ট্র দপ্তর। পররাষ্ট্র সচিব রমেশ ভাণ্ডারী থিম্পু থেকে স্ট্রেট যাচ্ছেন নাইজিরিয়ান ফরেন মিনিস্টারের সঙ্গে কথা বলতে। চিমার প্রবলেমটা না মিটলে, বুঝলেন, ইস্টবেঙ্গলের শ্রীলঙ্কা ফাইলে সই হবার চান্স কম। ফরেন সেক্রেটারি সই করার সময়ই পাবেন না।'

রেফারি প্রদীপ নাগ আমাদের বন্ধু লোক। টেস্থ জুলাইয়ের দাঙ্গার পর বেঁচেবর্তে আছেন কিনা; খোঁজ নিতে সি আর এ টেন্টে গেলাম। প্রদীপবাবুকে পেলাম না। কিন্তু ঢোকার মুখেই রেফারি সংস্থার এক তৎপর কর্তাকে অতিশয় গম্ভীর মুখে বসে থাকতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছেন?' তিনি মাথা নাড়লেন। 'তাহলে কি মায়াস্থেনিয়া গ্রেভিস?' অমিতাভ বচ্চনের অসুখটা তাঁরও হয়েছে— এটা অ্যাকসেপ্ট করার চান্স পেয়েও তিনি নিলেন না, ঘাড় নাড়লেন। 'তাহলে কি ময়দানে ফের গড়াপেটা শুরু হওয়ায় আপনি চিন্তিত?' এবার বিরক্তির সঙ্গে মুখ খুললেন ভদ্রলোক : 'দেখুন মশাই, ভাল তো কখনও বলেন না, মিছিমিছি আমাদের বদনাম দেন কেন? গট আপ দেখে আমরা কবে চিন্তিত হয়েছি? আমরা শুধু বাঁশি বাজাব, যে যেরকম খেলা খেলতে চায় খেলুক। রেফারিরা পার ম্যাচ পনের টাকা পায়, তবু আমরা আপত্তি করি না। সব কিছু মেনে নিই। কিন্তু এই চিমার চিন্তায় আমাদের চোখে ঘুম নেই, বুকে বল নেই, জিভে পরচর্চা পর্যন্ত নেই।

সাতদিনের মধ্যে চিমাকে হোল লাইফের জন্য সাসপেন্ড না করলে আমরা আর ম্যাচ খেলাব না। কথার কথা নয়, লিখে নিতে পারেন, আই এফ এ সেক্রেটারি নিজের ঘরে মিটিংয়ে না ডাকলে আমরা কিছুতেই ডিসিশন থেকে নড়ব না।

আই এফ এ-র সহকারী সচিব বিকাশ রায়চৌধুরিকে বেশ চিন্তিত অবস্থায় দেখলাম। বললাম, 'মশাই, আপনার আবার চিন্তা কীসের? যে রেটে আপনার মিলন সমিতি পয়েন্ট তুলছে, সেকেন্ড ডিভিশন লিগ পেল বলে। নেকস্ট ইয়ার ফার্স্ট ডিভিশন 'বি' গ্রুপ, তার পরের বছর 'এ' গ্রুপ, তার পরের বছর ফেডারেশন কাপে চান্স পেয়ে এ ভাবেই জিতেটিতে ট্রফিটা তুলতে পারলে তবে তো এশিয়া কাপে যাবার চিন্তা, ভিসার চিন্তা, পয়সার চিন্তা। হাতে সময় প্রচুর। প্লিজ, আপনি এখনই চিন্তা করবেন না।'

বিকাশবাবু বললেন, 'মেলা চালাকি করবেন না। গট আপ ম্যাচ খেলছি বলে আওয়াজ দিচ্ছেন? আপনাদের মতো সেনসেশন বেচে খাই না, বুঝলেন? ভেবেছিলাম, প্রদ্যুৎ দত্তর জমানায় গট আপ ম্যাচ খেলব না। উঠি নামি নাহি লাজ, হাড্ডাহাড্ডি লড়ে যাব সব ম্যাচে। চিমা সব গণ্ডগোল করে দিল। হাড্ডাহাড্ডি লড়াই মানেই টেনশন, টেনশন মানেই মারামারির চান্স, ক্যালকাটা পুলিস এখন চিমাকে নিয়ে এতই চিন্তিত আর ব্যস্ত যে অন্য দিকে নজর দেবার সময় নেই, ক্লাবে এম পি-র ভাই দাদা থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। আই এফ এ-র একজন রেসপনসিবল অফিস বেয়ারার হিসাবে আমি ময়দানের ল অ্যান্ড অর্ডার প্রবলেম বাড়াতে চাই না।'

—'তাহলে চিমার জন্যেই আপনাদের গট-আপ ম্যাচ খেলতে হচ্ছে?'

জবাবে বিকাশবাবু বেশ অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে তাকালেন। সম্ভবত সেই দৃষ্টির অর্থ— 'একজাক্টলি সো!'

সল্ট লেক স্টেডিয়ামে এস এস এস অফিসে গিয়েছিলাম উড বি মেয়র কমলকুমার বসুকে (শোনা যাচ্ছে আর একবার 'হু ইজ কমলকুমার বসু' লিখলেই উনি চিফ মিনিস্টার হয়ে যাবেন) অভিনন্দন জানাতে। তাঁর ঘরের বাইরে একশ সাতাশজন ঠিকাদারকে মর্মস্পর্শী সমবেত বিলাপসঙ্গীতে মগ্ন দেখা গেল। গত এক বছরে কাজ করে তাঁরা এক পয়সাও পাননি এবং কে কে বাসু একবার কর্পোরেশনে বসে গেলে আর হোল লাইফেও নাকি পাবেন না! উত্থান মানুষকে বিনয়ী করে। প্রসিদ্ধ সলিসিটার, বনেদী ঘরের বামঘেঁষা রূঢ়ভাষী এস এস এস সচিব মুখে মেয়রের হাসি মেখে বললেন, 'পাবেন পাবেন, ওঁরা ওঁদের পাওনা টাকা বছর দশেকের মধ্যেই পেয়ে যাবেন। ভেবেছিলাম এবারই কিছু দিয়ে দেব। কিন্তু চিমা হ্যাজ চেঞ্জড আওয়ার প্ল্যান। চিমার হাত থেকে অপোনেন্ট টিমের প্লেয়ার এবং সাপোর্টারদের বাঁচানোর জন্য স্টেডিয়ামে ইমিডিয়েটলি কয়েক লক্ষ মিটার কাঁটা তার এবং কয়েকশ টন লোহার শিক দরকার। হাতে যা আছে, সব এতেই চলে যাবে। ভেবেছিলাম, আর একবার লটারি করে আরও কিছু টাকা তুলব। কিন্তু কলকাতার লোক আর এস এস এস কার্ডের জন্য লোভ কববে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত চিমার হাত থেকে বাঁচার ব্যবস্থা আমরা স্টেডিয়ামে গড়ে তুলতে না পারি। অন্য সব খরচ এখন তাই বন্ধ। বাইরে ওঁরা কাঁদছে কাঁদুক, কাল-পরশুই থেমে যাবে, বেশি দম নেই।'

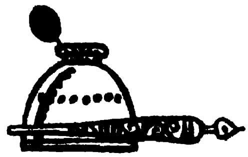
পূর্তমন্ত্রী যতীন চক্রবর্তী গত পরশু এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন যে আপাতত কলকাতার রাস্তাঘাট মেরামতের কাজে হাত দেওয়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বর্ষা নেমে গেছে। এবং প্রথমত, চিমার ভয়ে পাবলিক ইতস্তত না ছুটে যাতে নির্দিষ্ট জায়গায় লুকোতে পারে, সেজন্য বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে কিছু পাকা ট্রেঞ্চ বা ফোর্ট তৈরি করা দরকার।

বিদ্যুৎমন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেছেন যে গোটা ফুটবল মরসুমেই কলকাতাকে লোডশেডিংমুক্ত রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছে— যাতে চিমা অন্ধকারে দাঙ্গা বাধানোর সুযোগ না পায়।

এবং গতকাল গভীর রাতের খবর, স্বাস্থ্যপরীক্ষা অসমাপ্ত রেখেই মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু লন্ডন থেকে কলকাতায় ফিরে আসার কথা ভাবছেন। চিমা সমস্যা নিয়ে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে তাঁর নাকি অবিলম্বে কথা বলা দরকার। তাঁর অনুপস্থিতিতে চিমা দাঙ্গা বাধাক এবং সেই সুযোগে বামফ্রন্ট সরকারকে ফেলে দেওয়া হোক— এটা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না।

পুনশ্চ : প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, গত এক সপ্তাহ আমি প্রখর ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং ব্রঙ্কাইটিসে আক্রান্ত। এখনও জানি না, এজন্যও চিমা ওকোরি দায়ী কিনা।

৯৯



ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে না বললেও সবাই জানেন, আমি হচ্ছি ঘোলা জার্নালিস্ট। দুর্বুদ্ধি না থাকলে বড় হওয়া যায় না এবং আমার দুর্বুদ্ধি থাকার কোন চান্স ছিল না, নেই। রেকর্ড সময়ে, মাত্র সাড়ে তিন বছর বয়সেই আমার ঘটে যতটুকু বুদ্ধি ঢোকার ঢুকে গিয়েছিল। ওই বয়স দুর্বুদ্ধি গজানর পক্ষে যথেষ্ট নয়। দুর্বুদ্ধি তথা বুদ্ধি কম থাকায় আমার একটি খাতা আছে। ব্লু বুক। নীল মলাটের বড় নোট বুক। খেলাধুলো এবং ময়দান সম্পর্কে হাজার ইনফর্মেশন, ডেফিনেশন তাতে টোকা আছে। দিনে অন্তত একষট্টিবার এই নোটবুক আমাকে খুলতে হয়, হাতে নীল নোটবুক, চোখে পবিত্র অজ্ঞতা, কানে ভোঁতা পেন্সিল— আমাকে তখন একটু একটু জার্নালিস্ট দেখায়, বিশ্বাস করুন!

সম্প্রতি একটি দায়িত্ব পাওয়ার পর বারবার নোটবুক খুললাম বন্ধ করলাম, কিন্তু 'বিশেষজ্ঞর' ডেফিনেশন খুঁজে পেলাম না। এক চিকলেট উৎপাদন সংস্থা কলকাতা টুঁড়ে জার্নালিস্ট খুঁজে বার করে এই বাবুরাম সাপুড়েকে এবং দায়িত্ব দেয় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের সেরা ফুটবলার বাছার— বিশেষজ্ঞদের মতামতের ভিত্তিতে। বিরাট পুরস্কার, কিন্তু শর্ত একটাই 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'-এর ব্যাপারে অধিকাংশ বিশেষজ্ঞদের একমত হতে হবে। 'বিশেষজ্ঞ' কে বা কাবা, 'বিশেষজ্ঞ'র ডেফিনেশন কী, এসব ব্লু বুকে না পাওয়ায় এক সর্বজ্ঞ জার্নালিস্টের ড্রইং রুমস্থ হতে হল। তিনি খোলসা করে বললেন, 'একজন 'বিশেষজ্ঞ'র কোন ডেফিনেশন দেওয়া যায় না। তবে দুই বা তার চেয়ে বেশি 'বিশেষজ্ঞ'র ডেফিনেশন দেওয়া যায়। 'কোন বিশেষ ব্যাপারে যারা একমত হন না— তাদেরই 'বিশেষজ্ঞ' বলা হয়।' নোটবুকে আমিই টুকে নিলাম, কিন্তু মানে বুঝলাম পরে, কাজে নেমে।

বিশে জুলাই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ শেষ হবার আগেই কাজে নেমে যাই। 'বিশেষজ্ঞ' বলতে ঠিক কী বোঝায়, এ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা না থাকায় সেফ লাইনে থেকে মূলত এক্স-প্লেয়ারদের সঙ্গে কথা বললাম। এক নম্বর এক্স-প্লেয়ার কাম-এক্সপার্ট তখনও মন দিয়ে খেলা দেখছেন, হাঁটুতে টোকা মেরে জিজ্ঞেস করলাম, 'ম্যান অফ দি ম্যাচ কাকে মনে করছেন?'— 'এখনও তিন মিনিট বাকি, তবু লিখে নিন, প্রশান্ত ব্যানার্জি।

একে বলে গেমমেকিং, বুঝলেন। গোল খেয়েও কেমন ম্যাচটা ধরে রাখল, গোল করাল। ওর কাছাকাছি কাউকে দেখছি না।'

চিকলেট কোম্পনির বড় প্রাইজ প্রশান্তর কপালে নাচছে ভাবতে ভাবতে দু'নম্বর এক্স প্লেয়ার কাম এক্সপার্টের কাছে গেলাম। তিনি হতাশ করলেন : 'ম্যান অফ দি ম্যাচ'? আবার কে, দেবাশিস মিশ্র। ফার্স্ট হাফে ডান দিক দিয়ে কীরকম অপারেট করল, দেখলেন?' আমি প্রশান্তর নাম বললাম। তিনি হাসলেন: 'কী যে বলেন! প্রশান্ত কটা ভাল পাস বাড়িয়েছে ঠিকই, কিন্তু দেবাশিসের মতো অপোনেন্ট ডিফেন্সকে ফাঁকি দিতে পেরেছে? যদি কিছু ফুটবল খেলে থাকি, তার জোরে বলছি, আজকের ম্যান অফ দি ম্যাচ— দেবাশিস মিশ্র।'

খেলা শেষ হয়ে গেছে। তাই দৌড়ে দৌড়ে অন্যদের মতামত নিতে হল। তিন নম্বর এক্স প্লেয়ার কাম এক্সপার্ট দুই যুবককে বোঝাচ্ছিলেন, আজকের স্টারদের চেয়ে তিনি কত বড় ফুটবলার ছিলেন। ডিসটার্ব করতেই জবাব দিলেন, 'খেলা বুঝলে একটা লোককেই ম্যান অফ দি ম্যাচ বলতে হবে— জামশিদ নাসিরি। ফ্যান্টাস্টিক গোল করল, দেবাশিস আর বিশ্বজিৎকে দুটো গোল ওপেন করে দিল, গোটা ম্যাচ বাবলুকে নাকাল করল, একজন ফরোয়ার্ড কী করবে?' আমি দেবাশিস মিশ্রর নাম বললাম। তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন : 'নন-টেকনিক্যাল লোকেদের নিয়ে এই হল মুশকিল! মশাই ।'

ইস্টবেঙ্গলের তিন হাফের বিরুদ্ধে মাঝমাঠে মোহনবাগান খেলছিল দুই হাফ নিয়ে। প্রশান্ত ভার্সাস সুদীপ (পরে সুনির্মল), মিহির ভার্সাস বিকাশ, দেবাশিস মিশ্র ছাড়া ছিল। তাই খুব দৌড়েছে। এগারবার হানড্রেড মিটার স্প্রিন্ট টেনেছে, কিন্তু কটা গোল করেছে, কটা ফাইনাল পাস করেছে? জামশিদ, জামশিদ, আর কোন নাম নেই।'

'জামশিদ, জামশিদ, আর কোন নাম নেই'— চার নম্বর এক্স প্লেয়ার কাম এক্সপার্টকে গিয়ে বললাম। তিনি তাচ্ছিল্যের ত্যারছা ব্যাটে আমাকে ফ্লিক করে বললেন : 'কোন্ মূর্খ একথা বলে? হ্যাঁ, জামশিদ গোলটা ভাল করেছে, দু-চারটে বল ভাল জায়গায় রেখেছে, কিন্তু তাই বলে একেবারে ম্যান অফ দি ম্যাচ? কৃষ্ণগোপাল কি বানের জলে ভেসে এসেছে? এই পারফরমেন্স-এর পরও ওকে ম্যান অফ দি ম্যাচ বলা হবে না? জামশিদ ভাল খেলেছে সেই সময়ে, যখন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে চেপে ধরেছে। মোহনবাগান ডিফেন্স বলতে কিছু তখন ছিল না। সঙ্গে ইস্টবেঙ্গল পাবলিকের চিৎকার। কিন্তু কৃষ্ণগোপাল যখন মোহনবাগান হারছে, কোণঠাসা, সাপোর্টাররা চুপচাপ, বলতে গেলে একাই ম্যাচটা ঘুরিয়ে দিল। একে ম্যান অফ দি ম্যাচ না বললে পাপ হবে ভাই।'

পাঁচ নম্বর এক্স (প্লেয়ার + পার্ট) নামার মুখে সিগারেট ধরিয়ে বললেন, 'অ্যাট লিস্ট টু মি, সুদীপ চ্যাটার্জি ইজ দ্য ম্যান অফ দি ম্যাচ। একে বলে কমপ্লিট ফুটবলার মানে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডে। মাঝমাঠে রাজা, ডিপ ডিফেন্সেও রাজা। উনিশ মিনিট দেখাল, মাঝমাঠে লিডারশিপ কাকে বলে। পরের একান্ন মিনিট দেখাল, ডু অর ডাই ডিফেন্স কাকে বলে।' আমি কৃষ্ণগোপালের নাম বললাম। তিনি : 'বুকে হাত দিয়ে বলুন তো,

গোলটা না করতে পারলে কৃষ্ণগোপালের নাম কেউ তুলতেন? পঁয়ত্রিশ মিনিটে দুটো দৌড় আর তিনটে ধাক্কা ছাড়া ওর কাছে আর কী পাওয়া গেছে? অলোক বল জমা দিল, বিকাশ জায়গায় ছিল না, বলাই জঘন্য ফাইনাল ট্যাকল করল, তরুণ লেট অ্যাকশন নিল, ভাস্কর খোঁড়া পায়ে গোল ছেড়ে ফালতু দু স্টেপ এগিয়ে এল। হ্যাঁ, পাওয়ারফুল রান অ্যান্ড গুড গোল, কিন্তু শুধু এতেই ম্যান অফ দি ম্যাচ হয় না। সুদীপ ইজ অ্যান এ্যাসেট, সুদীপ ইজ আনপ্যারালাল, সুদীপ ইজ...'

পাঁচ নম্বরের কথা শেষ হওয়ার আগেই ছ'নম্বর এক্স-এর দিকে ছুটে গেলাম। তিনি নামতে শুরু করেছেন। বললেন : 'সবচেয়ে ভাল খেলেছে কৃষ্ণেন্দু। আপনারা সব বিশ বছর ধরে এক খেলা দেখে অভ্যস্ত। গোলের মুখে উঁচু উঁচু লব। স্টপার টকাস টকাস করে পাঁচটা হেড করলেই সে ম্যান অফ দি ম্যাচ। স্ট্রাইকার পাঁচটা বলে মাথা ছোঁয়ালেই সে হিরো। সাইড ব্যাকের খেলা বুঝতে মগজ লাগে, বুঝলেন। সত্তর মিনিট যেরকম পেসে নেমে উঠে কৃষ্ণেন্দু খেলে গেল, তার দাম কে দেবে? আশি গজ দৌড়ে এল, একবার ইস্টবেঙ্গলের কেউ বাধা দিতে পারল না, মোহনবাগানের কেউ সাপোর্ট দিতে পারল না। সাইডব্যাকরা চিরকালই অবহেলিত, তাই কৃষ্ণেন্দুর নাম সবাই বলছেন না।' আমি সুদীপের নাম করলাম। তিনি : 'ইয়ার্কি মারছেন না তো? সুদীপ আজ খেলল কোথায়? মিডফিল্ডে যতক্ষণ ছিল, মিহির-প্রশান্তকে দমাতে পারেনি, যা খেলার খেলেছে দেবাশিস। স্টপারে গিয়ে গোল বন্ধ করতে পারেনি, কৃষ্ণকে রুখতেও পারেনি। আন্দাজে একটা নাম বলে দিলেই হয় নাকি?'

সাত নম্বর এক্স স্টেডিয়ামের লাউঞ্জে প্রশস্ত সোফায় বসে ঘুমোচ্ছিলেন। ঠেলে তুলে বললাম, 'ঘুম ভাঙাচ্ছি বলে কিছু মনে করবেন না, প্লিজ। ম্যান অফ দি ম্যাচ......?' চোখ কচলে তিনি— 'মোটেই আমি ঘুমোচ্ছিলাম না, চোখ বুজে ভাবছিলাম।' কী ভাবছিলেন? 'ভাবছিলাম মিহিরের কথা। ভেবে দেখুন, এই ছেলেটাই আট বছর আগে, সেভেন্টিসেভেনের বিগ লিগম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে জিতিয়েছিল। আট বছরে গঙ্গায় কত জল বহে গেল, অশোক মিত্র মুছে গেল, মিহিরের সব চুল উঠে গেল, কিন্তু আজও মাঠে প্লেয়ার সেই মিহির বোস। কী ওয়ার্কলোড নিল, দেখলেন? প্রশান্ত আর কৃষ্ণ তো খেলে গেল মিহিরের জোরেই। আমি বলছি, সবাই বলুন, ম্যান অফ দি ম্যাচ— মিহির।' আমি কৃষ্ণেন্দুর নাম বললাম। তিনি : 'আপনি সুস্থ তো? ফার্স্ট হাফে ওর দিক দিয়ে ক্যান্টার করে গেল ইস্টবেঙ্গল, আর আপনি বলছেন কৃষ্ণেন্দু ম্যান অফ দি ম্যাচ?'

আট নম্বর এক্সকে ধরা গেল স্টেডিয়ামের বাইরে, গেটের সামনে। 'আজকের ম্যাচটা একজন ফুটবলারের জন্যই স্মরণীয় হয়ে থাকবে।' আশায় কান পাতলাম। প্রশান্ত, দেবাশিস, জামশিদ, কৃষ্ণগোপাল, সুদীপ, কৃষ্ণেন্দু, মিহির— সাতটা নাম আগেই পাওয়া গেছে। অষ্টম এক্স এদের মধ্যে একজনের নাম বললেই তাকে অধিকাংশের পছন্দ বলে চালানোর একটা চেষ্টা চালান যাবে। অষ্টম বললেন : 'বল নিয়ে খেলা আর বল ছাড়া খেলা— সব মিলিয়েই একজনকে সেরা বলা হয়। আজ প্রথম উনিশ মিনিট সুব্রতর

ব্যর্থতায় মোহনবাগান ডিফেন্স যখন ভেঙে গেছে, মনোরঞ্জনের নেতৃত্বে ইস্টবেঙ্গল ডিফেন্স অটুট ছিল। ততক্ষণ পর্যন্ত মনাই মাঠের বেস্ট ডিফেন্ডার। মাঠ থেকে চলে যাবার পর, ও যখন বল থেকে দূরে, অফ দি বল, তখনও মনাই ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াল। ও থাকলে ইস্টবেঙ্গল জিততই। মাঠের বাইরে যাবার পরেও ওর ব্যাপারটাই সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর হল। খেলে এবং না খেলে একটা ম্যাচকে যে এভাবে ইনফ্লুয়েন্স করে গেল, তাকে ম্যান অফ দি ম্যাচ বলব না?'

ধোঁয়া উড়িয়ে তিনি বিদায় নিলেন। সেই ধোঁয়াটে রঙের ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লাম : বিশেষজ্ঞ শব্দের মানে বোধহয় বুঝেছি।

১০০

এই সেই পুণ্যতোয়া নালা। এখন আর জল তেমন ঘোলা নাই, একদা এখানে কাদা থিকথিক করিত, পারাপারের সময় পবিত্র তরল কর্দমে ফুটবলপ্রেমীদের পেন্টালুন বাটিকাচিত্রিত হইত। কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র 'হু ইজ কমলকুমার বসু' উনিশ'শ চুরাশির এক আগস্ট প্রভাতে এই পাকা নালার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঐতিহাসিক কাঁচা নালাটির নির্মাণকার্য কর্পোরেশন ও পূর্ত বিভাগের অভূতপূর্ব কর্মতৎপরতায় মাত্র সাড়ে তিন বৎসরে সমাপ্ত হয়। আই এফ এ-র প্রস্তাবে ক্রীড়ামন্ত্রীর সমর্থনে এবং মেয়র তথা এস এস এস সচিবের অনুমোদনে নাম রাখা হয় 'আচার্য এম দত্তরায় নালা।'

এই সেই সুবিখ্যাত নালা, শতবর্ষ আগে যাহার আশেপাশে এক সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় এগারটি দর্শনীয় গড়াপেটা ম্যাচ। ভাবিলে শিহরন জাগে যে ঘাসে বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছি, যে বৃক্ষের তলায় বসিয়া আছি সেই ঘাসের পূর্বপুরুষেরা কী সব মহাপুরুষদের পাদুকাধূলিতে ধন্য, এই বৃক্ষেরই ছায়ায় কত গড়াপেটার প্যাঁচ কষা হইয়াছে, এই পুণ্য ভূমিতেই কী নিপুণ মমতায় রচিত হইয়াছে কত সৎ ক্লাবের সমাধি। ভাবিলে সত্যই রোমাঞ্চ জাগে, আমার পশ্চাতে কুলু কুলু স্বরে প্রবহমান নালার আশেপাশেই চার ইতিহাসবিখ্যাত মাঠ— টাউন, ইউনিভার্সিটি, বি জি প্রেস এবং ওয়াই এম সি এ। শতবর্ষ আগে পুণ্য নালাসন্নিকটবর্তী এই চার প্রাঙ্গণে এক মাসে অভিনীত হইয়াছিল একচল্লিশটি গড়াপেটা ম্যাচ।

সম্মুখে প্রোথিত এই নীল বর্ণ স্মারক খুঁটিটি সগর্বে এক মহান শিক্ষকের কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। ওইখানে, ঠিক ওইখানে, শতবর্ষ আগে এক কাষ্ঠনির্মিত কেদারায় উপবিষ্ট হইয়া মুহূর্মুহূ ওষ্ঠ সঞ্চালন করিয়া সুবার্বান ক্লাবের শিক্ষক মহামতি মনা ঘোষ তাঁহার ছাত্রদের গড়াপেটা খেলার খুঁটিনাটি নির্দেশ পর্যন্ত বিতরণ করিয়াছিলেন। টাউন মাঠে সগর্বে দণ্ডায়মান উচ্চশির ওই স্মৃতিস্তম্ভ, ভারতীয় ফুটবল ও সংস্কৃতির মহান কীর্তির সুদৃশ্য মিনার। একশত দুই বৎসর পরেও স্মরণ করিলে হৃদয়ে নৃত্য জাগে, ওই মাঠেই অনুষ্ঠিত হয় একশত চৌদ্দ গোলের চিরস্মরণীয় ম্যাচ। সত্তর মিনিটে একশ চৌদ্দ গোল। অহো। শতবর্ষ আগে ভারতীয় ফুটবল কী দুর্ধর্ষ স্বর্ণশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এখন আর সে

রামও নাই, অযোধ্যাও নাই। বলা বাহুল্য গড়াপেটাও নাই। একশ চৌদ্দ গোল দূরে থাক এখন কোন ম্যাচে চৌদ্দ গোলই হইতে চায় না। ভারতীয় ফুটবলের মান তলানিতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। বিশেষজ্ঞদের বিশেষ সাক্ষাৎকার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। সাতচল্লিশ বিশেষজ্ঞ সাতাত্তর প্রকার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। কাজের কাজ কিছুই হইতেছে না। সে রাম নাই, সে রাম গাঙ্গুলি নাই, সে অযোধ্যা নাই, সেই দুর্নীতিশোভিত আই এফ এ-ও নাই, নাই নাই, কিছুই নাই, এক ম্যাচে একশ চৌদ্দ গোলের আর কোন সম্ভাবনাই নাই।

অদূরে 'গড়াপেটা রোড'— একদা ইহা 'রেড রোড' নামে খ্যাত ছিল। বেশ কিছু দূরে, এই ময়দানেই পুণ্য তালতলা মাঠ, একশত দুই বৎসর পূর্বে মহান ফুটবল নৃত্যে রত বাইশজন ফুটবলার এবং ষোলজন কর্মকর্তা আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া মাত্র আশিটি গোলের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছিলেন। মহান পরাজয়ের স্মৃতিতে সেখানে একটি অনুচ্চ শহিদ বেদি স্থাপিত।

মৃদুমন্দ বাতাস বহিতেছে, কিন্তু কিঞ্চিৎ সূর্যকিরণও বিরক্ত করিতেছে। তবু উঠিতে মন চাহে না। স্মরণ করিলে গাত্রকণ্টক হয়, মাত্র পাঁচ গজ দূরে, ওই পীতবর্ণরঞ্জিত শৃঙ্খলবেষ্টিত জমিতেই একদা তিন যুযুধান গড়াপেটাবিখ্যাত ক্লাবের একশজন বীর কর্মকর্তা একযোগে এক ক্ষীণকায় সাংবাদিকের উপর চড়াও হইবার মহান প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সুবার্বানের শিক্ষক তথা বিংশ শতাব্দীর সর্বাধিক বিখ্যাত মারমুখী ফুটবলার মহামতি মনা ঘোষ উত্তেজনায় পা হড়কাইয়া ভূমিশয্যা নিয়াছিলেন। বৃষ্টিতে মাঠ পিচ্ছিল ছিল। কিঞ্চিৎ কোমলও ছিল, মহামতি শিক্ষকের দেহভারে সেই যে মাঠের ওই অংশ সামান্য নিচু হয়, অদ্যাপি তাহা সংরক্ষিত। কে বলে বাঙালি ইতিহাসসচেতন নহে?

এখন আমার পৃষ্ঠদেশে যে ঈষদুষ্ণ বাতাস টোকা মারিতেছে, তাহাতে পবিত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণের স্পর্শ আছে। ওই সেই পুণ্য ক্রীড়াভূমি, একদা যেখানে ম্যাচ হারিয়া ম্যাচ জিতিয়াছিল একটি ক্লাব। মাঠে গোল খাইলেও রেফারির রিপোর্টে তাহারা গোল দিয়াছিল। কর্তব্যপরায়ণ রেফারি আড়াই বৎসরের মধ্যে আন্তর্জাতিক প্যানেলে প্রবেশাধিকার পাইয়া পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মর্মর মূর্তি ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে স্থাপিত, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় রৌদ্রবৃষ্টিতে ফলক হইতে তাঁহার নাম মুছিয়া গিয়াছে। নাম মুছিয়াছে, কিন্তু তাঁহার কীর্তি বাঁচিয়া আছে। হে প্রাতঃস্মরণীয় রেফারিকুলতিলক, তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ, শুধু দুঃখ, তোমার নামটাই মুছিয়া গিয়াছে।

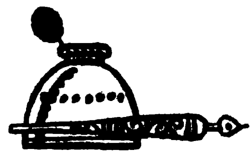
আমার সম্মুখে সুখনিদ্রায় শায়িত ওয়াই এম সি এ মাঠ, শতবর্ষ পূর্বে এই মাঠেই শেষ ম্যাচে এক পয়েন্টের দরকার থাকা সত্ত্বেও উয়াড়ির সমর্থকরা খেলার আগেই পটকা ফাটাইয়া দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ চ্যাম্পিয়ন হইবার বিজয়োৎসব শুরু করিয়াছিলেন। ঐতিহ্যশালী ক্লাবের রুচিবান সমর্থক ও অতিরিক্ত খেলোয়াড়দের স্মৃতিতে ওইখানে, আমার ঠিক বিপরীত প্রান্তে, শ্বেতবর্ণরঞ্জিত স্মৃতিবেঞ্চি প্রোথিত হইয়াছে। শতবর্ষ পূর্বে বেঞ্চি ছিল না, বেঞ্চিলাঞ্ছিত প্রাঙ্গণের ওই অংশে বসিয়া অতিরিক্ত ফুটবলাররা এবং

দাঁড়াইয়া অতিরিক্ত সমর্থকরা শতাব্দীর সেরা গালিবর্ষণ করিয়াছিলেন। ঐতিহ্যশালী ক্লাবের গড়াপেটা ম্যাচ খেলিবার মৌলিক অধিকার কতিপয় সংবাদপত্র স্বীকার করে নাই, সেজন্যই ওই ঐতিহ্যময় ও প্রতিবাদী গালিবর্ষণ। শ্বেতবর্ণরঞ্জিত ওই বেঞ্চিতে বসিয়া চোখ বুজিলে এখনও নাকি সেই গালিগালাজের মৃদু কলতান অনুভব করা যায়।

আমি ভ্রমণপিপাসু। বোম্বাইয়ে নারীমুক্তির এক অনমনীয় প্রবক্তার প্রস্তরমূর্তি দেখিয়াছি। যিনি সহধর্মিণীকে নিয়মিত ঠেঙাইতেন। আর এই কলিকাতায়, পার্শ্ববর্তী বি জি প্রেস প্রাঙ্গণেই স্থাপিত হইয়াছে তদানীন্তন আই এফ এ-র এক সহসচিবের কাষ্ঠমূর্তি। যিনি গড়াপেটার বিরুদ্ধে আজীবন বক্তৃতা ঝাড়িয়াছেন এবং রেলিগেশন ফাইট করিতে করিতে টানা নয়টি গড়াপেটা ম্যাচ খেলিয়া প্রায় রানার্স আপ হইতে চলিয়া ছিলেন। আহা, কাষ্ঠমূর্তিতে পোকা ধরিয়াছে, কিন্তু সেই নিরহঙ্কার কর্মযোগীর ভাবমূর্তি আজিও সমান উজ্জ্বল।

রৌদ্রের তেজ বাড়িতেছে। পিঠ এবং মস্তকের চাঁদি উঠিতে চায়, কিন্তু মন চাহে না। এই বৃষ্টিহীন আশ্চর্য আগস্ট প্রভাতে এই স্মৃতিবিজড়িত পবিত্র প্রান্তরকে আমি এককভাবে শুধু অবলোকন নয়। অনুভব করিতেছি। গড়াপেটার নির্মল স্মৃতিতে যেন অবগাহন করিতেছি। এই সেই পবিত্র নালা যাহার সন্নিকটবর্তী প্রাঙ্গণসমূহে শতবর্ষপূর্বে ফুটবল পুতুলেরা হাসিতে হাসিতে গোল খাইয়াছে, কাঁদিতে কাঁদিতে জিতিয়াছে, হারিয়া হাসিয়াছে, জিতিয়া গম্ভীর হইয়াছে, যে বৃক্ষের নিচে অর্ধশায়িত হইয়া ডায়েরি লিখিতেছি, শতবর্ষ পূর্বে তাহার ছায়ায় কত না শলাপরামর্শ, কত না মহৎ পরিকল্পনার গুঞ্জন। বাড়ুক রৌদ্রতাপ, ফাটুক চাঁদি, এখন আমি এই পবিত্র পীঠস্থানে গড়াপেটার স্মৃতিনিদ্রায় নিমজ্জিত হইব। হে গড়াপেটার দেবতা, জাগরণে না হোক, অন্তত নিদ্রায়, স্বপ্নে আমাকে একটি গড়াপেটা ম্যাচ দেখাও।

১০১



বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা। ভারতীয় ফুটবলের এককালের 'ব্লু রিবন' আই এফ এ শিল্ডে খেলতে চাইছেন না ভারতীয় ফুটবলের ব্ল্যাক (অ্যান্ড হোয়াইট) রিবন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাবের সর্বজনমান্য সচিব ফুটবল-বন্ধু ইব্রাহিম আলি মোল্লা তাঁর অতিক্ষুদ্র চেম্বারে এক সুবৃহৎ সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন, 'সল্টলেকেই যখন আই এফ এ শিল্ডের খেলা হবে, আমরা খেলব না। ক্লাব বা ফুটবল বা ক্লাবের ঐতিহ্যের ওপরে হল আমাদের সমর্থকরা। এই সমর্থকদের কথা আমাদের ভাবতে হবে। দাদারা খুব বড় করে লিখে দেবেন, 'আমরা সল্টলেকে আর কখনও কোন ম্যাচ খেলব না।'

আই এফ এ সচিব প্রদ্যুৎ দত্ত চুপচাপ বসে থাকার লোক নন। একুশ ঘণ্টার মধ্যে গভর্নিং বডির মিটিং ডেকে সিদ্ধান্ত নিলেন, মহমেডান সল্ট লেক স্টেডিয়ামে না খেললে তাদের খারিজ করা হবে। গভর্নিং বডির প্রবীণদের প্রস্তাবমত আলোচনার রাস্তা অবশ্য খোলা রাখা হল। পরদিন আই এফ এ দপ্তরে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় মুখোমুখি হলেন আই এফ এ সচিব প্রদ্যুৎ দত্ত এবং মহমেডান স্পোর্টিংয়ের গ্রাউন্ড সেক্রেটারি তাজ মহম্মদ। আই এফ এ সচিবের মতো সামান্য পদাধিকারীর সঙ্গে বৈঠকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই বিখ্যাত সচিব বসবেন কেন, গ্রাউন্ড সেক্রেটারিই যথেষ্ট। তাজ মহম্মদ বললেন, 'প্রদ্যুৎদা, আপনি ঠিক করে নিন, কতক্ষণ আলোচনা চলবে। আমাকে একটা কথাই বলে যেতে বলা হয়েছে 'আমরা সল্ট লেকে খেলব না।' আপনি যা-ই বলুন, যেরকমই বোঝান, আমাকে ওই একটা কথাই বলে যেতে হবে।' প্রদ্যুৎ দত্ত হাসলেন, কপালের কম্পিত ঘাম মুছলেন এবং বললেন, 'ভদ্রলোকের এক কথা!' তা, আমিও ভদ্রলোক, ওই একই কথা— সল্টলেকেই খেলতে হবে।' সাড়ে তিন মিনিট স্থায়ী আলোচনার পর আই এফ এ সচিবের ঘর থেকে বেরিয়ে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকদের তাজ মহম্মদ বললেন, 'আমরা সল্ট লেকে খেলব না।' এক সাংবাদিক : 'সে তো আগেই বলা হয়েছে, আজকে কী কথাবার্তা হল?' তাজ মহম্মদ, 'আমরা সল্ট লেকে খেলব না, আমরা সল্ট লেকে খেলব না' বলতে বলতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। ইংরেজি দৈনিকের

স্বাস্থ্যবান রিপোর্টার চশমার কাচ মুছে জানালেন, 'আ ক্লিয়ার কেস অফ ডোপিং!'

লস এঞ্জেলেস অথবা পিকিং অথবা মস্কো অথবা রিয়াধ অথবা হংকং অথবা সিওল থেকে ফিরে আই এফ এ সভাপতি তথা এ আই এফ এফ সচিব অশোক ঘোষ জানালেন, আলোচনায় সব সমস্যার সমাধান হয়। মহমেডান কর্তাদের তিনি সাদর আমন্ত্রণ জানালেন, এ আই এফ এফ দপ্তরে।

অশোক ঘোষ নিজে যা-ই মনে করুন, এ আই এফ এফ সচিবের পদটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যে মহমেডান সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লার মতো ব্যক্তিকে তাঁর দপ্তরে হাজির হতে হবে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করতে এলেন কার্য নির্বাহক কমিটির প্রভাবশালী সদস্য মইনুল হক চৌধুরি। তাঁর মাথায় ছিল জরির কাজ-করা চমৎকার টুপি, কালো ভেলভেটের ওপর জরি দিয়ে লেখা 'আমরা সল্ট লেকে খেলব না।' অশোক ঘোষ জানতে চাইলেন, 'ভাই, কী হলে আপনারা সল্ট লেকে খেলবেন? বলুন, আমি চেষ্টা করে দেখি।' ভাই মইনুল হক চৌধুরি সহাস্যে জানালেন, 'কারও কিছু করার নেই, দাদা। একজিকিউটিভ কমিটির মিটিংয়ে ডিসিশন হয়ে গেছে, এখন পাল্টাব কী করে? আমাদের প্রেসিডেন্ট, বুঝলেন দাদা, খুব হেল্পফুল। ওনার অ্যাবসন্সও আমাদের কাজে লাগে।' অশোক ঘোষ টানা দশ মিনিট বুঝিয়ে বললেন, আই এফ এ আর এ আই এফ এফ-কে এভাবে চটিয়ে ফেলা ঠিক হচ্ছে না। মইনুল হক চৌধুরি বললেন, 'ভয় দেখাবেন না, দাদা। আমাদের মহান নেতা, ইব্রাহিম আলি মোল্লা আপনাদের এই অ্যাটিচুডের জন্যই প্রদ্যুৎ দত্তকে হিটলার বলেছেন, আপনাকে মুসোলিনি বলবেন।'

পরদিনই ক্রীড়াদপ্তরের উপসচিব রমানাথ সমাদ্দার মহমেডান সচিবের কাছে চিঠি পাঠালেন, 'মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।' 'মাননীয়' অর্থাৎ ইংরেজি 'অনারেবল' শব্দটির নিচে সবুজ কালির দাগ মেরে চিঠিটা মাননীয় মহমেডান সচিব পাঠালেন কার্যনির্বাহক কমিটির আর-এক তালেবর সদস্য তায়েব আলির কাছে। নির্দিষ্ট সময়ে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে উপস্থিতি ঘোষণা করে তায়েব আলি বললেন, 'আমরা সল্ট ...... —থামিয়ে দিলেন সুভাষ চক্রবর্তী। 'আপনারা কি জানেন না, কত কষ্ট করে সল্ট লেক স্টেডিয়াম আমরা বানাচ্ছি? জানেন না, দেশের মানুষের কত প্রিয় এই স্টেডিয়াম? জানেন না এই স্টেডিয়ামকে পপুলার হতে না দেবার জন্য কী ভাবে একে একে উপেক্ষা করে গেছে সি এ বি. আই এফ এ আর এ আই এফ এফ? জানেন না, কত দুঃখে আমাকে সি এ বি সচিবকে টাইট দিতে হয়েছে, আই এফ এ-কে দশ লাখ লোক নিয়ে গিয়ে অন্য মাঠে খেলানোর চেষ্টা বন্ধের হুমকি দিতে হয়েছে, এ আই এফ এফ-কে জানাতে হয়েছে যে ময়দানে ধানচাষ করাব? মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে চিরদিনই আমরা প্রগতিশীল শক্তি হিসাবে বিবেচনা করি। বামফ্রন্ট সরকারকে এভাবে ল্যাং মারাটা ঠিক হচ্ছে কি?'

বিস্তর ভদ্রতা দেখিয়ে তায়েব আলি একের বদলে দু-কাপ চা খেলেন, স্পোর্টস মিনিস্টারকে একের বদলে তিনবার স্যার বললেন, কিন্তু আর কিছু করতে পারলেন না। ক্লাব সচিবের অর্ডার। তার ওপর প্রেসিডেন্ট আউট অফ স্টেশন। সরি।

অতঃপর মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব আলোচনার আমন্ত্রণপত্র পায় কলকাতার মেয়র, স্পোর্টস কাউন্সিল ও এস এস এস-এর হর্তাকর্তাবিধাতা হু ইজ কমলকুমার বসুর কাছ থেকে। এবার প্রতিনিধির দায়িত্ব পান মীর সৈয়দ ওমর। তিনি উপস্থিতি সম্পর্কে কোনরকম আগাম ঘোষণা না করেই মেয়রের ঘরে ঢোকেন এবং বলেন, 'আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, মহমেডানের সল্ট লেকে খেলা উচিত।' দরকারি ফাইল এক ঝটকায় সরিয়ে কমলকুমার বসু অবাক চোখে তাকান 'বসুন বসুন। নেমেই দেখুন না, আর কোনও অসুবিধা হবে না। কমান্ডো নামিয়ে দিচ্ছি।' ফুটবল সচিব বললেন, 'আমি মনে করি, ক্লাবের খেলা উচিত, কিন্তু ক্লাব তা মনে করে না। প্রত্যেকটা গেমেই এরকম হচ্ছে, বুঝলেন। ক্লাব কমিটি ভুল ডিসিশন নিচ্ছে। ব্যক্তির চেয়ে সংগঠন বড়, তাই আমাকে ক্লাবের ডিসিশন মেনে নিতে হচ্ছে। খুবই আনফরচুনেট ব্যাপার, তবে এটাই ঘটনা, স্যার। আমাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলতে হচ্ছে 'আমরা সল্ট লেকে খেলব না।'

কমলকুমার বসু চা অফার করতে ভুলে গেলেন। চিফ মিনিস্টারের ডাইরেক্ট টেলিফোন নাম্বারটা অবশ্য ভোলেননি। পরদিন, হ্যাঁ, একেবারে পরদিনই রাইটার্সে মুখ্যমন্ত্রীর ঘরে আমন্ত্রিত হলেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের কর্মকর্তারা। একজনই গেলেন— ভাইস প্রেসিডেন্ট আরশাদ সায়গল। ভীষণভাবে স্যারাক্রান্ত হলেও আরশাদ সায়গলের ভাষণটি খুব আবেগদীপ্ত ছিল : 'স্যার, আমরা নানা দিক দিয়েই কোণঠাসা। তবু এটাও মানব স্যার, আপনার আমলে আমরা খুব বেশি সমস্যায় নেই। সল্ট লেক স্টেডিয়াম, স্যার, ন্যাশনাল প্রপার্টি, আমাদের সবার প্রিয় জিনিস। কিন্তু স্যার, নিজের লাইফ অনেক বেশি প্রিয়।

সাপোর্টারদের লাইফ-এর কথা ভেবেই, স্যার সল্ট লেকে খেলতে চাইছি না। আমাদের অধিকাংশ সাপোর্টারই নিরস্ত্র, দুচারজন নিরীহ সার্পোটার অবশ্য একটু সাবধানে থাকে, ওই ক্ষুরটুর একটু আধটু রাখে আর কি। ময়দানে ওগুলো সাফিসিয়েন্ট স্যার, কিন্তু সল্ট লেকে সাইফার। আপনি প্লিজ আমাদের রিকোয়েস্ট করবেন না, স্যার। রিকোয়েস্ট রাখতে না পেরে খুব কষ্ট পাব। কষ্ট দেবেন না স্যার। আপনি বরং যা বলার বলে অন্য কাজে চলে যান। আমরা চিফ সেক্রেটারিকে বা স্পোর্টস মিনিস্টারকে বা আপনার পি এ-কে বলে দেব যে আমরা সল্ট লেকে খেলব না। চিফ মিনিস্টার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখে রাজভবনে চলে গেলেন।

তাহলে কি আর কোন আশাই নেই? আই এফ এ শিল্ডে মহমেডান স্পোর্টিং সল্ট লেকে না খেললে— এদেশের কী হবে গো? গোটা বাংলাদেশ যখন চোখের জলে ভাসমান, আশার বিদ্যুৎ এল দিল্লি থেকে। এটিকে জাতীয় সমস্যা বিবেচনা করে স্বরাষ্ট্র সচিব বি ডি প্রধান মহমেডান সচিবকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, 'আগামী কাল দুপুর দুটোয় কলকাতায় রাজভবনে আসুন, আমি আলোচনার জন্য যাচ্ছি।' স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে এল সাতজন মাঝারি এবং ছোট আমলার একটি বড় দল। মহমেডান স্পোর্টিং অবশ্য ওই এক-এর থিয়োরিতেই স্থির থাকল। বি ডি প্রধান এবং তাঁর সাত সহকারীর মুখোমুখি হলেন মহমেডানের অন্যতম সহ-সভাপতি গোলাম মোস্তাফা। তাঁর সঙ্গেও সাতজন সহচর

এলেন, তবে তাঁরা বাইরে গাড়িতেই ঠাসাঠাসি থাকলেন। স্বরাষ্ট্র সচিবের সামনে একুশটি ফাইল, আরও কিছু সাজিয়ে রাখছিলেন সহকারীরা, গোলাম মোস্তাফা বললেন, 'স্যার, এত ফাইল আনবেন না, দরকার নেই। যতই ফাইল খুলুন, প্রস্তাব দিন, আমরা তো সেই একটা কথাই বলব— সল্ট লেকে খেলব না! বি ডি প্রধান ঝানু আমলার চোখে মামা ওরফে গোলাম মোস্তাফাকে মেপে নিয়ে বললেন, 'এই একটা কথাই দেবার জন্য দিল্লি থেকে ছুটে আসব, এটা ভাবছেন কেন?' খুবই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর। গোলাম মোস্তাফা ততোধিক আত্মবিশ্বাসী গলায় জবাব দিলেন, 'চমকাবেন না স্যার। আমাদের হিতেশ্বর সাইকিয়ার মতো গুড ম্যান পাননি যে চমকে লাইনে এনে ফেলবেন।' প্রধান সাহেব নিজেই চমকে গেলেন। এইরকম দাপট রিসেন্টলি কোন অপোজিশন লিডারের মধ্যেও দেখেননি। যান্ত্রিকভাবে সাতরকম রাস্তায় বোঝানর চেষ্টা করে সাত বারই জবাব পেলেন 'আমরা সল্ট লেকে খেলব না।' ঝানু আই এ এস উনচল্লিশটা ফাইল এবং সাতজন সহকারী নিয়ে দিল্লি ফিরে গেলেন।

সেই রাতেই প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সংসদীয় সচিব অরুণ সিংয়ের টেলিফোন ঝনঝন: 'আপনারা দিল্লিতে আসুন, কথা আছে।' ইব্রাহিম আলি মোল্লা জানালেন, 'আমাদের পক্ষে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয়।' দোর্দণ্ডপ্রতাপ অরুণ সিংয়ের কণ্ঠস্বর টেলিফোনে খুবই করুণ শোনাল। 'তাহলে আমিই আসছি, আগামীকাল সন্ধের ফ্লাইটে।' অস্কার ফার্নান্ডেজকে নিয়ে অরুণ সিং যখন মহমেডানের সহ-সচিব সুলেমান খুরশিদের সঙ্গে বসলেন তখন রাত নটা বেজে গেছে। অরুণ সিং বললেন, 'জানেন তো, আমি আপনাদের কলকাতায় ছিলাম বহুকাল, রেকিট অ্যান্ড কোলম্যানে।' সুলেমান খুরশিদ বলেন, 'জানি না। তবে আপনি নিশ্চয় জানেন, আমি একজন 'প্রফেসর', প্লাস এক্স-জার্নালিস্ট?' অরুণ সিং দুঃখের সঙ্গে জানালেন, জানেন না। তিনি বললেন : 'দেখুন, আমি এসেছি পি এম-এর ইচ্ছায়। আপনাদের ব্যাপারটা এখন ইউ এন ও-তেও পৌঁছে গেছে। সমাধান করতে না পারলে আমাদের ইন্টারন্যাশনাল প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাচ্ছে। কী করলে আপনারা সল্ট লেকে যাবেন, বলে ফেলুন।' সুলেমান খুরশিদ : সল্ট লেকে আমরা যাব, তবে টিম যাবে না, সাপোর্টাররা যাবে না। আমরা সল্ট লেকে খেলব না।

ট্রাঙ্ক টেলিফোনে রাজীব গান্ধীর সঙ্গে পঁয়ত্রিশ মিনিট কথা বলার পর অরুণ সিং জানালেন ইব্রাহিম আলি মোল্লাকে, 'পি এম আগামী পরশু সকাল দশটায় আপনাদের সঙ্গে কথা বলবেন, আপনারা দিল্লিতে চলুন।'

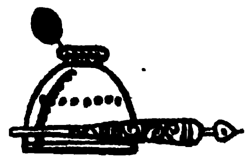
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এক্সিকিউটিভ কমিটির জরুরি সভা ডাকা হল, প্রধানমন্ত্রীর ডাকে দিল্লি যাওয়া উচিত হবে কি না। অনেকে বললেন, পি এম-এরই কলকাতায় আসা উচিত। শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রেসিডেন্ট ছাড়াই, সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, দয়া করে দিল্লি যাওয়া হবে।

সাত দিনের একুশ দফায় আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রীকে সাহায্য করেন অরুণ সিং এবং মাখনলাল ফোতেদার ছাড়াও তিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বুটা সিং, মহসিনা কিদোয়াই এবং এস

ভি চ্যবন। শেষ পর্যন্ত আই এফ এ শিল্ডের আগের দিন দূরদর্শনে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী : 'আজ ভারতের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। পাঞ্জাব এবং আসাম চুক্তির চেয়েও এই সল্ট লেক চুক্তির প্রভাব অনেক সুদূর প্রসারী। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব স্টেডিয়ামের এক তৃতীয়াংশের মালিকানা পাবে, সেখানে ট্রেঞ্চ ইত্যাদি তৈরিও করতে পারে। ইস্টার্ন বাই পাসের একটা অংশও পাবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, তার পাশে একটি আধুনিক রক্ষণাত্মক অস্ত্রাগার নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় টাকাও তাদের দেওয়া হবে।

প্রত্যেক বছর প্রত্যেক বড় ম্যাচের (সল্ট লেকে) আগের ছমাস এবং পরের ছমাস মহমেডানের প্রত্যেক কর্মকর্তার জন্য এক ডর্জন করে সুদক্ষ কমান্ডো দেওয়া হবে, ক্লাবের সচিবের হাতে তাঁদের সমর্থকদের সুবিধার জন্য পনের হাজার বুলেট প্রুফ জ্যাকেটও তুলে দেওয়া হচ্ছে। আমার জ্যাকেটটি শুভেচ্ছার প্রতীক হিসেবে আজ সকালেই তুলে দিয়েছি মহমেডান স্পোর্টিংয়ের সচিব ইব্রাহিম আলি মোল্লার হাতে। ভারতের ইতিহাসে ইব্রাহিম আলি মোল্লার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমার মতো সামান্য দেশবাসীর ডাকে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ব্যস্ত এবং জনপ্রিয় কর্মকর্তারা যেভাবে সাড়া দিয়েছেন, তা আশাতীত। আসাম চুক্তির সময় গুয়াহাটি থেকে মাত্র বাহান্ন জন আসু নেতা দিল্লিতে উড়ে এসেছিলেন। মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ডেলিগেশনে ছিলেন ছিয়াত্তর জন। জওহরলাল নেহরু এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশিত পথ ধরে ভারতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। এই চুক্তি সেই রাষ্ট্রের বনিয়াদকে আরও শক্ত করল। জয় হিন্দ।'

১০২



হৃদয়ে চ্যানেল নাইন। এবং হৃদয়ের ওপর ছড়ানো শার্টের ওপরও চ্যানেল নাইনের ইনসিগনিয়া, লেখা— স্পোর্টস ৯। আমি কেরি প্যাকারের ফ্যান। অস্ট্রেলিয়ায় থাকলে, জীবনে মাঠে যেতাম না। চ্যানেল নাইন জিন্দাবাদ। যতটুকু ছিটেফোঁটা পাই, তাতেই প্রেমে নিমজ্জিত। এবার ইন্ডিয়া যাচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায়, চ্যানেল নাইনের সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হওয়ার কথা। কিন্তু ভারতীয় দূরদর্শনের অদূরদর্শী কর্তারা ঠিক করেছেন, ক্রিকেটকে আর বেশি কভারেজ দেবেন না। তার বদলে গলফ, পোলো, মোটর র‍্যালি দেখাবেন, ঘুমপাড়ানি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান ভেঁজে কিছু লোককে টাকা পাইয়ে দেবেন এবং কাতুকুতুমুখর সিরিয়াল চালাবেন। পাবলিক ক্রিকেট দেখতে চায়? পাবলিক নিজের ভাল বোঝে না। পাবলিক তো এটাও বোঝে না যে রোজ পর্দায় মন্ত্রীদের ফোলা মুখ দেখা স্বাস্থ্যের পক্ষে কত উপকারী। পাবলিক কি ছাই এটাও বোঝে যে 'হট ট্র্যাক', 'রকলাইন' ইত্যাদি ভারতীয় যুব-সমাজের নৈতিক পুনরুজ্জীবনের পক্ষে কত জরুরি। টু হেল উইথ দ্য পাবলিক : টু হেল উইথ ক্রিকেট। দূরদর্শনের গিল সাহেব ফতোয়া দিয়েছেন, শুধু কোম্পানি স্পনসরশিপে হবে না, পাবলিক যদি অন্তত পঁচিশ লক্ষ টাকা নিজেরা তুলে দেয়, তবেই চ্যানেল নাইনের সঙ্গে ইন্ডিয়ার ক্রিকেট পাবলিকের এবার দেখা হতে পারে। এক্সট্রা পঁচিশ লাখ টাকা পেলে ক্রিকেটের মতো বাজে জিনিস দূরদর্শনে গিলতে গিল সাহেব রাজি আছেন। পঁচিশ লাখ টাকা চাঁদা তোলা মুশকিল। তাই দেশ জুড়ে নানাভাবে 'চ্যানেল নাইন ফান্ড' গড়ার কাজ শুরু হয়ে গেছে। মাঝে মাত্র এক মাস সময়। এডিটর সাহেবকে ডিসটার্ব করছি না। দৌড় দেখা আছে। বাছা ফুটবলারদের সঙ্গে পেয়েও এফ ডব্লু এ-র হয়ে এক বছরে তিন লাখ টাকা তুলতেই দম বেরিয়ে গেছে। নিজেই কলকাতা থেকে একটা স্যুভেনিয়ার বার করছি। আশা করি, হাজার পঞ্চাশেক টাকা 'চ্যানেল নাইন ফান্ড'-এর জন্য তুলে দিতে পারব। বিজ্ঞাপনের জন্য স্কুল আর কলেজ লাইফের সেইসব বন্ধুদের কাছে ধর্না দিচ্ছি, যারা দারুণ দাঁড়িয়েছে। খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। এরা সকলেই অফিসে বিশাল নরম রিভলভিং চেয়ারে বসে, অফিসে যাতায়াত করে গাড়ির নরম গদিতে বসে, বাড়িতেও বসা আর শোয়া। আমি ট্রামে বাসে দাঁড়াই, ইলেকট্রিকের বিল জমা

দিতে দাঁড়াই, সিনেমা হলে লাইন দিয়ে দাঁড়াই, এডিটরের সামনে মাথা চুলকে দাঁড়াই, ফুটবল মাঠে গ্যালারিতে দাঁড়াই। তবু, ওরাই নাকি দাঁড়িয়েছে। বেশ বাবা, দাঁড়িয়েছ যখন, ছাড় বিজ্ঞাপন। একটা চেনা প্রেস পেয়েছি। ক্রেডিটে কাগজ পাচ্ছি। বলা বাহুল্য, দুটো জায়গাতেই পয়সা দেব না। মহৎ কাজে এরকম করলে পাপ হয় না। পঞ্চাশ হাজার তুলতেই হবে। ক্রিকেট— গিল সাহেবকে গেলাতেই হবে। বন্ধুগণ, আপনারাও কিছু বিজ্ঞাপন তুলে দিন না। রেটফেট জানতে হলে 'খেলা'র অফিসে দুপুরবেলা চলে আসুন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার সঙ্গে যাকে চেয়ারে বডি এবং টেবিলে মাথা রেখে ঘুমোতে দেখবেন, তাকে চিমটি কেটে জাগান। তিনিই বাবুরাম সাপুড়ে। রেট কার্ড পেয়ে যাবেন। হারি আপ।

বিজ্ঞাপন আসছে, আসবে। দেবব্রত ঘোষকে কভার ডিজাইন করতে বলেছি। ম্যাটার থাকবে মাত্র তিন পৃষ্ঠা। শ্রীলঙ্কা ফেরত এবং অস্ট্রেলিয়াগামী সম্ভাব্য ক্রিকেটারদের ছবিসহ সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। এটা লিখে ফেলেছি। আপনারা নিজের লোক, এখনই পড়ে ফেলুন।

কপিলদেব : বীর। প্রতিকূলতা তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। শ্রীলঙ্কায় গাভাসকার বিশেষ বিরোধিতা না করায় ভাল কিছু করার জন্য অনুপ্রাণিত হননি। সর্বজনবাধ্য অধিনায়ক। ব্যাটসম্যানদের ব্যাটিং অর্ডার ঠিক করে নিতে বলেন। ওয়ান ডে ম্যাচে টেস্ট ব্যাটিং করলেও প্রশ্রয়হাস্যে মধুর থাকেন। বেদির রেকর্ড ভেঙেছেন। নিজের অধিনায়ক হিসেবে একটিও টেস্ট না জেতার রেকর্ড ভাঙতে পারেননি।

রবি শাস্ত্রী : 'অডি'র বিরহে কাতর এবং প্রাইজ হিসেবে কোনও গাড়ির অভাবে ম্রিয়মাণ থেকেও শ্রীলঙ্কায় চল্লিশ, পঁয়তাল্লিশ, সাতষট্টি আর একাশির চারটি পিচ কামড়ানো ইনিংস খেলেছেন। দ্বিতীয় ওয়ান ডে-তে যোল ওভারে পঁচিশ করে রেকর্ড করেছেন। রঞ্জি ট্রফিতে ওভার বাউন্ডারির রেকর্ড, ইন্টারনাশন্যাল ক্রিকেটে ওভারডিফেন্সের রেকর্ড— দুটোই এক বছরে। ফাইটার। বিপক্ষ দল প্রথমে ব্যাট করে দেড়শর মধ্যে আউট হয়ে গেলে, ওয়ান ডে-তে দুনিয়ার এক নম্বর ওপেনার। আদর্শ টিমম্যান। আগে নিজে বাঁচেন, পরে টিমকে বাঁচান।

সুনীল গাভাসকার : গত দু-বছর ধরে ক্রিকেটকে 'এনজয়' করছেন। ওপেনার হয়ে লেট মিডল অর্ডারসুলভ ব্যাটচালনা করেন প্রথম দিকে। অতঃপর, এখন মিডল অর্ডারে এসে ওপেনারসুলভ ব্যাটিং। এনজয়িং ক্রিকেট ইন টু ডিফারেন্ট ওয়েজ। আদর্শ টিমম্যান। প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যান অধিনায়ককে অসভ্যের মতো পেটালে, নিজেই ফিল্ডিং সাজানোর দায়িত্ব ঘাড়ে নেন। অবশ্য অধিনায়কের অনুরোধে ওপেন করতে রাজি হন না।

মহিন্দার অমরনাথ : 'শ্রীযুক্ত কাম ব্যাক।' সেঞ্চুরি মানেই 'কাম ব্যাক টন।' মাঝে মাঝে কোথায় যান— যে কারণে ফিরে আসার সুযোগ ঘটে, বলা কঠিন। এক দিনের খেলায় টেস্ট ব্যাটিং করেন, টেস্টে দশ দিনের ম্যাচের। ক্যান্ডিতে একটি অনবদ্য ম্যাচলুজিং সেঞ্চুরি করে এসেছেন। প্রথম টেস্টে বাদ পড়েছিলেন। সুতরাং, সিরিজে সবচেয়ে বেশি রান! আদর্শ টিমম্যান। চড়া রোদে বেশিক্ষণ ফিল্ডিং করতে পারেন না।

দিলীপ বেঙ্গসরকার : একেবারেই টিমম্যান নন। প্রথম টেস্টে সেঞ্চুরির লোভ সংবরণ করে ম্যাচ বাঁচানো আটানব্বুই রানে অপরাজিত থাকেন। তিনটি একদিনের ম্যাচেই নিজের কথা না ভেবে টিমের কথা ভেবেছেন। তিন, চার, পাঁচ— যেখানে ব্যাট করতে বলা হয় সেখানেই করেন। তাঁর চেয়ে জুনিয়ররা ক্যাপ্টেন আর ভাইস ক্যাপ্টেন হয়ে গেলেও ঝগড়া করেন না। ইনি টিমম্যান নন।

মহম্মদ আজহারউদ্দিন : সানি গাভাসকারের সেঞ্চুরির রেকর্ড ছুঁতে আর মাত্র সাতাশটি বাকি। আদর্শ টিমম্যান। আগে অন্যরকম ছিলেন। এখন দলীয় শৃঙ্খলা মেনে অফ স্টাম্পের বাইরে মাছ ধরা শুরু করেছেন। তৃতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে এবং দ্বিতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে নিজের ফর্ম খারাপ এবং অদূর ভবিষ্যতে বাদ পড়ার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও দ্রুত রান তোলার চেষ্টা করেন। তৃতীয় ওয়ান ডে ম্যাচে নিজেকে শুধরে নেন। অন্যদের মতো টেস্ট ব্যাটিং দেখান।

লালচাঁদ রাজপুত : বিশেষজ্ঞদের মতে, গাভাসকারের পর ভারতীয় ক্রিকেটে সবচেয়ে নিখুঁত ওপেনিং ব্যাটসম্যান। শুধু দু-একটা ছোটখাটো খুঁত। অফ স্টাম্পের বাইরে ক্রমাগত ছিপ ফেলেন। ব্যাট আর প্যাডের মধ্যে দু-ইঞ্চির মাঝেমাঝে। আদর্শ টিমম্যান। পরের ব্যাটসম্যানদের বেশিক্ষণ বসিয়ে রেখে বিরক্ত করেন না।

কৃষ্ণমাচারী শ্রীকান্ত : কমপালসিভ হিটার। উইকেটে থাকলেই মারেন, তাই বেশি থাকেন না। ব্যাটিংয়ে কব্জির ব্যবহার নিষিদ্ধ করে দেবার লাইনের প্রবক্তা। তৃতীয় একদিনের ম্যাচে টেস্ট ব্যাটিং দেখানোর চেষ্টা করে এবং লেগ স্টাম্পের সামান্য বাইরের উপর্যুপরি পাঁচটি বল ফ্লিক করতে গিয়ে ব্যাটে লাগাতে না পেরে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। আদর্শ টিমম্যান, কারণ নিজের জন্যও খেলেন না।

সদানন্দ বিশ্বনাথ : এত অল্প বয়সে জীবনের শেষ টেস্ট আর কেউ খেলেননি। রেকর্ড। তিন টেস্টে তিন জোড়া প্যাড ব্যবহার করেছেন, তবু পায়ের যন্ত্রণায় এখনও কাতর। বল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্লাভসের বদলে প্যাডে নিয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি উইকেটে বল বেশি উঠলে গ্লাভসে পাবার আশা রাখেন। অস্ট্রেলিয়ায় যাওয়ার আশা অবশ্য কম। শ্রীলঙ্কায় চ্যানেল নাইন না থাকায় কমপিটিটিভ স্পিরিট দেখানোর উৎসাহ পাননি। আদর্শ টিমম্যান। দ্রুত উদীয়মান কিরমানিকে জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছেন।

লক্ষ্মণ শিবরামকৃষ্ণান : ডান হাত থেকে বাঁ হাতে বল চালাচালির এবং স্পেল শুরু করার আগে মিড অনের কাছে, একটা ট্রায়াল বল করার সময় এখনও দুর্দান্ত লেগ স্পিন করান। দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে ভাল ব্যাট করেছেন। ব্যাটসম্যান হিসেবে টিমে থাকার আশা করতে পারেন। আদর্শ টিমম্যান। ইদানীং নেট প্র্যাকটিসেও টিমের কোন ব্যাটসম্যানকে কষ্ট দিতে চান না।

চেতন শর্মা : আপাতত এক নম্বর স্ট্রাইক বোলার। ব্যাটসম্যানরা বেশি ভুল করলে বেশি উইকেট পান। আদর্শ টিমম্যান। মাঝে মাঝেই অন্য পেস বোলারদের টিমে আসার ব্যবস্থা করে দেন। আদর্শ স্পোর্টসম্যান। উইকেট না পেলেও, বেদম মার খেলেও হাসেন।

আক্রমণাত্মক হালকা দাড়ি, যদিও বল মাঝে মাঝেই বন্ধুভাবাপন্ন।

মনিন্দার সিং : সম্প্রতি স্ট্যাটিসটিসিয়ানদের নতুন বিপদে ফেলেছেন। আঠার, উনিশ, কুড়ি— এর মধ্যে কোনটা টেস্টের সংখ্যা, কোনটা বয়স এবং কোনটা উইকেটের সংখ্যা বোঝা যেত না। কোনরকমে বি বি মানা-সুধীর বৈদ্য-গোপালকৃষ্ণানরা অ্যাডজাস্ট করে নিয়েছিলেন। সম্প্রতি ক্যান্ডি টেস্টের প্রথম ইনিংসে চার-চারটে উইকেট তুলে নিয়ে ভয়ঙ্কর গণ্ডগোল বাধিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অবশ্য স্ট্যাটিস্টিসিয়ানদের আশ্বস্ত করেছেন, আর উইকেট নেননি, আগামী তিনটে টেস্টে নেবার ইচ্ছেও প্রকাশ করেননি।

রজার বিনি : এক সময়ে কর্ণাটকের (এবং দু-একবার ভারতেরও) ওপেনিং ব্যাটসম্যান ছিলেন। এখন একদিনের ম্যাচে আট নম্বরে এসে 'ওপেন' করেন। আদর্শ টিমম্যান। সতীর্থ ব্যাটসম্যানদের ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ও ভালবাসা। প্রতিপক্ষ দল আগে ব্যাট করলে এক ওভারে উনিশ রান পর্যন্ত দেন, যাতে টিমের ব্যাটসম্যানরা বড় ইনিংস খেলার সুযোগ পান। এই ভালবাসা প্রতিপক্ষ ব্যাটসম্যানরাও পেয়ে থাকেন, বলা বাহুল্য।

রাজিন্দর সিং ঘাই : আদর্শ টিমম্যান। এক মাসের সফরে একবারও এই প্রশ্ন তুলে অধিনায়ককে বিব্রত করেননি— 'আমি কেন এসেছি?' আপাতত ভারতের পাঁচ নম্বর পেস বোলার। তিন নম্বরে আসতে আসতে রিটায়ার করে ফেলবেন, আশা করা যায়।

গোপাল শর্মা : এক সময়ে অফ স্পিন করাতেন। এখনও ডেলিভারি দেখে ব্যাটসম্যানরা সেরকম ভাবেন এবং ঠকেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে তাঁর শেষ তিনটি উইকেট সোজা বলে পাওয়া। প্রসন্নর মতো ফ্লাইট করান না। বেঙ্কটের মতো 'কক' করান না। যাদবের মতো হাফ ভলিও দিতে পারেন না। একেবারে অন্য ধাতের স্পিনার।

১০৩

না এবারও হল না। এবারও আমার পুজো সংখ্যায় লেখা হল না। যখন স্কিম করছিলেন এডিটর সাহেব, যথাসম্ভব প্রস্ফুটিত করে মেলে রেখেছিলাম নিজেকে, যদি তিনি দেখেন, ডাকেন, একটি পৃষ্ঠাও বরাদ্দ করেন এই সামান্য সাপুড়ের জন্য। বাঁশি আমার হাতেই রইল, ঝোলায় কত না-বলা কথা ও দীর্ঘশ্বাস, তিনি আমাকে দেখলেনই না। একে একে সাবজেক্ট নিয়ে বেরিয়ে গেল চোখের মণি ভুলের খনি জার্নালিস্টরা, দিকে দিকে দূত ছুটল বাঘ সিংহদের লেখা কুড়নোর জন্য। কত লেখক। তাঁদের কত রকম লেখা। 'কানের কাছে নানান সুরে নামতা শোনায় একশ উড়ে।' জার্নালিস্টরা একুশ রকমের বাহানা দিয়ে তেইশ দিন লেট করে লেখা জমা দিলেন। আহা, কী সব লেখা। বঙ্গ (ক্রীড়া) সাহিত্যের এক-একটি মাইলস্টোন। এডিটর সাহেবের অতিপ্রিয় 'সুপ্রিয়দা' প্রমুখ বড় লেখকেরা তেত্রিশ দিন ঘুরিয়ে তিন থেকে পাঁচ পৃষ্ঠার লেখা দিলেন, শুধু এই অভাজনকেই ডাকা হল না— যে ডাক পাবার পরদিনই বিগলিত হাস্যে লেখা জমা দিত।

পুজো সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর মনে হল, মহামান্য এডিটর সাহেব কোনও ভুল করেননি। এই বিশাল বিশেষ সংখ্যায় লেখার যোগ্যতা আমার সত্যিই হয়নি। আমি বিরাট বিপুল বিখ্যাত লেখক নই যে শুধুমাত্র নামের ভারে কেটে যাব। এডিটর সাহেবের লিস্টে প্রথমেই আসেন বিখ্যাতরা, যাদের নাম দেখে লোকে কাগজ কেনে। আমার নাম জানে বাংলাদেশের সাতান্নজন লোক, তারাও হয়ত বিজ্ঞাপনে আমার নাম দেখে পুজো সংখ্যা কেনার ইচ্ছা ত্যাগ করতেন। এডিটর সাহেব নিশ্চয় ভুল করেননি। তাঁর বিখ্যাত পত্রিকার পুজো সংখ্যার সাতান্ন কপি অবধারিত কম বিক্রি তিনি রোধ করেছেন।

এডিটর সাহেবের লিস্টে অবশ্যই আছেন তাঁর প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, যাঁরা দুর্ধর্ষ সব রচনায় শারদ সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছেন। সারা বছর ব্যস্ত থাকেন ময়দান খুঁড়ে এবং ভারত জুড়ে খবর সংগ্রহে, পুজো সংখ্যায় এঁরা সে সবের প্রসন্ন বা বিষণ্ণ জাবর কাটেন অথবা বিচিত্র কল্পনার তৈলাক্ত বাঁশ বেয়ে লেখক হিসেবে ওপরে ওঠেন, কখনও কখনও হয়তবা নামেনও, তবে জয়োল্লাসে মগ্ন থাকায় তাঁদের এবং তাঁদের গডফাদার এডিটর সাহেবের

এদিকটা আর জানা হয় না। আমি স্বীকার করতে বাধ্য, এমন লেখা আমি লিখতে পারতাম না। যা পারতাম না, যা পারব না, সে কাজের জন্য আমাকে এডিটর সাহেব কেনই বা ডাকবেন, বলুন!

ছোটগল্পও আছে কিছু। আমি গল্প লিখিনি কখনও, আর এমন গল্প তো কল্পনার বাইরে 'সাঙ্গ হলে মনে হবে, শেষ হয়ে হইল না শেষ'......এসব তো ছোটগল্পের শৈশবের সংজ্ঞার অংশ। এখন অন্যরকম। কোন কোন গল্পের শুরুতেই মনে হয় শেষ হয়ে গেছে সব, অন্তত হলে ভাল হত! না, আমি এসব তো পারব না, কেনই বা এডিটর আমাকে ডেকে পৃষ্ঠা নষ্ট করবেন বা সাতান্ন কপি বিক্রি কমাবেন।

নামী ক্রিকেটার বা ফুটবলার হলেও না হয় কথা ছিল। উগরে দিতাম এক আধ টুকরো স্মৃতি অথবা দু-তিন কুচি মতামত, পত্রিকা এবং পত্রিকার পাঠক-পাঠিকারা ধন্য হয়ে যেত। কেউ কেউ একই কথা বলেছেন আগেও, কখনও না কখনও, কোথাও না কোথাও। কেউ কেউ একেবারেই অন্যরকম কথা বলেছেন আগে, কোথাও না কোথাও, কখনও না কখনও। কেউ কেউ কিছুই বলেননি বলতে গেলে লেখায়, আগেও বলেননি তেমন কিছু কোথাও না, কখনও না। তবু তাঁরা আছেন তাঁরা থাকবেন। ক্লান্ত পদযুগলকে (অথবা হস্ত) বিশ্রামে চড়িয়ে তাঁরা অনুগ্রহ পূর্বক মস্তিষ্ক সঞ্চালনে রাজি হচ্ছেন, এ কি কম কথা! এই সব বিখ্যাত লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক বিরাট খেলোয়াড়দের পাশে কে এই বাবুরাম নামে সাপুড়ে, যাকে পুজো সংখ্যায় লিখতে ডেকে এডিটর সাহেব কাগজের নাম ডোবাবেন? ছি!

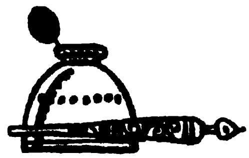
তবু হাতে যার কলম লেখার ইচ্ছে তার হয়। হাতের কলমকে মনে হয় সেই চাষীর লাঙল, যার চাষ করার জন্য কোন জমি নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়-এর গল্পের সেই তাঁতী যার তাঁতে সুতো নেই। এডিটর সাহেব ঝুঁকি নেন না, বাবুরাম সাপুড়েরা লেখার ডাক পায় না, তবু শরৎ আসে, কাশ ফুলের পতাকা উড়িয়ে, সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে। আমি তো নই বিখ্যাত লেখক যে, যেমন খুশি কিছু অক্ষর কাগজে বসিয়ে দিলেই লোকে গোগ্রাসে গিলে নেবে। আমি নই বিশিষ্ট সাংবাদিকও যে জাবর কাটার নেশায় বুঁদ হয়ে সম্মোহিত রাখব পাঠক পাঠিকাদেরও। আহা, যদি এডিটর হতাম! বছরের কিছু গল্প, ঘটনা, কথাবার্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিতাম আরোপিত রসিকতা আর হাস্যকর ভাষণের সুস্বাদু মশলা, দশ বারো পৃষ্ঠার বিশাল কড়াইয়ে রান্না করে পরিবেশন করতাম 'প্রিয়' পাঠক-পাঠিকাদের, পুজোয় এমনিতেই অতিভোজনে ব্যতিব্যস্ত 'প্রিয়'রা নিশ্চিতই ঢেকুর তুলতেন।

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ!' কিন্তু সে তো পর্বত, রবি ঠাকুর তাকে দিয়ে এমন অসম্ভব চাওয়াতেই পারেন। আমি কী করে দেখি পুজো সংখ্যায় ডাক পাবার অসম্ভব স্বপ্ন? তবু ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় এই শরতের সাদা মেঘ হয়ে আপনাদের কাছে পৌঁছে গিয়ে কিছু বলতে। খেলারই কথা, তবু শুধু খেলার নয়। খেলা শুধু খেলা নয়। সারাবছর খেলা আর খেলার খবরের চচ্চড়ি (না, না বিরিয়ানিই) গিলে ক্রীড়ামোদী পাঠক-পাঠিকাগণ, আপনারা তৃপ্ত অথবা ক্লান্ত। ইচ্ছে হয়, এই ক্লান্তি আর তৃপ্তির দেওয়াল চূর্ণ

করে আপনাদের কাছে হাজির হতে, আজি এ শারদ প্রাতে। একদিন না একদিন পুজো সংখ্যায়, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়, ডাক আসবে আমার এবং আমি একটা লেখার মতো লেখা লিখব। খেলোয়াড়রা সেই লেখার কথা ভাবেনি কখনও। বিখ্যাতরা সেই লেখার আশ্চর্য সমতলে নেমে আসতে পারবে না কখনও। সাংবাদিকরাও খবরের গন্ধ গা থেকে ধুয়ে ফেলে পৌঁছতে পারবে না সেই লেখার উঠোনে। এডিটরদের নিরেট মাথায় কখনও অঙ্কুরিত হবে না সেই আশ্চর্য লেখার বীজ। আমি, বাবুরাম সাপুড়ে, তেমন একটা লেখা লিখব, যা হবে শরতের রোদের মতো তেজী, শরতের বৃষ্টির মতো পরিষ্কার, শরতের আকাশের মতো নীল ঝলমলে, শরতের বিদায়ের মতো বিষণ্ণ।

এবারও পুজো সংখ্যায় আমি নেই। তবু আমি আছি। প্রিয় পাঠক ও পাঠিকা, যদি সাদা কাশফুল থাকে কাছাকাছি, তার দিকে তাকান। আমি সেখানে আছি। নীল আকাশে মন্দাক্রান্তা ছন্দে ভেসে-চলা ওই সাদা মেঘের দিকে তাকান। আমি আছি। নতুন জামা-পরা উজ্জ্বল শিশুদের দিকে তাকান। আমি আছি। উত্তাল ঢাকের বাদ্যিতে কান পাতুন। আমি আছি। গল্পে আনন্দে আহারে আরামে উদ্ভাসিত হোক আপনাদের শারদ উৎসব, আমি আছি, আমি থাকব আপনাদের পাশাপাশি। শুধু আমার লেখাটাই অপেক্ষা করবে আরও কিছুকাল। আমাকে আপনাদের কাছে পৌঁছতে দেবে না— এমন সাধ্য কার?

১০৪



আপনারা বলবেন, অপাত্রে সৌভাগ্য। আমি জানি, যোগ্যতার স্বীকৃতি। গোটা দেশের স্পোর্টস জার্নালিস্টদের মধ্যে পছন্দ করার জন্য চাঁদু বোরদে যে আমাকে বেছে নিয়েছেন, এটা নিতান্তই আমার অনস্বীকার্য প্রতিভা বা দক্ষতা বা ক্ষমতা বা যোগ্যতার স্বীকৃতি। বোরদে যোগ্য মুখ্য নির্বাচক, আমি যোগ্য মূর্খ জার্নালিস্ট— মিল না হবার কোন উপায় নেই।

ব্রেকফাস্টের আগে বোরদে কারও সঙ্গে দেখা করেন না। আমার ক্ষেত্রে একসেপশন, ন্যাচারালি। সাত সকালে পুনায় তাঁর বাড়িতে হাজির হতেই কলিং বেলের পাখির কিচিরমিচির, বালকভৃত্য জানাল, সাহেব তখনও ফাস্ট ব্রেক করেননি। ইদানীং একটু দেরি হচ্ছে। খবরের কাগজে কেউ কোন গালাগালি করল কিনা দেখে নিতে হয়। অতঃপর আলোচনা ধুয়ে ফেলার জন্য স্নান। স্নানের পর ব্রেকফাস্ট সেরে তিনি ড্রইং রুমে আসেন, ভিজিটরদের মিট করার জন্য। স্লিপে নাম লিখে পাঠালাম। জানতাম, আমি বোরদের কাছে একসেপশন কেস। স্নান করেই ড্রইং রুমে চলে এলেন এবং আমার সামনেই ব্রেকফাস্ট করলেন। সিলেকশন কমিটির চেয়ারম্যান কাউকে ইন্টারভিউ দেন না। বাবুরাম সাপুড়েকে দেন।

• মিঃ চেয়ারম্যান, আপনারা বলেছিলেন, কিরমানি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাদ্রাজেই জীবনের শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন। আরও বলেছিলেন, নেহাত ভাল ব্যাট করে ফেলেছিল, নাহলে ওই সিরিজেও বাদ দেওয়া হত। আবার কেন কিরিকে ফিরিয়ে আনা হল? ওই ব্যাকগিয়ার কি অযৌক্তিক নয়?

বোরদে : এই ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেনটা অন্য কেউ করলে আমি 'নো কমেন্টস' বলতাম। তুমি আমার ভাইয়ের মতো। ভাই লজ্জা দিও না মোরে।

মোরে, হুঁ, মোরে। হঠাৎ মোরে নেমে এল কেন? শ্রীলঙ্কা ট্যুরে একটু অফ কালার থাকলেও তার আগেই অস্ট্রেলিয়া আর শারজায় সদানন্দ তো ভাল কিপিং করে এল। এই সেদিনও ও ছিল আপনাদের মতে ইন্ডিয়ার নাম্বার ওয়ান উইকেটকিপার, এখন সেই শারজা আর অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার সময়েই ওকে দু নম্বর উইকেটকিপারও ভাবতে পারলেন

না?

বোরদে : বাজে বোকো না, ভাই। পারলাম না আবার কী? চেষ্টা করলে পারতাম না? চেষ্টা করিনি। অস্ট্রেলিয়ায় একটাও টেস্ট খেলবে না মোরে— রাইট ইন দ্য ভরত রেড্ডি মোল্ড। কিরি নিশ্চিন্তে কিপ কেরতে পারবে। সদানন্দ হঠাৎ ভাল ফর্মে থেকে ডিসটার্ব করতে পারত। ইউ শুড নট ডিসটার্ব ইওর ম্যান বিহাইন্ড দ্য স্টাম্পস্।

• বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ আর রথম্যানস কাপে মদনলাল খুব ভাল বল করেছিল। শ্রীলঙ্কা ট্যুরে বাদ দিলেন। এবারও বাদ। কেন?

বোরদে : তুমি ছেলে ভাল, কিন্তু তোমার মাথায় কাউডাং ছাড়া কিছু নেই, ভাই। আমরা রেকর্ড ঘেঁটে দেখেছি, মদন দেড় বছর বাদে টিমে ঢুকে ভাল খেলে। টাইম এলে ওকে ফের টিমে আনা হবে। আনতে কোন অসুবিধে নেই, কারণ ডোমেস্টিক ক্রিকেটে ও সব সময়েই রান-উইকেট পায়। মদনলালের স্বার্থে, ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের স্বার্থে আমাদের আরও বছর খানেক অপেক্ষা করতে হবে।

• অশোক মালহোত্রা কেন?

বোরদে : নিশ্চয় এজন্য নয় যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে ও প্রচুর রান করেছে। ইন ফ্যাক্ট, নানা ট্যুরে গিয়ে বসে থাকার রেকর্ড এখন অনেকেরই দখলে। চান্স না পেয়েও কীভাবে শান্ত থাকতে হয়, অশোকের কাছ থেকে তা শেখা দরকার। রাজু, রাজিন্দার, কিরণ— ওদের সবার কাছে আদর্শ হিসাবে জ্বলজ্বল করবে অশোক। সিলেক্টরদের বুঝলে ভাই, অনেক কথাই মাথায় রাখতে হয়।

• সানিকে জোর করে ওপেন করানোর কী কারণ?

বোরদে : ছিঃ, জোরের কী আছে ভাই। ও না গেলে কি ওকে দিয়ে ওপেন করানো যাবে? গিয়ে যদি গণ্ডগোল করে, মেক-শিফট ওপেনার— রবি বা রজার। সুনীলকে বাদ দিলে, আমাদের মেক-শিফট ওপেনাররা চিরকালই রেগুলার ওপেনারদের চেয়ে ভাল ওপেন করেছে। বুধি, আবিদ, ফারুখ, রবি, নাউ ইফ রিকোয়্যার্ড— রজার। এটাও একটা স্ট্র্যাটেজি।

• রাজপুতকে বাদ দেওয়া কি ঠিক হল?

বোরদে : ছেলেটার টেকনিক মোটামুটি সাউন্ড। শ্রীলঙ্কায় কিছু রান করেছে। দলীপ সেমিফাইনালে ডাবল সেঞ্চুরি, ফাইনালে সেকেন্ড ইনিংসে থার্টি নট আউট। গুড পারফরমেন্স, তার ওপর সুনীলের পর জেনুইন ওপেনার দেশে নেই। এই অবস্থায় বাদ পড়ার মানে বোঝ? একদম ভেঙে পড়া। আমরা দেখতে চাইছি, এই অবস্থা থেকে লালচাঁদ বেরিয়ে আসতে পারে কিনা। পারসোনালিটি টেস্ট। আমরা খুব ভাল লোক। কিন্তু ফিউচার সিলেক্টররা তো এত ভাল লোক নাও হতে পারেন। তাঁরা অন্যায়ভাবে বাদ দিলেও যাতে লালচাঁদ ভেঙেচুরে শেষ না হয়ে যায়, এটা তারই সেফগার্ড। আমরা জানি, রাজপুত উইল বি অ্যান অ্যাসেট ফর দ্য টিম। আমরা ওকে একটু পোক্ত করে নিচ্ছি। টপ লেভেল স্ট্র্যাটেজি, মাথায় না ঢুকলে কষ্ট পেও না, ভাই।

• মনসুর আলি খান পতৌদি লিখেছিলেন, এবার মহিন্দার অমরনাথকে ক্যাপ্টেন করা উচিত। আপনারা ওর নামটা ভাবলেনই না কেন?

বোরদে : পতৌদি ডান দিকে গেলে আমি বাঁ দিকে যাই। কিন্তু এজন্য মহিন্দারের নাম কনসিডার করিনি— এটা বলা ঠিক নয়। কারণ, ওই লেখাটা আমি পড়িনি। আসলে, মহিন্দারকে ক্যাপ্টেন না করার ব্যাপারটাও হাইলি স্ট্র্যাটেজিকাল। মহিন্দার সিনিয়র ক্রিকেটার। দিল্লি আর নর্থ জোন টিমকে ভালভাবে লিড করেছে। পার্টিকুলরলি অস্ট্রেলিয়ার কন্ডিশনে দারুণ এক্সপিরিয়েন্সড। ওখানে গ্রেড ক্রিকেটেও খেলে খেলে সব মাঠের ঘাস চেনে। ক্যাপ্টেনসি বোঝে, জানে। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া পরিবেশ চেনে, জানে। ওকে তাহলে কী করে ক্যাপ্টেন করা সম্ভব? ক্রিকেট হল আনন্দের খেলা, অজানার রোমাঞ্চকর আনন্দ। যে সবই জানে তার এই আনন্দ থাকার কথা নয়। না না, মহিন্দারকে ক্যাপ্টেন করে আমরা ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ক্ষতি করতে পারব না। ইন্ডিয়ান ক্রিকেটের ফিউচারের কথা তোমরা ভাব না কেন, ভাই। এইট্টি সিক্সের ইংল্যান্ড ট্যুরে রবি শাস্ত্রীকে আমরা ক্যাপ্টেন বানাব ঠিক করে ফেলেছি। কপিল অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর ভুল করবেই, আমাদের ডিসিশন নিতে অসুবিধে হবে না। মহিন্দার সম্পর্কে আমাদের তেমন কনফিডেন্স নেই।

• কনফিডেন্স বোধহয় গাভাসকার সম্পর্কেও নেই। মিডল অর্ডারে বড় রান করে ফেললে অনেক ঝামেলা।

বোরদে : দ্যাখ ভাই, সুনীল একা টেস্টে যত রান করেছে, আমরা পাঁচজন সিলেক্টর মিলে তার প্রায় অর্ধেক রান করেছি। আমরাও ক্রিকেট বুঝি, ব্যাটিং বুঝি, কিছু কিছু। যা করেছি বেশ করেছি, চান্স পেলে আবার করব, এই নিয়ে অ্যাট লিস্ট তুমি ফ্যাচফ্যাচ কোরো না, ভাই।

• গাভাসকারকে নাকি ওয়ান ডে-তে উপযুক্ত মনে করছেন না। শ্রীলঙ্কায় স্লো ছিল? সেকেন্ড ওয়ান ডে-তে ছত্রিশ বলে ছত্রিশ, থার্ড ওয়ান ডে-তে বত্রিশ বলে ঊনচল্লিশ। রবি শাস্ত্রী, দ্য চ্যাম্পিয়ন অফ চ্যাম্পিয়নস— বিয়াল্লিশ বলে পঁচিশ। আজহারউদ্দিনের অবস্থাও প্রায় সেইরকম। আর ছত্রিশ বলে ছত্রিশ (বা বত্রিশ বলে ঊনচল্লিশ) স্লো হল?

বোরদে : মাথায় দু-এক ফোঁটা বুদ্ধি রাখ, ভাই। রবি-আজহাররা জুনিয়র, এদের এখন শেখার বয়স, বোঝার বয়স। ওদের একটু ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। বাট সানি ইজ থার্টি সিক্স অ্যান্ড হাফ, হি মাস্ট স্কোর ফাস্ট, অলওয়েজ। ছত্রিশ বলে ছেষট্টি করতে হবে। যে যত সিনিয়র, তাকে তত ফাস্ট স্কোর করতে হবে। ধর যদি আমি এখন টিমে থাকতাম, ছত্রিশ বলে ছিয়ানব্বই করতে হত। ছিয়াশির বেশি পারব না বলে খেলছিই না। সানিরও ছেড়ে দেওয়া উচিত।

• সানিকে আউট করার সঙ্কল্প সাধু, সন্দেহ নেই। কিন্তু স্লিপে ক্যাচগুলো ধরবে কে?

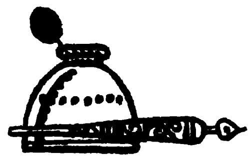
বোরদে : স্লিপে তো এখন আর ক্যাচ ওঠে না, ভাই। আমাদের পেস বোলাররা স্লিপ ফিল্ডারদের বেশ টেনশন থেকে মুক্তি দিয়েছে। এখন স্লিপে শুধু দাঁড়াতে হয়। বেঙ্গসরকার

খুব ভাল দাঁড়ায়, রবিও দারুণ। দুজনই খুব লম্বা কিনা।

• কো-সিলেক্টরদের সম্পর্কে আপনার মতামত কী?

বোরদে : খুব ভাল। ওদের একজন একটা টেস্ট খেলেছে, দুজন পাঁচের কম, আর একজন দশের কম। ওরা সবাই মিলে যা খেলেছে, আমি একাই তার চেয়ে ঢের বেশি খেলেছি। সিলেকশন কমিটির মিটিংয়ে বেশ কনফিডেন্টলি ঢুকি, বসি। বিষাণ থাকার সময় বেশ অস্বস্তি হত। সুদ এল, আমার সুখও এল। শুভেচ্ছা জানাও, ভাই, এ সুখ যেন দীর্ঘস্থায়ী হয়।

১০৫



গ্যাংটক, দিল্লি, বোম্বাই— সগর্বে উড্ডীন সবুজ-মেরুন পতাকা। পতাকার রঙ নয়, আরব সাগরের তীরে সূর্যোদয়ের টকটকে রঙ চোখেমুখে মেখে মোহনবাগানের গর্বসুন্দর ফুটবল সচিব চুনী গোস্বামী ঘোষণা করলেন, 'নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ডুরান্ড আর রোভার্সে টিমটাকে জেতালাম।' সাড়ে তিন গজ দূরে দাঁড়ানো সসঙ্কোচ কোচ অমল দত্ত বলেন, 'আমার কিছু বলার নেই।' বারো বছরের বিয়াল্লিশ ট্রফির ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য বলেন, 'সুখের পায়রা চুনী গোস্বামী এখন টিমের সাফল্যের ঝোল নিজের বাটিতে টানতে এসেছেন। খেললাম আমরা, শেষ হাসি হাসবেন উনি। লড়লাম আমরা, ক্লান্তি আর শান্তিতে ঘুমোবেন তিনি!' সুব্রতর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে আর একটু হলে নাকচ কোচ অমল দত্ত সেই একই মন্তব্য রাখেন, 'আমার কিছু বলার নেই।'

ভারতবর্ষের তাবৎ মোহনবাগানি সমস্যায় পড়েন, এই অবস্থায় কার গলায় সবচেয়ে বড় মালা পরানো উচিত। সবার আগে কাকে 'গুরু' বলা উচিত। অর্থাৎ, পরবর্তী বিপর্যয় এলেই কার দিকে থুথু ছোঁড়া উচিত। ময়দানের সর্বজনস্বীকৃত অনুসন্ধানী রিপোর্টার হিসেবে, সুতরাং, ব্যাপারটা খতিয়ে দেখার দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। গত চার দিনে হেঁটেছি মাইল চারেক, ঘুমিয়েছি ঘণ্টা পঞ্চাশেক, কথা বলেছি ময়দানের কত বাঘ ভালুকের সঙ্গে। এত কষ্ট, সে তো শুধু আপনাদের জন্য। সুতরাং, প্রিয় মোহনবাগানিগণ, ম্রিয় (মান) ইস্টবেঙ্গলিগণ, সকলেই আমার রিপোর্ট গিলুন। গিলে ধন্য হন।

বোম্বাইয়ে চুনী গোস্বামীকে আমি ট্রাঙ্ককলেই জিজ্ঞেস করি, 'আপনি বাটিতে, আই মিন কোলে ঝোল টানছেন কেন?' চুনী গোস্বামী : 'বিকজ আই হ্যাপেন টু বি দ্য ফুটবল সেক্রেটারি। বাট দিস ইজ সেকেন্ডারি। আসল কথা হল, প্রেজেন্স, পারসোনালিটি। গ্যাংটকেরটা মাইনর টুর্নামেন্ট ছিল, ওখানে আমার মতো মেজর পার্সোনালিটির প্রেজেন্স দরকার ছিল না, ওখানে শৈলেন মান্নার প্রেজেন্সই যথেষ্ট। দিল্লিতে আর এখানে জেতালাম দাঁড়িয়ে থেকেই, বসেছি কদাচিৎ, শুয়েছি— কই মনে পড়ে না, আমি শেষ হাসি না হাসলে কে হাসবে? ফুটবলাররা লিগের সময়ও ছিল, কোচও ছিলেন, আমি ছিলাম না। মেজর পার্সোনালিটির প্রেজেন্স ছিল না। আই হ্যাভ মেড দ্য ডিফারেন্স। আমি খুব ক্লান্ত। তবু হাসব। হাসতে হাসতে আরও ক্লান্ত হলে ঘুমিয়ে পড়ব। ঘুম ভাঙলে আবার হাসব। গুড

নাইট।'

চুনী গোস্বামীকে হাসার এবং ঘুমনোর সুযোগ দিয়ে আমি সুব্রত ভট্টাচার্যর কাছে হাজির হই। ক্রমাগত খেলে কিঞ্চিৎ ক্লান্ত থাকায় এবং সন্তানসম্ভবা স্ত্রী নার্সিংহোমে থাকায় সুব্রত হাসছিল না, ঘুমোচ্ছিলও না। জিজ্ঞেস করলাম, 'চুনী গোস্বামীর এই বক্তব্য কী করে অস্বীকার করা যাবে যে লিগে তিনি, অর্থাৎ কিনা তাঁর মেজর পার্সোনালিটির প্রেজেন্স না থাকায় টিম ঝুলেছে, ডুরান্ড রোভার্সে তিনি অর্থাৎ তাঁর মেজর পার্সোনালিটির প্রেজেন্স থাকায় ক্লাবের গলায় মালা আর ট্রফি ঝুলেছে?' সুব্রত : 'চুনী গোস্বামীকে জিজ্ঞেস করবেন, মোহনবাগান তাঁর মেজর প্রেজেন্সে ফেডারেশন কাপ ফাইনাল হেরেছিল কেন? চুনী গোস্বামীকে বলবেন তাঁর মেজর কী যেন দিয়ে মোহনবাগানকে শিল্ডটা পাইয়ে দিতে। তখন যেন আবার বম্বেতে জরুরি কাজ না পড়ে যায়। চুনী গোস্বামী আমার মতে, একটা ফুলও ডিজার্ভ করেন না, মালা তো দূরের কথা।'

ধীরেন-দে কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার টিমের সিনিয়রমোস্ট ফুটবলার আর জুনিয়রমোস্ট ফুটবল সেক্রেটারির মধ্যে টাগ অফ ওয়ার, সরি, ওয়ার অফ টাং চলছে। আপনার ভার্ডিক্ট জানতে চাই, মোহনবাগানের এই সাকসেসে কার ক্রেডিট বেশি ফুটবল সেক্রেটারির, না, সুব্রতসহ ফুটবলারদের?' ধীরেন দে অর্ধনিমীলিত চোখে হাসলেন এবং সুগন্ধী রুমালে নাক ও হাসি মুছলেন। প্রশ্নটা রিপিট করলাম। ধীরেন দে রুমাল এবং হাসি রিপিট করলেন। আমি পকেট থেকে দুর্গন্ধী রুমাল এবং মুখে উচ্ছে হাসি তুলে আনতেই রিপিট বন্ধ হল। ধীরেন দে অভিজাত যাত্রার, স্বগতোক্তির ঢঙে জবাব বিতরণ করলেন : 'হুঁ, ক্রেডিট! খেলার তো ঐ ছিরি, লিগে বোধহয় সাতান্ন পয়েন্ট লস। আর ফুটবল সেক্রেটারি বম্বেতে অন ডিউটি ছুটি কাটিয়ে এখন হাসতে এলেন। এখন আবার ঘুমবে বলছে। আরে, গোটা 'সিজনইতো' ঘুমোলি বাপধন। আর সুব্রত? না, না, ওর কথা আর শুনব না। লিগে জামশিদ গোল করল ওর পাস থেকে, কী ফাইন ব্যাক হেড, আহা, বলটাকে নামিয়ে দিলে, থামিয়েও দিলে। লিগে এগারটা গোল খাইয়েছে, একাই। '...ক্রেডিটটা তাহলে...? ধীরেন দে প্রশ্ন শেষ করতে দিলেন না, রুমাল... হাসি... এসব কিস্যু না, বললেন : 'ক্রেডিটটা আমাকে দিতে পার, যদি দিতেই হয়। আমি অবশ্য এসব চাই না। মান্নাটা চায়, চায় না, ইন ফ্যাক্ট নিজেই নেয়।' ধীরেন দে-র বক্তব্য অমল দত্ত শুনলেন। বললেন, 'আমার কিছু বলার নেই।'

দুপুরে দে'জ মেডিকেলের অফিসে ধীরেন দে-র সঙ্গে কথা বলার পর বিকেলে মোহনবাগান টেন্টে গেলাম শৈলেন মান্নার সঙ্গে কথা বলার জন্য। পেলাম না। গজু বোস বললেন, 'মান্না-টান্নাকে আর না, এখন আমাকে খুঁজুন।' দুধের বদলে জল, তথাস্তু, সজল বসু ওরফে গজু বসু, ওরফে হুঁ হুঁ গজু বোস দ্য গ্রেট বললেন, 'মশাই, আপনারা এক টিপ নস্যির সমানও ফুটবল বোঝেন না। বুঝলে, মালাটা আমার গলায় চড়িয়ে ইন্টারভিউ শুরু করতেন। এবার আমার বেস্ট রিক্রুট— মজিদ আর রবিকুমার। মাত্র লাখ দেড়েক খরচ করে ওদের আনা হয়েছে। আমি জানতাম রবিকুমার চান্স না পেয়ে দেশে পালাবে, মজিদ জঘন্য খেলে ডোবাবে। মজিদ খেলতে পারবে না, রবিকুমার পালাবে, তাহলে মাঝমাঠে প্রশান্তকে হেল্প করবে কে? আমি শুধু এই প্রবলেমটা ক্রিয়েট করতে

চেয়েছিলাম, বলতে পারেন একটা চ্যালেঞ্জ, যাতে যোগ্য দুই মিডফিল্ডার জ্বলে উঠতে পারে। গ্যাংটক আর ডুরান্ডে মিহির, রোভার্সে ফরিদ ভাল না খেললে মোহনবাগান জিতত না। এই যে মিহির আর ফরিদকে ফর্মে তুলে আনা, এজন্য রবিকুমার আর মজিদকে দরকার ছিল, আমি এই দরকারটা বুঝেছিলাম। এখন তো কত লোক ক্রেডিট নিচ্ছে। একটু মিলিয়ে নিয়ে মালাফালা দেবেন ভাই।'

গজু বোসের খাওয়ানো টোস্ট চা তখনও গলায় আধশোয়া, তিনি কফির কাপ বাড়িয়ে বললেন, 'তাছাড়া আমি কিছু মানি না, শুধু মানি...ইয়ে মানিই আসল লোক, বুঝলেন। ডুরান্ডটা সবাই ফ্লুক বলছে। ওঃ, এত টাইব্রেকার হজম হচ্ছিল না মশাই। রোভার্সে এক গোলে জিতলেও হইচই জমত না, বুঝলেন। ওই সেকেন্ড গোলটাই ভাইটাল, গোল ফর সেলিব্রেশন, গোল অফ সেলিব্রেশন। গোলটা তো মানিই করাল তাই না? এই মানির হয়ে সবচেয়ে বেশি আমি বলেছি। মালায় আমার অ্যালার্জি, ঘাড় চুলকোয়, তবু দিতে পারেন এই একবার, তাতে যদি অন্যদের ফালতু ঝগড়াটা শেষ হয়।'

মোহনবাগানের অন্যতম কর্মকর্তা কাশী মণ্ডলের সবিনয় ধারণা : 'মোহনবাগানের দারুণভাবে রোভার্স জয়ে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব কাশী মণ্ডলের! আমি বলেছিলাম, সুদীপকে এনে দেব। এনে দিতে পারিনি। আনলে সুব্রত খেলত না। সুব্রত না খেললে চুনী গোস্বামী ফাইনালে হাফ টাইমে জুতিয়ে বার করে দেবার কথা বলত না। না বললে, কিছু ফুটবলার রেগে এবং বাকিরা ওই কথায় আনন্দ পেয়ে সেকেন্ড হাফে এত ভাল খেলত না।'

অজিত দত্ত বললেন, 'চুনী ঠিকই বলেছে, ও ফুটবল সেক্রেটারি হয়েছে বলেই টিম এত সাকসেস পেয়েছে। কিন্তু, নিজে সরে গিয়ে ওকে ফুটবল সেক্রেটারি বানাল কে? হেঁ, হেঁ, উইথ মালা, একটা ছবি হবে নাকি ভাই।' কাছাকাছিই বসে ছিলেন বীরু চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মুখে প্রশান্তির হাসি। কিছু বললেন না। শুধু মুখে মাখা ছোট্ট একটি অনুচ্চারিত বাক্য, 'হুঁ, হুঁ প্রশান্ত।'

চুনী গোস্বামী, সুব্রত ভট্টাচার্য, শৈলেন মান্না, ধীরেন দে, গজু বোস, কাশী মণ্ডল, অজিত দত্ত— যাবতীয় মুখ চোখের সামনে ভাসাতে ভাসাতে, সমস্যায় আগের চেয়েও বেশি হাবুডুবু খেতে খেতে মোহনবাগান টেন্ট থেকে বেরিয়ে এলোমেলো হাঁটছিলাম। হঠাৎ খেয়াল হল, আমি একটি ক্লাব টেন্টের সামনে দাঁড়িয়ে। সাইনবোর্ডে লেখা : 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব'। নামটা চেনা-চেনা মনে হওয়ায় কাছে গেলাম। এক ভদ্রলোক, দেখতে ঠিক কর্মকর্তা-কর্মকর্তা, বসতে বললেন। আমার প্রশ্নের, সমস্যার জটের কথা তাঁকে বলে ফেললাম। তিনি বললেন 'আপনি চারদিন ফালতু হাঁটাহাঁটি, খাটাখাটি করেছেন। আমরা রোভার্স কমিটির সঙ্গে ঝঞ্ঝাট না বাধিয়ে রাখলে এবং পয়সার চেয়ে সম্মানের কথা বেশি ভেবে ডুরান্ড খেলতে গেলে কি মোহনবাগান ট্রফি দুটো পেত? প্লিজ, মোহনবাগান পাবলিককে খবর দিন, মালাগুলো যেন এই টেন্টে নিয়ে আসে, আমি মালার বিছানায় শুয়ে আজ ঘুমাব, চুনী গোস্বামীর হাসির সঙ্গে সুর মিলিয়ে কাঁদব।'

১০৬

এই একটা জিনিস, বুঝলেন, অর্জন করতে হয় না, আপনিই হয়— বয়স! আমারও বয়স হচ্ছে এবং প্রচলিত ভুল ধারণা অনুযায়ী অভিজ্ঞতাও বাড়ছে। এই অভিজ্ঞ ক্রীড়া সাংবাদিকের কাছে উদীয়মান ক্রীড়া সাংবাদিকদের কিঞ্চিৎ আনাগোনাও শুরু হয়েছে। চা-খরচা বেড়েছে খানিক, নাহলে ব্যাপারটা বেশ আরামদায়ক। গত রবিবার যে এল তাকে ঠিক উদীয়মান বলা যাবে না। সে আছে দীর্ঘকাল, কিন্তু 'টেক অফ' করেনি এখনও। প্রখর বুদ্ধি এবং অসীম প্রতিভার সাহায্যে সে নিজেকে বেঁধে রেখেছে একই জায়গায়। শেখায় বিশ্বাসী নয় সে, তবু কিছু শিখতে একদা বাধ্য হয়েছিল। ব্যাপারটাকে সে ভালভাবে নেয়নি। যে শিখিয়েছিল তাকে সে ক্ষমা করেনি। কাদা, আলকাতরা, কালি ধুলো— এই জাতীয় সব ভাল ভাল জিনিসই সে ছুঁড়ে মারার চেষ্টা করেছে ওই পাপীর দিকে— যে তাকে একদা কিছু শেখানর চেষ্টা করেছিল। মনের কোণে আশা ছিল, কালি-ঝুলি-আলকাতরার জবাবে অন্তত একটা লেখা লিখবে ঘোর পাপী, সেটা ভাঙিয়ে, তাই নিয়ে ফেনা তুলে কাপড় কেচে চলে যাবে তার কাগজের দুটো ইস্যু। দিনকাল এমন খারাপ পড়েছে, গোলাবারুদের দাম এত বেড়ে গেছে, এখন আর মশা মারতে সচরাচর লোকে কামান দাগে না। হতাশ, টেক অফ না-করা সাংবাদিক আমার বসার ঘরে ঢুকল স্মার্টলি, রুমাল দিয়ে মুখের কালি মুছতে মুছতে, হাত দিয়ে মাথার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে। মোছা এবং ঝাড়া শেষ হবার পর বলল, 'ম্যাগাজিন করতে আর ভাল লাগে না। একটার পর একটা কাগজ তুলে দিতে আর ভাল লাগছে না।' বুঝিয়ে বললাম, 'এই তো তোমাদের দোষ ভাই, এই তুলে দেবার লাইনে রেকর্ডটা মজবুত না করেই ছাড়ার কথা ভাবছ।'

— 'আমি রেকর্ডের জন্য খেলি না! ইয়ে, রেকর্ডের জন্য কাগজ করি না, তুলি না। ইন ফিউচার, ডেইলি পেপারে ট্রাই করতে চাই।'

— 'ভাই, একা ডেইলি পেপার তুলে দেওয়া সম্ভব নয়। ইমপসিবল কাজে নামতে চাইছ কেন, এই টেক অফ না-করা মধ্যতিরিশে।'

— 'না, না, বললাম তো, আর তুলে দেবার লাইনে থাকতে চাইছি না। আমি ডেইলি পেপারের স্পোর্টস পেজে বিপ্লব ঘটাতে চাই। দেখিয়ে দিতে চাই, ম্যাগাডাস্টবিনে পড়ে

না থাকলে এতদিন ডেইলির ফাঁপা মাতব্বরদের ভিটেতে আমি ঘুঘু চরিয়ে দিতাম। চাকরি পাবার লাইনটা আমি দেখছি, আপনি শুধু আমাকে কিছু অ্যাডভাইস দিন, ডেইলি পেপারের স্পোর্টস রিপোর্টিংয়ে কোথায় কোথায় ফাঁক আছে। এখন থেকেই মেন্টাল প্রিপারেশন নেব, যাতে চাকরি পেলে পরদিন থেকেই ক্যান্টার করে দিতে পারি। আপনার কাছেই এলাম। অরিজিনাল আইডিয়া আর কার কাছেই বা পাব? সব জার্নালিস্টই নিজের নিজের আইডিয়া কাজে লাগাচ্ছে। আপনারটা মাথাতেই থেকে যাচ্ছে, ইউজ করার স্কোপ নেই। অথচ আপনার মত জিনি...'

ঠিক আছে, ঠিক আছে। মনে মনে বললাম, ওটুকুই থাক, তোমার যা ইংরেজি উচ্চারণ, হয়ত জিনিঅ্যাস বলে ফেলবে! কথা না বাড়িয়ে জ্ঞান ও ভাষণদানে প্রবৃত্ত হলাম :

'বৎস, আধুনিক সাংবাদিকতার মূল ধারা এবং কৌশলের সঙ্গে তোমাকে পরিচিত হতে হবে। ডিটেইলস এবং ফলো আপ। যে কোন খবরকে নানাভাবে চাখতে, দেখতে, দেখাতে হবে। নানাভাবে রাঁধতে হবে। খবর সেদ্ধ করতে হবে, ভাজতে হবে, পোড়াতে হবে। যে খবরে সুক্তোর সম্ভাবনা, তা দিয়েও মুড়িঘণ্ট বানাতে হবে। খবরের ভিতরে ঢুকে খবরকে চৌচির করে ফাটিয়ে দিতে হবে। খবরের খোসা ছাড়াতে হবে, তারপর টুকরো করতে হবে, প্রয়োজনে একেবারে পাউডার বানিয়ে ফেলতে হবে। হুঁ, প্রথম যে কথা মনে রাখতে হবে— ডিটেইলস। উদাহরণ ছাড়া কথা বলার মানে হয় না। ধর, রিসেন্টলি 'আজকাল' ডেইলিতে অমল দত্তর বাড়িতে ফুটবলারদের নেমন্তন্ন খাওয়ার ছবি আর খবর বেরিয়েছে। কিন্তু কী জঘন্য ট্রিটমেন্ট। এত ভাল একটা খবরকে ওরা 'কিল' করল। মার্ডার। খবরটা পড়ে দেখ, কিস্যু নেই। ইনফর্মেশন বলতে আছে অ্যাবসেন্ট ফুটবলারদের নাম আর লাঞ্চ-এর মেনু। এই ধরনের খবরের ক্ষেত্রে তোমাকে কিন্তু 'ডিটেইলস'-এ ঢুকতে হবে। যেমন ধর : (ক) কোন্ আইটেম খেতে কেমন হয়েছিল, (খ) কোন্ আইটেমের রান্না কতটা ভাল হয়েছিল, (গ) কে কতটা খেয়েছে, (ঘ) খাওয়ার পর কে কী মন্তব্য করল। ভাবলে আরও বেরবে। পি কে ব্যানার্জির বাড়িতে ফুটবলারদের লাঞ্চ-ডিনারের খবরও ছাপা হয়েছে, কিন্তু সেই 'ডিটেইলস'-এর অভাব। প্রথমেই কী বলেছিলাম? ডিটেইলস, আর ফলো আপ। এই খবরটারও, দ্যাখ, কেমন ফলো আপ-এর স্কোপ ছিল, মাথামোটারা কিছু করেনি। পরদিনই সব ফুটবলারের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত ছিল, গলদা চিংড়ি খেয়ে কারও পেটের গণ্ডগোল হল কিনা। খবরের প্রতি এদের কোনও মায়ামমতা নেই। ধরে আর ছাড়ে। আশা করব, তুমি যা ধরবে তা সহজে ছাড়বে না।

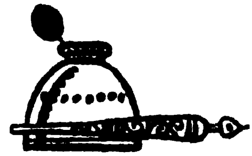
আরও একটা উদাহরণ চাই? নাও। সম্প্রতি অতিবিখ্যাত সাপ্তাহিকে অর্ধখ্যাত এক লেখক গাভাসকারকে নিয়ে প্রবন্ধরূপী জিমন্যাসটিক্স পেশ করেছেন। সুদূর অতীতের অন্ধকার থেকে দিনের আলোয় তুলে এনেছেন কত না মণিমুক্তো। কিন্তু সেই ডিটেলইস-এর অভাব, ফলো আপ-এর অভাব। গাভাসকার তিরিশটা টেস্ট সেঞ্চুরি আর সাড়ে আট হাজারের বেশি রান কী করে করেছে? লেখক জানিয়েছেন, ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে সেভেন্টিওয়ান সিরিজে সোবার্স গাভাসকারের প্রচুর ক্যাচ ফেলেছিলেন, গাভাসকারের সেরা সময়ে প্যাকার সার্কাস সব ভাল বোলারদের তুলে নিয়ে গিয়েছিল এবং ওভালে

ঐ ঐতিহাসিক দুশ একুশের সময় মাইক হেনড্রিক মাঠে ছিলেন না (বথাম, উইলিস ইত্যাদি বাজে খেলোয়াড়রা ছিলেন অবশ্য)। কিন্তু কথা হল, এসব কথা তো সবাই জানে। হ্যাঁ, হঠাৎ এতদিন পর আবার মনে করিয়ে দেওয়ার পরিশ্রমটা আছে। কিন্তু আরও সব ডিটেইলস নেই কেন? টেস্ট জীবনে গাভাসকারের কত ডজন ক্যাচ পড়েছে, কতবার অফ স্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিতে গিয়ে একটুর জন্য ব্যাটে লাগেনি, ফিল্ডাররা ফসকানোয় কত ফালতু রান গাভাসকার পেয়েছে, আম্পায়ার কতবার জেনুইন এল বি ডব্লু দেননি, অপোনেন্ট ক্যাপ্টেন কতবার ভুল বোলারকে দিয়ে বল করানোয় গাভাসকার বেশি রান করেছে? সব লিখতে হবে। খাটতে হবে ভাই। তুমি অবশ্য পারবে। গত চল্লিশ মিনিট ধরে যেরকম অক্লান্তভাবে মুখের কালি তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছ, তোমার ওপর ভরসা করা যায়। আর হ্যাঁ, এটারও ফলো আপ দরকার ছিল। এই লেখার পরই গাভাসকার শারজায় দুটো জঘন্য ইনিংস খেলে একশ উনচল্লিশ করে গেল, দুটো ক্যাচ ফসকানো তো আমরা নিজেদের চোখেই দেখলাম, কিন্তু আরও ডিটেইলস চাই— কী করে গাভাসকার এত রান পেল? ইমরান মাত্র পাঁচটা বল করেছে, হার্পারের দাঁতে ব্যথা ছিল, ওয়ালশ-এর জায়গায় ড্যানিয়েল থাকলে ওরকম হত না, গোমস লেট স্টার্ট নেওয়ায় দু-বার গাভাসকার এক-এর জায়গায় চার পেয়েছে— এই জাতীয় অজস্র ডিটেইলস দিয়ে 'ফলো আপ' করার দরকার ছিল।

যারা গাভাসকারকে দিবারাত্র তেল দেয়, ফুল, বেলপাতা দিয়ে পুজো করে, তারাই বা কতটুকু ডিটেইলস দেয়? সানির ডায়েরি, সানির অ্যালবাম, সানির কত কিছু। কিন্তু কেউই কি এখনও জানতে পেরেছেন এই সব দরকারি খবর : (ক) গাভাসকার ডিনারে চাপাটি নেয় কিনা, নিলে কতগুলো নেয়। (খ) সকালে গাভাসকার কী পছন্দ করে— চা না কফি? (গ) গাভাসকারের টেলিফোনের রঙ কী? (ঘ) রোহন কোন স্কুলে পড়ে? (ঙ) রোহনের প্রিয় বন্ধুদের নাম কী। (চ) কেউ তো করেই, গাভাসকারের বাড়ির বাজারটা কে করে? কোনও ভৃত্য? তাহলে তার নাম কী? (ছ) গাভাসকার চায়ে কত চামচ অথবা কত কিউব চিনি নেয়? রোহন? মার্শেনিল?'

আমার বক্তৃতায় চমৎকৃত হয়ে এবং মুখের কালি মোছার ব্যাপারে হাল ছেড়ে দিয়ে টেক অফ না-করা জার্নালিস্ট উঠল এবং কী যেন বিড়বিড় করতে করতে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ডিটেইলস আর ফলো আপ— শব্দ দুটো কানে গেল। ছেলেটার হবে। বললাম, 'এ দুটো তো অবশ্যই চাই। আর চাই ইমাজিনেশন, ইনোভেশন। আর একটা উদাহরণ নিয়ে যাও সবার আগে। এই ধর, চুনী-সুব্রত ক্ল্যাশ নিয়ে দুটো ডেইলি বেশ ডিটেইলস দিল, ফলো আপও করল, কিন্তু সঙ্গে একটু ইমাজিনেশন থাকলে কী হত, ভেবে দ্যাখ। চুনী গোস্বামীকে বলে কয়ে ধরে বেঁধে একবার শুধু কলকাতায় আনতে হত। তারপর নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে হত। সঙ্গে ফটোগ্রাফার থাকত। চুনী আশীর্বাদ করছেন সুব্রতর নবজাত পুত্রকে— এই ছবিটা পরদিনের কাগজে কীরকম হিট করত, ভেবে নাও। সঙ্গে ক্যাপশন— 'মধুরেণ....' না, না, এটা খুব হাল্কা হয়ে গেল। খুব ভারি শব্দ চাই। এই ধর— 'মহামিলনের লগ্নে, মহাজীবনের ভোরে!'

১০৭



জগদ্বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট নির্বাচন কমিটির এই ইনফর্মাল মিটিংয়ের মূল সুর বিষাদ বা আনন্দের ছিল না। অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম টেস্ট ড্র হয়েছে, বেশ হয়েছে। দুঃখের কিছু নেই, আনন্দেরও কিছু নেই। দেশের সাড়ে চার প্রান্ত থেকে পাঁচ নির্বাচক শিলংয়ের পাইনউড হোটেলে জড়ো হয়েছেন কিছু জরুরি, আগাম কিন্তু ইনফর্মাল শলাপরামর্শের জন্য। বোর্ড পয়সা দিচ্ছে না, তবে পাঁচজন নির্বাচকই স্পনসর পেয়েছেন। তাঁদের কোটের বুকে ক্যাম্পা কোলার ইনসিগনিয়া। ইনফর্মাল মিটিং, সুতরাং বোর্ড ফাইন-টাইন করতে পারবে না।

মিটিংয়ের শুরুতেই দুশ্চিন্তায় মুখর হন মুখ্য নির্বাচক: 'আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, ওনলি দ্যাট চ্যাপ, সুনীল গাভাসকার। আমি খুশি যে ওর মুখে চুনকালি পড়েছে। ওপেন নাকি করবে না! সেই তো সুড় সুড় করে করলি, সেঞ্চুরিও করতে হল ওপেন করেই। আমি মনে করি, এটা আমাদের নৈতিক জয়।'

দ্বিতীয় নির্বাচক মহোদয় কথা বলতে গিয়েও সাড়ে পাঁচ সেকেন্ড থমকে থাকলেন মুখে একসঙ্গে হাফ ডজন ফিশফিঙ্গার। একটু ফ্রি হয়ে বললেন: 'আপনারা মরাল ভিক্টরির কথা বলেছেন, এদিকে রত্নাগর কী লিখেছেন, দেখেছেন? তাঁর বক্তব্য সুনীলকে মিডল অর্ডারেই ব্যাট করতে দেওয়া উচিত, ইন ফ্যাক্ট সেই সেভেন্টি এইট থেকেই ওকে মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ ওর হাইট কম, রাইজিং বল খেলতে ওর অসুবিধা হয়। তাই আগে অস্ট্রেলিয়ায় কোনও টেস্টেই ফার্স্ট ইনিংসে সেঞ্চুরি পায়নি (সেকেন্ড ইনিংসে বল মোটে লাফায় না!—বাঃ সাঃ) এবার এডিলেডেও দ্বিতীয় দিন থার্টিনাইনের মধ্যে একটা চান্স আর একটা হাতে-লাগা ছিল।'

মুখ্য নির্বাচক: 'আপনি মিছিমিছি বিচলিত হবেন না, প্লিজ। ডিকি রত্নাগরকে সিরিয়াসলি নেবার কিছু নেই। সুনীলের পিছনে আমরা কতদিন ধরে লাগছি? কতটুকুই বা লাগতে পেরেছি? ডিকি ক্লান্তিহীন, ডিকি লজ্জাহীন। এ পর্যন্ত তিনবার সুনীলকে টেস্ট ক্রিকেট থেকে তাড়ানোর প্রস্তাব করেছে, তিনবারই পরের টেস্টে সুনীল অ্যাটলিস্ট সেঞ্চুরি করেছে। এইট্টি থ্রিতে গায়ানা টেস্টের রেডিও কমেন্ট্রি করার সময়, সুনীল যখন

হাফ সেঞ্চুরিতে পৌঁছল, ডিকি আন্তরিকভাবেই বলেছিল যে, গাভাসকারের খেলা দেখে মনে হচ্ছে না সেঞ্চুরি হওয়ার কোনও চান্স আছে। সেঞ্চুরি হবার ঠিক আগেই ডিকি সসম্মানে মাইক্রোফোন ছেড়ে দিয়েছিল, তখনও নিজের ওই টার্ন-এর পাঁচ মিনিট সময় হাতে থাকা সত্ত্বেও। সুনীলের কীর্তির চারপাশে কাদা লেপার চেষ্টা ডিকি বছরের পর বছর চালিয়ে যাচ্ছে। এই একশ ছেষট্টির কথা বলার সময়েও যে সুনীলের ব্যাটিংয়ের গণ্ডগোলের সাইডটাই হাইলাইট করতে পারছে, তার জন্য আমাদের সবাইকেই একবার টুপি খুলতে হবে। সুনীলকে আমরা ওপেন করতে বাধ্য করেছি, তারপর ডিকি বলছে ওকে মিডল অর্ডারেই পাঠানো উচিত। আগে বলেনি, লেখেনি। ডিকিকে নিয়ে ভাববেন না, প্লিজ।

তৃতীয় নির্বাচক প্লেটে টম্যাটো সসের আলপনা আঁকতে আঁকতে ঘোষণা করলেন, 'গাভাসকার এক নম্বর, সন্দেহ নেই। আই মিন, এক নম্বর নচ্ছার। আপনারা বুঝছেন না, এডিলেডের ইনিংস আমাদের নাকে র‍্যাঁদা ঘষার ইনিংস। হাতেফাতে লাগেনি দাদা, ওপেন করে থার্টি নাইন বানিয়ে কেটে পড়ল, ফের এল মিডল অর্ডারে। ওপেনার হিসেবে থার্টিনাইন, মিডল অর্ডারে করল হানড্রেড টুয়েন্টি সেভেন। দুনিয়ার লোককে বোঝাল, মিডল অর্ডারে ও কত ভাল। হুঁ, বাঁ হাতে চোট নিয়ে অমন খেলা যায়? আমাদের কি এক্সপিরিয়েন্স নেই নাকি? একবার, বুঝলেন, সার্ভিসেসের সঙ্গে রঞ্জি ম্যাচে আমার বাঁ হাতের কব্জির ওপরে লাগল, ফুলে গেল। ওই ব্যথা নিয়ে ফ্যানটাস্টিক থার্টি সিক্স করেছিলাম। হানড্রেড সিক্সটি সিক্স হয় না। টেস্টে হয় না। আমি অবশ্য টেস্ট বেশি খেলিনি।'

চতুর্থ নির্বাচকের নাকে চিলি সস ছিটকে যাওয়ায় এমনিতেই রেগে ছিলেন: 'আমরা কেন মূল প্রবলেম থেকে দূরে সরে যাচ্ছি? হোয়াট টু ডু উইথ দিস ম্যান? গাভাসকার আমাদের ম্যাচটা জিততে দিল না। ইস্‌স্‌, জে-তা ম্যাচ। ফোর্থ ডে-র শেষে থ্রি নাইন্টি ওয়ানের জায়গায় ফাইভ থার্টি ওয়ান থাকলে ফিফথ ডে-র শুরুতে একটা প্রেসার তৈরি করা যেত। একশ ষাটের লিড। কপিল আবার একশ ছয়ে আটটা নিলে, বাকি চুয়ান্ন বা তেপ্পান্নয় বাকি দুটো নিয়ে নিত অন্য কেউ, দু-একটা রান আজও কি হত না। টুকটুক করে নিজের রেকর্ড বাড়িয়ে ম্যাচটা ড্র করে দিল। ভিলেন, টিমের কথা ভাবে না। আমাদেরও আর ওর কথা ভাবা উচিত নয়। এই ইনিংসটা আরও চোখ খুলে দিল।'

পঞ্চম নির্বাচক চিলি চিকেনের শেষ লঙ্কাটির ডগায় দাঁত-চিমটি কেটে জানালেন, 'ইনফর্মেশন আছে আরও অনেক, ডাইরেক্টলি ফ্রম অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এখানে বসেই কি আমরা বুঝছি না, ও কত বড় ভিলেন। যাদব যখন অত ভাল খেলছে, ওকে আরও বেশি স্ট্রাইক দেওয়া উচিত ছিল না? সেঞ্চুরিটা বাঁধা ছিল, তাহলে ওয়ার্ল্ড রেকর্ডের জন্য আর মাত্র তিরিশটা বাকি থাকত।'

মুখ্যসহ চারজন একযোগে প্রশ্ন হাঁকলেন: 'অস্ট্রেলিয়া থেকে কী কী ইনফর্মেশন এসেছে?'

পঞ্চম বাজলেন: আপনারা শুনে ছিঃ ছিঃ করতেও ভুলে যাবেন, এডিলেডে মাইক্রোফোনে যখন কপিলের নাম 'ম্যান অফ দ্য ম্যাচ' বলে অ্যানাউন্স করল, সুনীল

কী করছিল জানেন? বোধহয় বাথরুমে ছিল। টিমের সবাই ওই সময় ড্রেসিং রুমের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, সুনীল নয়। পরে যাতে বলতে না পারে যে বেঁটে বলে ওকে দেখা যায়নি, জার্নালিস্টরা ড্রেসিং রুমে ঢুকে বসে ছিলেন, পিছন থেকে দেখার জন্য। এবার একেবারে ক্লিন কট বিহাইন্ড। পিছন থেকে দেখা, কট। এর পরে আর টিম স্পিরিট থাকে?

সেকেন্ড ইনফর্মেশন আরও ডেঞ্জারাস। রেস্ট ডে-তে অ্যালান বর্ডার একটা নাচের স্কুলের জন্য চাঁদা তুলেছে। আর ভিলেন সুনীল 'ওয়ান ডে ওয়ান্ডার্স'-এ সই মেরেছে। অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে বড় কাগজের ফার্স্ট পেজে দুটো ছবিই ছেপে দিয়েছে। হোয়াট বেঙ্গল থিঙ্কস টু ডে, ওয়ার্লড উইল থিঙ্ক টুমরো। ইস্। এরপর আর এই লোকটাকে ট্যুরে পাঠানোর মানে হয়?

দ্বিতীয় নির্বাচক প্রখর ক্রিকেট চিন্তাশীল। এগার ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘাড় হেলিয়ে বলেন 'আর-একটা সাইকোলজিকাল প্রোবলেমও আছে। ইউ ক্যান নট বি এ সাকসেসফুল লিডার, উইথ মোর কেপেবল ম্যান ইন দ্য টিম দ্যান ইয়োরসেলফ। এতে কনফিডেন্স নষ্ট হয়। সুনীলকে বাদ দিলে কপিলের কনফিডেন্স বাড়বে।'

মুখ্য নির্বাচক কাঁটায় শেষ দিকের ফিঙ্গার চিপস গাঁথতে গাঁথতে বক্তব্য রাখলেন: 'আমরা সকলেই একমত, শিলং খুব ভাল জায়গা, পাইনউড খুব ভাল হোটেল এবং এখানকার স্ন্যাকস আনপ্যারালাল। এছাড়া আর-একটি ব্যাপারেও আমরা একমত, সুনীল গাভাসকারকে অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ইন্ডিয়া টিম থেকে বাদ দেওয়া উচিত। যেদিন প্রথম সিলেক্টর হয়েছিলাম, মনে মনে স্বপ্ন দেখেছিলাম, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, এমন অন্তত একটা কিছু করে যাব, যা অন্য কেউ পারেনি। পনের বছর ধরে অনেক সিলেক্টর মনে মনে ভেবেও কখনও, একবারও গাভাসকারকে বাদ দিতে পারেনি। আমি এই দুর্লভ কৃতিত্ব অর্জন করতে চাই, চেয়ারম্যান হিসেবে। আপনাদের নামও ইতিহাসে লেখা থাকবে। কিন্তু, ক্রিকেটের ইতিহাসে এই নাম লেখানোর সুযোগ আর বেশি আমরা পাব না। সামনেই শেষ সুযোগ। এইট্টি সিক্স-এর ইংল্যান্ড ট্যুর-এর পরই সুনীল রিটায়ার করতে চায়। এই অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে আরও একটা বড় ইনিংস খেললেই (ব্যাটা খেলেও ফেলবে) ইংল্যান্ড ট্যুরে জায়গা পাকা। সুতরাং, আমাদের সামনে কঠিন দায়িত্ব। অস্ট্রেলিয়া ট্যুরকে ভুলতে হবে। ভারতীয় ক্রিকেটের স্বার্থ ভুলতে হবে। ভারতের লক্ষ লক্ষ ক্রিকেট রসিকদের আবেগের কথা ভুলতে হবে। শিলংয়ের এই ডিসেম্বরের সন্ধ্যার মতোই ঠাণ্ডা, অতি ঠাণ্ডা মাথায় আমাদের গাভাসকারকে বাদ দেওয়ার অপারেশন করে ফেলতে হবে। এজন্য পাঁচজনকেই মনের জোর রাখতে হবে। কালই আপনারা যে যার শহরে ফিরে যান। নিজের সেরা ছুরিটায় শান দিয়ে যান। খুনটা যদি সত্যিই করে ফেলতে পারি, সব কাগজের ফার্স্ট পেজে রক্তাক্ত ছুরি হাতে আমাদের পাঁচজনের ছবি নিশ্চয় ছাপা হবে। এখনও টিকে থাকা দু-এক ফোঁটা সম্মান ছাড়া আমাদের আর কিছুই হারানোর নেই, জয় করার জন্য পড়ে আছে *ক্রিকেট ইতিহাসের একটি কালো পৃষ্ঠা।*'

১০৮

এ আই এ জি সি ওরফে অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি গাভাসকার কমিটির একশ সাতাত্তরতম বৈঠক শুরু হল সাধারণ সচিবের গুরুগম্ভীর ভাষণ দিয়ে : 'গোড়া ধরে গড়া—অন্য কোনও পথ নেই। ভারতীয় ক্রিকেটে যদি আনতেই হয় নতুন জোয়ার, আমাদের এখন, আজ, এই দুপুর একটা ছত্রিশ মিনিট থেকেই তাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হবে। আমরা দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিরামহীন গাভাসকার বিরোধিতা করে ভারতীয় ক্রিকেটের অফুরন্ত সেবা করে যাচ্ছি। আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুকিয়ে মুখিয়ে আছি গোটা দেশ জুড়ে। আমরা সবাই যদি ট্যালেন্ট স্পটিং অপারেশনে নামি, পনের বছরের মাথায় নিশ্চয় অন্তত একজন ক্রিকেট সুপারস্টার পেয়ে যাব। আসুন, আজ সবাই মিলে প্রতিজ্ঞা করি, ট্যালেন্ট খুঁজে বার করবই করব।'

দিল্লির প্রবীণ সাংবাদিক দেশলাই কাঠির মশলার দিক দিয়ে কানে সুড়সুড়ি খাচ্ছিলেন। সুড়সুড়ি ইনকমপ্লিট রেখে এবং কানে আঙুল নাড়িয়ে চুলকোনি কমপ্লিট করে বিরক্তি প্রকাশ করলেন : 'ব্যাপারটা কী, এটা বোর্ডের ক্রিকেট কমিটি নাকি? এ আই এ জি সি উঠে গেল নাকি? দিল্লি থেকে বাঙ্গালোরের এই ফাজিল ফালতু ঠাণ্ডায় ডেকে এনে এসব রসিকতার কী মানে হয়?'

সচিব ফের উঠে দাঁড়ালেন : 'ছি ছি বড়দা, এ আই এ জি সি উঠতে যাবে কেন? ব্যক্তি নয়, বড় হল সংগঠন। গাভাসকারের বিরোধিতা করে ভারতীয় ক্রিকেটের প্রতি যে কর্তব্য পালন করেছি, ভবিষ্যতেও তার পতাকা আমরা বহন করতে চাই। কিন্তু গাভাসকার আর বেশিদিন থাকবে না। সুতরাং, পিছনে লাগার টার্গেট চাই। আমি যে টি এস ও-র কথা বলছিলাম, তা একই সঙ্গে ট্যালেন্ট সার্চিং অপারেশন এবং টার্গেট সার্চিং অপারেশন। আমাদের অর্গানাইজেশনকে লাটে তোলার জন্য গাভাসকার ক্যান রিটায়ার, এনি টাইম। আমাদের তাই খোঁজার কাজ শুরু করে দেওয়া দরকার, আমি তো শুরু করেই দিয়েছি।'

কমিটির নবাগত সদস্য চশমা নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন? কতদ্দুর এগোলেন?' সাধারণ সচিব : 'অনেক দূর। বলতে পারেন, পিলার

গড়া হয়ে গেছে।'

কমিটির প্রায় সব সদস্য সমস্বরে : 'সেকি!' সাধারণ সচিব : 'ইয়েস। ফেইলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। আমি খোঁজার চেষ্টায় ফেইল করেছি। অর্থাৎ, পিলার গড়ে ফেলেছি, এখন তার ওপর সাকসেস তৈরি হতে যতটুকু সময় লাগে, ওই একটু ধৈর্যের ব্যাপার আর কি।'

চশমা খুলে কপাল নাচিয়ে হাসার অদ্ভুত চেষ্টা করতে গিয়ে, নবাগত সদস্য সবার নজরে এসে গেলেন। মাদ্রাজকেশরী শুধোলেন, 'ইনি কে?' সাধারণ সচিব : 'লাস্ট সেক্রেটারিয়েট মিটিংয়ে এনাকে এই কমিটিতে কো-অপ্ট করা হয়েছে। আপনাকে জানাতে ভুলে গেছি। উনি বাংলার উদীয়মান গাবিসা, আই মিন গাভাসকার বিরোধী সাংবাদিক। আর একজনও উঠছেন, তবে এক সঙ্গে একই স্টেটের দু'জনকে এমন ইমপর্ট্যান্ট কমিটিতে নেওয়া যায় না। এনার কথা বলি, অনেকেই হয়ত জানেন না। এবারের শারজা আর অস্ট্রেলিয়া ট্যুরে গাভাসকারের ওপেনার হিসাবে যাওয়া নিয়ে লেখেন, যেতেই হবে। এত টাকা গাভাসকার ছাড়তে পারে না। যাবে, কিন্তু খুব বেশি রান করবে না। এমন রান করবে, যাতে টিম থেকে বাদ না যায়। আবার এমন বেশি নয় যাতে কপিলের ক্যাপ্টেনসিতে টিম জিতে যায়। ওনার কথা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে, হোয়াই ওনলি অক্ষরে অক্ষরে, একেবারে প্রিন্টিং-মিসটেক সুদ্ধু মিলে গেছে। সিডনি আর এডিলেডে গাভাসকার নাইন্টি টু আর সেভেন্টি সেভেন করল, কিন্তু কপিলের টিম হেরে গেল। কোনরকমে টেস্টে চার ইনিংসে তিনশ বাহান্ন তুলে একশ সতের পয়েন্ট তেত্রিশ অ্যাভারেজ করে ওয়ান ডে-র টিমে থাকল, কিন্তু কোনও টেস্ট জিততে দিল না কপিলকে। এই একটি ফোরকাস্ট অথবা মৌলিক চিন্তার জন্যেই এনাকে কমিটি মেম্বার করে নেওয়া যেত। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। 'ওয়ান ডে ওয়ান্ডার্স'-এর সাড়েদুর্ধর্ষ সমালোচনা করেছেন। প্রথমে ন্যাকামি ধরেছেন। এইট্টি থ্রি-র প্রুডেনশিয়াল কাপ নিয়ে 'রানস অ্যান্ড রুইনস'- ছিল চার লাইন, এইট্টি ফাইভের বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ নিয়ে পাতার পর পাতা আদিখ্যেতা। তারপর ব্যালান্সের অভাব ধরেছেন। বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপের জন্য টিম সিলেকশন হয়েছিল চণ্ডীগড়ে, ইন্ডিয়া-ইংল্যান্ড ওয়ান ডে ম্যাচের পর, রাতে। গাভাসকার সাতকাহন গপ্পো করেছে, ওই সন্ধেয় ও নিজে এবং ক্যাপ্টেনসির আর-এক দাবিদার রবি শাস্ত্রী কী করছিল, কীরকম মানসিক অবস্থায় ছিল। কিন্তু ইনি লিখেছেন, গাভাসকার অন্য-এক দাবিদার মহিন্দার অমরনাথের কথা লেখেননি। তখন হোটেলে কী করছিল অমরনাথ? তার মানসিক অবস্থা? গাভাসকার কিছুই লেখেনি। গাভাসকার অবশ্য বলতে পারে, চণ্ডীগড়ের টিমে অমরনাথ ছিল না, অমরনাথ তখন চণ্ডীগড়ে ছিলই না এবং ও লিখেওছে যে অমরনাথ অধিনায়ক হলে ওকে নিশ্চয় হঠাৎ চণ্ডীগড়ে আবির্ভূত হতে দেখা যেত, কারণ টিম সিলেকশনের সময় ক্যাপ্টেনের হাজির থাকা জরুরি। আমরা এসব কথা শুনবই না। চণ্ডীগড়ের কথা ক'জনের মনে আছে? 'ওয়ান ডে ওয়ান্ডার্স'-ও কি সবাই পড়েছে? সুতরাং, সাহস করে সমালোচনা লিখে দিতে হবে। ইনি পেরেছেন।

ইনি বীর। ইনি আমাদের কমিটির নতুন মেম্বার।'

নবাগত গাবি নক্ষত্র প্রশংসায় খাবি খেতে খেতে সচিবকে বললেন, 'ওই মিথ্যে ধরার কথাটাও বলুন না দাদা!' সুতরাং সাধারণ সচিব: 'হ্যাঁ হ্যাঁ, গাভাসকারের মিথ্যা একেবারে কট।' চণ্ডীগড়ের গল্প বলতে গিয়ে লিখেছে, ক্যাপ্টেন হওয়ার খবর পাওয়ার পর, বোর্ড সচিবের নির্দেশে হোটেলের ধার দিয়ে অন্ধকার পথ ধরে বেরোবার সময়ই ভেবে ফেলে, অস্ট্রেলিয়া ট্যুরের পর আর ক্যাপ্টেন হবে না। কিন্তু কী গুল রে বাবা, ইনি ধরে ফেলেছেন, আর-এক জায়গায় গাভাসকার লিখেছে যে ভারত-ইংল্যান্ড প্রথম টেস্ট চলার সময়ই ও বোরদেকে জানায় যে এরপর আর ভারতের অধিনায়কত্ব করবে না। তাহলে, চণ্ডীগড়ে হোটেল থেকে বেরোনর সময় একথা ভেবে ফেলার ব্যাপারে গুল নয়? গাভাসকার অবশ্য এখানেও বলতে পারে, বইয়ে পরিষ্কার লিখেছে যে বোরদেকে ওকথা বলেছিল কানপুর টেস্টের সময়, যে টেস্টম্যাচ হয়েছিল চণ্ডীগড় ওয়ান ডে ম্যাচের এবং বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপের টিম হয়ে যাওয়ার পরে। কিন্তু গাভাসকারের কথা শুনছে কে? এই যে গাভাসকারের গুল ধরতে গিয়ে ডাহা গুল, পড়ার ভুল, বোঝার ভুল, এসবেরই স্বীকৃতিতে ইনি আজ অল ইন্ডিয়া অ্যান্টি গাভাসকার কমিটির কো-অপ্টেড মেম্বার। ইনি শুধু ভুল বুঝতে বা পড়তেই নয়, ভুল বোঝাতেও জানেন। যারা জানেন না যে ওয়ান ডে ওয়ান্ডার্স-এর শুরুতেই সানি-রবির থামস আপ সেবনের কথা বলা হয়েছে এবং যাদের জানা নেই যে, সানি গাভাসকার মদ্যপান করে না— তাদের ভুল বোঝানর জন্য ইনি সমালোচনারূপ অক্ষয় কীর্তিটিতে লিখেছেন, রবির সঙ্গে সানি হোটেলের ঘরে বসে পানীয় চর্চা করছিলেন। থামস আপও পানীয়, সুতরাং মিথ্যা কথা নয়। কিন্তু ভুল বোঝানর কী দুর্দান্ত চেষ্টা। ইনি বছর চল্লিশের মধ্যেই এই অর্গানাইজেশনের সেক্রেটারি হবেন, আমি ফোরকাস্ট করছি।'

বিশালবপু সভাপতি মহোদয় গলা খাঁকারি দিলেন, 'আপনারা দয়া করে কাজের কথায় আসুন। তিনজন অলরেডি ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি পড়তে পারি। তাই আগেই বলে নিই, ট্যালেন্ট অব টার্গেট সার্চিং আমাকে দিয়ে হবে না। এই বয়সে আর খোঁজাখুঁজি পোষাবে না।'

প্রবীণ দিল্লিওয়ালা আশ্বাস দিলেন, 'না না, হতাশ হবেন না। সার্চিংয়ের কাজটা জুনিয়ররা করবে। আমরা শুধু এক্সপার্টাইজ দেব। একটা কথা বলে রাখি, এখনকার ক্রিকেটারদের মধ্যে কাউকে তেমন টার্গেট করা যাবে না। আজহারউদ্দিনকে টার্গেট করলে এখন হয়ত বাদই হয়ে যাবে, তাহলে আর টার্গেট করে কী লাভ? মহিন্দার চলে, বেশ স্বাস্থ্যবান টার্গেট, কিন্তু গাভাসকারের মতো কনসিসটেন্ট নয়, পাবলিক ভালবাসে ভালনারেবলদেরই, এই ভালবাসার লোককে টার্গেট করার ঝুঁকি নেওয়া যায় না। তাছাড়া মহিন্দার মাঝে মধ্যেই কনসিসটেন্টলি জিরো এক দুই করে টিম থেকে বাদ পড়ে, তখন আমাদের কী হবে? এদিক দিয়ে কপিল ভাল। কিন্তু ওর মেজাজ গরম, উল্টোপাল্টা লিখলে...... কিছু বলা যায় না! মারাঠি ধুরন্ধর হিসাবে গাভাসকারকে মানায়, কপিলকে ধুরন্ধর ভিলেন হিসাবে পাবলিক নেবে না, যতই গুল মারি না কেন। এই ঢাকটা অবশ্য

পিটিয়ে যাচ্ছি যে ও বাজে ক্যাপ্টেন। আলটিমেটলি ওর জায়গায় রবি আসবে। কিন্তু রবি আর কী এমন টার্গেট, আমাদের আবার গাভাসকার হ্যাবিট। অর্থাৎ, এখনই কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না। তাহলে আমরা কী করব?'

বোম্বাই-পরিত্যক্ত প্রবীণ গাবিসা বললেন, 'নিঃশ্বাস নেবার মত সময় হয়ত আমরা পাচ্ছি। আমাদের আর্নেস্ট রিকোয়েস্টে বোর্ড প্রেসিডেন্ট গাভাসকারকে আর্নেস্ট রিকোয়েস্ট করেছেন, ও যেন অ্যাটলিস্ট আর একটা টেস্ট সিরিজ খেলে দেয়। উনি অবশ্য প্রেসকে একথা বলে দিয়েছেন যে এমন কোন রিকোয়েস্ট করেননি। ছিঃ, বোর্ড প্রেসিডেন্টের মতো পাওয়ারফুল লোক একটা ক্রিকেটারকে খেলা না ছাড়ার রিকোয়েস্ট করছে, এটা জানাজানি হয়ে গেলে দুনিয়ার লোকের কাছে আমরা মুখ দেখাতে পারতাম? কিন্তু, রিকোয়েস্ট সত্যিই করেছেন। আরও করবেন। আমরা কয়েক মাস টাইম পাব। এর মধ্যেই পারলে টার্গেট খুঁজে নেব। না পেলে, ট্যালেন্ট খুঁজতে বেরিয়ে পড়তে হবে। এত বছর অক্লান্ত গাভাসকার-বিরোধিতা করে আমরা এই লাইনে যেরকম বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠেছি, এই জ্ঞানকে হেলায় নষ্ট করা যায় না। আজকের মিটিং শেষ করার আগে গাভাসকারের বিরুদ্ধে সাতশ চুয়াল্লিশ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করা হোক। খেলা ছেড়ে দিয়ে আমাদের কমিটিকে তুলে দেবার এই হীন চক্রান্তের আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।'

১০৯

নগদ একটি পৃষ্ঠা বরাদ্দ থাকা সত্ত্বেও অধিকাংশ সপ্তাহে হাতে কলম উঠছে না, মুখে বুলি ফুটছে না, কালিতে বিষ মিশছে না। 'রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা চাই'-এর ভঙ্গিতে 'বাবুরাম সাপুড়ের হাতে আরও পৃষ্ঠা চাই।' আওয়াজ তুলে চাপা যুদ্ধ চালাতে চালাতে হঠাৎই একসময় মনে হল, একটি পৃষ্ঠার সাপ্তাহিক অসদ্ব্যবহার করার ইচ্ছাও ক্রমশ বিলীয়মান। হিল্লিদিল্লি ঘোরা সাংবাদিক বীরদের দেখে আগে রোমাঞ্চিত হতাম, তাঁদের ভিত্তিহীন প্রতিবেদন পাঠ করে আলোকিত হতাম, 'সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরে' আমিও একদিন এইরকম বাজার গরম করব— এমন স্বপ্ন মনের মধ্যে গুনগুন করে ফুটত, গরম ভাতের মতো। কিন্তু, খেলার মাঠ, খেলার মাঠের লোক, খেলার খবর— সবই যে এত দ্রুত আমাকে আমার মতো প্রথম সারির বোরকেও একঘেয়েমির গাড্ডায় ফেলে দেবে, কে ভাবতে পেরেছিল? বেরিয়ে আসার চেষ্টার কথা যে ভাবিনি তা নয়, কিন্তু আমি কে অমুক চন্দ্র তমুক যে আমার ডাকে বাংলা ক্রীড়াসাংবাদিকতা একঘেয়েমির উষ্ণমসৃণ গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসতে রাজি হবে? যা চলছে, তাই চলবে। পাবলিককে যা পড়ানো হবে, তা-ই পড়বে। যা বোঝান হবে তা-ই— বুঝলে ভাল, না বুঝলে আরও ভাল। এই পরিস্থিতিতে এই বিচ্ছিরি লাইন আমার ছেড়ে দেওয়াই উচিত। কিন্তু সেজন্য তো আর ঝট করে রেললাইনে গিয়ে দাঁড়ানো যায় না। আমার অস্বাভাবিক ও বিরল প্রতিভার বিকাশের উপযুক্ত একটি লাইন খুঁজে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে।

যতদিন লাইনে, ততদিন মাইনে। লাইনে থাকবে, মাইনে নেব, কিন্তু আপনাদের সেবা করব না— এটা হয় না। তাই, বাংলা ক্রীড়া সাংবাদিকতার সামান্য উপকারে ব্রতী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। মনে হল, এই যে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চে দলবদলের মাদলে কোঁদলে পাবলিকের কান ঝালাপালা, চোখ ফালাফালা, তা থেকে যদি কাউকে বার করে আনা যায়। সাহস সঞ্চয় করলাম, দলবদল নিয়ে হাস্যকর মাতামাতির বিরুদ্ধে যথাসম্ভব তথ্য কালেক্ট করে এডিটরের কাছে প্লেস করব।

প্রথমে সম্পাদকের কাছে পাঠানো কয়েক কিলোগ্রাম চিঠির উপর আলতো চোখ

বোলালাম। প্রতি কিলোগ্রামে অন্তত একটি করে চিঠি পেলাম, যাতে পত্রলেখক অথবা লেখিকা দলবদল নিয়ে লেবু কচলানোর সুতীব্র সমালোচনা করেছেন। কাটিহার থেকে বৈভব সমাদ্দারের বক্তব্য এইরকম : 'এটা আপনার মাথায় কে ঢোকাল সম্পাদক মহাশয় যে দলবদলের বস্তাপচা গল্পগাছা শোনার জন্য আমরা হাঁ করে থাকি? আমরা চাই খেলার খবর, বর্ণনা, বিশ্লেষণ। কার বাবা কী চান, মা কী ভাবছেন, দাদা কোন দিকে যেতে চাইছেন, আন্ডারহাইটতুতো দাদা কী বোঝাচ্ছেন— এসব পোড়া গল্প আর কে শুনতে চায়? শুনছি, তনুময় বসু এবার ইস্টবেঙ্গলে সই করলেও করতে পারেন। তনুময় আমার প্রিয় খেলোয়াড়। ও যদি দলবদল করে, দয়া করে তার স্টোরিটা পত্রিকায় ছাপাবেন। ইতি।'

দ্বিতীয় কিলোগ্রাম থেকে পাওয়া গেল বহরমপুরের অনুভব ভৌমিকের চিঠি : 'ধ্যার মশাই, এই দলবদলের ফুটুসফাটুস আর কদ্দিন চালাবেন? পচা সব্জি নিয়ে ভরদুপুরে বাজারে বসে কী ব্যবসা করছেন এডিটরদাদা? যার তার কাছে যে দেশ গণ্ডা গণ্ডা গোল গেলে, নিজের দেশের মাঠের টুর্নামেন্টে আধখানা গোলও করতে পারে না যে দেশ, সেদেশের ফুটবলারদের দলবদল নিয়ে আবার এত কচকচি কীসের? অন্য কারও নাম শোনেননি? অন্য কোনও খেলার? দিব্যেন্দু বড়ুয়া? বুলা চৌধুরি? গীত শেঠি? পি টি ঊষা? সৈয়দ মোদি? আন্নাভি? ইন্দু পুরী? হ্যাঁ, যদি সুদীপ চ্যাটার্জির নাম করেন মানব, ও হল ফুটবলার, বাঘের বাচ্চা। গত বছর কাশী মণ্ডলের হাত ফসকে সুদীপ বেরিয়ে গিয়েছিল। শুনছি, এবার হাতে ছাই মেখে ধীরেন দে আর বুয়া মিত্র নামছেন। আশা করি আগামী সংখ্যায় নেপথ্যকাহিনী জানতে পারব। ইতি।'

তিনসুকিয়া থেকে চৈতক বর্মন : 'আর ঠিক সাড়ে তিন মাস পরে ওয়ার্লড কাপ শুরু, আর আপনারা কলকাতার লিলিপুটদের দলবদলের গল্প ফাঁদছেন? বুদ্ধি না হয় নেই, কাণ্ডজ্ঞানও কি নেই দু-চার ফোঁটা? কোথায় আমরা বসে আছি, মারাদোনা-জিকো-রবসন-প্লাতিনি-ববির মতো স্টারদের গল্প শুনব, ওদের লেটেস্ট ফর্মের খবর নেব, আপনারা কিনা এখনও কলকাতার টুনি বাল্বদের ক্রমাগত জ্বালিয়ে আমাদের জ্বালিয়ে যাচ্ছেন! যেখানে নাইজিরিয়ার মতো ছোট্ট দেশও ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল ম্যাপে জায়গা পেয়ে যাচ্ছে, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়। নাইজিরিয়ার কথায় মনে পড়ল, চিমা নাকি এবার ইস্টবেঙ্গলে সই করছে? কোন কাগজে পড়ছি জীবন চক্রবর্তী ভাইজাগ চলে গেছেন, কোন কাগজে পড়ছি এখনও যাননি তবে যাবেন, কোথাও আবার পড়ছি যাওয়ার কোন কথাই নেই। এ ভাবে কনফিউজ করার কী মানে হয়? চিমা সত্যিই ইস্টবেঙ্গলে সই করছে কিনা, অবশ্যই তাড়াতাড়ি জানাবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের প্রিয় পত্রিকাই সবার আগে এই গুরুত্বপূর্ণ খবর জানাতে পারবে। ইতি।'

বইমেলায় আমার এক বন্ধুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বললেন, 'গত দেড় ঘণ্টা ধরে বইমেলা টুঁড়ে এক পিসও লেখক পেলুম না। এখন একটু ঠাণ্ডা হলুম, আপনাকে দেখে।' বই কেনার প্র্যাকটিস নেই, বইমেলায় আমি কচুরি খেতে আর লেখক দেখতে আসি। আপনিও আবার খেলায় লেখা-টেখা লেখেন। আপনাদের সিজন তো শুরু হল

বলে, দলবদলের যাত্রাভিনয়। আপনাদের কাগজে অলরেডি কনসার্ট বাজছে নিশ্চয়?' বন্ধুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর প্রায় ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে এরকম আওয়াজ আশা করা যায় না। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি উৎসাহ পেলেন! 'এ ওখানে যাচ্ছে, সে এখানে আসছে, এ পাকা কথা দিয়েছে, সে দোটানায় পড়েছে, এর দাদা বেঁকে বসেছে, তার মা কাঁদতে বসেছে— পারেন মাইরি আপনারা! রাগ করবেন না, চেনা লেখক বলতে আপনিই, তাই একটু বেশি কথা বললুম।' হাত নেড়ে চলে গেলেন। চলে গেলেন না, ফিরে এলেন। মনে হল, জরুরি কোন কথা মনে পড়ে গেছে। আবার জ্ঞানগালাজ খাওয়ার আশঙ্কায় মুখ তেতো করে তাকালাম। আমার বন্ধুর ঘনিষ্ঠতম বন্ধু প্রায়, ফিসফিস করলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনে ভাইপোটা জিজ্ঞেস করবেই, কৃশানু বিকাশ কি রিয়েলি মোহনবাগানে ব্যাক করছে? কৃশানুর বাবা, মা, শান্টুদা— এঁদের লেটেস্ট ওপিনিয়ান কী?'

ইন্ডিয়া-পাকিস্তান হকি ম্যাচ শেষ হওয়ার পর মোহনবাগান লনে বসে চা খাচ্ছি, এক ফুটবলপ্রেমী সঙ্গীতশিল্পী ধরলেন : 'বাবু বাবু আপনাদের ভালবাসি বলে বলছি এই দলবদলের কিচিরমিচির আর ভাল্লাগে না। একেবারে সেই শীতকাল থেকে ঢোলের আওয়াজ বাজতে থাকে, দলবদলের ভোল বদলের ঢোল বিচ্ছিরি। যা সব খেলা কলকাতার ফুটবলারদের। এদের ভোলবদলের গপ্পো আর কেউ শুনতে চায় না। আপনারা কলকাতার বাইরে একটু তাকান। এত ভাল খেলছে গোয়ার ছেলে আলফানসো, শুনছি দারুণ লড়ছে হায়দরাবাদের সরাফ আলি— এদের ছবি ছাপেন না কেন? এদের কথা লেখেন না কেন? শুধু এই কলকাতার ফালতুদের 'দীর্ঘ ও অন্তরঙ্গ' ভাষণ আর দলবদলের প্যানপ্যানানি।'

চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। অজান্তে তর্জনী ও মধ্যমা আধ ইঞ্চি ফাঁক হতেই তাতে সিগারেট গুঁজে ফুটবলপ্রেমিক শিল্পী ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে ফের কথা শুরু করলেন, 'আলফানসো নাকি সত্যিই দারুণ খেলছে। শুনছি, ওকে ইস্টবেঙ্গল ধরছে? খবর আছে কিছু?'

এই সব এবং আরও অনেক দৃষ্টান্ত নিয়ে এডিটরের ঘরে ঢুকলাম। যেন ঘণ্টাখানেক পর পার্লামেন্টে বাজেট পেশ করবেন— এমন গম্ভীর ও ব্যস্ত ভঙ্গিতে চোখ তুললেন। এসব চোখ আমাকে দেখিয়ে লাভ নেই। তবু, অভ্যেস! থামানোর সুযোগ না দিয়ে ক্রীড়ানুরাগী এবং পাঠকপাঠিকাদের দলবদলের কচকচি বিরোধী চিঠি এবং বক্তব্যের সারমর্ম জানালাম। ভয়াবহ ইংরেজিতে প্রস্তুত একটি নোটও টেবিলে রাখলাম। বললাম, 'মহান দায়িত্ব পালনের ডাক— কড়া নাড়ছে আপনার কানে। সাড়া দিন। দলবদলের কিচিরমিচির খতম করুন।'

সামনের খোলা প্যাডে নাম না-জানা কখনও না-দেখা ফুলের ছবি আঁকতে আঁকতে এডিটর সাহেব বললেন, 'কানে স্লাইট ময়লা জমেছে। তবে তাতে কিছু আটকাবে না। আমি নিশ্চয় ব্যাপারটা ভেবে দেখব। এত কষ্ট করে নোট লিখেছেন, মাস দেড়েকের মধ্যে পড়েও ফেলব। তবে আপাতত সবাই খুব ব্যস্ত, চেয়ারঘুমের ফাঁকে ফাঁকে নিশ্চয়

চোখে পড়ছে? আমাদের আটজন রিপোর্টার এখন আটটা নার্ভসেন্টার অপারেট করছে, প্রত্যেকের পকেটে লেটেস্ট ভাবনামিটার, গুল ছাঁকার লেটেস্ট গ্যাজেট, আরও অনেক কিছু। এই মুহূর্তে আর-একজন লোক চাই। দুজন ছুটিতে, সুতরাং আপনাকেই চাই। এইমাত্র খবর পেলুম, অতনু ট্র্যাঙ্গেলে ঠোকাঠুকি খাচ্ছে। তনুময়কে রাখতে না পারলে মোহনবাগানকে নিতেই হবে অতনুকে। তনুময়কে না পেলে ইস্টবেঙ্গলকে নিতেই হবে অতনুকে। প্যাট জেনিংসকে না পেলে মহমেডানকে রাখতেই হবে অতনুকে। তিনটে টিমই তাই চেষ্টা চালু রেখেছে। এখনও মাইল্ড চেষ্টা, তবে ডেনসিটি বাড়তে পারে এনিটাইম। আপনি গড়িয়ায় নরেন্দ্রপুরে চলে যান ফোল্ডিং চেয়ার নিয়ে। ওর বাড়ির সামনে বসে পড়ুন। কোনও খবর পেলেই অফিসে চলে আসবেন। আটজনের ব্যস্ততায় এবং দুজনের অনুপস্থিতিতে ডাক এসেছে আপনার কাছেও— দলবদলের মহান ডাক।

১১০

ভিভ রিচার্ডস বলতে ঠিক কী ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে? নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, শতকরা নিরানব্বুই ভাগ ক্ষেত্রে আপনার উত্তর অন্যের সঙ্গে মিলবে—কৃতী, সফল পুরুষ। যাঁকে দেখা যায় কিন্তু ছোঁয়া যায় না। গর্বিত, কিন্তু অকপট নন। সাধারণের স্তরে নেমে আসতে নারাজ। এই সাক্ষাৎকারের পূর্বশর্ত ছিল ভিভকে যথাসম্ভব খোলামেলা হতে হবে। তিনি ধরা দেবেন, তাঁকে ছোঁয়া যাবে, ভেঙে যাবে মাঝের দেওয়াল। ভিভ রাজি হলেন। বলে গেলেন এতদিন না-বলা অনেক কথা।

'আসলে কথা বলতে ভয় করে, কারণ আমাকে বড় বেশি ভুল বোঝা হয়। প্রচলিত অর্থে আড্ডাবাজ নই, তাই অসামাজিক বলে বদনাম। কিন্তু যে মিশে যেতে পারবে আমার সঙ্গে, সে আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না কখনও। আপনারা আমার বন্ধু ক্রিকেটারদের কাছে যান, রিচি রিচার্ডসন, অগাস্টিন লোগি, ম্যালকম মার্শালকে জিজ্ঞেস করুন, ভিভ রিচার্ডস হল ওদের সব থেকে প্রিয়।'

ভিভের বসার ঘরে সত্যিই সারা জীবন বসে থাকতে ইচ্ছে হয়। ভিভের (নাকি মিসেস রিচার্ডসের) সুরুচির চিহ্ন সর্বত্র ছড়ান। অন্তত তিন হাজার গোবলেট, মেডেল, প্লেক। তবু সবার আগে চোখে পড়ে টনটনের একটি সেলুনের ছবি, যার কাঠের দরজায় খোদাই করা রয়েছে ভিভেরই প্রতিকৃতি, সঙ্গে সগর্ব ঘোষণা : 'এখানে ভিভিয়ান রিচার্ডস চুল কাটেন'।

কী ওয়েস্ট ইন্ডিজ কী ইংল্যান্ড, আসলে দুনিয়ার যে কোন ক্রিকেট-খেলিয়ে দেশেই ভিভের জনপ্রিয়তা আকাশছোঁয়া। শপিং করার সময়ও মুক্তি নেই, হাজার হাজার হাত বাড়িয়ে দেবে অটোগ্রাফ বুক। *কেমন লাগে এই গ্ল্যামার?* ভিভি : 'অস্বীকার করব না, দারুণ লাগে। আমি ভাগ্যবান। তবে দেখুন, এই যে লোকে আমাকে এত ভালবাসে, তার তো কিছু কারণও আছে। আমি হিরো নই, স্যাম ট্রিগারের মতো দেখতে নই, মাইকেল জ্যাকসনের মতো গাইতে পারি না, তবু যে এত ভালবাসা পাচ্ছি তার কারণ নিশ্চয় এই যে আমার খেলাটা একটা উঁচু পর্যায়ে পৌঁছেছে।

সাধারণ লোককে তো আর বোকা বানানো যায় না, তারা নিশ্চয় এটা বুঝেছে যে

ভিভ রিচার্ডস লোকটা ট্যালেন্টেড। বললে হয়ত খুব বেখাপ্পা শোনাবে, এইট্টিটু-র ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের আগে যখন মারাদোনাকে নিয়ে সবচেয়ে বেশি হই চই, অনেকেই বলেছে 'দূর ও কি আর ভিভের মতো ক্রিকেট ফুটবল দুটোই ভাল খেলতে পারবে? খেলুক না ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেট! পারবে? পারবে না!

হামবড়াই করছি না, এই গ্ল্যামারে আমি বিস্মিত নই। ভেবে দেখুন এই আমি একজিবিশন ইন্টারন্যাশনাল ফুটবল ম্যাচে পর্তুগালকে হারিয়ে দিলাম। থ্রি টু ওয়ানে জিতলাম, প্রথম গোলটাই আমার। দুটো দুর্দান্ত থ্রু বাড়ালাম। তাঞ্জানিয়ার বিরুদ্ধে নব্বুই মিনিট নিখুঁত ফুটবল খেললাম। এর দুদিন পর ট্যুরিং অস্ট্রেলিয়া টিমের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি। আপনার কি মনে হয় না, তখন চ্যানেল নাইন থাকলে আমাকে আরও বেশি হাইলাইট করা হত, আরও পাবলিসিটি পেতাম? বিশ্বের আর কোথাও কেউ এরকম করে বেড়াচ্ছে বলে তো শুনিনি! দেখুন আমি ছেঁদো কথায় নয়, পারফরমেন্সে বিশ্বাসী। যে কটা বছর আমি ওয়েস্ট ইন্ডিজ টিমে আছি, সে কটা বছরই আমরা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এক নম্বর। কটা বছর আমি লিওয়ার্ড অ্যান্ড উইন্ডওয়ার্ড আইল্যান্ড টিমে থাকার সময় শেল শিল্ডে আমাদের পারফরমেন্স দেখুন। কাদের নিয়ে খেলে যাচ্ছি? অ্যান্ডি রবার্টস আর এই রিচি রিচার্ডসন, এছাড়া আর সবইতো সাধারণ, অতি সাধারণ মানের খেলোয়াড়। ক্রিকেটের কথা ছেড়েই দিন, যেটুকু ফুটবল খেলেছি, সব জায়গায় আমার গোল আছে। আবার বলি, সাধারণ লোককে বোকা বানানো সম্ভব নয়। যতই ঢাক পেটাও, কিছু এসে যায় না। তারা কিন্তু একদিন ঠিকই বলে ফেলবে যে প্লাতিনির প্রায় সব গোলই পেনাল্টি বা ফ্রি কিক থেকে।'

প্রবীণ সাংবাদিকরা প্রায় একসঙ্গে বলেন, ডন ব্র্যাডম্যানের মতো ব্যাটসম্যান ক্রিকেটের ইতিহাসে আর আসেননি, ক্রিকেট কখনও পায়নি গ্যারি সোবার্সের মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়। কিন্তু চ্যানেল নাইন না থাকায় তাঁরা যথেষ্ট প্রচার পাননি। ভিভের ইগো ধাক্কা খেল। এটাই চাইছিলাম। একটু আহত স্বরে বললেন : 'ব্র্যাডম্যান বা সোবার্স প্রচার পাননি মানে? আমার চেয়ে বড় ব্যাটসম্যান বা প্রতিভাবান ক্রিকেটার বলতে কী বোঝাতে চাইছেন? ব্র্যাডম্যান ভাল— অত্যন্ত প্রতিভাবান ক্রিকেটার ছিলেন সত্যি কথা। দারুণ টেম্পারমেন্ট, স্ট্রোক প্লে ছিল। কিন্তু ব্র্যাডম্যান কখনই কমপ্লিট ব্যাটসম্যান ছিলেন না। হি ওয়াজ মোর এ গ্র্যাফটার দ্যান এ ক্রিকেটার। ব্যাকরণসম্মত স্ট্রোক প্লে, ব্যাকরণ-ভাঙা স্ট্রোক প্লে, অনিশ্চয়তার সৌন্দর্য, প্রয়োজনে অফ স্পিন বোলিং— সবই আমার আছে। ব্র্যাডম্যানের ছিল শুধুই রানক্ষুধা। জানি না প্রচার পাননি বলতে কী বোঝানো হচ্ছে। আমার তো মনে হয় ওরা যথেষ্ট জনপ্রিয়। অন্তত আমি ওদের দুজনের সম্পর্কেই দারুণ শ্রদ্ধাশীল।'

আর সুনীল গাভাসকার? তাঁকে কি আপনি এই প্রজন্মের অগ্রগণ্য ব্যাটসম্যান হিসাবে মানেন?.তাঁকে কোথায় রাখবেন? 'সুনীল গাভাসকারকে আমি আমার বা গ্রেগ চ্যাপেলের স্ট্যান্ডার্ডে ধরিই না! শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যান হতে হলে আক্রমণাত্মক অ্যাটিচ্যুড মাস্ট। সানির অ্যাটাকিং শট খুবই কম। যথেষ্ট ইমপ্রোভাইজেশন নেই— মানে পরিস্থিতি অনুযায়ী

খেলাটাকে অদলবদল করার ক্ষমতা। ওর যেটা আছে, চমৎকার ডিফেন্স এবং অতুলনীয় ধৈর্য। আমাদের সময়ে আর কারও এত ভাল ডিফেন্স নেই। কিন্তু সানির মধ্যেই আবার সুপার ফাস্ট বোলিং খেলার মতো সাহস বা মনের জোরের অভাব দেখেছি।'

মেপেজুকে হিসেব করে কথাবার্তা নয়, এরকম খোলামেলা ডায়ালগই টেনে বার করতে চাইছিলাম। ভিভ একেবারে কট অ্যান্ড বোল্ড। কথা বলার মারাত্মক মুডে চলে এসেছেন। জানতে চাইলাম, নিজেকে নিজের থেকেই বিচ্ছিন্ন করে, কীভাবে বিশ্লেষণ করবেন খেলোয়াড় ভিভকে? 'গালাগালি খাওয়ার ব্যবস্থা করছেন! তা করুন। আমার তো মনে হয় ক্রিকেটের ইতিহাসে আমি 'গ্রেট'দের অন্যতম। ইফ নট দ্য গ্রেটেস্ট। ভেবে দেখুন, সেভেন্টিফাইভের ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিমে মার্শাল ছিল না, সেভেন্টিনাইনের ওয়ার্ল্ড কাপ উইনিং টিমে রিচার্ডসন ছিল না, এইট্টি ফাইভে শারজায় লয়েড ছিলেন না। এতদ্দ্বারা কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে আমি কখনও কারুর ওপর নির্ভর করিনি। কিন্তু দল আমার ওপর নির্ভর করেছে। শুধু শুধুই তো আর নিজেকে 'গ্রেটেস্ট' বলছি না!'

আপনার বিরুদ্ধে একটা বড় অভিযোগ, যে ক্রিকেট এত দিল এবং দিচ্ছে, তাকে কিছুই ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন না। ভিভ হাসলেন, 'আমি জানতাম, এই প্রশ্ন উঠবে। কেন কোচিং করছি না, বা করার কথা ভাবছি না, এটাই জানতে চান তো? এক কথায় উত্তর হচ্ছে— উইন্ডওয়ার্ড অ্যান্ড লিওয়ার্ড আইল্যান্ড ছাড়তে চাইনি বলে।' তার মানে? 'মানে, কোচ ভিভ রিচার্ডসকে টিকে থাকতে হলে দল পাল্টাতেই হত। আর যেহেতু প্রিয় আইল্যান্ড ছাড়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, কোচিং লাইনে আসতে চাই না।' তখনও ব্যাপারটা আমার কাছে খুব পরিষ্কার হচ্ছে না। ভিভ আরও সহজ করলেন, 'অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমাকে স্টেট পাল্টাতেই হয়। ভেবে দেখুন বারবাডোজ বা জামাইকা কী দারুণ টিম, সেখানে আইল্যান্ড টিম নিয়ে আমি কীই বা করতে পারব? খারাপ টিমকে কোচ করতে কেউ চায় না। সবাই চায় সাফল্য।'

আপনাকে আদর্শ করে যারা নিজেদের গড়তে চায়, তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন? ওজনদার, কাজের কথা বললেন ভিভ : 'তাদের থেকেও আমি বেশি করে বলব, তাদের গুরুজনদের— ক্রিকেটের 'ন্যাক' না থাকলে ছেলেকে জোর করে ও লাইনে পাঠাবেন না। জোর করে কোন কিছু গিলিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। পরিশ্রম করে একটা স্তর পর্যন্ত ওঠা যেতে পারে, তার ওপরে কিছুতেই যাওয়া যায় না। আমার সময়ের ক্রিকেটার ধরে উদাহরণ দিচ্ছি— জিওফ বয়কট। ওর থেকে বেশি পরিশ্রম আর কে করতে পারবে? এর জোরে কিছুটা উঠেওছে, টেস্টে আট হাজার রান আর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে একশর বেশি সেঞ্চুরি করেছে, কিন্তু দেখুন, ফাস্ট ক্যাটেগরির ক্রিকেটারদের মধ্যে ওকে কেউ ধরবে না।'

কে বলে ভিভ রিচার্ডস খোলামেলা কথাবার্তা বলেন না? (বিশেষ করে যখন আমি বলাতে চাইছি!)

১১১

অপ্রত্যাশিত বা অসম্ভব কিছুতে চমকে যাওয়ার অভ্যাস ত্যাগ করতে হয়েছিল পঁচিশ বছর আগে, যেদিন স্কুলের সহৃদয় অঙ্ক স্যার আমাকে ভুল করে 'ইনটেলিজেন্ট' বলে ফেলেছিলেন। তার আগে অথবা পরে এই সুদীর্ঘ জীবনকালে এমন ভুল আর কেউই করেননি। কিন্তু, অঙ্ক স্যারের সহৃদয় ভুল আমার জীবনের মোড় একটু হলেও ঘুরিয়ে দিয়েছিল। আমি আর কোনও কিছুতেই বিস্মিত না হওয়ার মহান শিক্ষা পেয়েছিলাম। এখন চোখের সামনে প্রস্ফুটিত হয় অপ্রত্যাশিত ফুল, এখনও মেঘ চিরে বৃষ্টি ফুল হয়ে ঝরে হঠাৎই কোনও তপ্ত চৈত্র সন্ধ্যায়, দূর কোনও জনপদে অকস্মাৎ পেয়ে যাই প্রায় হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে, ভাল লাগে, মৃদু রোমাঞ্চ জাগেই, তবু বিস্মিত হই না।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর, আর-একবার বিস্মিত হতে যাচ্ছিলাম, হলাম না নেহাতই মনের জোরে, আর কখনও বিস্মিত না হওয়ার সিদ্ধান্ত পঁচিশ বছর আগে নিয়ে ফেলায়। দলবদলমন্দ্রিত দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেলের অবশিষ্ট ঘাম শুকিয়ে গড়ের মাঠের হাওয়ায় ফুরফুরে সন্ধে, আমার সামনে উদ্ভাসিত হল সেই অপ্রত্যাশিত দৃশ্য। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পাঁচ গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তাকে আমি একসঙ্গে পেয়ে গেলাম। ক্লাবের মিটিংয়ে নয়, এমনিই, কোনও ঝামেলায় নয়, একসঙ্গে সহাস্য আলাপ-আলোচনায় মগ্ন। তখন ইস্টবেঙ্গল টেন্টের আশেপাশেও যদিও সন্ধ্যা নেমেছে মন্দ মন্থরে, যেন প্রখর সূর্যালোকে বিদ্ধ হল আমার চোখ। এ কি স্বপ্ন ? একি মায়া ? ইস্টবেঙ্গলের, ফর দ্যাট ম্যাটার, কলকাতার কোনও বড় ক্লাবের প্রধান কর্মকর্তারা এক জায়গায়, অথচ গণ্ডগোল হচ্ছে না ?

বিস্মিত হয়ে পড়ার ফাঁড়া কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল লনের নক্ষত্র জটলার কেন্দ্রস্থলে হাজির হয়ে আর্জি পেশ করলাম : 'আমি আপনাদের একটা ফাস্ট ইন্টারভিউ নিতে চাই। ফাস্ট ফুড, ফাস্ট ইন্টারভিউ, এসব এখন খুব চলছে কিনা। ঠিক সতের মিনিটে আমার ইন্টারভিউ শেষ হয়ে যাবে।'

পাঁচ কর্তাই মেজাজে ছিলেন। আবেদন মঞ্জুর হল। আপনাদের টিম এয়ারলাইন্স গোল্ড

কাপে না খেলার জন্য অভিনন্দন। কলকাতায় মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল মিটিং হলে আপনাদের বা প্লেয়ারদের কী হয় জানি না, আমাদের মানে জার্নালিস্টদের খুব টেনশন হয়। সিজনের শুরুতেই এই টেনশেন-ফেনশন ভাল লাগে না, বাঁচালেন।'

প্রথম কর্মকর্তা ছিটকে বেরলেন : 'শুধু আপনারা কেন, মোহনবাগানও বেঁচে গেল। দেখা হলে তিন গোল মারতাম। ওদের লাক ভাল, আমাদের সঙ্গে খেলতে হল না। গতবারও রোভার্স ডুরান্ডে এইরকম লাক ফেভার করেছিল। এবারও কত জায়গায় করবে কে জানে! এবং সব ক্ষেত্রেই, দুনিয়ার কোনও শক্তি আমাদের এই ডায়ালগ দেওয়া থেকে বিরত করতে পারবে না যে ওরা জিতল আমরা না খেলায়। আমরা থাকলে আমরাই জিততাম। তিন গোলে।

—'খেলার কথা পরে, ইয়ে, খেলা তো এখনও শুরুই হল না। এখন টিমের কথা বলি। আপনাদের টিম কেমন হল?'

প্রথম কর্মকর্তা : কেমন আবার, ফার্স্ট ক্লাস।

• গত বছর সুপার ফর্মে ছিল অলোক মুখার্জি। এবার গুরুদেবের উপদেশ, হোটেলের ঘরের দিকে ছুঁড়ে-দেওয়া গালিগালাজ— কোনও কিছু দিয়েই ওকে ধরে রাখা গেল না। আপনাদের কি মনে হয় না যে এটা একটা বড় ক্ষতি?

তৃতীয় কর্মকর্তা : হাঃ হাঃ কী বললেন, ক্ষতি? তিন হাজার অলোক মুখার্জিও ইস্টবেঙ্গলের কোনও ক্ষতি করতে পারবে না। আপনি কি নিজেদের কাগজেও এই খবর দেখেননি যে এবার ইস্টবেঙ্গলে খেলবে এমেকো ইউজিগো?

• কিন্তু সে তো অ্যাটাকিং মিড ফিল্ডার। আমি ডিপ ডিফেন্সের লোকের কথা বলছি।

চতুর্থ কর্মকর্তা : আপনি জার্নালিস্ট না হলে এখন আপনাকে 'গাড়ল' বলতাম। এ কথাটা কি কখনও শোনেননি যে অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স? এমেকো অ্যাটাক করতেই থাকবে, বল আমাদের ডিফেন্সে আসবে কখন?

• এমেকো ইউজিগো অথবা ইউজিগো এমেকো অথবা শুধু এমেকো অথবা শুধু ইউজিগো কেমন প্লেয়ার?

পঞ্চম কর্মকর্তা : 'শুধু মিডফিল্ডার এমেকোই বলুন। এমেকো হল চিমা ইন্টু সাড়ে তিন প্লাস প্রশান্ত ব্যানার্জি ইন্টু দেড়। মিডফিল্ডার থেকে কিনা তাই প্লাস প্রশান্তর নামটাও বলে রাখলাম।'

• 'অলোক গেলে যদি ক্ষতিই না হয়, জব্বলপুরে গিয়ে ওই খুচরো ঝামেলাগুলো বাধালেন কেন?'

পঞ্চম কর্মকর্তাই : 'তখনও এমেকোর কেসটা কনফার্মড হয়নি, তাই।'

• গত বছর আপনাদের টিমে তিন জন ওরিজিনাল মিডফিল্ডার ছিল। তাদের মধ্যে একজন, দেবাশিস মিশ্র মোহনবাগানে পালাল। এটা লস নয়?

তৃতীয় কর্মকর্তা : হাঃ হাঃ হাঃ। এমেকো ইউজিগো কি ঘাস ছিঁড়তে এল? মশাই, মিডফিল্ড এবার জ্বালিয়ে দেব, বুঝলেন! সুদীপের লম্বা স্টেপিং, লম্বা পাস, বিকাশের

জোরে দৌড়, জোরে শট,— এসব এবার দরকার নেই। জাস্ট স্টকে থাকবে, যদি কোনদিন এমেকোর জ্বরটর হয়।

• গত বছর লিগ বাদ দিয়ে সব জায়গায় আপনাদের টিমের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে দেবাশিস রায়। আপনার টিমের কোচ পি কে ব্যানার্জি এবং মোহনবাগানের কোচ অমল দত্ত— দুজনেই একবাক্যে বড় ম্যাচের আগে বলেছিলেন যে ইস্টবেঙ্গলের সবচেয়ে ডেঞ্জারাস ফরোয়ার্ডের নাম দেবাশিস রায়। সেই দেবাশিসই এবার আপনাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে......

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : মাথা খারাপ? দেবাশিস আমাদের আনন্দের পুকুরে ডুবিয়ে গেছে। মশাই, গতবার ও আটশ পঁচাত্তরটা গোলের চান্স মিস করেছে। গড়ের মাঠের রেকর্ড। নায়ারের ছত্রিশ গোলের আর দেবাশিসের আটশ পঁচাত্তর না-হওয়া গোলের রেকর্ড কেউ কখনও ভাঙতে পারবে না। ওই আটশ পঁচাত্তরটা চান্স এমেকো পেলে, আমার বিশ্বাস, অ্যাট লিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট......

• মানে চারশ সাড়ে সাঁইত্রিশ গোল?

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : হুঁ। তবে অত দরকার নেই। একশ সাড়ে সাঁইত্রিশেই আমরাই লিগ শিল্ড সব পেয়ে যাব। এমেকো, হাঃ হাঃ।

• কিন্তু জামশিদ তো কয়েকটা গোল করেছিল। লিগে টপ স্কোরার। ফেডারেশন আর লিগে মোহনবাগানকে গোল। ওকে হারিয়ে আপনারা কতটা আনন্দিত?

প্রথম কর্মকর্তা : প্রচুর। গত বছর লিগ ম্যাচটা আমরা জিততে পারিনি জামশিদের জন্য। গোলই যদি করবি, একটা কেন? যদি দু-তিনটে করে রাখত, কেষ্টগোপালের গোলে কি ম্যাচ ড্র হত? এমেকোকে বলেছি, ও যেন সবসময় অ্যাট লিস্ট দুটো করে গোল দেয়, অ্যাট এ টাইম।

• অর্থাৎ, অলোক মুখার্জি, দেবাশিস মিশ্র, দেবাশিস রায়, জামশিদ নাসিরি— সব ফাঁক এই এমেকোই ভরাট করে দেবে?

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : নিশ্চয়। আরও দু-তিন জন গেলেও দিত। গেল না, কী আর করা যাবে?

• মহমেডান ফরোয়ার্ড লাইনে পাশাপাশি কামান দাগবে চিমা, জামশিদ আর সাবির, মোহনবাগান ফরোয়ার্ড লাইনে একসঙ্গে দৌড়বে মানি-দেবাশিস-বিদেশ, আপ অ্যান্ড কামিং সুব্রত রায়-সত্যজিৎ চ্যাটার্জিরাও মেরুন-সবুজে, আপনারা কি একটুও চিন্তিত নন?

তৃতীয় কর্মকর্তা : সব প্রশ্নের জবাবেই আমরা দুটি শব্দ উচ্চারণ করব : এমেকো ইউজিগো। তবু যদি নানারকম উটকো প্রশ্ন তুলে সাপোর্টারদের ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করেন, আমরা আর এক সেট দুই শব্দ ব্যবহার করব : চার্লস আপ্পু। আর কিছু বলার আছে?

• না না, বিশেষ আর কিইবা বলার থাকতে পারে? শুধু দু-একটা খুচরো প্রশ্ন। যেমন ধরুন, গতবার যে উইং না থাকার সমস্যা...

প্রথম কর্মকর্তা : উঃ, প্রশ্নের শেষ নেই। তবে এই নামটাও শুনে যান— চার্লস চিবুজার।

যত প্রশ্ন তত নাম। গোটা সিজনে কটা ট্রফি পাব জানি না, তবে এরকম নাম দিয়ে ঝাঁন অনেক। একটা সিজন তো, দেখতে দেখতে আর নাম ছাড়তে ছাড়তেই কেটে যাবে!

পুনশ্চ : এই লেখা প্রেসে যাওয়ার পর খবর এল, ইস্টবেঙ্গল শেষ পর্যন্ত এয়ারলাইন্স ক্লাবে খেলছে। প্রথম কর্মকর্তাকে টেলিফোন করলাম : 'তাহলে তো সিজনের শুরুতেই দেখা হচ্ছে মোহনবাগানের সঙ্গে?' কর্মকর্তা মহোদয় তিনটি অক্ষর উচ্চারণ করলেন— 'এমেকো!'

২

একবার... ঘুরে আসি

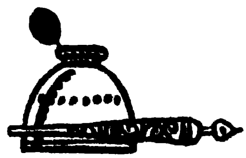
ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হতে তখনও দিন দশেক বাকি, নাকি সুরে, প্রায় গানের সুরে এডিটরকে বললাম, একবার সুযোগ দিন না—আ, ঘুরে আসি। নেভা পাইপে জ্বলন্ত কামড় দিয়ে এডিটর ফুঁসলেন, এই সেদিন আমেরিকা ঘুরে এলেন, ফের যেতে চাইছেন, লজ্জা করে না? ফাঁকা ঠোঁটে বাঁকা জিভ বুলিয়ে বললাম, লজ্জা কীসের, আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের ক্যাপ্টেন তো পাঁচবার পাবলিকের খরচে ওয়ার্ল্ড কাপ—অলিম্পিক-টলিম্পিক দেখছেন আর অভিজ্ঞতা জমাচ্ছেন। আমাকে জমানোর স্কোপ দিলে কী ক্ষতি! এডিটর পাইপের বোলে হাত বুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেন। দ্বিতীয় এবং মরিয়া চেষ্টা হিসেবে বললাম, তা হলে স্বীকৃতি দিন। যেন শব্দটা এই প্রথম শুনলেন, ভীষণ শব্দ হল অথচ কাচ ভাঙল না—এই কায়দায় টেবিলে পাইপ রেখে গলা ছাড়লেন, 'স্বীকৃতি' মানে? বললাম, স্বীকৃতি মানে, আপনি আমাকে পছন্দ করেন, তার স্বীকৃতি। আমি সপ্তাহে দু'দিন আপনার বাড়িতে সেলাম ঠুকতে যাই, তার স্বীকৃতি। আমি আপনাকে তানজানিয়া থেকে দুটো ক্লে পাইপ আর আমেরিকা থেকে তিনটে সানমাইকা এনে দিয়েছি, তার স্বীকৃতি। মন্ত্রীর দশ-বিশটা থাকে, আপনার পকেটে মাত্র একটা 'স্বীকৃতি'। প্লিজ, আমাকেই আমেরিকা পাঠান ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করতে। গলায় মিছরির ছুরি শানিয়ে এডিটর : গিয়ে আপনি কিছু করতে পারবেন? গিয়ে অথবা ফিরে আজকালকে কী দিতে পারবেন? দু'হাত একশ আশি ডিগ্রি করে বলতে যাচ্ছিলাম, অনেক। সামলে নিয়ে বললাম, স্বীকৃতিটাই বড় কথা। দেখেননি, আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের ভাইস ক্যাপ্টেন-গোলকিপার একটা কাগজে বলেছেন, যদি কেউ মনে করেন যে বিশ্বকাপের ম্যাচ দেখে আমাদের প্রশিক্ষণের ধরন কিংবা খেলার আধুনিকতা শিখতে পাঠানো হচ্ছে তা হলে তিনি ভুল করবেন। এটা হল স্বীকৃতি। খেলা তো টিভিতেও দেখতে পারতাম। 'এরকম বলেছে নাকি' বলতে বলতে ফের পাইপ তুলে নিলেন এডিটর। হ্যাঁ, বলেছেন। বলেছেন, 'সরকার সম্মান দিলেন বলে মাঠে বসে খেলা দেখার সুযোগটি পাচ্ছি।' প্লিজ, আমাকেও সম্মান দিন, স্বীকৃতি দিন, সুযোগটি দিন। এডিটর সাহেব কোনও জরুরি টেলিফোনের জন্য হাত বাড়িয়ে বললেন, দূর, আপনি কিছুই করতে পারবেন না। আমি নিজের মাথার দিকে হাত

বাড়িয়ে বললাম, কিছু যে করতেই হবে এমন মাথার দিব্যি কে দিয়েছে? এডিটরের চোখ ব্রহ্মতালুতে ওঠার আগেই যোগ করলাম, এটা আমার নয়, ওই গোলকিপার-ভাইস ক্যাপ্টেনের ডায়লগ, কাগজে, ছাপা অক্ষরে।

আমাদের এডিটর অর্জুনের মতো পাখির চোখ ছাড়া কিছুই দেখেন না, নিজের কাগজ ছাড়া কিছুই পড়েন না। পাইপে নাক ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এরা এ-সব বলছে নাকি? আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের স্টপার, ময়দানের চিরলড়াকু ফুটবলার সাক্ষাৎকারে বলেছেন, বছরে ১৫৬টা জায়গায় চিফ গেস্ট হতে হয়, এই ট্রিপের পর উনি ওয়ার্ল্ড কাপ সম্পর্কে বলতে পারবেন। একদিক দিয়ে সুখবর যে, শ্রোতাদের সে-সব কথা শুনতে হবে না, যা এখন বলেন। কিন্তু দুশ্চিন্তার দিকও আছে। ১৫৬ সংখ্যাটা হিসেব করেই বলেছেন। বছরে ৫২ সপ্তাহ, ৫২×৩=১৫৬ বার চিফ গেস্ট। তিন সপ্তাহ আমেরিকায় থাকলে ৯টা মিস। এগুলো মেকআপ করতে হবে, তখন অত্যন্ত টাফ শিডিউল হয়ে যাবে, পুরনো অভ্যেস, টাফ থেকে ব্যাপারটা রাফ না হয়ে যায়। অ্যাশপটে পাইপের ছাই ফেলতে ফেলতে এডিটর বললেন, এসব কথা তো এখানে বসেই শোনা যাচ্ছে। আমেরিকা যাওয়ার কী দরকার? আর কেউ কিছু বলেছে? — ইয়েস। হেডমাস্টার স্ট্রাইকার মাথা খাটিয়ে আরেকটা দুর্দান্ত হেড দিয়েছেন, ছাপার অক্ষরে, ট্যুর করে এমনিতে কিছু হবে না, তবে ফিরে এসে ফুটবল অ্যাকাডেমি পেলে দেখিয়ে দেবেন। ওয়ার্ল্ড কাপে বেঙ্গল টিমের রেফারি বলেছেন, রাজ্য সরকার তাঁকে রেফারি অ্যাকাডেমি করে দেবে, শুধু আমেরিকা থেকে ফেরার অপেক্ষা। ট্যুরে পারহেড খরচ ২ লাখ, ফিরে আসার পর মাত্র ২ কোটি টাকা খরচ করে একেকজনকে অ্যাকাডেমি-টেকাডেমি করে দিলেই হবে, এ আর এমন কী।

বাংলার বেকেনবাউয়ারের মন্তব্য অবশ্য আমাকে মনে করাতে হল না। ওটা আজকালেই বেরিয়েছে। এডিটর বললেন, কী সুন্দর বলেছে, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই! সোজা কথা, ছেড়ে দাও, ঘুরে আসি। সামনে, টেবিলের উল্টো দিকে এডিটরের উদ্ভট মুখ। আমার চোখের সামনে তবু ভাসতে থাকল ছোট বেকেনবাউয়ারের মুখ। করুণ, বেদনার্ত। ছেড়ে দাও ভাই, ঘুরে আসি। যেন করুণ সুরে বাজছে, একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। চোখ জলে ভরে গেল। নাঃ, এই সজল চোখে জার্মানি-বলিভিয়া ওপেনিং ম্যাচ দেখা সম্ভব নয়।

কলকাতায় বিশ্বকাপ



মুখেই যত ফটরফটর, কলকাতার জার্নালিস্টরা কিস্যু খবর রাখে না। লোকালি ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করার কাজটা পাওয়ার দু-একদিনের মধ্যেই একটা স্কুপ টুপ করে কেটে পড়ল, ভাবা যায়? কান খাড়া করে শুনুন, আর মাত্র ২৮ বছর পর, ২০২২ সালে কলকাতায় বিশ্বকাপ। রাজ্য ক্রীড়া দপ্তরের ঘনিষ্ঠ এক সাংস্কৃতিক কর্তা আমার পুরনো সোর্স, ফোনে জানতে চাইলাম, কেমন দেখলেন উদ্বোধন? হাসিতে সেভেন্টি পার্সেন্টি হতাশা আর থার্টি পার্সেন্ট আনন্দ মিশিয়ে জবাব, দেখিয়ে দেব কাকে বলে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, আর তো মাত্র আঠাশটা বছর। সুপার-জার্নালিস্টের কান, খটাস করে ধাক্কা মারল, সে কি, কলকাতায় ওয়ার্ল্ড কাপ? — হ্যাঁ। ২০২২ সালে। দাবি জানানো শুরু হবে আগামী ২৬ মার্চ, পবিত্র দিনে। মহাপদযাত্রায় সেদিন কলকাতা অচল হবে, পৃথিবী প্রকম্পিত হবে। আগামী বিশ বছর এইরকম চলবে, ঘনঘন। আজই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে মিটিং। এই যাঃ, বলে ফেললাম। আমার সোর্স বাংলার ক্রীড়া ও সংস্কৃতিতে প্রবল ফোর্স, ঝুলে পড়লাম। আমাকে কর্তার নতুন কোনও মোসাহেব ধরে নিয়ে কেউ পাত্তা দিল না। মিটিং শুরু হল। প্রায়ান্ধকার ঘর। সাজানো, কিন্তু আলো কম। চাপা উত্তেজনা সব গলায়, কিন্তু মুখগুলো ঠিক দেখা যাচ্ছে না। কে একজন চিঁহি গলায় জানতে চাইলেন, প্রথম গানটা কে গাইবে? ভারি গলায়, বোঝাই গেল গুরুত্বপূর্ণ গলা, জবাব হল : শিকাগোয় তো ওই ডায়ানা রস। আমাদের ওপেনিং সঙে সব রস থাকবে। বীর রস, ব্যালান্স আনতে পাশাপাশি ধীর রস। কেন্দ্রের চাপে খাদি রস, পাবলিকের চাহিদার কথা ভেবে আদি রস। একজনকে দিয়ে হবে না। আমাদের ওপেনিং সং গাইবেন এক হাজার একজন। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড।

ভাঙা গলায় প্রশ্ন, কিন্তু কে উদ্বোধন করবেন? প্রাইম মিনিস্টার না প্রেসিডেন্ট? ভারি গলায় থাপ্পড়, চিফ মিনিস্টার থাকবেন না? গভর্নর? নো প্রবলেম। এত ভাল অ্যারেঞ্জমেন্ট আর কোনও দেশে নেই। চার-চারটে জায়গা। উদ্বোধক, সভাপতি, প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি।

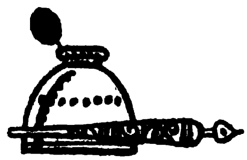
কাঁসা গলায় ক্রীড়া বিভাগের কর্তা : কিন্তু শিকাগোয় এটা কী হল? ২৪টা দেশ নাচগানের জন্য এক মিনিট করেও পেল না! প্রথমে চাপা হাসি, তারপর কাঁপা গলায় আশ্বাস : এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। কলকাতা বিশ্বকাপে (সামনের বিশ্বকাপ থেকেই

৩২ দল) নাচগানের জন্য ৩২ ঘণ্টা থাকবে, পার টিম এক ঘণ্টা। ভাষণ ১৬ ঘণ্টা। 'ভাষণ?' পঞ্চাশোর্ধ্বে টাই বাঁধতে-শেখা আমলা বোঝালেন, ইয়েস, ভাষণ, সাহেবরা এটাকেই বলবে 'কমিক রিলিফ'। টানা আটচল্লিশ ঘণ্টার প্রোগ্রাম। ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। আধ মিনিট নীরবতা, তাতে আসন্ন বিশ্বরেকর্ডের বাজনা বাজতে থাকল কানে কানে। বাজনার তাল কেটে উদ্বোধন কমিটির চেয়ারম্যান হাল ধরলেন, কিন্তু আপসোসের ব্যাপার, আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টিম লেটে যাচ্ছে। ওপেনিং সেরিমনির অভিজ্ঞতা ওরা আনতে পারবে না। মাঝে আরও ৬টা ওয়ার্ল্ড কাপ, মিনিমাম ৬৬ জন অভিজ্ঞতা অর্জন করবেন, ওঁদের উদ্বোধনের আগেই পাঠাতে হবে। চেয়ারম্যান কিঞ্চিৎ হাঁপাতেই গুরুত্বপূর্ণ বক্তা দাপালেন, আসল জিনিস হল পদযাত্রা। আমাদের ১০০ জন বিশ্বকাপার পায়ে বল নাচাতে নাচাতে, না পারলে হাতে বল নিয়ে নিজে নাচতে নাচতে সামনে থাকবেন। এঁদের চেহারায় থাকবে স্বীকৃতি ও অভিজ্ঞতার ছাপ। তারপর এক হাজার সম্ভাব্য বিশ্বকাপার, যাঁরা ভবিষ্যৎ টিমে ঢোকার জন্য লড়ে যাচ্ছেন, এঁদের চোখেমুখে থাকবে আশার ছাপ। তারও পরে দশ হাজার ফুটবলার। এঁরা পারেননি, কখনও পারবেনও না ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে থাকতে, মুখে থাকবে 'তবু যদি কিছু পাই' ছাপ। সব শেষে দশ লাখ লোক, ওদের টুপিতে ফুটবলের ছাপ।

কিন্তু, গান-টানের কী হবে? স্যাঁকা গলায় কালচারাল ফ্রন্টের প্রশ্ন। 'শুরুতে, চোলিকে পিছে। শেষে চোলিকে পিছে।' আর মাঝে? 'চোলিকে পিছে। যদি না অবশ্য ততদিনে আরও বেশি দেশাত্মবোধক গান এসে যায়।' চেয়ারম্যান দম নিতেই হঠাৎ মিটিংয়ের ডানদিক থেকে চাপা হইচই : তা কেন, তা কেন, আমাদের 'স্বীকৃতি'র কী হবে? অবিলম্বে আশ্বাস, ঠিক আছে, ঠিক আছে, আপনারা ভাষণের সময় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকে থাকবেন, তা ছাড়া সামনের বছর থেকে অস্কার অ্যাওয়ার্ড দেখতেও টিম পাঠাব। আশ্বাসে বিশ্বাস রেখে সাংস্কৃতিক নেতার পরবর্তী প্রশ্ন, ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাসকট কী হবে জানতে না পারলে, ব্যাকগ্রাউন্ড সঙের থিম ঠিক হবে কী করে? চেয়ারম্যান বললেন, ম্যাসকট ঠিক হয়ে গেছে, ধুতিপাঞ্জাবি-পরা ইলিশ। চোলিকে পিছে পিকে ওঠার মুহূর্তে আকাশ থেকে ২০২২টা প্যারাসুটে নেমে আসবে ২ লক্ষ ২২ হাজার ইলিশ, উইথ ধুতিপাঞ্জাবি। ছড়িয়ে পড়বে স্পেশাল ইলিশ-গ্যাস, গন্ধে ম-ম করবে গোটা স্টেডিয়াম। বিদেশিদের সহ্য না হতে পারে, তাই ঢোকার সময় গেটে স্পেশাল রুমাল ধরিয়ে দেওয়া হবে।

স্পোর্টস স্পেশালিস্ট পুলিসকর্তা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। বললেন, ওপেনিং সেরিমনির মুখে দশ লাখ লোক স্টেডিয়ামের দিকে এলে ভয়ঙ্কর প্রবলেম হবে। চারপাশে জঘন্য জ্যাম হবে। গোটা শহর, স্টেডিয়ামের ভেতরে-বাইরে পাবলিক গলদঘর্ম হবে। 'গলদঘর্ম?' জলদগম্ভীর গলায় জ্বলন্ত আত্মবিশ্বাস : এটাই তো লাস্ট আইটেম। শিকাগো স্কাইস্ক্র্যাপার দেখিয়েছে, আমরা টেলিভিশনে গোটা দুনিয়াকে দেখাব জ্যাম। আঠাশ বছর পরের আন্তর্জাতিক সাফল্যের আনন্দে চোখ বুজে এল নেতা তথা বক্তার, ভাবুন বন্ধুগণ, ইলিশ-গ্যাস, জ্যাম, পাবলিক ঘামছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে বাজছে শতাব্দীর চূড়ান্ত জিজ্ঞাসা—কেয়া হ্যায়, কেয়া হ্যায়....।

মাথাধরা? বদহজম?



'জনগণের সঙ্গে মিশুন। জনগণের পাশে বসুন। জনগণের স্রোতে ভাসুন। জনগণের দুঃখে হাসুন। জনগণকে ভালবাসুন।' ভোর সাড়ে আটটায় টেলিফোনে বেজে উঠল জনগণপন্থী এডিটরের গলা। আশঙ্কা ভুল। টেলি-ভাষণ নয়, এডিটর আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছেন। 'আপনারা কেন শুধু বড় বড় ফুটবলার, এক্সপার্ট, মিনিস্টার, আর্টিস্টদের নিয়ে পড়ে থাকেন? ক্রীড়ামোদী পাবলিকের ইন্টারভিউ নিন। কী ভাবছেন ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে, এই ধরুন একজন ব্যাঙ্ককর্মী অথবা ধরুন—।' অথবার দরকার নেই। তিন ফ্ল্যাট দূরেই মাঝবয়সী মাঝারি ব্যাঙ্ক অফিসার, মাঝামাঝি মেজাজ, নিশ্চিন্তে ইন্টারভিউ চাওয়া যায়। আমাকে হতাশ ও হতভম্ব করে ভদ্রলোক জানালেন ইন্টারভিউ দেওয়া সম্ভব নয়। কেন নয়! আজ রবিবার, তবু কেন নয়? বললাম, হয়ত খুব ব্যস্ত আছেন। জাস্ট দু-তিনটে প্রশ্ন। আজ ভোরে নিশ্চয় কলম্বিয়ার ম্যাচ দেখলেন। যারা চ্যাম্পিয়ন হতে পারেন বলেছেন স্বয়ং পেলে, তারা এভাবে কাত। এত ভাল টিম। অ্যাসপ্রিলা—। থামিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ক অফিসার বললেন, 'অ্যাসপ্রিলা? অ্যাসপ্রো দিন আমাকে, একসঙ্গে পাঁচটা। জীবনের বৃহত্তম, তীব্রতম মাথাধরার আমি শিকার। গত আড়াই সপ্তাহ ধরে চলেছে খবরের কাগজের অলআউট অ্যাটাক। ক্যাটানেসিও, থার্ডম্যান মুভমেন্ট, লিবেরো, স্ক্রিনিং, ৪-৪-২, ৪-৫-১, ১-১-৮, আমি আর পারছি না মশাই।' সমব্যথীর চোখে তাকিয়ে বললাম, কাছেই তো ডাঃ বসুমল্লিক থাকেন, দেখিয়ে নিন, তারপর ইন্টারভিউ দিন। ধরা মাথা দু'হাতে ধরে নাড়লেন মাঝারি ব্যাঙ্ক অফিসার, এরপর আমরা তাঁকে সংক্ষেপে মাঃ ব্যাঃ অঃ বলব, 'অসম্ভব। ডাঃ বসুমল্লিক মাথা আরও ধরিয়ে দেবেন। আরও ফুটবল বকবেন। আমি অনেক কষ্টে সাঁত্রাগাছিতে একজন ডাক্তার পেয়েছি, আজ উনি আমার মাথাধরার ট্রিটমেন্ট করবেন।'

ঠিক আছে, কাল আসব, আরও সকালে, আপনার অফিসে যাওয়ার আগে। 'নো, কাল আসবেন না। অফিসটফিসের প্রশ্নই উঠছে না, কিন্তু কাল আমি স্পেশালিস্টের কাছে যাব। ভয়াবহ বদহজম।' সেকি, নেমন্তন্নে উল্টোপাল্টা খেয়েছেন নাকি? ভয়ে বিষাদে মাখামাখি চোখে ডান পাশের স্তূপটির দিকে তাকিয়ে বললেন মাঃ ব্যাঃ অঃ, 'ওই যে, সাড়ে ছত্রিশ

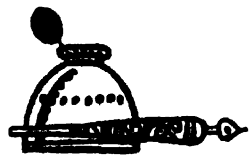
কেজি, অলরেডি। খবরের কাগজের কালার সাপ্লিমেন্ট, স্পোর্টস ম্যাগাজিনের স্পেশাল ওয়ার্ল্ড কাপ নাম্বার। ওরা জ্ঞান আর খবর খাওয়াতে চাইছে, খেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কত আর হজম করা যায়।' কিন্তু, বদহজমের জন্যও স্পেশালিস্ট? 'ইয়েস, ভেরি মাচ। এমনকি পেটখারাপের লিকুইডিটির হেরফেরের ওপর নির্ভর করছে, আপনি কী ধরনের বদহজম-স্পেশালিস্টের কাছে যাবেন। আমি ডাঃ সাহার কাছে যাচ্ছি, রানাঘাট। তিনটে করে ডায়াজিন পার ডে খেয়েও লাভ হয়নি, সমানে চোঁয়া ঢেকুরে আওয়াজ— বাজ্জিও, রোমারিও, দেখেনিও।' দেখেনিও! ইনি আবার কে? 'থাকতেও পারেন কেউ, দেখে নেবেন।' অলরাইট। আপনাকে যখন ধরেছি, ছাড়ব না, বউনি বলে কথা। পরশু, মঙ্গলবার আসব। আর্তনাদে ভেঙে পড়লেন মাঃ ব্যাঃ অঃ, 'নো। পরশু আমি ডেন্টিস্টের কাছে যাব, বর্ধমান। এই যাই-যাই মাঝবয়সে, যখন দেড়খানা দাঁত সশব্দে বিদায় নিয়েছে, আমি আর রিস্ক নিতে পারি না— আলকেটাস, পানাগুলিয়াস, গারলুকোভিচ, হার্সভেট্রট, টিয়ানটোকিস, জুবিজারেটা— এ-সব উচ্চারণ করতে করতে বাকি দাঁতগুলো ভেঙে গেলে খাব কী? প্লিজ, আসবেন না।'

বলছেন যখন, মঙ্গলবার আসব না। বুধবার কখন আসব বলুন। লজ্জায় মাথা নিচু করে মাঃ ব্যাঃ অঃ বললেন, 'আসবেন না। বুধবার ঘাড়। কোমর। পিঠ। হাঁটু। শুয়ে বসে দাঁড়িয়ে নানান পোজে নানা আসনে খেলা দেখতে দেখতে ব্যথা। পার্মানেন্ট ড্যামেজ যাতে না হয়, বুধবার অর্থোপেডিক সার্জেনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। ডাঃ মুখার্জির কাছে যাচ্ছি না। ফুটবলের কথা শুনে আরও ব্যথা বাড়বে। যাচ্ছি খড়দা, ডাঃ হালদার।'

মাত্র তিন ফ্ল্যাট দূরের প্রতিবেশী, দুঃখে আমারও মন ভিজে এল। তবে বুধবারও যাক, বৃহস্পতিবার আসব। এবার একটু বিরক্তির সঙ্গে মাঃ ব্যাঃ অঃ, 'আপনি এখনও বোঝেননি, আমার প্রবলেমটা কত ব্যাপক, বৃহস্পতিবার নিউরোলজিস্ট। দেখে যা-ই মনে হোক, আমার নার্ভ তো পাথরের নয়। নার্ভের ওপর খবরের কাগজের লোকেরা কী অত্যাচার চালাচ্ছে, ভেবে দেখুন। এটা জেনে রাখুন, ওটা শিখুন, সেটা মাখুন। কী ভয়ঙ্কর জেনারেল নলেজ টেস্ট, এই বয়সে। ফুটবলের যুবরাজ কে? আফ্রিকান সিংহ কারা? সুপার ঈগল কাদের বলা হয়? পাহাড়ি উট কে? উঃ।' পাহাড়ি উট? এরকম কেউ আছে নাকি? প্রায় পাগলের মতো হেসে বললেন মাঃ ব্যাঃ অঃ, 'জানি না, কেউ থাকতেও পারে!' সত্যি, সমস্যা কত গভীর, আগে বুঝিনি। অত্যন্ত বিবেচনাময় গলায় বললাম, সরি। আমি বরং শুক্রবারই আসব। 'নো! শুক্রবার এবং শনিবারও নয়, আমি রাঁচি যাচ্ছি, ফিরতে ফিরতে রবিবার।' কেন? 'ট্রিটমেন্ট।' আগাম। হবেই এমন কোনও কথা নেই, তবে এভাবে চললে, আমার মাথা খারাপ হতে পারে। একসঙ্গে ফুটবলের মাথাধরা, বদহজম, অর্থোপেডিক কমপ্লেন, নার্ভের প্রবলেম, দাঁত— কিছুই বলা যাচ্ছে না। ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হওয়ার পরও যাতে ঠিকঠাক ব্যাঙ্কজীবনের অবশিষ্ট পনের বছর কাটাতে পারি, সে কথা ভেবেই রাঁচিতে চেকআপ। রবিবার আসুন। যদি এ রকম দাঁড়ায় যে আমি পাগল হয়েই গেছি, আপনার ভাগ্য খুলে যাবে। আপনার নাম বালিগঞ্জ তথা কলকাতা তথা বাংলা

তথা ভারত তথা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। ওই সাক্ষাৎকারে আমি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ব, হয়ত আপনাকে থামিয়ে আমি প্রশ্ন করে আমিই জবাব দেব। ওই সাক্ষাৎকারে হয়ত আমি দেখাব, ঔদার্য কাকে বলে। একটা প্রশ্নের সাতটা জবাব দেব। এটা হবে এ ঐ ও ঔ।' মানে? 'মানে—একান্ত ঐতিহাসিক ওতপ্রোত ঔদার্যময় সাক্ষাৎকার। পৃথিবীতে প্রথম একজন পাগলের নেওয়া পাগলেরই ইন্টারভিউ।'

গো ফর গোল.



গো ফর গোল। এই ডাকে সাড়া দিয়ে, এই ওয়ার্ল্ড কাপের প্রথম আট ম্যাচে সতের গোল। অ্যাভারেজ ২.১২৫। নাইনটিএইটে ফ্রান্স ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ধরলে ২০২২ সালে কলকাতা ওয়ার্ল্ড কাপ হবে সাত নম্বর। প্রতি ওয়ার্ল্ড কাপে অ্যাভারেজ এক গোল করে বাড়লে তখন দাঁড়ানো উচিত ৯.১২৫। গো ফর গোল। গোটা ফুটবল দুনিয়া যখন এত সিরিয়াস, এভাবেই গোল বাড়বে। আমাদের টার্গেট, ফ্র্যাকশন রাখব না, অ্যাভারেজ দশে নিয়ে যাব। প্লিজ, জানতে চাইবেন না, এ-কথা আমাকে কে বলেছেন। ২০২২ ওয়ার্ল্ড কাপ অর্গানাইজেশন কমিটির সেকেন্ড মিটিংয়েই এ বিষয়ে টানা সাড়ে সাত ঘণ্টা কথা হয়েছে। কমিটি একুশ জন মেম্বারের মধ্যে কে খবরটা দিয়েছেন, বলা যাবে না। তাহলে পরে আর একটাও খবর পাব না। যদি খুব ঝুলোঝুলি করেন, নাম লিখতে পারি, কিন্তু সেটা এমন একটা নাম হবে যিনি কখনও আমাকে খবর দেননি, ভবিষ্যতেও দেবেন না।

মিটিংয়ের শুরুতেই চেয়ারম্যান জানান, আমেরিকায় গোল বাড়ানোর জন্য ফিফা রেফারিদের বলেছে, যত পার কড়া হও, গোল বাড়াও। মুড়ির মতো ইয়েলো মুড়কির মতো রেড কার্ড ছেটাও। শুধু তা-ই নয়, এমন বলে খেলা হচ্ছে, যাতে বুটের কামড় ভাল বসে, বল বেশি সুইং করে। আগামী ২৮ বছরে এই চেষ্টা আরও বাড়বে। আমাদের ভাবতে হবে তখনকার কথা, যখন গড়ে দশ গোল হবে ম্যাচে। এরপর কমিটি মেম্বাররা একে একে প্রস্তাব দেন। কিছু সরাসরি নাকচ হয়। বাকি সব প্রস্তাব ফিফার কাছে যাবে, সব দেশের ফুটবল ফেডারেশনের কাছেও পাঠানো হবে।

(ক) দুই গোলপোস্ট কর্নার ফ্ল্যাগে পোঁতার এবং বার চল্লিশ ফুট উঁচুতে রাখার প্রস্তাব খারিজ হয়। গৃহীত প্রস্তাব : কর্নার ফ্ল্যাগ থেকে পাঁচ ফুট ছেড়ে গোলপোস্ট থাকবে। বার থাকবে এখনকার আট ফুটের বদলে বাইশ ফুট উঁচুতে। গো ফর গোল।

(খ) গোলকিপার হাতে বল ধরতে পারবে না, ফুটবল সবাইকেই ফুট দিয়ে খেলতে হবে, এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ হয়। তবে, গোলকিপারের দু'পায়ে পাঁচ প্লাস পাঁচ মোট দশ কেজি ওয়েট লাগানো বাধ্যতামূলক করতে হবে। গোলকিপারের নড়াচড়া যথাসম্ভব

আটকাতে হবে। গো ফর গোল।

(গ) ব্যাকপাস গোলকিপার হাত দিয়ে ধরতে পারবে না, এই নিয়ম এবারেই চালু হয়ে গেছে। প্রস্তাব ওঠে, গোলকিপার ব্যাকপাসে শুধু হেড করতে পারবে। সে ব্যাকপাস গড়ানো হলেও। অতিরিক্ত কড়া বিবেচনায় এই প্রস্তাব খারিজ হয়। নতুন প্রস্তাব, ব্যাকপাসই নিষিদ্ধ। ব্যাকপাস করলে, সেই স্পট থেকে ফ্রিকিক পাবে প্রতিপক্ষ দল। গো ফর গোল।

(ঘ) অফসাইড বলে কিছু থাকবে না। এই টিমের স্ট্রাইকার ওই টিমের গোলকিপারের ব্যক্তিগত বন্ধু হলে, বল কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত অনায়াসে গল্প করতে পারবেন। ফোটোগ্রাফার সুমন চট্টোপাধ্যায় চাইলে খেলা চলার সময়েই ক্লিন্সম্যান আর গয়কোচিয়ার আড্ডার ছবি তুলতে পারবেন। গো ফর গোল।

(ঙ) কড়া ট্যাকলিং হলে রেড কার্ড তো বটেই, অন্য ব্যবস্থার কথাও ভাবতে হবে। মাঝমাঠেও যদি বড় ফাউল হয়, পেনাল্টি দিতে হবে। পেনাল্টির ব্যাপারে কোনওরকম কিপটেমি চলবে না। গো ফর গোল।

(চ) বারে বা পোস্টে বল লাগলে আধ গোল দিতে হবে। গোল বাড়াতে হলে এরকম নতুন নতুন পথ নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। রেজাল্ট হবে সাড়ে ৭—সাড়ে ৫, এইরকম। (লিখিত প্রস্তাবে নেই, তবে কথা হয়েছে, এই সাড়ে-র কনসেপশন এদেশে খুবই জনপ্রিয়, পাবলিক এখানে অন্তত ভালভাবে নেবেই। তা ছাড়া, এতে জাতীয় স্বার্থের ব্যাপার রয়েছে। হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে ভারত খেলবেই। আমাদের ফুটবলারদের বারপোস্ট টিপ অতুলনীয়, অত বড় গোলের বদলে অত ছোট জায়গার বারপোস্টে মারায় আমাদের দক্ষতা সর্বজনস্বীকৃত। হাফ হাফ করে প্রচুর গোল পাবে ভারত।) গো ফর গোল।

(ছ) অফসাইড নিয়ম উল্টে দিতে হবে। নিজেদের পেনাল্টি বক্সে গোলকিপার ছাড়া আর মাত্র একজন থাকতে পারবে। বিপক্ষ দলের এগার জন ঢুকে পড়লেও আপত্তি নেই। পেনাল্টি বক্সে ডিফেন্ডার কমাতে হবে। গো ফর গোল।

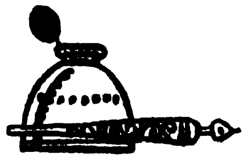
(জ) রেফারিংকে শিল্পের স্তরে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এ ব্যাপারে কলকাতার কয়েকজন প্রাক্তন ও প্রবীণ রেফারিকে প্রশিক্ষক হিসেবে ফিফা নিতে পারে। বড় টিম ছোট টিমের বিরুদ্ধে গোল না পেলে, যে অবিশ্বাস্য দক্ষতায় ওঁরা পেনাল্টির ব্যবস্থা করতে পারতেন বা পারেন, সেই দক্ষতা ফুটবল-বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে হবে। গো ফর গোল।

(ঝ) শুধু নিয়ম বদলালেই হবে না, বন্ধুগণ, প্রচারের ঝড় তুলতে হবে। আগামী ২৮ বছরে ব্রিগেডে অন্তত ২৮টা জনসভা করতে হবে। ২৮ হাজার মিছিল। ২৮ কোটি পোস্টার। প্রচারের মূল লক্ষ্য, গো ফর গোল। গোলের শত্রু ডিফেন্ডারদের বিচ্ছিন্ন কর। ফুটবল-শিল্পের শত্রু ডিফেন্ডারদের বয়কট কর। ফুটবল জনগণের খেলা। জনগণের শত্রু। ডিফেন্ডারদের ঘৃণা কর। প্রচার এমন জায়গায় তুলে নিয়ে যাওয়া হবে যে আর কারও ডিফেন্ডার হওয়ার ইচ্ছা বা সাহস থাকবে না। ডিফেন্ডার তৈরি না হলে গোল বাড়বে।

অর্গানাইজেশন কমিটির যে মেম্বার আমাকে খবর দিলেন, তিনি এমনিতে গম্ভীর,

তাঁর চৌকো মুখে আবেগ দেখিনি কখনও। কিন্তু গোলের জন্য ওর আবেগ, উদ্দীপনা দেখে ভাল লাগল। তবু, বলতেই হল, এইরকম হয়ে গেলে ফুটবলে বুদ্ধি, প্রতিভা ইত্যাদির দরকারই হবে না। এ তো ছাগলের খেলা হয়ে যাবে। গো ফর গোট! ভদ্রলোক আমার 'ট'-কে গ্রাহ্যই করলেন না। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়েস, গো ফর গোল। নিজের চোখে দেখলাম, ওঁর চৌকো মুখটা ক্রমশ গোল হয়ে গেল। গো ফর গোল।

ভ্যাঁ, বঁ ভইয়্যাজ



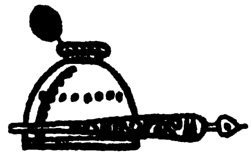
বঁ ভইয়াজ! আটচল্লিশ ঘণ্টা ফোন না পেয়ে, প্রথম পাতার প্রথম কলমে ফাজলামি করার দিন ফুরিয়ে এল ভেবে, দুরুদুরু বুকে এডিটরের ঘরের দরজা খুলে দেখি, টেবিলের ওপর তিন ফুট বাই দেড় ফুট পোস্টার, তাতে কোনও দাবি নেই, শুধু শুভেচ্ছা, বঁ ভইয়াজ! ইংরেজিতে লিখলে আমার মতো পাবলিক বন ভয়েজ উচ্চারণ করে ফেলতে পারে, তাই বাংলায়, টকটকে লাল রঙে। এডিটরের চোখের রং আরও লাল। রাত জেগে খেলা দেখে, আহা। এডিটর অন্তর্যামী, সব ভাবনা শুনতে পান। করুণ লাল চোখে তাকিয়ে, আহা কী দুর্লভ, বললেন যে রাত জেগে নয়, সকাল থেকে মনে মনে কেঁদে তাঁর চোখ লাল। অন্তত ওয়ার্ল্ড কাপের সময়টায় যে নিজের অমূল্য সময় নষ্ট করে সব খবরের কাগজ পড়া উচিত, সম্প্রতি বুঝেছেন। সামনে ছড়ানো ইংরেজি-বাংলা মিশিয়ে ছয় অথবা সাত অথবা আটটা কাগজ। ওপরের কাগজটার দু-তিন জায়গা একটু ভেজা, হয়ত চোখের জল পড়েছে টুপটাপ। এডিটর বললেন, সত্যি, এই লেখাটা না পড়লে বুঝতেই পারতাম না, কত ভুল আমি করেছি! সত্যি, চুনী গোস্বামীদের গালমন্দ করা উচিত নয়, শুভেচ্ছা জানানো চাই। বলা উচিত, শুভ যাত্রা, বঁ ভইয়াজ। অপরাধী চোখ নিচে নামিয়ে পাইপে সুখটান দিলেন এডিটর। একটু একটু ধোঁয়া উঠল, ছড়াল। মনে হল, সবজান্তা এডিটরের দর্প ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল। মুখে লজ্জা, দাঁতে দ্বিধা, আলতোভাবে পাইপ কামড়ে এডিটর বললেন, কী চমৎকার যুক্তি, মন্ত্রী তো সরাসরি বলে দিলেই পারেন, কিছু শিখতেটিখতে নয়, রাজ্যের ফুটবলের কোনও উন্নতিটুন্নতির জন্যও নয়, 'পুরস্কার' দিতেই এই প্রাক্তন ফুটবলারদের আমেরিকায় পাঠানো হচ্ছে। মন্ত্রী অবশ্য বলেছেন, এটা স্বীকৃতি। ইংরেজি কাগজে এ-ও বলেছেন, আগের ফুটবলাররা কিছুই পাননি, এটাকে ধরা যায় ওল্ড-এজ পেনশনের মতো কিছু! বলেছেন, কিন্তু এত সুন্দরভাবে বোঝাতে পারেননি। বোঝার পর থেকে আমি বারবার মরে যাচ্ছি, লজ্জায়। বলতে বলতে এডিটরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে এল। মনে হল, এতদিনের ফাঁপানো দর্প মুছে গেল। আমাকেও কফি দিতে বলে এডিটর বললেন, এই খবর কি আপনিও জানতেন যে, একবার ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ফিরে পি কে ব্যানার্জি অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা রিপোর্ট দিতে

চেয়েছিলেন? সে রিপোর্ট নিতে মহাকরণে কেউ গা করেনি। পি কে রিপোর্ট দিতে চেয়েছিলেন যখন, তাঁর বাড়িতে গিয়ে রিপোর্ট নিয়ে আসা উচিত ছিল মহাকরণের। কত খবর আমরা রাখি না, জেনে নিতে হবে। হয়ত পি কে বারবার ফোন করেছেন, কেউ ধরেনি। হয়ত ডাকে পাঠিয়েছেন, কেউ রিসিভ করেনি। মহাকরণে জমা দিতে গেছেন, দুরদূর করে তাড়িয়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত কিছু লোক নিয়ে মহাকরণের সামনে বিক্ষোভ জানিয়ে ১৪৪ ধারা ভেঙে হয়ত গ্রেপ্তারও হয়েছিলেন, আমরা খবর রাখি না। 'বঁ ভইয়াজ' লেখা পোস্টারে মাথা ঠুকতে থাকলেন অনুতপ্ত এডিটর। মনে হল, মাথা না হোক, দর্প গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল পোস্টারে, টেবিলের ফাঁকা জায়গাতেও। বেচারা।

সবুজ কালিতে আন্ডারলাইন, এডিটর বলে চললেন, অথবা কেঁদে চললেন, দেখুন, কী দুর্ধর্ষ যুক্তি, খরচ হবে মাত্র পনের-বিশ লাখ টাকা, এটা কোনও বড় অঙ্কের টাকাই নয়। প্রাক্তন ফুটবলারদের জন্য সামান্য কয়েক লাখ টাকা খরচ হতে দেখে অগ্রাধিকার ক্ষেত্রগুলি কী হওয়া উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোনও অর্থই হয় না। আহা, কী পরিষ্কার, মাত্র পনের-বিশ লাখ, এত সামান্য অর্থ নিয়ে প্রশ্ন তোলার অর্থই হয় না। যে-রাজ্যে আন্তর্জাতিক মানের উঠে আসার মতো দাবাড়ু সূর্যশেখর গাঙ্গুলিকে টাকার অভাবে বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েও এশীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার ব্যাপারে অনিশ্চিত থাকতে হয়, এশীয় জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন সহেলি ধরকে তিরিশ হাজারের জন্য মাথা কুটতে হয়, প্রতিভাময়ী সাঁতারু উর্মিলা ছেত্রীর বাবাকে উদয়াস্ত রিকশ টেনে মেয়ের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতে হয়, ল্যাংচা মিত্র-নায়ারদের অনুদানপ্রার্থী হতে হয়, জাতীয় স্কুল চ্যাম্পিয়ন বাংলা দলের ফুটবলার বাঁকুড়ার পিতৃমাতৃহীন রঘুনাথ সোরেনকে নিজেই শালপাতা কুড়িয়ে বিড়ি বেঁধে সংসার চালাতে হয়, ফুটপাথে কাপড় বিক্রি করতে করতে অনূর্ধ্ব ১৪ জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়ন জয়দেব সাহার দাদাকে দুশ্চিন্তায় থাকতে হয়— হাঙ্গেরিতে বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার টাকা আদৌ জুটবে কিনা, আত্মমর্যাদাবান সুধীর কর্মকারের ট্রেনিং ক্যাম্প সংগঠকদের পনের-বিশ হাজার টাকার জন্য ঘুরতে হয়, সে-রাজ্যে সামান্য পনের-বিশ লাখ টাকা খরচ হতে দেখে অগ্রাধিকারের প্রশ্ন তোলা কী ভীষণ অন্যায়, আগে বুঝিনি। বলতে বলতে ঘামতে থাকলেন এডিটর। যেন, ঘামের সঙ্গে ঝরে পড়ল দর্প। দরকার ছিল। ঘাম মুছতে মুছতে, মনে মনে চোখও মুছতে মুছতে, এডিটর বললেন, আসলে আমাদের কু-মন, তাই শুধু খারাপ ভাবি। কী দুর্দান্ত বিশ্লেষণ, 'অস্বীকার করে লাভ নেই, এমন ঘোর দুর্দিন বাংলার ফুটবলের ইতিহাসে এর আগে কখনও আসেনি।' সুতরাং, ঘোর দুর্দিনই যখন, প্রাক্তন ফুটবলারদের আমেরিকায় পাঠাতে হবে। সুদিন ফিরবে ভেবে নয়, 'পুরস্কার' দিয়েই পাঠাতে হবে। আগে বুঝিনি, কেন বুঝিনি, বলতে বলতে পুরো এক গ্লাস জল খেলেন এডিটর। যেন ঢক করে গিলে ফেললেন এতদিনের ফালতু দর্প। কত কত বছর ধরে চিনি এই দর্প, অহমিকার বেলুনটিকে। চোখের সামনে চুপসে যেতে দেখে কষ্ট হচ্ছিল। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। এবং হাত থেকে কফির কাপ পড়ে গেল। ভেঙে গেল। যেন দর্প চূর্ণ হল। চূর্ণবিচূর্ণ কাপ অথবা দর্পের দিকে না তাকিয়ে

এডিটর বিরল আবেদনের সুরে বললেন, আমাকে টিমে ঢোকাতে পারেন, আপনার তোঁ বন্ধু সোর্স? সে কি, আমেরিকা যেতে চান? স্বীকৃতি চান? পুরস্কার চান? কীসের জোরে? প্রায় ভ্যাঁ করে কেঁদে এডিটর বললেন, না ওসব চাই না। আমাদের বিশ্বকাপাররা যেদিন যাবেন, সেদিন দমদম এয়ারপোর্টে ওঁদের যাঁরা মালা পরাবেন, সেই টিমে ঢুকতে চাই। প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। সবচেয়ে বড় মাপের মালা আমাদের ক্যাপ্টেনের গলায় পরিয়ে, এই পোস্টার নাড়তে নাড়তে, কাঁদতে কাঁদতে বলতে চাই— বঁ ভইয়াজ।

এক্সপার্ট হতে হলে



ছেলেটিকে দেখে অবাকই হলাম। এখন তো ওর আসার কথা নয়। বড় ম্যাচের আগে গত পাঁচ বছর ধরে একই কাহিনী। টিকিটের ডিমান্ড থাকলে আমি পাই না এবং ছেলেটিকে বলি, একটু আগে এলে না ভাই, সব নিয়ে চলে গেল। টিকিট প্রচুর পাওয়া গেলে আমিও পাই, ছেলেটিকে খুঁজি, পাই না। এবার এখন যদি মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ হয়, আমি আন্ডারগ্রাউন্ডে যাব, কেউ আমাকে টিকিট গছাতে পারবে না। ডিমান্ডের প্রশ্নই নেই, তবু ও কেন এসেছে? বাঃ, গত কয়েক মাসে বেশ ভাল চেহারা করেছে। সতেরর তাজা তরুণ। 'কী হে, এবারও টিকিট লাগছে নাকি?' না না, ছেলেটি রীতিমত প্রণাম ঠুকল, আমি এবার ফার্স্ট ডিভিশনে খেলছি, খিদিরপুর। দরকার হলে দু-একটা টিকিট এমনিই পাব। অন্য ব্যাপারে এসেছি। আঃ, মনটা ফুরফুরে হয়ে গেল। অচ্যুৎ ব্যানার্জির খিদিরপুর। স্বপন, সুরজিৎ, গৌতম, প্রসূনদের খিদিরপুর। আমাদের পাড়ার ছেলেটা খিদিরপুরে খেলছে। মিনিট খানেক কিন্তু কিন্তু করে খিদিরপুরের উদীয়মান ফুটবলার বলল, 'আমাকে একটু সাহায্য করুন। এবার যা খেলছি, লিগে অন্তত পাঁচটা ম্যাচ খেলবই। আমি এক্সপার্ট হতে চাই। খবরের কাগজে, রেডিওয়, টিভিতে। ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়েই লেখার বা বলার ইচ্ছা।' বাঙালির ছেলের মনের জোর আর ইচ্ছা দেখে মেজাজ আরও ভাল হয়ে গেল। কী করে এক্সপার্ট হতে হয়— এ বিষয়ে যে এক্সপার্ট ভাষণটি আমি দিয়েছি, তার সংক্ষিপ্তসার এখানে প্রকাশিত হল।

●●●

(এক) কোনওরকম টেনশন রাখা চলবে না। টেনশনের কোনও কারণই নেই। তুমি গোল মিস করছ না, তোমার দোষে গোল হচ্ছে না, তোমাকে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে না, পাবলিক গালাগালি দিচ্ছে না। তা হলে কীসের ভয়? কীসের টেনশন? প্রথম দিকে সেফ খেলবে, মানে লিখবে। একেবারে ফাঁকায় স্কোয়ার পাস। যথা, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। আর্জেন্টিনার গ্রিসকে হারানো উচিত। মারাদোনা আর সে মারাদোনা নেই, তবে এখনও তিনি মারাদোনা। জার্মানির লড়ার ক্ষমতা, ব্রাজিলের সাম্বা, হল্যান্ডের হাম্বা— দরকার মতো গুঁজে দেবে। খুব গম্ভীরভাবে লিখবে, রুমানিয়ার ওয়ার্ল্ড কাপ জেতার সম্ভাবনা

খুব বেশি নয়।

(দুই) মনে রাখবে, দর্শক/পাঠক নিজের সঙ্গে এক্সপার্টের বক্তব্য মিলিয়ে দেখে। মিললে এমনিই খুশি হয়। না মিললে, এক্সপার্ট কত বেশি জানে ভেবে খুশি হয়। এত পাঠক, নানাভাবে খুশি করা যাবেই, যদি তুমি যে কোনও একটা কথা সাহস করে লিখতে পার। ধর, মারাদোনা। গোলটা তো গোল, দারুণ গোল তো দারুণ গোলই, কিছু করার নেই। কিন্তু আসল ব্যাপার এর পর। তুমি লিখতে পার, মারাদোনা দারুণ গোল করলেও এই গতি নিয়ে বেশি দূর পারবেন না। অথবা বলতে পার, এই তো সবে শুরু, মারাদোনা এবার ফাটিয়ে দেবেন। এখানে একটু ঝুঁকি নিয়ে বলে দিতে পার, ওপর ওপর মনে হচ্ছে গতি কমেছে, কিন্তু চোরা গতি ঠিকই আছে, পকেটে বা আস্তিনে বা মোজায় লুকিয়ে রেখেছেন, আসল সময়ে বার করবেন। আগেই বলেছি, রিস্ক নিতে না পারলে, গম্ভীরভাবে লিখবে/বলবে, মারাদোনা এবারও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলেও উঠতে পারেন। দু-তিনটে 'যদি' দিয়ে বলবে/ লিখবে।

(তিন) ফুটবলের ল্যাঙ্গোয়েজ, টার্ম ব্যবহার করতে হবে। অ্যাটাকিং থার্ড, ফ্লানেলিং, ডেডবল ভ্যারিয়েশন, লিবেরো ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোই যথেষ্ট নয়। নতুন কিছু দিতে হবে। খেলা ছড়ানোর বা গোটানোর কথা প্রচুর শোনা বা পড়া গেছে। তুমি খেলা ভেজানো বা শুকনো করার কথা বলতে পার। ধর, বিচিত্র পদ্ধতিতে অ্যাটাক করেও গোল পাচ্ছে না ব্রাজিল, তখন রিকার্ডো, রোচা আর দুঙ্গা মিনিট তিনেক বল দিয়ে-নিয়ে বাইরে পাঠিয়ে খেলাটাকে শুকিয়ে নিল। তারপরই হঠাৎ ব্রাজিলের বৃষ্টি, অ্যাটাক, গোল। কাঠখোট্টা জার্মানির বিরুদ্ধে উল্টোভাবে ম্যাচ ভিজিয়ে নেওয়ার কথাও লেখা যেতে পারে।

(চার) কাগজের লোকেরা বলতে পারে, অ্যানেকডোট দাও, গপ্পো দাও। এখন দিও না। পেলে বা প্লাতিনির অ্যানেকডোট দিতে হয় না। তোমার দেওয়া চলবে না, পাবলিক মারবে। আগে মাঝামাঝি জায়গায় আসতে হবে, তারপর গল্প দিও। পাবলিক নিশ্চিতভাবেই খাবে। ভবিষ্যতে এ জিনিস দিতে হতে পারে, কীভাবে দিতে হয় তা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। যখন দেবে, স্মার্টলি দেবে। জার্মানি-রাশিয়া ম্যাচের রিপোর্টে মোহনবাগান-খিদিরপুর ম্যাচের রেফারেন্স আনবে।

(পাঁচ) যাদের খেলা নিয়ে লিখছ, মনে মনে নিজেকে তাদের লেভেলে নিয়ে যাবে। পাড়ার রকের কচিদা যদি ক্লিন্টনের চাল বা মেজরের ভুল নিয়ে অনায়াসে বলে যেতে পারে, তুমিই বা কেন বারেসির মিসটেক, লিওনার্দোর ওভারটেক বা ওভারল্যাপের গণ্ডগোল নিয়ে লিখতে পারবে না? যদি ভাব, তুমি বড় জোর হাফ, আধ, কী করে হাজার নম্বরের প্লেয়ার নিয়ে লিখবে, ছেড়ে দাও, এক্সপার্ট হওয়া তোমার কম্মো নয়। যদি তিন বা চার ধরতে পারে হাজারকে, আধের চেষ্টা কী আর এমন বেশি? ট্রাই কর, পারবে।

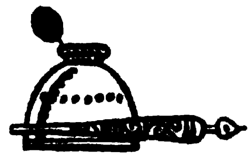
(ছয়) তোমার হয়ে কেউ লিখে দিলে ক্ষতি নেই। দু-একজন ছাড়া সবার ক্ষেত্রেই তাই, গোটা দুনিয়াতেই। পাবলিক তোমার অ্যানালিসিস জানতে চায়, ভাষা নয়। কিন্তু, তোমার লেখককে বলবে, দাদা, বা ভাই, বেশি ভাষা দিও না। নিজের লেখা নিজেই

বলবে। এবং পরে নিজেই পড়বে। ওই গল্পটা মনে রাখবে। ইন্ডিয়া টিমের এক ক্রিকেটার আরেক ক্রিকেটারকে নিজের অটোবায়োগ্রাফি উপহার দেয়। দিন দশেক পর দ্বিতীয় ক্রিকেটার ফিসফিস করে জানতে চায়, এত ভাল বই কে তোকে লিখে দিল রে? প্রথম ক্রিকেটার বলে, সেটা পরে বলছি, আগে তুই বল, তোকে কে পড়ে দিল?

(সাত) যদি পরের বার ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করার চান্স পাও, অন্তত এক মাস আগে থেকে ফুটবলের টেকনিক-ফেকনিকের পেপারব্যাক হাতে নিয়ে ঘুরবে। বাড়ি থেকে বেরবার সময় জুতো পরতে ভুলে গেলেও পেপারব্যাক নিতে ভুলবে না। পরের এক মাসও এটা করতে হবে। হাতের পেপারব্যাক ঘনঘন পাল্টাবে না। তুমি কিছুই পড়বে না, কিন্তু বেশি বই পাল্টালে লোকে সেটা বুঝে ফেলবে। মাঝে মাঝে সমঝদার কোনও এক্স-ফুটবলার বা জার্নালিস্টের কাছে গিয়ে যে কোনও পাতায় যে কোনও দু-চার লাইনে দাগ মেরে বলবে, এটা বুঝতে পারছ না। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে, তুমি খুব পড়াশোনা করছ। তোমার উন্নতি কে রোখে?

(আট) এক্সপার্ট হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলা ছেড়ে দেবে, প্রয়োজনে একুশ বছর বয়সেই, খিদিরপুর থেকেই। যদি খেলতে হয়, কানের অপারেশন করিয়ে নেবে, যাতে পাবলিকের মন্তব্য কানে না ঢোকে। যদি আমার পরামর্শমত নিজেকে তৈরি করতে না পার এবং তবুও যদি এক্সপার্ট হতেই হয়, কিছুটা হকি খেলে নাও, দিল্লি যাও, দূরদর্শন কর্তাদের কাছে গিয়ে বল, কুক্কু ওয়ালিয়ার মতো আমিও টিভিতে ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সপার্ট হতে চাই। আর হ্যাঁ, তুমি যে একটু ফুটবল খেলেছ, সেটা যেন ওরা কিছুতেই জানতে না পারে।

কাপুরুষের জবানবন্দি



ঝাড়া সাঁইত্রিশ ঘণ্টা ব্যর্থ চেষ্টার পর কলকাতা পুলিসের ডি সি, ডি ডি, গৌতম চক্রবর্তীকে বললাম, আমাকে একটু সাহায্য করুন, সুরজিৎ সেনগুপ্তকে খুঁজে দিন। 'সে কি, সুরজিৎবাবু নিখোঁজ নাকি?' বোঝালাম, নিখোঁজ-টিখোঁজ নয়, পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। রিপোর্টারদের অ্যাভয়েড করছেন। গৌতমবাবু মিষ্টি হেসে হতাশ করলেন, এ ব্যাপারে পুলিসের কিচ্ছু করার নেই। সুরজিতের বাড়িতে গিয়ে শুনি বাজারে, বাজারে ছুটে শুনি যানইনি, ফের বাড়িতে গিয়ে শুনি বাজার থেকে ফিরে অফিস গেছেন, অফিসে গিয়ে শুনি আসছেন না। আজকালে যখন লিখছেন, আসতেই হবে। মাঝরাতে ওত পেতে বসে থাকলাম। স্পোর্টস এডিটর জানাল, লাভ নেই। সুরজিৎ সেনগুপ্ত এবার আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে লিখবেন। বেশ। বললাম, তা হলে 'দেবাশিস দত্ত, নিউ ইয়র্ক'-এর মতো 'সুরজিৎ সেনগুপ্ত, আন্ডারগ্রাউন্ড' করে দিলেই তো হয়।

ডি সি, ডি ডি, হেল্প না করায়, আজকালেও না পেয়ে গতকাল ভোর সাড়ে চারটেয় গল্‌ফ গ্রিনে সুরজিতের বাড়ির সামনে বসে পড়ি। সাতটা বারো নাগাদ, যাবে কোথায়, সুরজিৎ সেনগুপ্ত সবে কেনা মারুতিতে বসে স্টার্ট দেবার মুখেই মুখ দেখালাম। ইন্টারভিউ চাই। সুরজিৎ নামলেন। আদরের মারুতিতে হাত বুলিয়ে বললেন, এটার? একটু দূরে ল্যাজনাড়া খাঁটি স্বদেশি কুকুরটিকে দেখিয়ে বললেন, নাকি ওটার? ওটা এখানেই থাকল। এটার জন্য রাতে আসুন, গ্যারাজে। 'এটা থাক, ওটাও থাক, আজ আপনার ইন্টারভিউতেই কোনওরকমে চলে যাবে।' দুজনের মধ্যে সাড়ে দশ মিনিট ধরে তারপর যে কুৎসিত ব্যাপারটা চলল, ভদ্র ভাষায় তাকে বলা যায় অভদ্রতা। এ যুদ্ধে চিরকালই জার্নালিস্টরা জয়ী।

•••

• পালিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন?

সুরজিৎ : গুলিট!

• মানে?

সুরজিৎ : ভয়ে, লজ্জায়। হল্যান্ড টিম থেকে সরে যাওয়ায় গুলিটের বাড়িতে পোস্টার, ফোনে হুমকি, পথেঘাটে ছি ছি। আমারও তাই। বেঙ্গলের ওয়ার্ল্ড কাপ টিম থেকে সরে

দাঁড়ানোর পর পাবলিক ভীষণ ক্ষেপে গেছে। সবাই বলছে, ভিতু। এই পর্যন্ত আপত্তি ছিল না, কিন্তু দেশদ্রোহী, বিশ্বাসঘাতকও বলছে। পথেঘাটে চেনা লোকেরা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে, অচেনারা থুতু দিচ্ছে। যে টিম থেকে পালায়, রাজ্যের জন্য ওয়ার্ল্ড কাপে ঝাঁপিয়ে না পড়ে, তার ক্ষমা নেই। কেউ কেউ নাকি বলেছে, এ জন্য পশ্চিমবঙ্গ রক্ষা আইনে অ্যারেস্ট করা উচিত। প্লিজ, আমাকে ছেড়ে দিন, সাড়ে সাতটার মধ্যেই আমার লুকিয়ে পড়ার কথা।

• এই প্রশ্নটা ছাপার জন্য নয়, মানে ছাপা হবেই না, আপনাকে নাকি আজকালের এডিটর চাপ দিয়ে এটা করিয়েছেন?

সুরজিৎ : অন দ্য কনট্র্যারি, উনি আমাকে আমেরিকা যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, প্লিজ যান। নিজেদের লোককেও অ্যাটাক করার এই চান্সটা দিন। চাপড়ে পিঠ ব্যথা করে দেবে মুগ্ধ পাঠক-পাবলিক। তা ছাড়া, এডিটর বলেছিলেন, আমরা আরও একটা বাইলাইন ইউজ করতে পারব। সুরজিৎ সেনগুপ্ত, ডিজনিল্যান্ড। সুরজিৎ সেনগুপ্ত, প্যারিস। সুরজিৎ সেনগুপ্ত, হোটেল অ্যাডোনিজ। সুরজিৎ সেনগুপ্ত, কেন্টুকিজ চিকেন।

• আপনি গেলেন না কেন?

সুরজিৎ : প্রথম কথা, নীতিগত সায় ছিল না। ছোটবেলায় বাবা বারবার বলতেন, দ্যাখ বিশু, জীবনে সব কিছুই পরিশ্রম করে অর্জন করতে হয়। যে জন্য তুই খাটিসনি, যা তোর পাওনা নয়, তা কখনই নিবি না, এটা অসততা, অন্যায়। যারা ওয়ার্ল্ড কাপ টিমে চান্স পেয়েছে, তারা সবাই টিমে থাকার লক্ষ্যে অবিচল থেকে কঠোর পরিশ্রম করেছে, মাসের পর মাস, কেউ কেউ বছরের পর বছর। সুদীর্ঘ সেবার সে এক উজ্জ্বল ইতিহাস। আমি বিনা পরিশ্রমে বা সেবায় 'পুরস্কার' নিতে রাজি হলাম না।

• ঠিক আছে, আপনি বেশি পদযাত্রা করেননি, দোলের দিন 'হোলি হ্যা-য়' বলে নাচেননি, 'পুরস্কার' আপনি পেতে পারেন না। কিন্তু 'স্বীকৃতি' ব্যাপারটা? এটা ভেবেও তো যেতে পারতেন?

সুরজিৎ : ভাল ফুটবলার হওয়ার স্বীকৃতি? প্রশান্ত সিংহ, প্রদ্যোৎ বর্মনের মতো এশিয়াডে সোনা জয়ী ফুটবলাররা স্বীকৃতির যোগ্য নন, সুধীর কর্মকার নন, কিন্তু আমি যোগ্য?

• টিমের বাকি সবাই যোগ্য?

সুরজিৎ : অফ কোর্স। গত ছ'মাস ওরা বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছে এবং কোথায় গিয়ে কতক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে থেকেছে, জানুন। বুঝবেন, তা ছাড়া, মিনিস্টার একটা ইংরেজি কাগজে বলেছেন, এক্স-ফুটবলাররা খেলার সময়ে টাকাপয়সা পায়নি, এটা হল পুরস্কার, বলতে পারেন ওল্ড-এজ পেনশন। মুশকিল হল, আমি খেলে টাকাপয়সা পেয়েছি। সুতরাং মিনিস্টারের ওই 'ওল্ড-এজ পেনশন' পাওয়ার অধিকার আমার নেই। আর যারা যাচ্ছে, তারা তো এক টাকাও পায়নি, ওরা পেনশন পাবে, আমেরিকায় যাবে, একদিন হয়ত চাঁদেও।

• আপনি বড্ড নীতির কথা বলছেন, আসল ব্যাপারটা কী, ওই যে বললেন, 'ভয়', কীসের ভয়ে যাচ্ছেন না?

সুরজিৎ : প্রত্যাশা। যারা যাচ্ছে, তারা অনেকেই বলছে, এর প্রতিদান দেবে। ফিরে এসে

ফিরিয়ে দেবে। আমি পারব না। স্বীকৃতি খেয়ে হজম করে ফিরিয়ে দিতে পারব না। বেড়িয়ে এসে বেড়ানোটা ফিরিয়ে দিতে পারব না। ফিরে এসে বেঙ্গলকে এরা কোথায় তুলে নিয়ে যাবে, ভাবা যায় না। আমি তুলতে পারব না, নিজেই ধপাস করে পড়ব, হাড়গোড় ভাঙবে, তাই গেলাম না।

• তবু, এমন একটা চান্স, গেলে পারতেন।

সুরজিৎ : একবার-আধবার যে ভাবিনি তা নয়। এক বন্ধু বলল, সেবা করিসনি তো কী হয়েছে, ফিরে এসে সেবা করবি। আগে খাটিসনি, পরে খাটবি। রোজ অ্যাটেনডেন্স দিবি। মিনিস্টারের কাছে মেগাস্টার 'হেঁ হেঁ' করছে, তুই পারবি না?

• ভাল সাজেশন।

সুরজিৎ : মে বি। কিন্তু আমি পারব না। আমার ছেলের স্কুল আছে, গান আছে, বাড়ির বাজার আছে, ছোটদের ট্রেনিং ক্যাম্প আছে, অফিস আছে, বই পড়ার অসুখ আছে, লেখার বদভ্যেস আছে। এত কিছু আছে যে সেবা করার উপায় নেই। পারব না।

• কিন্তু এভাবে কতদিন পালিয়ে বেড়াবেন?

সুরজিৎ : এই তো, আর দিন দশেক। আমার জ্বর সেরে যাবে।

• জ্বর?

সুরজিৎ : হ্যাঁ। আমাদের টিম স্টার্ট করলেই আমার জ্বর চলে যাবে। আপনি তো জানেনই, সব কাগজেও লেখা হত, বড় ম্যাচ এলেই আমার জ্বর হত, ম্যাচ চলে গেলেই সেরে যেত। বড় ম্যাচে আমি ভাল খেলতেই পারতাম না।

• কোনও বড় ম্যাচে না?

সুরজিৎ : নাঃ। ব্যাঙ্কক পোর্ট অথরিটির বিরুদ্ধে বরদলুই ফাইনাল, পাঞ্জাবের বিরুদ্ধে সন্তোষ ট্রফি ফাইনাল, কুয়েতের বিরুদ্ধে এশিয়ান গেমসে, এ রকম কিছু ছোট ম্যাচে ভাল খেলেছি, গোল করেছি। বড় ম্যাচ হল মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ, পারিনি।

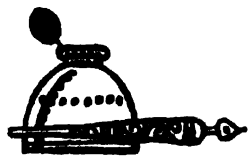
• মোহনবাগানের বিরুদ্ধে সেভেন্টিফাইভ শিল্ড ফাইনাল? সেভেন্টিএইট ডুরান্ড ফাইনাল?

সুরজিৎ : এক্সসেপশন। প্রুভস দি রুল। এখন আমার জ্বর ১২৫। গত দুদিন সেন্টিগ্রেডে জ্বর মেপে ৫৬-৫৭ দেখে মনোবল ধরে রেখেছি। এখনও ভয়, যদি ওয়ার্ল্ড কাপে নিয়ে যায়।

●●●

কথায় কথায় সাতটা চল্লিশ হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখি, প্রচুর পোস্টার নিয়ে মিছিল এগিয়ে আসছে। বিশাল বিশাল ছবি বেঙ্গলের বিশ্বকাপারদের। ওঁর বাড়ির সামনে এসে 'বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী' ইত্যাদি বলে গালাগালি দিতে পারে বলে গাড়ি ফেলেই ছুটলেন সুরজিৎ, মিছিলের উল্টোদিকে, জনরোষের ভয়ে। ঐ চাপ আর তাড়ার মুখেও বলে গেলেন, লিখে দেবেন, আমি কলকাতায় নেই। লিখবেন, ইন্টারভিউটা নিয়েছেন হিমালয়ের পাদদেশে অথবা দেওঘর স্টেশনের চায়ের দোকানে অথবা বনগাঁ লোকালের ছাদে। প্লিজ।

দোলনা ও মারাদোনা



আর সবাই ছ্যা ছ্যা করলেও আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টাররা গত এক সপ্তাহে আমাকে সাতষট্টি বার কনগ্র্যাচুলেট করেছে। অভিজ্ঞতায় বুদ্ধি বাড়ে, এমনকি আমারও বাড়ে, একটু লেটে হলেও বুঝলাম, এটা আসলে চক্রান্ত। ওয়ার্ল্ড কাপের সময় পেজ ওয়ানে ওদের জায়গা কেড়ে নেওয়ায় ব্যাপক রাগ। এদিকে 'কলকাতায় বিশ্বকাপ'-এর পর তেমন কোনও স্কুপ করতে পারিনি। ওরা কনগ্র্যাচুলেট করে আমাকে শুধু ফাজলামিতেই রাখতে চায়, যাতে আর স্কুপে যেতে না পারি, যাতে নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপে আর চান্স না পাই। আমরা বাঙালি। আমরা কেন্দ্রের চক্রান্ত নিয়ে ঘর করি। আমরা বিকল্প পথে কাজ করে দেখাই। স্কুপ চাই, স্কুপ। আর কে না জানে, কলকাতায় স্কুপের আসল জায়গা হল দলবদল— একদা দলবদলের মাদল, দলবদলের কোন্দল, দলবদলের ভোলবদল, দলবদলের ঝড়বাদল ইত্যাদি লিখে ফাটিয়ে দিয়েছি। মারাদোনা এখনও, লতা মঙ্গেশকর এখনও, কপিলদেব এখনও এই সিরিজের লেটেস্ট— বাবুরাম সাপুড়ে এখনও।

ময়দানের বড় খবর, বহু বিক্ষোভ প্রতিবাদ সত্ত্বেও দলবদলে উদারনীতি তিন বড় দল প্রয়োগ করতে চলেছে। এবার জানলা-দরজা খুলে দেওয়া হচ্ছে, অবাধ প্রতিযোগিতা, বিদেশ থেকে নানা রঙের ফুটবলার আসবেন। মোহনবাগানের কর্তা সময় দিলেন পনের মিনিট। আমস্টার্ডাম থেকে ফিরে স্নান সেরেই পনের মিনিট মাত্র, দেড় ঘণ্টা পরেই ফের লন্ডনের ফ্লাইট। যথাসময়ে পৌঁছে দেখি বিখ্যাত কর্মকর্তা দোলনায় দুলছেন, ঝিকিমিকি হাসছেন। কোনও বড় প্লেয়ার কি অলরেডি ডান হয়ে গেল নাকি? 'না', মোহনবাগান কর্তা দোল খেয়ে বললেন, 'অত সহজে ডান করি না। ক্লিন্সম্যানের এজেন্ট তিনদিন ধরে লেগে আছে। এখনও নট ব্যাড, হয়ত চিমার কাছাকাছি, কিন্তু লাল-হলুদ জার্সির গন্ধ গায়ে, নিতে চাই না, ভাল কাউকে না পেলে পরে তুলব।' শুধু ফরোয়ার্ড, আপনারা কোনও ডিফেন্ডার নেবেন না? 'নিতে পারি। বার্থহোল্ড নিজে ফোন করেছিল। একে জার্মান, তার ওপর প্রচণ্ড রাফ, অসভ্য।' দোলনার স্পিড বাড়িয়ে মোহনবাগান কর্তা বললেন, 'দেখুন, আমাদের একশ বছরের ক্লাব। অসভ্যতা চলবে না। এই ক্লাবে প্র্যাকটিসে একজন

আরেকজনের দাঁত মেরে খুলে দিয়েছে, প্লেয়ার সাপোর্টারদের মুখে থুতু দিয়েছে, মাথায় হকিস্টিক মেরেছে, কিন্তু আমরা কখনও অসভ্যতাকে প্রশ্রয় দিই না। বার্থহোল্ডকে আমরা নিতে পারি না, জার্মান না হলেও নিতাম না।' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, মারাদোনা? মোহনবাগান কর্তা দোলনা থামিয়ে বললেন, 'বদনাম আছে অনেক, তবু হয়ত নিতাম, মোটামুটি পপুলার, ক্লাবকার্ড তাড়াতাড়ি রিনিউ হত। কিন্তু ওজনটাই প্রবলেম।' তাতে কী, এখনও এমন বাঁ পা। 'ঠিক। কিন্তু মারাদোনার বাঁ পা-র পাশাপাশি এই দোলনাটার দিকেও তাকান। ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান দোলনা। কোনও বড় প্লেয়ার সই করলে তাকে এখানে বসিয়ে দোলাই। মারাদোনা এলে, দোলনায় আমরা দুজন— এই ছবি চাইবে ফোটোগ্রাফাররা, টাটা স্টিল সলিড মডেলের দোলনা সাপ্লাই না করা পর্যন্ত মারাদোনাকে নিতে পারছি না স্যরি।'

মহমেডান কর্মকর্তার ডেরায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাত সাড়ে বারোটায়। রিসেপশনে একসঙ্গে ষোলজন বললেন, সঙ্গে আসুন। প্রথমে করিডর, তারপর সুড়ঙ্গ, তারপর সিঁড়ি, তারপর উঠোন, তারপর আবার সুড়ঙ্গ, এইভাবে দশ মিনিট যাওয়ার পর কর্মকর্তার ঘর। বাইরে তাকিয়ে দেখি, রাস্তা। উল্টোদিকে যে সাইনবোর্ড দেখে ঢুকেছিলাম, সেই সাইনবোর্ড। পাশে সেই রিসেপশন। মহমেডান কর্তা একইসঙ্গে চা, কফি আর শরবত আনতে বলে জানালেন, 'দাদা, আমাদের টাকা নেই। এক ম্যাচে বাংলাদেশের সাত প্লেয়ার খেলিয়ে যে রেকর্ড করে দিয়েছি, আগে ওরা ভেঙে দেখাক। তবে, আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখে অন্তত একটা প্লেয়ার নেব, না হলে সাপোর্টাররা টেন্টের গেট খুলে নেবে।' কাকে নেবেন? মহমেডান কর্তা ডান হাতে চা, বাঁ হাতে কফির কাপ এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা, জানেনই তো, আমাদের টাকা নেই। মোহনবাগানের সেক্রেটারি দু'বেলা ফরেন যায়। ইস্টবেঙ্গলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি নিজে ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে যাচ্ছে। আমাদের প্ল্যান, কাউকে বলবেন না দাদা, বেঙ্গলের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের একজনকে কোচ করে দেব। ওর কাছেই জেনে যাব, কাকে নেওয়া যায়। একটা নাম অলরেডি এসেছে, রিকার্ডো রোচা। ব্রাজিলের প্লেয়ার, খুব খারাপ হবে না। কিন্তু অ্যাডভান্স করার আগে আমাকে বুঝে নিতে হবে, রহমতের জায়গায় চলবে কিনা। রহমত ইনজিওর্ড, সে তো দাদা আপনারা জানেন।'

ইস্টবেঙ্গল কর্তা ওয়ার্ল্ড কাপ দেখতে যাওয়ার তাড়ায় ছিলেন। একে যাওয়ার তাড়া, তার ওপর নেক্সট ইয়ার পি সেন ট্রফিতে লারাকে ভাড়া করে আনতে চান। এখন থেকেই ব্যস্ত। দশ মিনিট টাইম দিলেন, ইস্টবেঙ্গল টেন্টের গেটে। হঠাৎ বৃষ্টি আমাকে, কী সৌভাগ্য, শেষ তিন মিনিট টেন্টের ভেতরেই। প্রথম প্রশ্ন শুরু করতে না করতেই থামিয়ে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কর্তা। লম্বা হাত প্রথমে সামনে হানড্রেড এইট্টি ডিগ্রি, তারপর কনুই মুড়ে নাইনটি ডিগ্রি, তারপর আরও মুড়ে ফর্টিফাইভ ডিগ্রি, সিগারেটহীন দু-আঙুল ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস করুন, ওই খবরটা ওই কাগজকে আমি দিইনি।' বললাম, 'বিশ্বাস করুন, আমি ওই খবরটার কথা বলছি না। জানতে চাইছি, এবার কাকে আনছেন, হাজি? ইস্টবেঙ্গল কর্তা বললেন, 'ছোট টিমের প্লেয়ার আমরা নিই বটে, কিন্তু হাজি বুড়ো হয়ে গেছে। ফুল টাইম টানতে পারবে না। আমরা প্লেয়ার চিনি। ইস্টবেঙ্গল এমেকার আবদার শোনেনি, পঁচাত্তর হাজারের বেশি দেয়নি, দেখলেন তো নাইজেরিয়ার মতো ফালতু টিমেও

ফার্স্ট টিমে আসতে পারছে না। হাজি নয়, আমরা রোমারিওর কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলেন? পাস্ট টেন্সে বলছেন কেন? 'নেব না। ভীষণ গ্রুপ করে। বেবেতোর সঙ্গে ঝগড়া। আমরা অফিসিয়ালরা সারা বছর গ্রুপ করি, টিমে গ্রুপ অ্যালাউ করি না।' বার্গক্যাম্প? ইস্টবেঙ্গলের কর্তা সরাসরি বললেন, 'না। বিগ ম্যাচ টেম্পারমেন্ট নেই। সঞ্জয় মাঝি ইন্ডিয়া টিমের ক্যাম্পে গেলে ওকে কাজে লাগানোর কথা ভেবেছিলাম, কিন্তু খবরটবর যা পাচ্ছি, নিয়ে লাভ নেই।' রোনাল্ডো? গলায় হাফ কিলো স্নেহ ঢেলে কর্মকর্তা, 'আপনারা ওর ভাল চান না? সবে ব্রাজিল টিমে এসেছে, দু-তিন বছর খেলতে দিন। সতেরর বাচ্চা ছেলে, লাল-হলুদ জার্সির ওয়েট নেবে কী করে? পরে নেব।' বাজ্জিও? 'প্রায় নিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু নরওয়ে ম্যাচে ওকে বসানোর পর কীভাবে কুলকুচো করছিল দেখেছেন? জল নয়, যেন বিষ ফেলছে মুখ থেকে। টিমের এক নম্বর প্লেয়ারের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কখনই ভাল থাকে না। বাইচান্স বাজ্জিও যদি লোকাল প্লেয়ারদের চেয়ে ভাল খেলে নাম্বার ওয়ান হয়ে যায়, আমরা মাঝে মাঝে বসাবই, বসানোর পর যদি এ রকম মুখ করে ওভাবে কুলকুচো করে, ইস্টবেঙ্গল জনতাকে চেনেন না?' মাথায় হাত বুলিয়ে কর্মকর্তা বললেন, 'ওদের টিপ কীরকম জানেন না?'

এই রিপোর্টে কোনও প্লেয়ার সম্পর্কেই ফাইনাল খবর দিতে পারলাম না বলে আজকালের স্পোর্টস রিপোর্টারদের নৃত্য করার কারণ নেই। কোট করা যাবে না, তবে পাকা খবর, ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হওয়ার পরই তিন বড় ক্লাব মাঝারি অফিসিয়ালদের টিম পাঠাচ্ছে ইউরোপে, লাতিন আমেরিকায়। ওঁরা এই সব ব্যাপারে খোঁজখবর করে এসে ক্লাব কমিটিকে জানাবেন :

(ক) ফ্রাঁ, মার্ক, লিরা ইত্যাদি হিসেব করার সহজ পদ্ধতি। কনভার্সন টেবিল তৈরি করতে হবে। এখনও পর্যন্ত মাত্র দু'রকম মুদ্রার সঙ্গে সম্পর্ক অফিসিয়ালদের, ব্ল্যাক আর হোয়াইট।

(খ) এই প্রসঙ্গেই গুরুত্বপূর্ণ, ওই প্লেয়াররা কত টাকা কত নম্বরে নেবেন? এক নম্বরে ফর্টি পার্সেন্টি, দু নম্বরে থার্টি পার্সেন্টি আর তিন নম্বরে টুয়েন্টি পার্সেন্টি— এই ভাগ চলবে কিনা। তিন নম্বর বা কাটমানির চাষবাস ওখানে আছে কিনা, সেটা জানাই সবচেয়ে জরুরি।

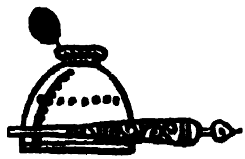
(গ) এক টিমের টাকা নিয়ে অন্য টিমে চলে গিয়ে পথে বসানোর সিস্টেম ওখানেও আছে কিনা এবং থাকলে কী ফর্মে আছে।

(ঘ) 'সম্মান' পাইনি, তাই টিম ছাড়লাম। 'সম্মান' পেলাম তাই এই টিমে এলাম। ওখানে টাকাপয়সার কোডনেম 'সম্মান' না অন্য কিছু?

(ঙ) ওরাও কি আমাদের ছেলেদের মতো কঠোর মাতৃভক্ত? 'মাকে প্রণাম করে আসছি' বলেই অন্য ক্লাবের ডেরায় যায়, না, অন্য কিছু বলে?

(চ) এই খবরটা শুধু মোহনবাগান অফিসিয়াল টিমকে জেনে আসতে বলা হয়েছে : মোহনবাগানে খেলার সুযোগ পাওয়ার জন্য মারাদোনা ৬ মাসে ৬ কিলো ওজন কমাতে রাজি আছেন কিনা।

চালাক সিনিয়র্স



সারাদিন বৃষ্টির পর যেন বিকেলের এক টুকরো নরম রোদ। এডিটরের মুখে সেই লাজুক রোদের ছায়া। ভুলটা বোঝার পর এখন বেঙ্গল ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের ব্লাইন্ড সাপোর্টার। ঘরে ঢুকতেই বললেন, 'শুধু ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা করলে হবে? যান, আমাদের টিমের প্রিপারেশন নিয়ে লিখুন। কাগজে দেখছেন না, ইতালির এক গোলে তিন রাত জাগছে গোটা দেশ, ব্রাজিলে অফিস-কাছারিতে কাজকর্ম বন্ধ, আয়ারল্যান্ডের ষাট হাজার লোক নিউ ইয়র্কে স্টেডিয়ামে। আর আমরা নিজেদের টিমের ট্রেনিং ক্যাম্পটা পর্যন্ত কভার করি না। ছিঃ।' বাড়াবাড়ি মনে হওয়ায় বলতেই হল, যতই ক্যাম্প করুক, টুর্নামেন্টের মাঝপথে গিয়ে কিছু করা যায় না। 'কেন করা যাবে না?' চেয়ারে বসেই লাফালেন এডিটর, 'বরিস স্পাসকিকে দুটো ম্যাচ ছেড়ে দেবার পর সেভেন্টি টু-তে ওয়ার্ল্ড চেস চ্যাম্পিয়ন হয়নি ববি ফিশার? মনোবল হারাবেন না, এটাই আসল। সল্টলেক স্টেডিয়ামে ট্রেনিং ক্যাম্পে গিয়ে শুনলাম, কোচ-কাম-ক্যাপ্টেন নেই, তিনি নিজেই নিজেকে আলাদা প্র্যাকটিস করাচ্ছেন। মাঠের এক কোনায় মাত্র তিনজন ফুটবলার। গোলপোস্টে ঝুলছে ব্যানার : চালাক সিনিয়র্স! মানে? চালাক হিসেবে সুবিখ্যাত এক সিনিয়র বললেন, 'জার্নালিজম করেন আর এটাও জানেন না? ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে ফেরার পর আমরা এই নামে সব ডিস্ট্রিক্টে একজিবিশন ম্যাচ খেলব। আর্জেন্টিনার বিখ্যাত টিম বোকা জুনিয়র্স। আমাদের চালাক সিনিয়র্স।' হাঁটছিলেন আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমের রেফারি। মুখচোখ দেখেই বুঝলাম প্রচণ্ড সিরিয়াস। বললেন, 'কালো জামা পরে রেফারিং করেছি সব সময়। এবার রঙিন শার্ট এসে গেল, আজই দর্জির কাছ থেকে ডেলিভারি পেয়ে গায়ে দিয়েছি। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হচ্ছে। তবে মানিয়ে নেব। প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসটাই আসল।'

তিন ফুটবলারের মধ্যে একজন এতক্ষণ আমাকে দেখেননি। দেখেই তেড়ে এলেন, আমাদের ট্রেনিংয়ে উইদাউট পারমিশন এসেছেন কেন? গেট আউট! সবচেয়ে চালাক সিনিয়র বোঝালেন, মাথা গরম করতে নেই। এখন আমাদের প্রেসের হেল্প দরকার। জানতে চাইলাম, আপনারা প্র্যাকটিসে কীসের ওপর জোর দিচ্ছেন? 'ভ্যারিয়েশন।

আমাদের কোচ-কাম-ক্যাপ্টেন বলেছেন, মডার্ন ফুটবলে আসল ব্যাপারটাই হল ভ্যারিয়েশন। যেমন ধরুন, আমাদের আমেরিকা যাওয়া। প্রথমদিকে আমাদের তিন-চারজন বলেছে, ঘুরে এসে অনেক কিছু করা যায়! যেই দেখা গেল এটা চলছে না, পরের তিনজন বলল, এটা স্রেফ বেড়ানো, বেড়ানোর সুযোগ পেয়ে ভাল লাগছে, উন্নতি-টুন্নতি হবে না, এভাবে কিস্যু করা যায় না।' ট্যাকটিক্স-এর কথা ভাবছেন না আপনারা? 'নিশ্চয়।' চালাক সিনিয়র বললেন, 'আমরা কী করছি, কেন করছি অপোনেন্ট টিম বুঝতেই পারবে না। আমরা করব একটা জিনিস, চাইব অন্য জিনিস। এই ধরুন, আমার পার্সোনাল ট্যাকটিক্স, হারো এবং ঘোরো! মন্ত্রীর কথায় ভোটে দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হারো, তারপর মজা করে আমেরিকা ঘোরো।' বাকিরা কে কোথায় কীভাবে প্র্যাকটিস করছেন জানা দরকার। ফোনে যোগাযোগ করে সকাল দশটা নাগাদ এক ফুটবলারের বাড়ি গিয়ে দেখি, নেই। তবে এসে গেলেন, পনের মিনিটের মধ্যেই, হাতে বাজারের থলি। এত দেরিতে বাজার? ফুটবলারের স্ত্রী জানালেন, 'এটা ফোর্থ।' ফুটবলার বললেন, 'ফিটনেসটাই আসল। যোগে বিয়োগ। যোগ ব্যায়াম মানেই ওজন বিয়োগ। যোগ করে আমি পার ডে সাড়ে পাঁচ গ্রাম ওজন কমাতে পারছি। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট নয়। তাই বাজার যাচ্ছি। আসছি। আবার যাচ্ছি। কিছু না কিছু আনতে ভুলে যাচ্ছি, ইচ্ছা করেও ভুলে যাচ্ছি। আজ কুচো চিংড়ি এনেছি প্রথমে, লাউ আনলাম এখন, একটু পরে কাঁচা লঙ্কা আনতে যাব। মডার্ন ফুটবলে আপনাকে মানতেই হবে, আসল ব্যাপার হল ফিটনেস।'

লড়াকু চালাক সিনিয়রের সঙ্গে কথা হল টেলিফোনে। বললেন, 'শুধু দেখছি। যা পাচ্ছি তা-ই দেখছি। টিভিতে খেলা দেখছি। আকাশে মেঘ দেখছি। রাস্তায় গর্ত দেখছি। শুধু চোখের প্র্যাকটিস করে যাচ্ছি। ময়দানে খোলা মাঠে যেখানে কোনও খেলা হচ্ছে, তিন মাঠ ছেড়ে গিয়ে বসছি, দূর থেকে খেলা দেখছি, যাতে আমেরিকায় স্টেডিয়ামের টঙে বসে খেলা দেখে এসেও বেঙ্গলের ফুটবলের উন্নতি করা যায়।

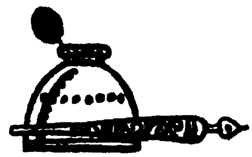
সল্টলেক স্টেডিয়ামে যে ফুটবলার তাড়া করেছিলেন, তাকেও টেলিফোনে ধরলাম। শুধু শুধু কেন রাগ করছেন? 'শুধু শুধু? আপনারা মানুষ? সেই কবে থেকেই খালি আমাদের গালাগালি করছেন? জানেন, ব্রহ্মানন্দকে পাঠাচ্ছে গোয়া গভর্নমেন্ট। গোয়ার মতো গরিব স্টেট যদি একজনকে পাঠাতে পারে, ওয়েস্টবেঙ্গলের মতো বড়লোক স্টেট দশজনকে পাঠাবে না? জানেন, ইকুয়েডর বারো, লাব্রাডর ষোল, আল্পস এগার, ভোলগা চোদ্দজনকে পাঠিয়েছে ওয়ার্ল্ড কাপে? কিছুই তো জানেন না। অবশ্য, এ-সব দেশের নাম আমিও আগে জানতাম না, এখন একটু পলিটিক্স করছি বলে জানি।'

কোচ-কাম-ক্যাপ্টেনকে পেলাম রবীন্দ্র সরোবরে। ভোর। জগিং করছিলেন। বললাম, প্লেয়াররা জানাল, আপনার মতে আসল ব্যাপারটা হল ভ্যারিয়েশন। কীরকম ভ্যারিয়েশনের কথা ভাবছেন? জগিং চালু রেখে কোচ-কাম-ক্যাপ্টেন বললেন, 'ভুল। সবার আগে এক্সপিরিয়েন্স। আমার এটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কাপ, ফোর্থও হতে পারে, ভুলে গেছি। তবে, এক্সপিরিয়েন্সের পরেই ভ্যারিয়েশন। এই যে জগিং দেখছেন, এবার আরেকটু

জোরে জগিং হবে, এটা একটা ভ্যারিয়েশন।' মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আর কিছু? 'সিওর। একটু পরে আমি হাঁটব। ওটা একটা ভ্যারিয়েশন। তারপর আরেকটু জোরে হাঁটব, আরেকটা ভ্যারিয়েশন।' আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ টিমকে কেউ হারাতে পারবে না, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে বললাম, দারুণ। কত ভ্যারিয়েশন। কোচ-কাম-ক্যাপ্টেন বললেন, 'আরও আছে। হাঁটার পর বসব। ভ্যারিয়েশন। তারপর আরও জোরে বসব। ভ্যারি—' ভেরি গুড। ওয়ান্ডারফুল। বঁ ভইয়াজ।

ফেরার পথে মনে পড়ল, টিমের গোলগেটারের সঙ্গেই দেখা হয়নি। ক্যাম্পে নেই, অফিসে নেই, বাড়িতে যেতে হল। দরজা খুলে একটি ছেলে জানাল, ভেতরের ঘরে প্র্যাকটিস। গিয়ে দেখি, শবাসন। পনের মিনিট বসে আছি, ফুটবলার শুয়েই আছেন। অনেক নাড়াচাড়ার পর বললেন, এটাই এখন সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট। আপনি নিশ্চয় জানেন, গত আড়াই বছরে আমাকে ১৪২৮ কিলোমিটার পদযাত্রা করতে হয়েছে। এত যাত্রার পরে এই পায়ে ফুটবল খেলা কঠিন। তবুও হাইড্রো কর্টিজেন নিয়ে ট্রাই করতাম। কিন্তু, টিমে ঢোকার জন্য লাস্ট দেড় মাস আমাকে আরও ৭০৮ কিলোমিটার হাঁটতে, দৌড়তে হয়েছে। কোচ বলেছেন, এটাও একটা প্র্যাকটিস। কোচ বলেছেন, টিমে ঢুকতেই আমাকে যা প্র্যাকটিস করতে হয়েছে, এখন রেস্ট ইজ বেস্ট। শবাসন, ওনলি।

অন্য খবর দিতে হবে



পেনাল্টি বক্সে আট জন। ওদিকে অসহায়, একা এডিটর। শনিবার রাত আটটা পঁয়ত্রিশে এই দৃশ্য দেখে ঢুকেই বেরিয়ে আসব ভাবছিলাম, এডিটর, এই প্রথম, করুণ হেসে বোঝালেন, তিনি চান আমি থাকি। সামনের ৬ চেয়ারে ৬ জন, বাকি দুজন দাঁড়িয়ে। ব্যাপারটা বুঝতে মিনিট খানেক সময় লাগল। জাতীয় চরিত্র গঠন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক এসেছেন, সঙ্গে সেতার। সঙ্গী সাতজন বেজে চলেছেন লিডারের সুরে, পাঁচফোড়ন কাটছেন মনের সুখে। সমিতির রাজ্য সম্পাদক বলে চলেছেন, 'পেয়েছেনটা কী, শুধু ফুটবল, ফুটবল, ফ্যাবল। খেলা ছাড়া আর কিছু নেই দুনিয়ায়? সমাজতন্ত্র অতলে, দেশ রসাতলে, এত দুর্নীতি বহুতলে, আর আপনারা শুধু খেলা ছাপছেন। সংবাদপত্র জাতীয় চরিত্র গঠন করে, এটা ভুলে গেছেন? শহিদ-শহিদ মুখে এডিটর কোনওরকমে গলায় আওয়াজ আনলেন, মানে, আপনারা এখন অন্য কী খবর দিতে বলছেন? সেকেন্ড রো-তে মাঝখানের চেয়ারে লম্বা চুলের কমিটি মেম্বার। তার পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। গুনগুন গাইছিলেন এতক্ষণ, লারা লারা, বিশুদ্ধ লারা। এডিটরের প্রশ্নে ফেটে পড়লেন, 'লারা যে দু-দুটো ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করেও থামছে না, কালও কাউন্টিতে ওয়ান নাইনটিসেভেন করেছে, এটা পেজ ওয়ানে আনা যায় না? শুধু ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল, শুধু খেলা খেলা খেলা, এভাবে জাতীয় চরিত্র ঠিক থাকে? এডিটর নোট করছিলেন। আসলে দুর্বোধ্য হাতের লেখা প্র্যাকটিস করছিলেন। লিডার বললেন, আশা করব, কাল থেকে এই বাড়াবাড়ি আপনারা বন্ধ করবেন। এডিটর ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলার আগেই সামনের রো-র ডানদিকে প্রথম জন বললেন, 'ছিঃ। খেলা, খেলা, খেলা। আপনার মন নেই মশাই? ফুটবল ছাড়া আর কিছু নেই? এই যে উইম্বলডনে স্টেফি কাত, কুরিয়েরের আউট, এসব কেন পেজ সেভেনে মুখ লুকিয়ে? লোরি ম্যাকনিল কালো প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে শুইয়ে দিলেন গ্রাফকে, সেটা নিয়ে মাত্র দেড় প্যারাগ্রাফ? ছিঃ।'

নার্ভাস এডিটর প্যাডে পাইপ, ঠোঁটে কলম ঠেকিয়ে বললেন, আমি এতটা ভেবে দেখিনি। পেছনের রো-র দ্বিতীয়, প্যান্টে মাঠের কাদার ছিটে, বললেন, 'আপনি এডিটর,

আপনারা জার্নালিস্ট, কেনই বা কিছু ভেবে দেখতে যাবেন। কিন্তু তাই বলে ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ করে পাবলিককে ক্ষ্যাপাতে গিয়ে নিজেরাও ক্ষেপে যাবেন? এই যে আজ ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ম্যাচ হল, কোনও ব্যাপার নয়? বিদেশের ঠাকুরের চেয়ে স্বদেশের কুকুরও ভাল, বিদেশের ব্রাজিল-আর্জেন্টিনার চেয়ে স্বদেশের মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলও ভাল, এই বাণী প্রচার করার দায়িত্ব নেই আপনাদের?'

জাতীয় চরিত্র গঠন সমিতির রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিচলিত হলেন, আলোচনার দড়ি অন্যদের হাতে চলে যাচ্ছে। 'শুধু ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়ে থাকলে, কাগজের অফিস জ্বালিয়ে দেব। অ্যাট লিস্ট কয়েক কপি কাগজ জ্বালিয়ে দেব। খেলা, প্লেয়ারের ব্রতকথা শুনে পেট ভরবে জনসাধারণের? এক জিনিস বেশি দিলে ভাল হয় মানুষের! ধরুন, ওয়ার্ল্ড কাপে সব ম্যাচে যদি পঁচিশ গোল হত, গোলের দাম থাকত? যদি পঁচিশটা মারাদোনা হত, মারাদোনা-ম্যাজিক থাকত? ফুটবলের কথা বন্ধ করুন। অন্য কিছু দিন।'

এডিটর ফের মিনমিন করলেন, কী দেব? সামনের রো-র তৃতীয় বেশ ভরাট পলিটিক্যাল গলায় বললেন, 'এই ধরুন, গ্যাট....।' গলা চড়িয়ে থামিয়ে দিলেন রাজ্য সম্পাদক, 'ভ্যাট! আপনারা ক্রাইমের খবর দিন। রোজ ৫০০ ক্যালরি ক্রাইম আমাদের দরকার। দিচ্ছেন না।' এডিটর এবার বলার সাবজেক্ট পেলেন, 'এটা চেষ্টা করে যাচ্ছি, বিশ্বাস করুন। এই তো, পরশু দিন পুলিস কমিশনারকে, স্যরি, আমরা আবার নগরপাল বলি, বললাম, লালবাজার থেকে একটাও স্টোরি পাওয়া যাচ্ছে না কেন, আপনার গোটা টিম কি খেলা দেখছে আর ঘুমোচ্ছে? কিন্তু প্রবলেম অন্য জায়গায়। ক্রাইম হচ্ছে না। ক্রিমিনালরাও খেলা দেখছে আর ঘুমোচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ অন্য রকম, আপনাদের মতো চরিত্র-সংগঠক, খেলাটেলা দেখে না, কিন্তু চুরির আসল সময়ে যে বাড়ির লোক খেলা দেখছে। সবাই খেলা দেখলে অসুবিধা ছিল না। দিনে চুরি করা যেত। কিন্তু সবাই খেলা দেখছে না, কিছু লোক রাতেই ঘুমিয়ে দিনে জাগছে, বিশ্বাস করুন, কেউ কেউ অফিস-টফিসও করছে। কী আর করেন, কৃতী ক্রিমিনালরা হয় খেলা দেখছেন নয়ত আঙুল চুষছেন!'

ফার্স্ট রো-র বাঁদিক থেকে প্রতিবাদ এল, 'এসবই আপনাদের অজুহাত। আপনারা হাজির গোল নিয়ে পাতা ভরাচ্ছেন, হাজি মস্তানের ডেথ নিউজ হাফ কলমও নয়। খেলা খেলা, ফুটবল ফুটবল করে দেশটার বারোটা বাজাচ্ছেন। এই যে ভি পি-কে জনতা দলের দুটো ফ্র্যাকশনই চাইছে, নিজেদের মধ্যে এত গণ্ডগোল থাকলেও চাইছে, বাতিস্তুতা আর ক্যানিজিয়া যেমন নিজেদের লড়ালড়ি থাকলেও মারাদোনাকে মানছে, আপনারা ব্যাপারটাকে হাইলাইটই করলেন না।'

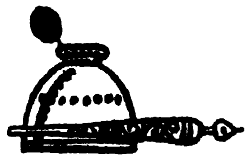
এডিটর মাথা নাড়লেন, হুঁ, এটা একটু আন্ডারপ্লে হয়েছে। বিহার-ইউ পি-র ওরা ফুটবল বোঝে না, তাই দলটল ভাঙার টাইম পাচ্ছে। এখানে কিছুই হচ্ছে না এখন। পলিটিক্যাল স্টোরি আমরা পেলেই দেব। রোজ খুঁজছি।

'ঘেচু খুঁজছেন।' সমিতির লিডার জল হয়ে পড়লেন কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলে, 'এত

বড় একটা খবর, আপনারা গুরুত্বই দিলেন না। বিধানসভায় জ্যোতিবাবুর সিটে বসে পড়লেন সত্য বাপুলি, অসীমবাবুর সিটে সুদীপ, ভেতরের পাতায় হার্ড নিউজ, ব্যস। নো ফলো আপ, নাথিং। উচিত কি ছিল না পরদিন পেজ ওয়ানে অ্যাঙ্কার বা অ্যাট লিস্ট পেজ ফোরে লাস্ট কলামে 'সত্য উপলব্ধি'? ওই সাতাশি সেকেণ্ড সত্যবাবু কীরকম রোমাঞ্চিত হয়েছেন, কী কী ঘোষণা করার ইচ্ছা জেগেছে তাঁর, জনগণকে জানানো উচিত ছিল না? তার বদলে আপনারা কী ছাপলেন, সাইড লাইনে বসে বাজ্জিও কী করছেন, তার বৃত্তান্ত। অসীমবাবুর সিটে বসে সুদীপবাবু কী বিকল্প নীতির কথা ভাবলেন, আমাদের জানাই হল না। তার বদলে, কী করলে কী হত, মাতুরানার যত ছাইপাঁশ।'

এবার সমিতির সাধারণ সম্পাদক উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর সপ্ত সঙ্গীও। এডিটরের হাতে কলম, সেই হাত মুখের একপাশে রাখা, অপরাধী ঢাকা-মুখের পোজ ফটোগ্রাফারদের দিচ্ছেন যেন। 'আপনারা আমার চোখ কিছুটা খুলে দিয়েছেন। কাল থেকে এত বেশি ভুল হবে না। কিন্তু এখনই চলে যাবেন না, প্লিজ। আমি আরও শুনতে চাই, জানতে চাই।' স্পেনের কাছে আয়ারল্যান্ডের গোল খাওয়ার পর জ্যাকি চার্লটনের মতো মুখ করে চেঁচালেন জাতীয় চরিত্র গঠন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক, 'নটা দশ বাজে, দশটা থেকে হল্যান্ড-বেলজিয়াম ম্যাচ, বসব মানে, ইয়ার্কি হচ্ছে?'

উৎসর্গ উৎসব



'কী করি, কোথায় যাই, কী লিখি' ভাবতে ভাবতে সারারাত ঘুমিয়ে সোমবার সকালে উঠে দেখি সুপুত্র সুখনিদ্রায়। মানেটা কী, স্কুলই গেল না? শুক্র-শনি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা দেখেছে ঠিক আছে, শনি-রবি ছুটি, ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ফের দেখার জন্য বুধবার স্কুলকামাই মানা যেতে পারে, তাই বলে কলম্বিয়া-সুইজারল্যান্ড ম্যাচও দেখতে হবে? ঠেলে ওঠালাম। সেই রোমহর্ষক ভাষাতেই কথা বললাম, যা তিন দশক আগে নানা ইস্যুতে পিতৃদেব ব্যবহার করতেন, তারও তিন দশক আগে তাঁর পিতৃদেব। নতুন জেনারেশন এত কনসিডারেট, কাঁচা ঘুম ভাঙানোয় বিরক্ত হল না। উঠে বাবু হয়ে বসে দু'হাত ছড়িয়ে বলল, 'আজকের স্কুলকামাই আমি ভালদেরামাকে উৎসর্গ করছি।'

আজকালকার ছেলেরা এত শার্প, শুধু স্টেটমেন্ট দেয় না, সঙ্গে কারণটাও রাখে, 'টিম ওয়ার্ল্ড কাপ থেকে আউট, দেশে ফিরলেই ব্যাপক ঝাড়, ওরকম চুল, তবু ঠাণ্ডা মাথায় খেলে গেল।'

নীরবে বললাম, থ্যাঙ্কিউ। মারাদোনার সঙ্গে কথা বলার এটাই সাবজেক্ট। মারাদোনা বাংলা জানেন না, আমি স্প্যানিশ জানি না, মারাদোনা ইংরেজি জানেন না, জানলেও আমার ইংরেজি বুঝতেন না, তবু নো প্রবলেম। মারাদোনার পাশে দোভাষী, আমার সঙ্গে আজকালের বহুভাষী, টেলিফোনে ইন্টারভিউটা দাঁড়িয়ে গেল।

• *এদিকে খুব কনফিউশন হচ্ছে। একটা খবর এই যে, রাশিয়া ম্যাচে জয় দুই মেয়েকে, গোলটা সমালোচকদের উৎসর্গ করেছেন। অন্য সূত্রের খবর, জয় উৎসর্গ সমালোচকদের, গোলটা দুই মেয়েকে।*

মারাদোনা : কনফিউশন আমারও আছে। দুটোকে আলাদা করতে পারছি না। এই জয় জরুরি ছিল, আমার দিক থেকে গোলটাও। সমান খুশি। আমি দুই মেয়েকে ভালবাসি। সমালোচকদেরও। দুই মেয়ে আর দু'হাজার সমালোচক, এরাই আমার অনুপ্রেরণার উৎস। কাকে যে কী দিই।

• *দ্বিতীয় জয় তো মা-কে উৎসর্গ করেছেন?*

মারাদোনা : এটায় কনফিউশন নেই। এই উৎসর্গটা অ্যানাউন্স করার আগে আমি স্ত্রী ক্লদিয়ার সঙ্গে কথা বলে নিয়েছি।

• ক্যামেরুন ম্যাচে হাফ টাইমে বেরনোর সময়ে যে চুমু ওড়ালেন, এটা নিশ্চয় সমর্থকদের জন্য। আপনি এত উৎসর্গ করে যাচ্ছেন কেন?

মারাদোনা : আমাকে এখন প্রচুর উৎসর্গ খরচ করতে হবে। বাতিস্তুতা আর ক্যানিজিয়া ওদের সাফল্য আমাকে উৎসর্গ করেছে। পাঁচ-পাঁচটা ওয়ার্ল্ড কাপ গোলের উৎসর্গ হজম করা সোজা ব্যাপার নয়। মনে হচ্ছে, আরও উৎসর্গ আসবে। তাই চুমুও উৎসর্গ। হাঁটুতে ওলিসের লাথিটাও উৎসর্গ করছি, শুনে খুশি হবেন, আপনাদেরই একজনকে।

• অ্যাঁ?

মারাদোনা : হ্যাঁ। আপনাদের দেশের ঐ রিপোর্টারকে, যিনি ধরে ফেলেছেন যে আমি প্লে অ্যাকটিং করছি। রেফারি বোঝেননি, বারবার রিপ্লে দেখে টিভি দর্শকরা বোঝেননি, আমি নিজেও বুঝিনি, উনি বুঝেছেন। ওলিসেরা আমার পায়ে আদর করছিল, মালিশ করছিল, আমি পড়ে যাচ্ছিলাম। এমন নিখুঁত অভিনয় যে আমার যন্ত্রণাও হচ্ছিল, এখনও আছে। এভাবে ধরা পড়েও আনন্দ। আমি মার খাওয়ার আনন্দ উৎসর্গ করছি।

• এই দুর্দান্ত ফিরে আসাটা কি আপনি স্ত্রীকেই উৎসর্গ করছেন?

মারাদোনা : না। আসলে আমার উৎসর্গ ফাইলটা ও-ই দেখছে। লোক খুঁজছে, আর কাকে কাকে উৎসর্গ করা যায়। ফিরে আসাটা আমি ইংল্যান্ডের সাংবাদিকদের উৎসর্গ করতে চেয়েছিলাম, কারণ ওরা এখনও বলে যে আমি শুধু হাত দিয়েই গোল করতে পারি। কিন্তু, এই বড় মাপের উৎসর্গটা আমি পেলেকে করতে চাই। পেলে চিরকালই আমাকে ইনস্পায়ার করেছেন। এবারও, যখন আমি আশাই করিনি, নিজের থেকে বাড়িয়ে দিয়েছেন সাহায্যের হাত। ওয়ার্ল্ড কাপ শুরুর আগে বলেছেন, আমি কিছুই করতে পারব না। আহা, পেলে আরও বলুন। তবে, পেলে এরকম আরও অনেক ভাল ভাল উৎসর্গ পাবেন। আপনি রোমারিওর সঙ্গে কথা বলতে পারেন।

মারাদোনার ভদ্রতার তুলনা নেই, ক্লদিয়ার নোটবুক থেকে রোমারিওর টেলিফোন নম্বরটাও দিলেন। রোমারিও ঘুমোচ্ছিলেন। ওয়ার্ল্ড সকারের গত নভেম্বর ইস্যুতে রোমারিওর কাছে প্রশ্ন ছিল, সবচেয়ে পছন্দের জিনিস কী আপনার? রোমারিও বলেন, 'গোল আর ঘুম।' তবে, গোল সব সময় হয় না, ঘুমও না। ঘণ্টা তিনেক পরে ফোন করে পাওয়া গেল। বললেন, 'রাশিয়া ম্যাচে গোলটা উৎসর্গ করেছি বাবাকে, ক্যামেরুনেরটা লিওনার্দোর নবজাত সন্তানকে। পেলেকে বড়সড় কিছু দিতে চাই। আমাকে ছোট করতে চান বলে পেলের ওপর আমার রাগ নেই। পেলে এত বড় যে সবাইকেই ছোট করার অধিকার আছে ওঁর। এবার আমরা চ্যাম্পিয়ন হতে পারি। পেলে যে তিনটে টিমকে চ্যাম্পিয়ন বলেছিলেন, তার মধ্যে একটা খসে গেছে, বাকি দুটোর মধ্যে আমরাও টিকে আছি। ভয়টা এখানেই। উৎসর্গ একটা বড় ব্যাপার। আমি গোটা টিমের হয়ে কথা দিচ্ছি, ওয়ার্ল্ড কাপ জেতাটাই পেলেকে উৎসর্গ করব। শুধু একটা শর্ত, উনি এখনই বলুন, ব্রাজিল পারবে না। পেলে আমাদেরও চান্স আছে বলায় টিমের মনোবল যে কীরকম

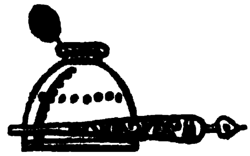
ভেঙে পড়েছে, না দেখলে বিশ্বাস করবেন না।'

মারাদোনা, রোমারিওর টেলিফোন-ইন্টারভিউ করার পর মনে হল, লোকাল টাচটাও দরকার। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের গোলটা কাকে উৎসর্গ করলেন? মনোহরণ বললেন, 'এ আই এফ এফ কর্তাদের। ইন্টারস্টেট ট্রান্সফার নিয়ে গণ্ডগোল পাকিয়ে ওঁরা আমাকে দেবেন না বলেছিলেন। খেলতেই পারব না যখন, এবার প্র্যাকটিস বেশি করিনি। আমি প্র্যাকটিস না করলেই ভাল খেলি।' জো পল আনচেরি গোল উৎসর্গ করলেন একজন ফুটবলারকেই। 'আমাকে কলকাতায় এনেছে বিজয়নদা। মোহনবাগান অফিসিয়ালরা আমাকে নিয়ে বেশি হইচই করতে থাকায় বিজয়নদা চটে যায়, দেশে চলে যায়। দাদা ছাড়াই আমি পারি, এটা বোঝানোর জন্য লড়ে গেলাম। গোল পেলাম। ওকেই দিলাম। উৎসর্গ।'

আবার আমেরিকায় টেলিফোন করলাম। সেই মারাদোনা-খ্যাত সাংবাদিককে। এই যে আপনি পাবলিককে সুশিক্ষিত করার অক্লান্ত চেষ্টা চালাচ্ছেন, মারাদোনাকে ড্রাগ-অ্যাডিক্ট, ম্যান-চাইল্ড, 'শিশির ভাদুড়ি' ইত্যাদি বলে তুমুল পপুলার হচ্ছেন, এই পপুলারিটি কাকে উৎসর্গ করছেন? সাংবাদিকের গলা গমগম করল, 'সুনীল গাভাসকার!' কেন? 'মূল সূত্রটা আপনারা এখনও ধরতে পারেননি। যে খুব ওপরে উঠবে, যে আর সবাইকে ছাড়িয়ে যাবে, তার গায়ে না হোক, পোশাকে কালি ছেটানোই হচ্ছে সর্বোচ্চ সাংবাদিকতা। আমরা গাভাসকারকে কালি, কাদায় ডোবাতে চেয়ে ইতিহাস তৈরি করেছি। তারপর গাভাসকার ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড ভেঙেছেন, আরও অনেক কিছু। আমাদের অক্ষয় কীর্তির স্মৃতি হিসেবে গাভাসকার এখনও জ্বলজ্বল করছেন। সেই স্মৃতিই আমার অনুপ্রেরণা, মারাদোনাকে ছোট করার। এই কর্তব্য থেকে কখনই বিচ্যুত হব না। ভবিষ্যতে যদি বেবেতো মেগাস্টার হয়, তাকেও এরকমই করব। এবং সেই কাদাছেটানো উৎসর্গ করব মারাদোনাকে।'

ওয়ার্ল্ড কাপ ঘিরে ব্যাপার যখন, আমাদের ক্যাপ্টেনকে ফোন করতেই হয়। গভীর রাত, গভীরতর গলায় ক্যাপ্টেন বললেন, 'আমাদের আমেরিকা সফর আমি উৎসর্গ করছি গ্রামবাংলার সেই নগ্নপদ ফুটবলারদের, যাঁরা একটা অ্যাঙ্কলেট পেলেই খুশি। উৎসর্গ করছি বাঁকুড়ার লড়াকু স্কুল-ফুটবলার রঘুনাথ সোরেনকে, যে শাল পাতা কুড়িয়ে বিড়ি বেঁধে নিজের পেট চালানোর চেষ্টা করে। জনসাধারণের টাকায় আমাদের এই বিশ্বকাপ ভ্রমণ আমি উৎসর্গ করছি সেই হাজার হাজার কিশোরকে, খালি পেটে যারা স্বপ্ন দেখছে ফুটবলার হওয়ার। কুড়ি লক্ষ টাকার সফর উৎসর্গ করছি বাটার সহদেব দাসকে, মাঠে ন্যূনতম চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই বলে যাকে জীবন দিতে হল। উৎসর্গ করছি সেই অগণিত গুণগ্রাহীদের, যারা আমাকে ভালবেসে চুনী গোস্বামী করেছে এই আশায় যে, একদিন সরকারি ক্ষীর খেয়ে জিভ চাটতে চাটতে আমি ওয়ার্ল্ড কাপে যাব, বেড়াতে, বারবার।'

গো ও ও ও ও ও ও ল



রেডিও-টিভি কর্তার কাছে যেতেই হল। দেশের স্পোর্টস ব্রডকাস্টে স্মরণীয় অবদানের জন্য ইনি অদূর ভবিষ্যতেই পদ্মভূষিত হবেন বলে খবর। কখনও আকাশবাণী, কখনও দূরদর্শনে তিনি রেখেছেন প্রতিভার প্রবল ছাপ। ফোনের পর ফোন আসছিল আজকাল অফিসে, রামাশ্যামার ইন্টারভিউ আর খবর হচ্ছে, রেডিও-টিভির দিকটা বাদ ? রীতিমত অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে গিয়েও অপেক্ষা করতে হল পাক্কা দেড় ঘণ্টা। এই নব্বই মিনিটে একুশজনের আবেদন শুনলেন ভদ্রলোক, তিনি রেডিও-টিভির বড় কর্তাদের কারও বাঁ কারও ডান হাত, একুশজনই ভাষ্যকার হতে চায়। কারও জোর গলার আওয়াজে, কারও খেলার অভিজ্ঞতা, কারও বিশুদ্ধ মামায়। রেডিও-টিভি কর্তা বললেন, রোজই এইরকম। আজ তো একুশ, কোনও কোনও দিন একশ এগার হয়।

• আপনি তো এ লাইনে এক নম্বর এক্সপার্ট, ওয়ার্ল্ড কাপের টিভি ব্রড়কাস্ট কেমন হচ্ছে বলুন।

রেঃ টেঃ কঃ : ভাল হচ্ছে, কারণ ওরা মোটামুটি আমাদের ফলো করছে। দু-একটা ক্যামেরাতেই কাজ চালাচ্ছে, ইতালি ওয়ার্ল্ড কাপের মতো সাতটা অ্যাঙ্গেল দেখিয়ে ব্যাপারটা জটিল করে দিচ্ছে না। তার চেয়েও বড় কথা, একটু আবছা ছবি দেখাচ্ছে বেশির ভাগ সময়। বেশ রোমান্টিক ব্যাপার। একটু কল্পনায় দেখার হাতছানি। ঠিক দূরদর্শনের মতো।

• অনেকে কিন্তু অসন্তুষ্ট, মাঝে মাঝেই বল হারিয়ে ফেলছে ক্যামেরা, কখনও কখনও মনে হচ্ছে খেলা দূরে, স্টেডিয়ামের বাইরে কোথাও। জটলায় ডিটেইলসও পাওয়া যাচ্ছে না।

রেঃ টেঃ কঃ : ওদের অসুবিধেটাও বোঝার চেষ্টা করুন। জটলা মানে তো গ্রাউন্ডে। লক্ষ্য করবেন, উঁচু বল ভাল দেখাচ্ছে ওরা। নিশ্চয় মেইনলি আমেরিকার টেকনিসিয়ানরাই কাজ করছে। বাস্কেটবল, বেসবলের অনেকটাই ওপরে ওপরে। ওরা ওপর-স্পেশালিস্ট। নিচটা ধরতে পারছে না। তাছাড়া স্কাইস্ক্র্যাপার দেখার অভ্যেস। মাঠ দূরে দেখাচ্ছে, ভাবছে, কাছে থেকে বেশি বেশি দেখালে এই অদ্ভুত খেলাটা আমেরিকান টেলি-দর্শকরা দেখতেই

চাইবে না।

• কিন্তু প্রচণ্ড সমালোচনা হচ্ছে এখানে।

রেঃ টেঃ কঃ : সমালোচনা ভাল মনে রিঅ্যাক্ট করার ক্ষমতা সবার থাকে না। স্পোর্টসম্যান স্পিরিট দেখুন আমাদের। প্রথম দিকে হকি প্লেয়ার কুক্কু ওয়ালিয়াকে এক্সপার্ট হিসেবে আনায়, সমালোচনা হল। আমরা ব্যবস্থা নিলাম। হকি কেন, কোনও প্লেয়ারই আর রাখলাম না। বিখ্যাত প্রাক্তন নিউজ রিডারকে আনলাম। অবশ্য, উনিও ফুটবলার। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় অন্য সেকশনের সঙ্গে ম্যাচে ওঁর গায়ে লেগে একটা গোল হয়েছিল। আমাদের কায়দাটা দেখেছেন? ব্যাকগ্রাউন্ডে মাঠ, সামনে দুজনের কাটআউট। দুজনে মুখোমুখি, গভীর সুখে সুখী। ওঁরা নিজেরাই কথা বলছেন। আপনারা বুঝতে পারছেন না। বুঝলে মুশকিল, তাই এই কায়দা।

• এমনিতে ওয়ার্ল্ড কাপের টিভি কমেন্ট্রি ভাল হচ্ছে?

রেঃ টেঃ কঃ : হচ্ছে, তবে ওরা এখনও কয়েকটা ব্যাপারে ভীষণ পিছিয়ে আছে। বাংলার মতো ইংরেজিও একটা নামকরা ভাষা। কিন্তু ওদের কোনও বিশেষ উদ্যোগ নেই। যে সব বাংলা আমরা এখন বলায়, এমনকি লেখাতেও আনি না, সেই সব শব্দ ব্যবহার করা হয় এখানে, যাতে শব্দগুলো হারিয়ে না যায়, বাচ্চারা যাতে জিজ্ঞেস করতে পারে, মানে কী বাবা? শ্লথ, পার্শ্বরেখা, গতিমন্থরতা। বাচ্চাদের কথা এখানে অন্যভাবেও ভাবা হয়। মোনবাগান, ইসবেঙ্গল, কিসানু, অমিত ভদ্যো, পেতাপ— এ সব উচ্চারণ পাবেন। একইভাবে ওরা জাম্মানি, জুগ্লাভিয়া, রাইকাদ, অ্যাসপিয়া— এরকম বললে পারত। তাতে বাচ্চারা অনেক ইনভলভড হয় কমেন্ট্রির সঙ্গে।

• আপনারা এই সাজেশনগুলো লিখে পাঠাচ্ছেন না কেন?

রেঃ টেঃ কঃ : পাঠাব, পরে। মাঝপথে ডিস্টার্ব করলে যা পারছে তা-ও পারবে না। সবচেয়ে বড় ফাঁক হচ্ছে হাফ টাইমে। এখানে হাফ টাইম মানেই রেডিও আর টিভি টপ ফর্মে। ওরা ফাঁকা রেখে পালাচ্ছে। যেন সবারই হাফ টাইম। এখানকার যে কোনও একটা বড়সড় ম্যাচের কথা ভাবুন। ওরাও সেরকম করলে, কী দাঁড়াত ভাবুন। আপনি বাথরুম যেতে পারতেন না, গভীর রাতে সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করতে পারতেন না, চোখ বুজে ফার্স্ট হাফের কোনও মুভ ভাবতে পারতেন না। টিভি আর রেডিওয় এ ব্যাপারে আমরা ওয়ার্ল্ডের নাম্বার ওয়ান। ধরুন, আর্জেন্টিনা-গ্রিস ম্যাচ। ধরুন, দুজন কমেন্টেটরের নাম জ্যাক আর বিল। কীরকম জমে যেতে পারত হাফ টাইম—

জ্যাক : বাতিস্তুতা ছেলেটা কিন্তু বেশ খেলে। তোমার কী মনে হয়, বিল?

বিল : আপনি ঠিকই বলেছেন জ্যাকদা। আপনি ছাব্বিশ বছর কমেন্ট্রি করছেন, আপনার চোখে তো পড়বেই। জ্যাকদা, আর-একটা জিনিস দেখছেন, ক্যানিজিয়া আর আগের ক্যানিজিয়া নেই। দুটো চান্স কীভাবে মিস করল।

জ্যাক : তুমি ঠিক বলেছ বিল। তুমি ইংল্যান্ডে থার্ড ডিভিশন লিগে দেড়বার টপ স্কোরার, তোমার চোখে তো এটা পড়বেই। বিল, তোমার কী মনে হয়, তবু কেন বাসিলে

ক্যানিজিয়াকে খেলাচ্ছেন?

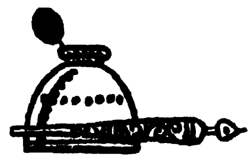
বিল : জ্যাকদা, আমার মনে হয় প্রতিপক্ষ দলের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ রাখার জন্য। মারাদোনাকেই দেখুন। পঁয়তাল্লিশ মিনিটে একবারও বোঝা গেল না, কেন ওকে খেলানো হচ্ছে। গতিমন্থরতায় ভুগছেন উনি, যখন গোটা টিম আগুয়ান, উনি পিছুয়ান, তবু খেলাচ্ছে। এই মনস্তাত্ত্বিক চাপের ব্যাপারটা অবশ্য আপনি বেশি বুঝবেন, আপনার মেয়ে তো সাইকোলজি নিয়ে এম এসসি পড়ে।

এরপর মারাদোনা গোল করলেই বিলবাবু বলবেন, আমি আগেই বলেছিলাম, মারাদোনাকে আটকানো অসম্ভব। আসলে, দর্শকদের কাছে টেনে নিতে হবে। যা মনে আসে তাই বলতে হবে। এমনভাবে ভাষ্য দিতে হবে, যেন সন্ধেয় পাড়ার রকে বা গরমকালে রাতে ছাদে আড্ডা দিচ্ছেন।

• আপনি সময় পাবেন কিনা কে জানে, এই ইন্টারভিউটা ট্রানস্লেট করিয়ে আমি ওদের কাছে পাঠিয়ে দেব। এতখানি সময় দেবার জন্য ধন্যবাদ।

রেঃ টেঃ কঃ : ধন্যবাদ অ্যাকসেপ্টেড। কিন্তু আরও একটু আছে। ফুটবলের আসল জিনিস হল গোল। গোল হচ্ছে নুন, গোল ছাড়া ফুটবলের সেরা রান্নাও টেস্টলেস। এই 'গোল'-টাই ঠিক করে বলতে শিখল না ওরা। যদি খেলা দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ে কেউ, যা আমাদের এখানে প্রায়ই ঘটে, ঐ 'গোল' আওয়াজেই ঘুম ভেঙে যাবে। গোল তো একশ-দেড়শ হচ্ছে না, তাহলে আওয়াজে এত কিপটেমি কেন! কত কাঠখড় পুড়িয়ে একটা গোল, ওরা স্রেফ বলে দিচ্ছে— গোওল। আরে, 'গো' আর 'ল'-এর মাঝে কি একটা 'ও'? অনেকক্ষণ 'গোল' বলতে হবে, অন্তত ততক্ষণ ধরে, যতক্ষণ সময় ফাইনাল মুভটা হতে লেগেছে। সবচেয়ে খারাপ লাগে কী জানেন, ওদের 'গোল' বলায় কোনও পার্সোনাল টাচ নেই। ব্যক্তিগত পছন্দ, আনন্দ, বেদনা, আবেগ নেই ওদের 'গোল' উচ্চারণে। বিচ্ছিরি। তাছাড়া, কী আনসায়েন্টিফিক, ঝপ করে বলে দেয় 'গোল', গোল বলতে সার্কেল কমপ্লিট করতে হবে না? যেন সার্কেল আঁকছেন, এইভাবে বলতে হবে না— গো ও ও ও ও ও ও ল?

ওঁরাই খেলেন



যতক্ষণ খাঁচায় ততক্ষণ চেঁচায়। তার বাইরেই ফিউজ। এরকম কোনও বাঘ দেখেছেন? আমরা দেখেছি। রোজ দেখি। নিজের প্রশস্ত খাঁচাঘরে গতকাল চলছিল এডিটরের টেলি-ধমক। ওদিকে, ১৬ হাজার মাইল দূরে দেবাশিস দত্ত। 'ফাজলামি করতে ডেট্রয়েটে বসে আছ?... আর অ্যাঁ অ্যাঁ করতে হবে না, ব্রাজিল টিমের এত বড় একটা স্কুপ এজেন্সি এ এফ পি করে দিল, তুমি ট্যাঁড়স ভাজছিলে?' রিসিভার ডান থেকে বাঁ কানে নিয়ে সুমন চট্টোপাধ্যায়কে : 'ব্রাজিলের এক্স-প্লেয়ার জুনিয়র টিমের স্পাই হয়ে সুইডেন ক্যাম্পে গেল, এই ছবিটা তুলে পাঠাতে পারলে না? অপদার্থ। যাও, বসে বসে ঐ মারাদোনা-ক্লদিয়া, বর-বউয়ের ছবি তোলো।' ল্যাঙ্গুয়েজ উত্তরোত্তর খারাপ এবং পছন্দের লোকেদের জন্যই যখন আজ এরকম, আমার ঘরে থাকার মানে হয় না। স্যুইংডোর ঠেলে বেরনোর মুখে ব্যাঘ্রগম্ভীর আওয়াজ, দাঁড়ান! সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আমি সালকিয়া ফ্রেন্ডসের গোলকিপার, দাঁড়িয়ে আছি অকুতোভয়, পেনাল্টি নিচ্ছেন বাতিস্তুতা। 'জুনিয়রের স্পায়িংয়ের খবরটা তো এজেন্সি করে দিল। আপনি কিছু করতে পারেন?' বললাম, 'জুনিয়ররা ফেল করলে আমাকে তো কিছু করতেই হবে। একটা দিন সময় দিন। খবরটা এজেন্সি করলেও, ফলোআপ আমিই করব।' ডুবতে ডুবতে খড়কুটো ধরে এডিটর বললেন, দেখুন।

দেখাদেখির কিছু নেই। ব্রাজিলের কোচকে ধরতে হবে। জুনিয়রকে স্পাই করে পাঠানো কেন, ধরা পড়ার কারণ কী, এবার কী করবেন। 'পেরেরা বললেন পেরেরা হোটেলে নেই' শুনতে হল মাত্র তিনবার। ইন্টার মিলান থেকে বলছি শুনে শেষ পর্যন্ত ধরলেন। ভাল চাকরি কে না চায়। 'মাপ করবেন। আমার বেশি প্রশ্ন নেই। ইন্টারভিউটা ভাল হলে আপনি বেঙ্গলে, বেঙ্গল কী নিশ্চয় জানেন, রোমারিওর চেয়েও ফেমাস হয়ে যাবেন।'

• জুনিয়রের মতো পরিচিত এক্স-প্লেয়ারকে স্পাই হিসেবে সুইডেন ক্যাম্পে পাঠালেন কেন? কী করে ধরা পড়লেন জুনিয়র? এবার কী করবেন?

কার্লোস আলবার্তো পেরেরা : আপনি তো দেখছি ব্রাজিলের জার্নালিস্টদের চেয়েও

মাথামোটা। সুইডেনের খবর নিয়ে আমি কী করব? গ্রুপের লাস্ট ম্যাচটা জেতার কী দরকার, আমরা তো সেকেন্ড স্টেজে উঠেই গেছি। আসলে সুইডেন ম্যাচটা আমি হারতে চেয়েছিলাম। রোনাল্ডোকে খেলানোর সুযোগ খুঁজছি, টিম হারলেই রোমারিও-বেবেতোর মধ্যে একজনকে বসানোর তৃপ্তি পেতাম। হেরে গিয়ে আর্জেন্টিনা-জার্মানিকে বোঝাতাম, আমাদের টিম তেমন ভাল নয়। রোমারিও গণ্ডগোল করে দিল। জুনিয়রকে এমনি পাঠিয়েছিলাম। ওটা একটা ট্যাকটিক্স।

• জুনিয়র তো এক্সপোজড, এবার কাকে পাঠাবেন?

কাঃ আঃ পেঃ : সিনিয়র কাউকে। কিছুতেই পেলেকে নয়, ও আমাদের খবর অপোনেন্ট টিমকে দিয়ে আসবে। টোস্টাওয়ের কথা ভেবেছি, নামটা আবার ছেপে দেবেন না। টোস্টাও লাল ফর্সা, পুরো সাহেব, ওকে জার্মান ক্যাম্পে পাঠাব। প্লেয়ারদের খবর, খেলার ধরন আমি চাই না। আসল ব্যাপার হল কোচ। ফোগটস কী ভাবছে, ঘণ্টায় ক'টা সিগারেট খাচ্ছে, কত ডজন কাগজ ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে ফেলছে, ডানের চেয়ে বাঁ কান বেশি চুলকোচ্ছে কিনা, ডিটেইলস দরকার। অবশ্য, টোস্টাওকেও ধরা পড়তে হবে।

• এই রে। তাহলে কী হবে?

কাঃ আঃ পেঃ : কিছুই হবে না। ট্যাকটিক্স, ট্যাকটিক্স। এর পর আর্জেন্টিনা ক্যাম্পে পাঠাব, না না, জিকো নয়, আর্জেন্টিনারই একজন এক্স-প্লেয়ারকে। ওদের লোক, আমাদের স্পাই। ফাটাফাটি ব্যাপার। কিন্তু সে-ও ধরা পড়ে যাবে।

• ইস্!

কাঃ আঃ পেঃ : ফোনে-কানে ইসফিস করবে না তো! আরে, ধরা পড়ার জন্যই তো পাঠানো। এই স্পায়িং নিয়ে হইচই হবে, অন্য সব টিমের কনসেনট্রেশন নষ্ট হবে, ওরাও স্পাইটাই খুঁজবে, কে স্পাইয়ের পোস্ট পাবে এই নিয়ে ওদের মধ্যে গণ্ডগোল হবে, মাঝ থেকে আমি শুধু ঠাণ্ডা মাথায় ছক কষব। স্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিক্স।

• ভেতরে ভেতরে এত?

কাঃ আঃ পেঃ : ইয়েস। আপনার মতো হাবা প্রচুর আছে যারা এখনও ভাবে যে ফুটবলের আসল ব্যাপার হল শুটিং, পাসিং, হেডিং, ট্যাকলিং, ট্র্যাপিং, ড্রিবলিং। ফুঃ। আসল ব্যাপার হল স্ট্র্যাটেজি, ট্যাকটিক্স, আসল ব্যাপার হল কাগজ-কলম, চক-ব্ল্যাকবোর্ড, ভোকাল কর্ড। হাবারা মারাদোনা-ক্লিন্সম্যান-বেবেতোদের নিয়ে নাচে, বোঝে না আসল লোক হল বাসিলে, ফোগটস, ইয়ে... আমি।

• তাহলে, জুনিয়রের গোটা ব্যাপারটাই ফালতু, সিরিয়াস কিছু নয়?

কাঃ আঃ পেঃ : বললাম যে, ট্যাকটিক্স। স্পাই নিয়ে হইচই হবে, আমি আসল কাজ করব। ফুটবলের ইতিহাসে এটা 'জুনিয়রট্রিক' নামে বিখ্যাত হবে। এর পর থেকে বাইশজনের ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড সব বেশ করবে এইভাবে : গোলকিপার- ৩, ডিফেন্ডার- ৬, মিডফিল্ডার- ৬, স্ট্রাইকার- ৪, স্পাই- ৩।

• আপনি তাহলে একটা নতুন জিনিস দিয়ে গেলেন।

কাঃ আঃ পেঃ : আরও দিতাম। চান্স পেলাম না। নর্মালি টিমের নাম্বার টেন হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার ওয়ান প্লেয়ারকে বসাতে পারলেই আপনি নাম্বার ওয়ান কোচ। ভেরি সিম্পল। যত বড় প্লেয়ারকে বসাতে পারবেন, আপনি তত বড় কোচ। আমার আগেই করে ফেলল সাকি। বাজ্জিওকে বসাল। ম্যাচটা কোনওরকমে জিতল, হাততালি পেল। হারলে, পিঠের চামড়া উঠত। ইতিহাসে নাম তুলতে গেলে এরকম রিস্ক অবশ্য নিতেই হয়। লক্ষ্য করুন, বাসিলে ফার্স্ট ম্যাচে মারাদোনাকে, ফোগটস থার্ড ম্যাচে ম্যাথাউসকে তুলে নিয়েছে। আমিও রাইকে তুললাম। কিন্তু আগে সাকি করে ফেলল, ব্যাড লাক।

• আপনার কি কোনও উপদেশ আছে, তরুণ কোচেদের প্রতি?

কাঃ আঃ পেঃ : অনেক। তার মধ্যে একটা হল, যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকবে। প্লেয়াররা তোমাকে চিট বলতে পারে, দালাল ভাবতে পারে, তেমন পরিস্থিতি এলে দু-চারটে চড়থাপ্পড়ও মারতে পারে। হজম কর। বড় কোচ হও।

• সুপারস্টাররা কি কোচেদের একদম পাত্তা দেয় না?

কাঃ আঃ পেঃ : তা কেন হবে। বাজ্জিও রেগে গিয়ে সাকিকে অ্যাটাক করে স্টেটমেন্ট দিয়েছে। কিন্তু কোচের পার্সোনালিটি থাকলে অন্যরকম হবে। আমেরিকায় আসার আগে একটা ফ্রেন্ডলিম্যাচে আমি রাইকে বসিয়েছিলাম। পরদিন দুপুরে যখন ওর পায়ে গরম তেল মাখাতে গেলাম, ও তো আমাকে লাথি মারেনি। উল্টে, আধ ঘণ্টা শান্ত হয়ে শুয়ে থেকেছে, যাতে আমি যতক্ষণ ইচ্ছা ওর পায়ে তেলমালিশ করতে পারি। এটা তো বলাই বাহুল্য যে, পার্সোনালিটি থাকতে হবে কোচের।

• এবার যদি ব্রাজিল চ্যাম্পিয়ন হয়, আপনি এত ওপরে উঠে যাবেন যে, আর ফোনেও পাব না। এখনই জিজ্ঞেস করে নিচ্ছি, আপনি এর পর রিটায়ার করবেন?

কাঃ আঃ পেঃ : রিটায়ার করাটা কোনও বড় কথা নয়। এর আগেও আমি তিনবার করেছি। তবে, ফোর্থবার রিটায়ার করে ফিরে আসার আগে আমি ইয়ং কোচেদের ট্রেনিং দিতে চাই। কোচেস ট্রেনিং, আমার ভাবলে দুঃখ হয়, ওরা আসল ট্রেনিংটাই পায় না। হারার পর বলতে হবে, কেন হারলাম। এটা কষ্ট করে শিখতে হবে। কোচিংয়ের আসল ব্যাপার হল, স্ট্র্যাটেজি আর ট্যাকটিক্সের পরেই— স্কেপগোটিং। কিছু গোট ধরতে হবে, তাদের ঘাড়ে কোপ মারতে হবে। প্রথমে রেফারি, না পারলে প্লেয়ার, না হলে অফিসিয়াল— কীভাবে কখন কতখানি দোষ কার ঘাড়ে চাপাতে হবে, এটা একই সঙ্গে সায়েন্স আর আর্ট।

• যদি কোনও স্কেপ-গোট না পান?

কাঃ আঃ পেঃ : গুড কোয়েশ্চেন। এরকম পরিস্থিতিতে একটাই রাস্তা। এবং সিওর সাকসেস। বলতে হবে, ব্যর্থতার সব দায় আমার। প্লেয়াররা খুশি হবে, অফিসিয়ালরা খুশি হবে, ফের কোচ হওয়ার চান্স থাকবে। সবচেয়ে বড় কথা, পাবলিক ভাববে, কী মহৎ কী মহৎ, প্লেয়ারদের দোষ চেপে আপনি মরে মহৎ হওয়া সহজ, কিন্তু এই পদ্ধতিতে আপনি বেঁচেও মহৎ।

গুডবাই

প্রমাণিত হল যে, বাবুরাম সাপুড়েরও পাঠক আছে। তিন-তিনজন ফোন করেছেন আজকাল দপ্তরে, কেন উধাও, বাবুরাম সাপুড়ের ব্লাডে কি এফিড্রিন পাওয়া গেছে? এডিটর বললেন, দয়া করে পুনরাবির্ভূত হোন, না-হলে লোকে আঙুল তুলে বলবে চক্রান্ত!

প্রমাণিত অবশ্য আরও অনেক কিছুই। প্রমাণিত হল যে চমকপ্রদ ডজ, বৈচিত্র্যময় ড্রিবল, নিখুঁত পাস, স্যুইং-ধরানো শট, অকল্পনীয় ফ্রি-কিক— এ সবই সম্ভব যদি আপনি এমন সর্দির ওষুধ নেন, যাতে কিঞ্চিৎ এফিড্রিন আছে। দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা নামে একজন বোকাসোকা লোক যদি আদর্শ নেতৃত্ব দিয়ে জাতীয় দলকে পর পর তিনবার ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে এনে ফেলতে যায়, এরকম অবিশ্বাস্য নেতৃত্বের জন্ম যে শুধুমাত্র ড্রাগই দিতে পারে তা তো বলতেই হবে। যদি দেশের বাইরে, ভয়ঙ্কর লড়াই-ঘেরা ইতালির লিগে দ্বিতীয় সারির একটি দল দু-দুবার করে দেন চ্যাম্পিয়ন, সন্দেহের আর জায়গা কোথায় যে এর পেছনে ড্রাগ ছাড়া আর কিছুই নেই? পনের বছর বয়সেই যে ফুটবল-দুনিয়ায় বিস্ময়, ড্রাগ ছাড়া আর কী থাকতে পারে তাঁর?

প্রমাণিত হল যে, সাসপেন্ড হয়ে খবর হওয়ার জন্য জেনেশুনে বিষ পান করেছেন মারাদোনা। আর্জেন্টিনা-নাইজেরিয়া ম্যাচের আগে পর্যন্ত একশ সতের জনের ডোপ টেস্ট হয়েছে, হয়েই চলবে, জানতেন সব দলের ফুটবলার। ড্রাগ নেওয়ার অপরাধে ১৫ মাস সাসপেন্ড-হওয়া মারাদোনা তবু নিয়েছেন এমন ওষুধ, যাতে কাজ তেমন হয় না, কিন্তু সাসপেন্ড হওয়া যায়। দুই বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন ড্রাগ-বিশেষজ্ঞ গ্যারি ওয়াডলার ও ব্রায়ান হেনলাইন বলছেন, এফিড্রিনে একজন ক্রীড়াবিদের কোনও সুবিধাই হয় না। অলিম্পিক মেডিকেল কমিশনের সহ-সভাপতি ডাঃ জ্যাকিস রোজ মন্তব্য করেছেন, দক্ষতা বা পরিশ্রমের স্তর বাড়ানোর জন্য কেউ ওই ড্রাগ নেয় না। মারাদোনার মতো শিল্পীর এ সবের দরকারও হয় না। ব্রাজিল দলের প্রধান চিকিৎসক লিডিও টোলেডো বলছেন, কিছুতেই ডোপ নয়, ওষুধটা দিয়েগো খেয়েছিল সর্দির সমস্যাতেই। বেকেনবাওয়ার বলছেন, এ সব ড্রাগে একজন ফুটবলার কোনও বাড়তি সুবিধা পেতে পারে না। খোদ

ইংল্যান্ডের নক্ষত্র গ্যারি লিনেকারের মন্তব্য, এফিড্রিন নিয়ে বাতিল? গোটা ব্যাপারটাই রহস্যময়। অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন দৌড়বীর লিনফোর্ড ক্রিস্টি লন্ডনে বলছেন, এফিড্রিনে কিছুই হয় না। সিওল অলিম্পিকের সময় আমি খেয়েছিলাম, টেস্টে ওরা এফিড্রিন পেয়েও ছিল। বলেছিলাম, অসুখের জন্য খেয়েছি। অলিম্পিক কমিটি ছেড়ে দিয়েছিল। তবু, প্রমাণিত হল যে গ্রিস ম্যাচে দুর্ধর্ষ গোল এবং নাইজেরিয়া ম্যাচে অনবদ্য পারফরমেন্স ওই এফিড্রিনেরই জোরে। এবং যদিও স্বয়ং হ্যাভেলাঞ্জ বলেছেন যে এমন ক্ষেত্রে কী শাস্তি হবে তা কোথাও লেখা নেই, মারাদোনাকে সম্পূর্ণভাবে বাতিলই করতে হল।

প্রমাণিত হল যে, সর্বোচ্চ স্তরের খেলোয়াড় বা কোনও কিছুই হতে গেলে ইংরেজি জানতেই হবে। ইউরোপীয়, বিশেষ করে ইংরেজ সাংবাদিকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে হবে। পেলের মতো লিখে ঘোষণা করতে হবে যে, ফুটবলটা ইউরোপিয়ানদেরই খেলা, অবশিষ্ট দুনিয়া তা শিখেছে মাত্র। বলতে হবে, ব্রাজিল নয়, বিশ্বকাপের উপযুক্ত জায়গা হল আমেরিকা।

প্রমাণিত হল যে, সরল সাদাসিধে মানুষ হওয়া অপরাধ। সেই মানুষের মাথা উঁচু করে থাকার অধিকার নেই, যে নিজের দলের ফুটবলারদের কাছের মানুষ, যে শুধু নামে নয়, মনেও দলের একচ্ছত্র নেতা। সেই মানুষ সর্বোচ্চ স্তরের ফুটবলে বেমানান, যে বলে, এবার খেলতে না এলে গ্যালারিতে বসে আর্জেন্টিনার ফ্ল্যাগ নাড়াতাম। যে চিরনির্বাসনে যাওয়ার পরেও, জীবনের সবচেয়ে দুঃখঘন মুহূর্তেও অটোগ্রাফ দেয় একটি ছোট্ট মেয়ের বাড়িয়ে-দেওয়া ফুটবলে। যে এমন মর্মান্তিক সাংবাদিক সম্মেলনেও আসে নিজের দেশের জার্সি গায়ে— যেন রাষ্ট্রনায়কের মরদেহে জাতীয় পতাকা।

প্রমাণিত হল যে, ইংরেজ সাংবাদিকেরা এতকাল ধরে ঠিকই বলে এসেছেন, মারাদোনা প্রতারক। নাইজেরিয়া ম্যাচের পর ওরা লিখল, কিচ্ছু মার খায়নি, সব অভিনয়, মারাদোনা প্রতারক। এখন লিখছে, মার খেয়েও খেলে যেতে পেরেছে, কারণ ড্রাগ নিয়েছিল, মারাদোনা প্রতারক। মার খেয়েছে অথবা খায়নি, মারাদোনা প্রতারক।

শুধু ইংল্যান্ড নয়, ইউরোপের অন্যান্য দেশের সাংবাদিকদের বড় অংশও ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলতে ব্যস্ত মারাদোনাকে। এখানেও খাওয়াদাওয়া হবে, ধৈর্য ধরুন। ভাগ্যিস সেই সব বিষাক্ত বিশ্লেষণের অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজতে কোনও ডোপ টেস্ট হবে না!

প্রমাণিত হল যে, যদি কারও জন্য একটুও নরম মনোভাব দেখাতে হয়, তার নাম কিছুতেই দিয়েগো আর্মান্দো মারাদোনা নয়। ছিয়াশির বিশ্বকাপে মেক্সিকোর রেমন ক্যালডেয়ার আটকে যান ডোপ টেস্টে। ক্যালডেয়ার বলেন, ডায়েরিয়ার জন্য খেতে হয়েছিল ওই ওষুধ, যাতে ছিল আপত্তিকর ড্রাগ। এবার মারাদোনার সর্দির ওষুধে এফিড্রিন। কিন্তু প্রমাণিত হল, ফিফা অবশ্যই নিরপেক্ষ এবং মারাদোনার সর্দি হতেই পারে না। প্রমাণিত হল, মারাদোনা আজকের পেশামুখী ও পেশিমুখী ক্রীড়াজগতে অনুপযুক্ত, বেমানান। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই ফিফার প্রতিনিধি বললেন, আগেও ড্রাগ নিয়েছে মারাদোনা, এই তথ্যটা আমরা মনে রাখব! সিদ্ধান্ত, সুতরাং, নেওয়াই ছিল। বলা যায়,

জালও পাতাই ছিল। কোনওরকমে অভিযোগটাকে নড়বড়ে পায়ে দাঁড় করাতে পারলেই হল, বাকিটুকু আগের ঘটনার জোরে হয়ে যাবে। বোকা মারাদোনা, ফিফার মুখোশকে মুখ ভাবলেন, আমেরিকায় এলেন ফুটবলকে ফুটবলের জনপ্রিয়তায় ফিরিয়ে আনতে।

প্রমাণিত হল যে, ফুটবল এখন যুদ্ধ। খেলাই এখন যুদ্ধ। এবং এ কথা গর্বের সঙ্গে প্রচার করার লোকেরও অভাব নেই। আর যুদ্ধ যখন, চক্রান্তই বা নয় কেন? কোটি কোটি ডলারের ফাটকায় হঠাৎ ক্ষতির সম্ভাবনা দেখে হঠাৎ-ফেবারিট আর্জেন্টিনার কোমর ভাঙতে ষড়যন্ত্র নয় কেন? ফুটবল এখন ফুটবলারের নয়, অসাধু ডাক্তারের। ফুটবলের চর্চাভূমি এখন ব্যবসায়ির বোর্ডরুম। ফুটবল এখন হিসেব শাস্ত্রর। ফুটবল এখন সেই সব সাংবাদিকের, যাঁরা ফুটবলারকে প্রতারক বলার প্রতারণায় বিশেষজ্ঞ। ফুটবল এখন সেই সব লোলচর্ম লোলুপের, ফিফা চেয়ারে বসে যাঁরা এফিড্রিন নেওয়ার অভিযোগে দুনিয়ার চিরশ্রেষ্ঠ ফুটবলারকে বাতিল করেন চিরকালের জন্য, সর্বোচ্চ বিশ্বকাপ ম্যাচ খেলার রেকর্ড ভাঙার ঠিক মুখে এবং যাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রিয় খাদ্য হল মদ্য।

প্রমাণিত হল যে, এসেছে নতুন যুগ। যাও শিল্প, অন্ধকারে মুখ লুকাও। এসো অঙ্ক লাভের হিসাব কর। যাও সৌন্দর্য, পাতালে প্রবেশ কর। এসো ঈর্ষা, সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হও। বল নিয়ে তুমি সরে যাও মারাদোনা, এখন শুধু বাহুবলের আরাধনা। এসো গুরুগম্ভীর, বিজ্ঞাননির্ভর, ব্যবসা-ঘেরা মাঠে, কে হে তুমি বাবুরাম সাপুড়ে, তালপাতার হাসিখুশির বাঁশি বাজাতে চাও?

গুডবাই॥

ভালবাসা! ভালবাসা!

সিগারেটসহ বাঁ হাত বাঁ দিকে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন ইস্টবেঙ্গলের প্রচারে দ্বিতীয় ও প্রভাবে প্রথম কর্মকর্তা : ভালবাসা, ভালবাসা! কী ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত ফিল্ম লাইনে এসে তরুণ মজুমদারের সুপারহিটের রিমেক করার কথা ভাবছেন নাকি? বাঁ হাতসহ সিগারেট ঠোঁটে ঠেকিয়ে বললেন কর্মকর্তা, মশাই, বলে কী, ভালবাসা! কী ছেলে ভাবুন, রাত একটায় দু লাখ টাকা গুনে নিল, পরদিন ভোরে মোহনবাগানের গাড়ি ধরল। বলে, ভালবেসে চলে গেল। অমুকদার ছেলের ভালবাসায় চলে গেল। নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যাতায়াত করতে করতে সিগারেটটা দ্রুত শেষ হয়ে গেল। এবার সামনের দিকে তালু উল্টে দু'হাত ছুঁড়ে বললেন, আমাদের যে অফিসিয়ালগুলো শিশিরের বাড়ি গিয়েছিল, কী বলব, হাঁদা। টোকেনটা নিল না, টাকাটা দিল। কী বলব মশাই, অত রাতে সাইকেল চড়ে মাংস এনে নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়াল যে ছেলে, পরদিনই সে হাওয়া। তাড়িয়ে দিয়েছিল মোহনবাগান, আমরা সারিয়েসুরিয়ে চাঙ্গা করলাম, তারপর এই। হুঁ, ভালবাসা! ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তা আরেকটা সিগারেট ধরানোর আগেই বললাম, রিস্ক নিয়েই বললাম, হ্যাঁ, ভালবাসা! ওঁরা অনেকদিন ভালবাসার পর ছেড়ে দিলেন। উনি ভালবেসে আপনাদের টিমে এলেন। আপনারা ভালবেসে ভাল দিয়ে নিলেন। উনি ভালবেসে ভাল খেললেন। আপনারা সোমবার রাতে ভালবেসে ওঁর বাড়িতে গেলেন। উনি ভালবেসে খাওয়ালেন। আপনারা ভালবেসে খেলেন। তারপর ভালবেসে দু লাখ অ্যাডভান্স দিলেন। উনি আরও বেশি ভালবাসা পেয়ে চলে গেলেন। যা-ই বলুন, ইস্টবেঙ্গল কর্মকর্তাকে বললাম, এর মধ্যে ভালবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই! কর্মকর্তার হাতে না-ধরানো সিগারেট, মুখ হাঁ, 'ভালবাসা ভালবাসা' বলতে মোহনবাগান টেন্টের দিকে এগোলাম। স্পোর্টস এডিটরের নির্দেশ, প্লিজ (সেনটেন্সের শুরুতে এই মলমটা দিয়ে নিতে হয়) রিপোর্টটা আজই দেবেন। হাফ কাজ করে বটতলায় শুয়ে পড়বেন না। পাব কি মোহনবাগানের আসল অফিসিয়ালকে, ভাবতে ভাবতে গিয়ে, পেয়ে গেলাম। মানে, অফিসিয়ালকে নয়, তাঁর ডান হাতকে মতান্তরে বাঁ হাতকে। মিটিমিটি হেসে বললেন, বিলিভ মি, এর মধ্যে এক্স-সেক্রেটারি নেই। উনি তো সব

ছেড়েছুড়ে দিয়েছেন। ওঁর রিকোয়েস্টে ভালবেসে একজন পনের লাখ টাকা ধার দিয়েছেন। মোহনবাগানের হাফ-কর্মকর্তা জানালেন, শিশিরের সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ করেন প্রাক্তন সচিবের ভবিষ্যৎ সহকারীর বর্তমান বন্ধু। ভালবেসে যোগাযোগ। ভালবেসে ভাল অফার। সোমবার গভীর রাতে ইস্টবেঙ্গল ভালবেসে দু লাখ অ্যাডভান্স দিয়ে আসার পর, মঙ্গলবার আমাদের আরও গভীর ভালবাসা, আরও দু লাখ বেশি অফার। মাত্র দু লাখ বেশি ভালবেসে, ইয়ে, আপনারাই তো লিখেছেন, দলবদলে বড় চমক, হুঁ হুঁ। কাগজওয়ালাদের জবাব নেই। মঙ্গলবার— মাঝরাতে নাটক, শিশির ইস্টবেঙ্গলেই। বুধবার— ভোরবেলা নাটক, শিশির মোহনবাগানে। ভরদুপুরে নাটক, শিশির ইস্টবেঙ্গলেই— বৃহস্পতিবার এই হেডিং হলে সিক্সটিন কলা পূর্ণ হত। মোহনবাগানের এক্স-সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলা যাবে? হাফ-কর্তা বললেন, 'নো। উনি ক্লাবের ব্যাপারে আর নেই। ওঁর ছেলে রিকোয়েস্ট করেছে শিশিরকে। ওঁর বাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হয় শিশিরকে। ওঁর সঙ্গেই তাজ বেঙ্গলে ডিনার করেছে শিশির। ওঁর কথাতেই ভালবাসা জোগাড় হয়েছে। কিন্তু উনি এসবের মধ্যে নেই। উনি যা বলবেন, ওঁর হয়ে আমিই বলছি, প্লিজ নোট করুন, নো কমেন্টস।

একটু দূরেই মোহনবাগানের আরেক এক্স-এর অফিস। উইদাউট অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেম্বারে ঢোকা সত্ত্বেও সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেতে বললেন না। কারণ, তিনি তখন চেয়ারে শুয়ে টেবিলে চশমা রেখে চোখ বুজে বাংলার ফুটবলের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবতে ভাবতে নাক ডাকাচ্ছিলেন। প্রথমে গলা খুকখুক, তারপর হ্যাঁচ্চো, সব শেষে গান গেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বললাম, ডোন্ট মাইন্ড। মিঃ এক্স চোখ মেলে বললেন, বিশ্বাস করুন, আমি সই জাল করিনি। বললাম, আরে না-না, সই জাল নয়, আমার লেখার সাবজেক্ট 'ভালবাসা'। ময়দানের ভালবাসা। মিঃ এক্স জানালেন, তিনি মোহনবাগানের সাতেপাঁচে আর নেই। চিরকাল ভালবেসেছেন, এখনও ভালবাসেন ক্লাবকে। বললেন, এই তো দশ লাখের স্পনসর ধরেছিলাম, এক্স হয়ে যেতেই টিপে দিলাম, যেন ক্লাব আর না পায়। তবু, বিশ্বাস করুন, ক্লাবকে ভালবাসি। এই তো, আমার লেফ্‌ট অ্যান্ড রাইট কম্বাইন্ড হ্যান্ড পিয়ারলেসের একটা প্লেয়ারকে ইস্টবেঙ্গলের ঘরে তুলে দিয়ে এল, তবু বিশ্বাস করুন, আমি মোহনবাগানকে ভালবাসি। ভালবাসতে-বাসতে অফিস টাইমেও চেয়ারে শুয়ে ভাবছি। জিজ্ঞেস করলাম, শিশির কি সত্যিই ভালবেসে মোহনবাগানে সই করলেন? — 'সই! বিশ্বাস করুন, আমি সই জাল করিনি!' আরে না, শিশিরের সইয়ের কথা বলছি। 'ও, তাই বলুন' বলে নিশ্চিন্তে আবার চেয়ারে শুয়ে পড়লেন মিঃ এক্স।

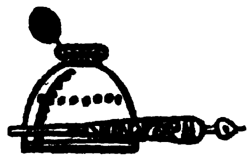
আকাশবাণীর মোড়ে মোহনবাগানের আরেক হাফ-কর্তার সঙ্গে দেখা। চোখ জলে ঝাপসা, প্রথমে দেখতে পাননি। একদম মুখোমুখি এসে বললেন, বুঝলেন, এই হল ভালবাসা! বললাম, হ্যাঁ, গড়ের মাঠের ঘাসে-ঘাসে শিশিরের ভালবাসার কাহিনী— শেষ করতে দিলেন না। হাফ-কর্মকর্তা বললেন, 'শিশির কেস তো পুরনো, লেটেস্ট সত্যজিৎ। ভালবাসা। ভেবে দেখুন, হঠাৎ ইস্টবেঙ্গল আট লাখ বলল। এদিক-ওদিক বলার পর

গতবারের চেয়ে মাত্র দু লাখ বেশিতে মোহনবাগানে থাকল। ইস্টবেঙ্গল ভালবেসে অত বেশি বলে আমাদের ভালবাসার খরচ বাড়িয়ে দিল। ভালবাসা, বুঝলেন, ভালবাসা। শুধু ভালবাসাই পারে একলাফে দু লাখ রেট বাড়াতে।

অফিসে ফিরে 'দলবদলের ভালবাসা' নামে রিপোর্ট লেখা শুরু করার ঠিক আগে ইস্টবেঙ্গলের গোলগাল কর্মকর্তার ফোন, 'দাদা, একটু ঠুসে দেবেন। কী জিনিস, সোমবার রাতে বাড়িতে ভালবেসে মাংস খাওয়াল, মঙ্গলবার ভোরে—' থামিয়ে বললাম, খাওয়াল! সোমবার রাতে মাংস খাওয়াল, মঙ্গলবার সকালে ঘোল খাওয়াল। মাংস খাইয়ে ভালবাসা। ঘোল খাইয়ে ভালবাসা।

ফোনটা রেখেই মনে হল, মহমেডান স্পোর্টিংয়ের অফিসিয়ালের সঙ্গে কথা বলা হয়নি। অন্যায়। পেয়ে গেলাম। ফোনেই যেন মুখ দেখা গেল। উদাস। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভালবাসা' সম্পর্কে কিছু বলবেন? — ভালবাসা, আলবৎ। আরও দুটো বাংলা শিখে নিলাম, বুঝলেন দাদা। সম্মান, আর একটা যেন কী, হাঁ হাঁ, গুরুত্ব। প্লেয়ার ধরতে গিয়ে দুটো বিগ টিমের প্লেয়ারদের মুখে শুনি, মোহনবাগান সম্মান না-দিলে আপনার টিমে চলে যাব। ইস্টবেঙ্গল গুরুত্ব না-দিলে মহমেডানে খেলব। কী না দিলে, কী না পেলে মহমেডানে খেলবে বুঝতে বেঙ্গলি টু ইংলিশ ডিকশনারি কনসাল্ট করলাম। খোঁজ রাখলাম, যদি মহমেডানে আসে। পরে দেখলাম, ডিকশনারি ভুল। 'সম্মান' মানে টাকা। 'গুরুত্ব' মানে টাকা। বুঝলাম, ওরা বলেছিল, মোহনবাগান প্রচুর টাকা না-দিলে মহমেডানে আসব, ইস্টবেঙ্গলে বিস্তর টাকা না-পেলে মহমেডানে আসব। আর এই 'ভালবাসা'। রাইট। ওরা 'সম্মান' আর 'গুরুত্ব'কে আলবৎ ভালবাসে। আমি লাইফে অনেক বিজনেস ট্রাই করলাম, ক্রাইম বিজনেসভি ধরলাম, কিন্তু 'সম্মান-গুরুত্ব'কে ওদের মতো এত ভালবাসতে পারলাম না। হতাশ মহমেডান কর্মকর্তার কথা জড়িয়ে আসছিল। বললেন, আজ আর কথা নয়। বেরোতে হবে। কাল ভোরেই বহুৎ লাগবে। জিজ্ঞেস করলাম, ভোরেই কী বহুৎ লাগবে? গভীর ফিসফিস ভেসে এল টেলিফোনে, ভালবাসা!

ঈর্ষাকাতর গাভাসকার



রোহন গাভাসকার কলকাতায় ঠিক কোন ক্লাবে খেলতে আসছেন? ময়দানের অফিসিয়াল থেকে বটগাছ ঘেঁটেও জানা গেল না। সাত দিন খেটে-ঘেঁটেও খবরটা পাওয়া গেল না কেন, এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হল কি না যে, আমার মাথার গোবর এখনও ঘুঁটে হয়নি— এই সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনার জন্যই ডেকেছেন এডিটর, ভেবেছিলাম। না। অপ্রত্যাশিত ভদ্র গলায় বললেন, কালই বম্বে যান, গাভাসকারের ইন্টারভিউ করে আনুন। এই না হলে এডিটর। কত সহজ রাস্তা, বোম্বাই যাও, রোহনকেই জিজ্ঞেস কর কোথায় খেলছেন ভাই, মারো এক্সক্লুসিভ। 'কিন্তু রোহন যদি চেপে যায়'... পরিচিত অভদ্রতা ফিরে এল এডিটরের মুখেচোখে, ভ্যাট, সানি গাভাসকারের ইন্টারভিউ চাই। ইন্টারভিউ কাম রিপোর্ট। আজহার বলেছেন, তাঁর সাফল্যে ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়েছেন গাভাসকার। জানতে হবে, ঈর্ষায় ঠিক কতটা কাতর পাঁচ ফুট আধ না কত ইঞ্চি যেন।

আরব সাগরতীরে 'স্পোর্টসফিল্ড'। ওয়াদেকারের নিচের ফ্ল্যাটে গাভাসকার। নিচে বলে ঈর্ষা কি না, এটাও জানা দরকার। কেউ কি মারা গেছেন? থমথম, থমথম। ফিকফিক করে কাঁদছেন মার্সেনিল। সোফায় মাথা গুঁজে রোহন, হয়ত কাঁদছেন। সানি? কাঁদছেন। বেডরুমে। চেনামুখ দেখেই কান্না বেড়ে গেল মার্সেনিলের, 'শেষ, শেষ, লিখে নিন সুনীল গাওস্কর শেষ।' গাওস্কর? 'হ্যাঁ। গালাগালি খাওয়ার সময় ওর স্পেলিং অন্যরকম, গাওস্কর। শেষ।'

শেষ? আমার কাজ শুরু। মার্সেনিলের কাছেই জানতে চাইলাম, আজহারের এই অভিযোগ কি ঠিক যে, আপনার স্বামী ঈর্ষাকাতর? এ কথা বলার জন্যই কি আপনারা সপরিবারে কাঁদছেন? প্রশ্ন শুনে মার্সেনিলের চোখে ঝর্না। বাঁচালেন রোহন। 'ঠিক বলেছে আজহারকাকু। কিন্তু, এই বয়সে বাবা ধাক্কাটা কী করে সহ্য করবে, ভেবে দেখল না।' ঠিক বলেছে? সানি সত্যিই ঈর্ষাকাতর? সানির ১০৮ ক্যাচের ভারতীয় রেকর্ড আর মাত্র চল্লিশটা হলেই আজহার ভাঙতে পারেন বলে?

রোহন : না না। বড় বড় রেকর্ড। ভাঙবে আর শব্দ হবে। বাবার ১০,১২২ টেস্টরান

বর্ডার টপকে গেছেন, কিন্তু একজন ইন্ডিয়ানও টপকে গেলে রাগ হবে না? এগার বছরে আজহারকাকুর চার হাজার পার হয়ে গেছে, বাকি ছয় হাজার তো কাল-পরশুই হয়ে যাবে, ঈর্ষা হবে না?

• হতেই পারে। কিন্তু এত কান্নাকাটি উচিত নয়।

রোহন : কী বলছেন! আজহারকাকু এগার বছরে ১৪টা সেঞ্চুরি করে ফেলেছে। ৩৪ হতে কতক্ষণ? দুনিয়ার সবচেয়ে ডেঞ্জারাস বোলিং সাইড ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বাবার সেঞ্চুরি ১৩, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। এই তেরোর পরেই চারজনের ৬। আজহারকাকুর এখনও শূন্য। আর মাত্র তেরোটা বাকি। ভয় লাগে না বাবার? এক ক্যালেন্ডার-বছরে হাজার রান বাবার চারবার, ওয়ার্ল্ড রেকর্ড। আর মাত্র পাঁচবার করলেই টপকে যাবে আজহারকাকু। একই টেস্টের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরি বাবার তিনবার। রেকর্ড। আজহারকাকুর এখনও একবারও হয়নি, তিনবার হতে কতক্ষণ? একই টেস্টে সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি আছে চারজনের। ডগ ওয়াল্টার্স, লরেন্স রো, গ্রেগ চ্যাপেল আর সুনীল গাওস্কর। এটাও ফেলে রাখবে না আজহারকাকু। টেস্টে সবচেয়ে কম সময়ে হাজার রান বাবার। ৬ টেস্ট, ৭৮ দিন। আজহারকাকু : ১৬ টেস্ট, ৭২১ দিন।

• এই রেকর্ডটা তো আর ভাঙতে পারছেন না আপনার কাকু। সবচেয়ে কম সময়ে, জীবনের প্রথম ৬ টেস্টেই এক হাজার...

মার্সেনিল : (টিস্যু পেপারে মুখ মুছতে মুছতে) বলা যায় না, বলা যায় না, কিচ্ছু বলা যায় না, আজহার ভীষণ ট্যালেন্টেড।

• কিন্তু, সানি গাভাসকারই তো, ইয়ে, মানে, গাওস্করই তো বলেছিলেন, রেকর্ড গড়া হয় ভাঙার জন্য। তা হলে এত ঈর্ষা, কান্নাকাটি কেন?

মার্সেনিল : আমরা কাঁদছি ঈর্ষার কথাটা ফাঁস হয়ে যাওয়ার জন্য। তা ছাড়া, শুধু তো রেকর্ড নয়। আরও অনেক ব্যাপার আছে। আজহারের পপুলারিটি বাড়ছে তো বাড়ছেই। সানি গাওস্করের পপুলারিটি কমছে তো কমছেই। একই জায়গায় দু'জনই থাকলে, আজহারের অটোগ্রাফ নিতে শয়ে শয়ে লোক ঝাঁপিয়ে পড়ছে, সানি গাওস্কর মাছি তাড়াচ্ছে।

• এরকম তো হয়েই থাকে। এত কষ্ট পেতে নেই।

মার্সেনিল : সুনীল গাওস্কর এখন বোম্বাইয়ের শেরিফ। ধরুন, আজহার যদি হায়দরাবাদের মেয়র হয়ে যায়?

• হলে হবে।

রোহন : (সোফায় নাক ঘষতে ঘষতে) যার হয় সে বোঝে। এই ধরুন, বাবার রান দেশে পাঁচ হাজার, বিদেশেও পাঁচ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তেরোটা সেঞ্চুরির সাতটাই ওদের দেশে। ফাস্ট বোলারদের বিরুদ্ধে ফাস্ট উইকেটে ক—ত সময় কাটাতে হয়েছে, লড়তে হয়েছে বাবাকে। আজহারকাকু ওরকম উইকেটে, ওরকম বোলিংয়ের বিরুদ্ধে বেশিক্ষণ থাকে না। কীরকম লাকি, ভাবুন। বাবার ঈর্ষা হবে না?

• কিন্তু, আজহার ভারতীয় ক্রিকেটকে যা দিয়েছেন, সেটা তো স্বীকার করতেই হবে। এ

জন্য ঈর্ষাকাতর হওয়ার কী মানে হয়?

রোহন : নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর। আপনারা সবাই। আজহারকাকু সব কেড়ে নিলে, বাবার থাকবেটা কী? এইট্টিফাইভে অস্ট্রেলিয়ায় সব দেশকে হারিয়ে বেনসন অ্যান্ড হেজেস ওয়ার্ল্ড সিরিজ কাপ জিতে এনেছে বাবা গাওস্কর। নাইনটিথ্রি-তে কলকাতায় হিরো কাপ চ্যাম্পিয়ন আজহারকাকুর টিম। রাউন্ড রবিনের ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে হারলেও, জিম্বাবোয়ের সঙ্গে টাই করলেও, পাকিস্তান, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া না-থাকলেও এটা তো অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। বাবা তখন থেকেই কাঁদছিল। দিনে দুটো পিলোকভার পাল্টাতে হত। এখন ঘণ্টায় ঘণ্টায় চেঞ্জ।

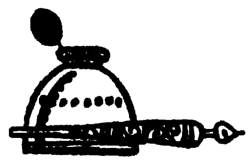
• তবু, উঠে দাঁড়াতে হবে। কমেন্টেটর, ক্রিকেট-লেখক গাভাসকারকেও আমরা চাই।

মার্সেনিল : (চোখের জল সশব্দে মুছতে মুছতে) সেটাও যাবে। কতবার বারণ করেছি, তবু ও নিজের লেখা নিজেই লেখে। আজহারেরটা অন্য কেউ লিখে দেয়। আজহারকে লেখার জন্য কলম ধরতে হয় না। কষ্ট করতে হয় না। ঈর্ষা হবে না সানি গাওস্করের?

• কিন্তু কমেন্ট্রি? ওটা তো...

মার্সেনিল : দেখবেন, যখন আজহার করবে, ওটাও ওর হয়ে অন্য কেউ করে দেবে। লাকি চ্যাপ। ঈর্ষা হবে না?

আমাকে দুটো টিকিট দেবেন



যাঁর মেজাজ মিনিমাম সাতাত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস, দাঁত খিঁচিয়ে বা পাইপ চিবিয়ে ছাড়া কথা বলা যিনি নিজের চেয়ারের পক্ষে অপমানজনক মনে করেন, সেই এডিটর সাহেব পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে বললেন, আমাকে দুটো টিকিট দেবেন? ডালমিয়ার বিরুদ্ধে লেখা, টিকিট মিনিস্টারের সঙ্গে ঝামেলা, করুণ অবস্থা তো হবেই, তাই বলে আমার কাছে টিকিট? হাফ-জার্নালিস্ট হিসেবে দেড়খানা টিকিট পাই। ইন ফ্যাক্ট দুটোই পাই, বাড়ি আসতে আসতে টানাটানিতে আধখানা ছিঁড়ে বেরিয়ে যায়। এবার টিকিট পেয়েই ব্রিফকেসে পুরেছি, ব্রিফকেসটার সামান্য ক্ষয়ক্ষতি হলেও দুটো টিকিট অলরাইট। জবাব পাওয়ার আগেই কপালে পাইপ ঠুকে এডিটর বললেন, এখন আসুন, কাল কথা হবে। গত পনের বছরের এক্সপিরিয়েন্স বলছে, কেউ একটা টিকিট চায় না। তিনটেও না। দুটো, অলওয়েজ। দুটো টিকিট আমার হাতে, তিয়াত্তর জন চান (ইন্টু টু), একুশ জনকে 'দেব' বলি। তাই নানারকম ড্রিবলিং আমাকে প্র্যাকটিস করতে হয়েছে। বেঙ্কটেশের পায়ে নাকি আট রকম ড্রিবল ছিল, আমার মুখে অ্যাট লিস্ট বারো। যাঁরা চাইছেন, তাঁরাও কিছু খারাপ প্লেয়ার না। নানারকম অ্যাটাক :

• 'কে—ম—ন আছেন? (অথবা 'আছ'. টেনে 'কেমন' কমন)। জন্ডিসের পর সাবধানে আছেন তো? কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হতে হতে আমার জন্ডিস মনে রেখেছেন। কিন্তু সে তো সাড়ে তিন বছর আগে হয়েছিল। তাতে কী।... 'সাবধানে থাকবেন। হ্যাঁ, দুটো টিকিট দরকার। আপনাকে ছাড়া কাকেই বা বলব।' আবার অভিভূত হতে হয়, বলার মতো আর কে—উ নেই আমি ছাড়া।

• 'উফ্, দারুণ হয়েছে আজকের লেখাটা। জবাব নেই।' কিন্তু আজ তো কোনও লেখা বেরোয়নি আমার। 'তাহলে কালকেরটা, নইলে পরশু...। অবশ্য এ আর নতুন কথা কী, আপনার সব লেখাই ফাটাফাটি, অন্য কাগজ হলে অ্যাট লিস্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর হয়ে যেতেন। ইয়ে, ওই, দুটো টিকিট চাইছিলাম।'

• 'একটা আবদার করছি, 'না' বলতে পারবেন না। তিনটে, না থাক, দুটো টিকিট দিতেই হবে। প্লিজ। কথা দিয়ে ফেলেছি। কখে পাব বলুন। প্লিজ, 'না' বলবেন না।'

• 'দেখুন, স্ট্রেট বলছি, এতদিন পর ফোন করছি নিজের স্বার্থে, একদম, দুটো টিকিট চাই। জানি, আপনার ওপর ভীষণ চাপ। আপনার কাছে চাওয়া উচিত নয় (আবার অভিভূত। ভাবা যায় কী তুমুল কনসিডা:রশন)।

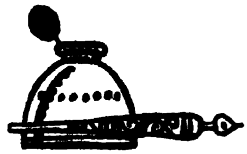
নানারকম অ্যাটাক। আগে প্র্যাকটিস ছিল। কখন ফুটবলের টিকিটের ডিমান্ড ছিল। বছরে দু-তিনবার ট্যাকল করতে হত। এখন ফুটবল আছে, টিকিটও আছে, ডিমান্ড নেই। দু-তিন বছর বাদে বাদে হঠাৎ-হঠাৎ অ্যাটাক। প্র্যাকটিস নেই। মাঝেমাঝে ভুল করে ফেলি। যার কাছে ডিমান্ড আছে টিকিট নেই, অ্যাটাক আটকানোর কিছু জেনারেল লাইন আছে। (ক) 'ইস্, কাল বললেন না!' বিকেলে ফোন এলে, 'ইস্, সকালে বললেন না!' (খ) আমাদের এডিটরকে তো চেনেন, সবার সঙ্গে ঝগড়া, আমরা কারুরও কাছ থেকে টিকিট নিই না, কাউকে টিকিট দিই না। (গ) (টিকিট-প্রার্থীর বাড়ি যদি দূরে হয়, যদি ফোনেই চেয়ে থাকেন) দুটো তো হবে না, একটা, কিন্তু এখনই আসুন, দশ মিনিট পরেই বেরোচ্ছি, অ্যাসাইনমেন্ট, বম্বে।

কিন্তু এখন আর জেনারেল লাইন চলছে না। মানে, সবসময় চলছে না। আবার ড্রিবলিংয়ে অভিজ্ঞ, এমন একজনের ফোন : 'গতবারের আগের বার বলেছিলেন কাল বললেই পেতাম, এবার চারদিন আগে ফোন করছি। গতবার বলেছিলেন টিকিট নেন না দেন না। দুটো নেন জানি, তাহলে দেনও কাউকে। এবার আমাকে, প্লিজ। তিন বছর আগে বলেছিলেন, চন্দননগর থেকে দশ মিনিটের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছতে আমাকে, প্লিজ। এবার নো প্রবলেম, আপনার বাড়ির দশ মিনিটের মধ্যেই আছি। বন্ধুর বাড়ি। ওকেই দেব। আমি তো মাঠে যাই না, টিভিতে কত ভাল দেখায়, তাই না? প্লাস রিচি বেনো, সানি গাভাসকার...।

নতুন নতুন পরিস্থিতি। চাই নতুন নতুন স্ট্র্যাটেজি। কালুভিথারানাকে আউট করতে রিচার্ড ইলিংওয়ার্থের ন্যাটা স্পিন দিয়ে বোলিং শুরু, এইরকম আর কি। ভাবছি। আরও একটা প্রবলেম, সিরিয়াস। হয়ত অ্যাটাক আটকাতে না-পেরে গোল খেয়ে গেছি, কোনও বার হয়ত কোনও কারণে দুই বা দেড়খানা টিকিটই কাউকে দিয়ে ফেলেছি। পরের বার ফোন, টিকিট চাই, দুটো। ঘাবড়ে গিয়ে বলি, দুটো তো হবে না, একটা ট্রাই করব। 'কেন, গতবার তো দুটো দিলেন।' এবার অবশ্য কোনও প্রবলেম নেই। আমার দুটো টিকিট, দুটোই এডিটর চান। তাই একটু আগে এডিটরের ঘরে গিয়ে বললাম, 'আমার ছেলেটা ক্লাস সেভেন, এই প্রথম মাঠে যাবেই বলছিল, তাতে কী, এই যে, দুটো টিকিট।' কলমটাকে পাইপ বানিয়ে মুখে ঠেকিয়ে এডিটর বললেন, 'রিল্যাক্স। আপনার ছেলেকে টিকিট দিন। ওকে মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওর মেজমামাকেও দিন।' কিন্তু আপনার দুটো? বিরল দৃশ্য। হাসলেন, এডিটর, সত্যি। 'আপনার মাথা মোটা। কিছু অন্যরকম হলেও এটা বুঝতেন না। টিকিট ট্যাকলিংয়ে এটাই লেটেস্ট। যারা টিকিট চাইতে পারে, চাইলেও চাইতে পারে লিস্ট করে ফেলুন। বাড়িতে বা অফিসে ফোনে ধরুন। একটু ধীরে লেগকাটার ছাড়ুন। বেঙ্কটেশ প্রসাদ। বলুন, কী বলব, এবার উল্টে আমিই ফেঁসে গেছি। একান্নটা টিকিট

দরকার। না পেলে সুইসাইড করতে হবে। উনপঞ্চাশ পেয়ে গেছি, আর দুটো। দিন, প্লিজ, দুটো।' উটকো এডিটরের সামনে যতটা সম্ভব, ব্যঙ্গ ছড়িয়ে বললাম, কিন্তু যাকে বলছেন, সে কোথা থেকে দেবে দু-দুটো টিকিট? ফালতু রিপোর্টারের সামনে যতটা সম্ভব, সৌজন্যের চিনি ছিটিয়ে এডিটর বললেন, 'ছা—। গা—। উনি দুটো টিকিট দেবেন কেন? উনি শুধু দুটো টিকিট চাইবেন না। কাউন্টার অ্যাটাক। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স। এটাই লেটেস্ট। ড্রিবলিং ৯৬।

ডালমিয়াজি হাসেন কেন



জীবনে ঢের ঢের ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করেছি, সব রিপোর্টেই প্রচুর গুল মেরেছি, কিন্তু এত বড় সমস্যায় আর কখনই পড়িনি। এডিটরের পেপারব্যাক এডিশন স্পোর্টস এডিটরের অর্ডার, তিনদিনের মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে, ১৩ মার্চ ইডেনে যখন লঙ্কাকাণ্ড, ডালমিয়াজি হাসছিলেন কেন। লয়েডের পাশে হাঁটতে হাঁটতে হাসছিলেন, জ্যোতিবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও হাসছিলেন। কিন্তু কেন? এডিটরের পকেটবুক এডিশন স্পোর্টস এডিটর জানেন, ডালমিয়াজিকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। হাসছিলেন কেন জানতে চাওয়ায় আরও হাসবেন। তখন সমস্যা আর সমস্যা থাকবে না, সঙ্কটে পরিণত হবে।

খেলা এবং খেলা বন্ধের চল্লিশ ঘণ্টা পর ইডেনে ঢুকে দেখি, দারুণভাবে পিচ তৈরি হচ্ছে। ২০০৮ বা ২০১২ সালে ইডেনে আবার বিশ্বকাপ হলে নিশ্চিত ভাল পিচ পাওয়া যাবে। ক্লাব হাউসের আপার টায়ারে গালে পা দিয়ে উপবিষ্ট সি এ বি-র লোয়ার টায়ারের এক কর্মকর্তা। স্ট্রেট জানতে চাইলাম, ডালমিয়া সাহেব সেদিন হাসছিলেন কেন? প্রায় ডালমিয়ারই মতো হেসে লোয়ার কর্তা : জার্নালিস্টরা কেন যে এত ডাল হয়। উদ্বোধনে ঝুলিয়েছিল লুনেত্তা। এবার পাবলিক দায়িত্ব নিল। আহা, কী দৃশ্য, গ্যালারির এখানে একটু আগুন, ওখানে একটু, পিচটা স্পিনিং রিভলভিং ছিল, জমে গেল একদম। উনি হাসবেন না?

লোয়ার কর্তা ঠিক না-ও বলতে পারেন, হাসার আর কোনও কারণ থাকতে পারে, ইত্যাদি ভেবে কলকাতার একুশ নম্বর সোশিওলজিস্টের কাছে গেলাম। বললেন, 'মিডিয়া, মিডিয়া। দায়ী মিডিয়া। পিচ খারাপের জন্য দায়ী মিডিয়া। ইন্ডিয়ার বাজে বাটিংয়ের জন্য দায়ী মিডিয়া। গ্যালারিতে আগুনের জন্য দায়ী মিডিয়া।' কিন্তু, ডালমিয়ার হাসির জন্যও দায়ী মিডিয়া? 'ঠিক তা নয়। মিডিয়ার জন্য এগুলো হল বলে উনি হাসছিলেন। হাজার টিকিটের কালোবাজারি নিয়ে এখন আর কেউ হইচই করবে না, শুধু আজহার আর দর্শকদের গালাগালি চলবে এখন, এ-কথা ভেবে হাসছিলেন।'

প্রশ্ন শুনে রীতিমত উত্তেজিত প্রাক্তন ক্রিকেটার। বাংলার হয়ে দেড়খানা ম্যাচ

খেলেছেন, বত্রিশটা টিকিট পেয়েছেন। বললেন, 'জগুদা হাসবে না তো কে হাসবে, আপনি? আপনার ফাজিল এডিটর? ইন্ডিয়া ওইভাবে হারায় প্রমাণ হয়ে গেল, প্লেয়াররা ফালতু। ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমাদের সুনাম শুধু একজনের জন্য, জগুদা। ইন্ডিয়া হারলেও জগুদা জিতেছেন। হারবেন না?' প্রাক্তন ক্রিকেটারের পাশে বসে ছোলাভাজা খাচ্ছিলেন এক বর্তমান হাফ-কর্মকর্তা। 'গোটা দুনিয়ার সামনে সেদিন জগুদা প্রমাণ করে দিলেন ইডেনের গ্যালারি মজবুত, আগুনেও কিছু হয় না। প্রমাণ হয়ে গেল, কলকাতার ক্রাউড কত জঘন্য। ইন্ডিয়া টিম বাজে, কলকাতার ক্রাউড বাজে। ভাল শুধু জগুদা নিজে আর জগুদার তৈরি গ্যালারি, ক্লাব হাউস।'

নতুন অ্যাঙ্গেল দিলেন এক বিদগ্ধ বিশেষজ্ঞ, 'পার্সোনালিটি কাকে বলে দেখিয়ে দিলেন ডালমিয়া। ইন্ডিয়া ডুবছে, গ্যালারি জ্বলছে, তবু হাসছেন। ওই হাসির মানে, এরকম তো কতই হয়, আমাকে টলানো যাবে না, আমি হাসছি। হাসার অবশ্য আরও কারণ আছে। খবরও তো রাখেন না, ডালমিয়া দারুণ ক্রিকেট খেলতেন। গাভাসকার, বিশ্বনাথের চেয়ে একটু কম অবশ্য। এবার টপকে গেলেন। ওঁর বাড়ির পাঁচটা অ্যালসেশিয়ানও উদ্বোধনে তিনটে করে কার্ড পেয়েছিল, বিশ্বনাথ পাননি। ওঁর চামচার চামচারাও গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরছিলেন, গাভাসকার গাড়ি পাননি। বিশ্বনাথ উদ্বোধন না-দেখে অভিমানে ফিরে গেলেন, গাভাসকার গাড়ি না-পেয়ে পথে বসে থাকলেন, হাসি আসবে না?'

নামকরা জার্নালিস্ট বললেন, 'প্রফেশনের মুখে চুনকালি মাখালেন মশাই। এই সোজা ব্যাপারটা বুঝলেন না? পরিস্থিতিটা ভাবুন। দর্শকরা মাঠে ঢুকেছেন একটা-দেড়টা নাগাদ। টানা তিন ঘণ্টা সলিড রোদ খেয়েছেন। রোদ খেয়েছেন, কিন্তু জল খাননি, কারণ পাননি। শরীরের কষ্ট, তারপর ইন্ডিয়ার হারে মনের কষ্ট। চোখের জলে জ্বলেছে আগুন। এই অবস্থায় হাসি আসবে না মুখে?'

প্রবীণ আম্পায়ার আঙুল তুলে বললেন, 'পিচ, পিচ। ডালমিয়ার হাসার অধিকার আছে। ওয়ার্ল্ড কাপ সেমিফাইনালের একমাস আগে পিচে স্টেজ, সাতদিনে ঘাস খুন, পিচে পেরেক, পিচে ব্যাটসম্যানদের ভরতনাট্যম, দুনিয়ায় কেউ কখনও এই জিনিস বানাতে পারেনি। টিভিতে স্পষ্ট দেখিয়েছে, সেদিন আসল দুজনই সাফল্যে একই টাইপের মিষ্টি হেসেছেন। অরবিন্দ ডি সিলভা, জগমোহন ডালমিয়া। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, ম্যান অফ দ্য পিচ।'

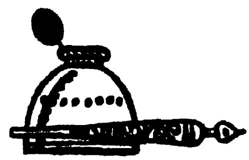
শিল্পায়নের রোমহর্ষক প্রবক্তা, শিল্পের নামে জমি দখলের উজ্জ্বল নক্ষত্রের সঙ্গে কথা হল টেলিফোনে। 'আসল জিনিসটা কেউ বুঝল না, বুঝলেন কিনা। আগে ইডেনের গরিব পাবলিক চায়ের ভাঁড় ছুঁড়ত। এবার মদের বোতল ছুঁড়ল। আগে পাবলিক কমলালেবু খেয়ে খোসা ছুঁড়ত, এবার গোটা কমলা ছুঁড়ল, আপেল ভি ছুড়ল। চা থেকে মদে, কমলার খোসা থেকে গোটা কমলা আর আপেলে— ইডেনকে কে পৌঁছে দিলেন? তিনি খুশি হবেন না? মতলব, হাসবেন না?' গভীর বামপন্থী বন্ধু পরামর্শ দিলেন, 'অন্যের কথায় প্রভাবিত হবেন না। নিজে বুঝুন। মানুষ হাসে কেন— এই বিষয়ে অন্তত তিনটে বই পড়ুন।

ভিডিওতে শেষ দিকটা তিরিশবার দেখুন। ভাবুন।

আমার যাবতীয় বই গত পঁচিশ বছর ধরে বন্ধুরা পড়তে নিয়ে গেছেন। লাইব্রেরিতে যাওয়ার সময় নেই। তবে, তিরিশ না হলেও, সাড়ে পাঁচবার দেখলাম। আমার ঘোর সন্দেহ, পাশে হাঁটতে হাঁটতে কাতুকুতু দিচ্ছিলেন ক্লাইভ লয়েড, ফলে হাসি। বন্ধুকে ফোনে বলতেই বললেন, 'রাবিশ! লয়েড যদিবা কাতুকুতু দিয়ে থাকেন, জ্যোতিবাবুর পাশে দাঁড়িয়েও ডালমিয়া হাসছিলেন কেন? কেউ একথা বিশ্বাস করবে যে জ্যোতিবাবু ডালমিয়াকে কাতুকুতু দিচ্ছিলেন?'

ঠিক। অসম্ভব। জ্যোতিবাবু ডালমিয়ার মতো রত্ন-কে যা দেন তা হল প্রশ্রয়। লেখাটা বেরিয়ে যাক। কালই পবিত্র সরকারের কাছে জানতে চাইব, 'প্রশ্রয়' কি কাতুকুতুর সমার্থবোধক শব্দ?

প্রোফেশনাল ইন্টারভিউ



ফোনে বললেন, 'এলেও আমাকে পাচ্ছেন না, কুড়ি মিনিট পরই বেরিয়ে যাব।' বললাম, নো প্রবলেম, দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। আমার বাড়ি থেকে অমল দত্তর বাড়ি যেতে লাগে মিনিমাম বত্রিশ মিনিট। তবু দশ, দশও না, সাড়ে আট মিনিটে পৌঁছে গেলাম। বেরোতে সাড়ে এগারো মিনিট বাকি, ব্রেকফাস্ট করতে করতে বই পড়ছিলেন অমল দত্ত। 'ফুটবল সার্কেল'। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি ডায়মন্ড ছেড়ে সার্কেল সিস্টেমে যাচ্ছেন? এক চুমুক বেলের পানা খেয়ে অমল দত্ত বললেন, 'বলব কেন? আমি প্রোফেশনাল কোচ, কী করব এত আগে বলব কেন?'

● ঠিক ঠিক, আগে থেকে বলা ঠিক নয়! আগের কথাই জিজ্ঞেস করব।

❑ কিন্তু, এত তাড়াতাড়ি পৌঁছলেন কী করে?

● ডায়মন্ড সিস্টেম। ড্রাইভারকে বললাম, ঝড়ের মতো যেতে হবে, গাড়ি ভাঙে ভাঙুক। তিন-চার গোল খেলে খাব।... আচ্ছা, ফুটবলাররা বলল সেক্রেটারিকে আপনার হয়ে বলবে, আপনি ওদের সাতদিন সময় দিলেন, তবু ঝটপট চার্চিলের টাকা নিয়ে নিলেন কেন?

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। হাতের চার্চিল... আই মিন হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব কেন? তা ছাড়া, আমি প্রোফেশনাল কোচ, ফুটবলারদের বিশ্বাস করব কেন? ওরা মিউ মিউ করে কী বলবে না বলবে, তার আশায় বসে থাকব কেন?

● আপনি একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। রাজনীতিতেও অলরাউন্ডার। বামপন্থী থেকে ডানপন্থী— পুরো সার্কেল কমপ্লিট করেছেন। সার্কেল সিস্টেম। আপনার মতো লোক চার্চিলদের হোটেলে মিটিং করতে চলে গেলেন, ভাবা যায় না।

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। দরকার হলে হোটেল কি, খাটালেও যাব। শুধু চার্চিলদের হোটেলে কেন, ওদের বাড়ির কিচেনে বা গাড়ির বনেটে গিয়ে বসব।

● তাই বলে গটআপ-এর মিটিংয়ে যাবেন?

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। দরকার হলে লোক খ্যাপানোর বা বোমা বাঁধবার মিটিংয়েও যাব।

● টেলিফোনে অঞ্জন মিত্রকে আপনি বলেছেন স্ট্রেট খেলা হলে জিততে পারতেন না। তাই...। আগে থেকে বুঝলেন কী করে যে জিততে পারবেন না?

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। হারের গন্ধ পাই। ব্যবস্থা চাই, যাতে মার না খাই।

● ওই গটআপ ম্যাচের দিন আপনি মাঠে গেলেন না পাবলিকের ভয়ে। মিথ্যা বললেন, পেট খারাপ। খেলার পর সাংবাদিকদের সামনে গ্লুকোজ-জল খাওয়ার অ্যাক্টিংও করলেন।

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। দরকার হলে গ্লুকোজ-জল কেন, পেনের কালিও খেতে পারি। আমি প্রোফেশনাল কোচ। শুধু অ্যাক্টিং কেন, দরকার হলে নাচ, গান, এমনকি মিটিংও করতে পারি।

● আচ্ছা, হেরে গেলেই আপনি রেফারিকে দোষ দেন কেন?

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। নিজেকে ছাড়া আর সবাইকেই দোষ দিই। রেফারি, ঘাস, আকাশ— যাকে পাওয়া যায়।

● ফুটবলারদের ঘাড়েও অপবাদ চাপান। সাতাত্তরে শিল্ডে হারার পর বলেছিলেন, ইস্টবেঙ্গলের তিন-চারজনকে ম্যানেজ করেছে মোহনবাগান। কোনও ডেফিনিট ইনফর্মেশন ছিল?

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। ইনডেফিনিট ইনফর্মেশন ধরে চলি। ইন ফ্যাক্ট, সেবার কোনও ইনফর্মেশনই ছিল না। শ্যামের গোলটা অফসাইড বলতে না পারায় ফুটবলারদের ঘাড়ে অপবাদ চাপিয়েছিলাম। প্রোফেশনাল কোচ কিনা।

● আপনি এবার ডায়মন্ড সিস্টেমে ফাটিয়ে দিলেন। কিন্তু তিনটে ম্যাচে দশ গোল খেলেন কেন?

❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। যখন দেখি সাপোর্টারদের এক্সপেক্টেশন খুব বেড়ে যাচ্ছে, তাল মিলিয়ে চলা মুশকিল, একসঙ্গে তিনটে বা চারটে খেয়ে যাই। সব নর্মাল হয়ে যায়। তা ছাড়া, আমি প্রোফেশনাল কোচ, মাঝেমাঝে একসঙ্গে কিছু গোল খেয়ে দেখে নিই, স্টমাক নিতে পারছে কিনা। বিদেশের প্রোফেশনাল টিমগুলোকে দেখেন না, মাঝেমধ্যে কেমন টপাটপ তিন-চার গোল খেয়ে নেয়।

● এবার যখন ন্যাশনাল লিগে চার্চিলের সঙ্গে মোহনবাগানের খেলা পড়বে, স্পেশাল কোনও স্ট্র্যাটেজি নেবেন?

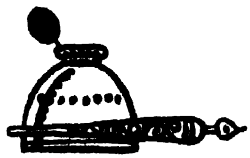
❑ আমি প্রোফেশনাল কোচ। আগে থেকে স্ট্র্যাটেজি বলতে যাব কেন? তবে চিমাকে কিমা বলব, রোশনকে রসুন বলব— এটা এখনই বলতে পারি।

● এই ইন্টারভিউটা কাল অবিকল ছাপা হবে। আপনি কাকে গালাগালি দেবেন, লেখার

জন্য আমাকে, না ছাপার জন্য এডিটরকে?

'সার্কেল সিস্টেম' বইটা হাতে নিয়ে গোল করে ঘোরাতে ঘোরাতে বাইরে বেরোলেন অমল দত্ত। বললেন, আমি প্রোফেশনাল কোচ। প্রথমে ক্যাটানেসিও সিস্টেমে বলব, কী লিখেছে? কে লিখেছে? কোথায় লিখেছে? পড়িনি তো। তারপর ডায়মন্ড সিস্টেমে গিয়ে বেধড়ক গালাগালি দেব, রাইটার, এডিটর, অডিটর— সবাইকে। আমি একই সঙ্গে মিথ্যা বলব, গলা ফুলিয়ে চেঁচাব। প্রোফেশনাল কোচ কিনা।

হ্যাঁ, একমাস আগেই রেডি



এবারের বিশ্বকাপ ভ্রমণ সম্পর্কে একটা লেখা তৈরির অর্ডার দিয়ে এডিটর সাহেব বললেন, 'একটু খাটুন। মাথাটাকেও খাটান। হিসেব কষে দেখিয়ে দিন, বারো লাখ টাকা দিয়ে কী কী ভাল কাজ করা যেত।' তা, আমিও তো বলতে পারি, এডিটর সাহেব বছরে যত তামাকু সেবন করেন, তা দিয়ে অনেক ভাল কাজ করা যেত। বলা যাবে না। আমার ঘাড়ে এক্সট্রা মাথা নেই। চাকরি বলে কথা, উনি যা বলবেন, তা-ই লিখতে হবে। সাংবাদিক স্বাধীনতা থাকলে লিখে দেখিয়ে দিতাম, বিশ্বকাপ ভ্রমণের ব্যবস্থা কত ভাল কাজ। ষোল বছর আগে স্পোর্টস ডিপার্টমেন্টের ভার নিয়েছিলেন আমাদের মন্ত্রী। সেই থেকেই বাংলার বিশ্বকাপ অভিযান। এই নিয়ে পাঁচবার। সেই থেকেই বাংলার ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড হু-হু করে বেড়ে চলেছে। এই যে শ্রীকান্ত দত্তর গোলে বাংলা এবারও সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন হল, সে তো এজন্যই যে ৫০-৬০ জন প্রাক্তন ফুটবলার, আমলা ইত্যাদি বিশ্বকাপ ঘুরে এসেছেন। ট্যুরিস্ট টিমে যে-সে ঢুকতে পারে না। একেবারে হিসেব কষে সিলেকশন। মন্ত্রীর নেতৃত্বে পদযাত্রায় অন্তত একশ পঁচিশ কিলোমিটার না হেঁটে থাকলে কারও নাম ওঠারই নিয়ম নেই। এবার মন্ত্রীমশাই চারজন মহিলা ফুটবলারকেও পাঠাচ্ছেন। টার্গেট ছিল ৩০% সংরক্ষণ। ১২ জনের টিমে ৩০% মানে ৩.৬। ৩.৬ জনকে পাঠানো সম্ভব কিনা, তা নিয়ে তিন ঘণ্টা রুদ্ধদ্বার বৈঠকের পর ঠিক হয়, যাকগে, একটু বাড়িয়ে ৪ করে দেওয়া যাক।

১২ লাখ টাকা দিয়ে কী কী ভাল কাজ করা যেত? এই ধরুন, পঁচিশে বৈশাখ দুপুরে বা ছাব্বিশে জানুয়ারি মাঝরাতে কলকাতা থেকে দীঘা পদযাত্রা করা যেত। বিশ্বকাপ ফুটবল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার জন্য। তাতে কত খরচ হত, সে হিসেব কষার আগেই ওরা হাজির। ওরা পাঁচজন। প্রাক্তন ফুটবলার। ওদের ক্যাপ্টেন বলল, 'দাদা, বাঁচান।' বলে কী! আমি কাউকে মারতেই পারি না, বাঁচাব কী করে? ওদের ভাইস ক্যাপ্টেন বলল, 'বিচ্ছিরি খবরটা এখনও পাননি? ফ্রান্স থেকে ফিরে একমাসের মধ্যে আমাদের প্রত্যেককে রিপোর্ট দিতে হবে। আর কারও কাছে গেলে ফাঁস হয়ে যাবে বলে আপনার কাছে এলাম। আমরা আগেই কাজ সেরে নিশ্চিন্তে বেড়াতে যেতে চাই। ফেরার

একমাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে বলছে, আমরা যাওয়ার একমাস আগে রিপোর্ট রেডি করে ফেলতে চাই। হেল্প করুন।' ট্যুরিস্ট টিমে তো ১২ জন, বাকি ৭ জন কোথায়? প্রাক্তন গোলকিপার ও মন্ত্রীর স্টোরকিপার বলল, 'মেয়েদের খবর জানি না। আটজন মেল ফুটবলারের মধ্যে আমরা পাঁচজন টিমে আছিই। বাকি তিনটে জায়গা নিয়ে ঝামেলা চলছে। এগারজন ক্যান্ডিডেট। একজন এক্স-ফুটবলার তো চান্স না পেলে তৃণমূলে চলে যাবে বলেছে। হুমকি দিয়েছে, সাড়ে তিনশ কিলোমিটার পদযাত্রার পরও যদি ওকে না নেওয়া হয়, পদযাত্রা করেই প্যারিস চলে যাবে। মিঠুন চক্রবর্তীকে নিয়েও প্রবলেম। মন্ত্রীদা ওঁকে পাঠাতে চান। কিন্তু কথা উঠেছে, মিঠুন তো এক্স নয়, কারেন্ট ফুটবলার। ওসব কথা থাক। আপনি আমাদের পাঁচজনকে আগে বাঁচান। রিপোর্ট লিখে দিন।

পাঁচটি আবেদনময় মুখ, পাঁচ জোড়া অভিব্যক্তিহীন চোখ ও পাঁচ জোড়া ক্লান্ত পায়ের দিকে তাকিয়ে কষ্টই হল। আহা, ওরা কত পদযাত্রা করেছে। খেলা ছাড়ার পরেও কত খাটাখাটনির মধ্যে আছে। ওরা এত কষ্ট করে রাজ্যবাসীর পয়সায় ফ্রান্সে বেড়াতে যেতে পারবে, আর আমি ক'টা রিপোর্ট লিখে দিতে পারব না?

বললাম, পাঁচজনের রিপোর্ট পাঁচরকম হতে হবে। নাহলে বলাবলি হবে যে তোমরা টোকাটুকি করেছ। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করলাম, আগে তুমি বল কোন বিষয়ে জোর দিতে চাও। সেইমত লিখে দেব। প্রাক্তনদের ক্যাপ্টেন বলল, ক্যাপ্টেনসি নিয়ে রিপোর্ট দিলে ভাল হয়। বেশ। তবে এইরকম : 'পাবলিকের পয়সায় বিশ্বকাপে না গেলে জানাই হত না, ক্যাপ্টেনসি কাকে বলে। আমি এতদিন জানতাম, মাঠে নেমে টস হয়, তার আগে কিছু ভাবার নেই। একটা ম্যাচের টিকিট না পেয়ে স্টেডিয়ামের মাত্র সাত কিলোমিটার দূরে পার্কে বসে ফ্রেঞ্চবাদাম খাচ্ছিলাম। চীনেবাদামের চেয়ে অনেক বেশি টেস্টফুল। পার্কেই একজন জার্মানের সঙ্গে আলাপ হল। ওর মুখেই শুনলাম, ওয়ার্ল্ড কাপের দেড়মাস আগে থেকেই ক্লিন্সম্যান টস প্র্যাকটিস করে গেছে। জার্মানির তিনজন ন্যাশনাল রেফারি রোজ একঘণ্টা ধরে কয়েন ওপরে ছুঁড়েছে, ক্লিন্সম্যান হেড-টেল বলে গেছে। প্রথমদিকে ফিফটি-ফিফটি ছিল, দেড়মাস অক্লান্ত প্র্যাকটিসের পর সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট কারেক্ট। অপোনেন্ট টিমের ক্যাপ্টেন কল করলে কী করতে হবে? ক্লিন্সম্যান চোখ বন্ধ করে বুকে ক্রুশ আঁকে। আমরা এখানে চোখ বন্ধ করে 'জয় মা' জাতীয় কিছু বলতে পারি।'

দ্বিতীয় প্রাক্তনের ইচ্ছা, স্টেডিয়াম নিয়ে লেখা। বেশ। তাহলে এইরকম : 'মাঠে ঢুকে খেলা দেখেছি একদিন, কিন্তু স্টেডিয়ামের বাইরে চক্কর দিয়েছি এগারবার। এ ব্যাপারে পদযাত্রার অভিজ্ঞতা বিশেষ কাজে লেগেছে। দুটো স্টেডিয়াম আমাদের যুবভারতীর চেয়ে কিছুটা ছোট। নাহলে এগারবার চক্কর দিতে পারতাম না। পদযাত্রা প্র্যাকটিসের সুবিধের জন্য সল্টলেক স্টেডিয়ামকেও ভেঙে একটু ছোট করে নিলে ভাল হয়। প্যারিসে আইফেল টাওয়ার বলে একটা জিনিস দেখলাম। আমার মনে হয়, ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা আরও উন্নত করার জন্য সল্টলেক স্টেডিয়ামের চার কোনাতেও চারটে আইফেল টাওয়ার বসালে ভাল হয়। টাকা তোলার জন্য প্রতিদিন ভোর সাড়ে ছ'টায় আধঘণ্টা পদযাত্রা করতে আমরা

রাজি আছি।'

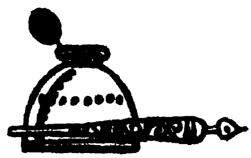
তৃতীয়জনের বক্তব্য খুবই ধারালো। বলল, 'খেলা তো এখানে বসে টিভিতে সবাই দেখবে। এখানে বসে যা দেখা যাবে না, আমি তা নিয়েই রিপোর্ট দিতে চাই।' বেশ। তবে এইরকম : 'ফ্রান্সের টেলিভিশন অত্যন্ত উন্নতমানের। বিশ্বাস করুন, একটুও ধুলো জমে না। প্রথমদিন অভ্যেসমত রুমাল দিয়ে মুছতে গিয়ে দেখি, রুমালটা আগের চেয়ে পরিষ্কার হয়ে গেল। আর ছবিও যে কী পরিষ্কার, বলে বোঝাতে পারব না। সরকার আমাদের ফ্রান্সে না পাঠালে যে কী হত! এখানকার টেলিভিশনে এত পরিষ্কার খেলা দেখতে পারতাম না। একবারও লোডশেডিং হয়নি, একটাও আরশোলা টেলিভিশনের পাশে ঘুরে বেড়ায়নি। হোটেলের ব্যবস্থাও ভাল। তবে, পরের বার থেকে আরও ভাল হোটেলের ব্যবস্থা করা উচিত। ইলিশ বা কই মাছ না হলেও চলবে, সকালে লুচি-বেগুন ভাজার ব্যবস্থা যেন থাকে। আর-একটা কথা, সরকার একটা করে এক্সট্রা বড় ব্যাগ যেন উপহার দেন যাওয়ার দিন। জিনিসপত্র কিনে সুটকেসে ঠেসে ঢোকাতে সত্যিই খুব অসুবিধে হয়েছে।'

প্রাক্তন গোলকিপার তথা মন্ত্রীর স্টোরকিপারের রিপোর্ট এইরকম দাঁড়াল : 'ডাক্তার বলেছেন, আমার চলাফেরা কমানো উচিত। চার বছর পর ওয়ার্ল্ড কাপ ট্যুরে যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এমতাবস্থায় আমার প্রস্তাব, বিশ্বকাপ ট্যুর বন্ধ করে দেওয়া হোক। দরকার নেই। আসলে, ওদের কাছ থেকে আমাদের কিছুই পাওয়ার নেই। কী বল্ব, ফাইনালের আগে 'হ্যালো মাইক টেস্টিং হ্যালো হ্যালো' বলার ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। খেলার আগে মিনিস্টারদের সঙ্গে হ্যান্ডশেকের ব্যবস্থাও নেই। সবচেয়ে যেটা খারাপ লাগল, ফুটবলাররা সারাক্ষণ মাঠ জুড়ে শুধু দৌড়ায়। একদম হাঁটে না। ওদের এখানে এনে পদযাত্রা শেখানো উচিত। খুব গরম লাগলে, নেতাজি ইনডোরে এ সি চালিয়ে পদযাত্রা করানো যায়।'

পাঁচ নম্বর রিপোর্টটা একটু খেটেখুটেই লিখতে হল। প্রাক্তন মিডফিল্ডারের ইচ্ছা, টেকনিকাল রিপোর্ট দেবে। বেশ। এইরকম : 'বাংলার তথা ভারতের ফুটবল স্ট্যান্ডার্ড যদি বাড়াতে হয়, কাতারে কাতারে ফুটবলার পাঠানো উচিত ইতালিতে। ওরা ওখানে গিয়ে জুভেন্টাস, এ সি মিলান, ইন্টার মিলান, লাজিও, ফিওরেন্তিনা, নাপোলিতে খেলুক। খাওয়াদাওয়ার কষ্ট একটু হবে, কিন্তু আমাদের ফুটবলের স্ট্যান্ডার্ড বাড়বে। ব্রাজিলের রোনাল্ডো, লিওনার্দো, অলিভেইরা ইতালিতে খেলছে। আর্জেন্টিনার বাতিস্তুতা, হল্যান্ডের ক্লুইভার্ট, জার্মানির বিয়েরহফ— সবাই ইতালির লিগে খেলে। আর একটা প্রস্তাব আছে। আমাদের ফুটবলারদের অভ্যেস পাল্টাতে হবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চা খাওয়া চলবে না। কফি খেতে হবে। ব্রাজিলের লোকেরা রোজ সকালে কফি খায়। আমার মনে হয়, কফির সঙ্গে ফুটবলের সূক্ষ্ম টাচের সম্পর্ক আছে। অভ্যেস পাল্টাতে অবশ্য সময় লাগবে। আপাতত কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে গিয়ে খোঁজ নেওয়া উচিত, কে কে দিনে অন্তত ১২ কাপ কফি খান। এরকম অন্তত তিনজনকে সামনেরবারই বাংলা দলে ঢুকিয়ে দেওয়া দরকার।'

অন্যদের হয়ে রিপোর্ট লিখে দিয়ে মনে হচ্ছে, আমার নিজেরও কিছু বলা উচিত। আমার প্রস্তাব, ১২ লাখ টাকা খরচ করে ১২ জনকে ফ্রান্সে পাঠানোর দরকার নেই। অন্তত এবার অক্লান্ত পদযাত্রীরা কিঞ্চিৎ ত্যাগ স্বীকার করুন। এই ১২ লাখ টাকা খরচ করে অভূতপূর্ব সংবর্ধনা দেওয়া হোক প্রিয় ক্রীড়ামন্ত্রীকে, যাঁর মাথায় এমন আশ্চর্য বিশ্বকাপ ভ্রমণের কথা ষোল বছর আগে এসেছিল। মনুমেন্টের মাথায় বিশাল মঞ্চ তৈরি হোক। কুমার শানুর উদ্বোধনী গণসঙ্গীতের সঙ্গে গণনৃত্য করুন কুমার মিঠুন। সমাগত দর্শকদের প্রদক্ষিণ করে পদযাত্রা করে চলুন বিশ্বকাপ-বেড়ানো ফুটবলার, আমলা ইত্যাদিরা। অবশ্য, এখনই অনুষ্ঠানটা করা যাবে না। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখন পঞ্চায়েত প্রচারে ব্যস্ত আছেন।

বেশি নাক গলাব না



যা দিনকাল পড়েছে, পাড়ার মোড়ে আড্ডা মারতেও স্পনসর লাগছে। আর কলকাতার ফুটবলের মতো বড় ব্যাপার, বড় দল স্পনসর ছাড়া চলে? কিন্তু খুঁত ধরা বাঙালির স্বভাব, প্রশ্ন উঠে গেছে, বড় দুটো ক্লাবেরই স্পনসর এক কোম্পানি কেন? যাদের মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তাদের দু'জনেরই 'মালিক' একজন কেন? প্রশ্ন উঠলে জবাব নামে। মোহনবাগান সভাপতি টুটু বসুকে ফোনে খুঁজলাম। শুনলাম একটু বেরিয়েছেন, বেলেঘাটা বা ব্রাসেলসে গেছেন। ইস্টবেঙ্গলের পল্টু দাসকে পেলাম। বললেন, 'এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে পারব না। আমাদের কথাবার্তাও স্পনসর্ড, মানে সেন্সরড।' ভেবে দেখলাম, চাঁদ সম্পর্কে লিখতে হলে চাঁদে যেতে পারলেই ভাল। স্পনসর সম্পর্কে প্রশ্নের জবাব পেতে হলে স্পনসরের কাছে যাওয়া ভাল। কলকাতাতেই পেয়ে গেলাম ইউনাইটেড ব্রুয়ারিজ কোম্পানির এক মেজকর্তাকে! বাঙালি, এবং কী আশ্চর্য, বাংলায় কথা বলেন।

'চা না কফি?' শুনে চমকে গেলাম। ভেবেছিলাম, জিজ্ঞেস করবেন ম্যাকডাওয়েল না কিং ফিশার? হুইস্কি না বিয়ার? চমৎকার গ্লাসে কফি, 'চিয়ার্স' বলে প্রথম প্রশ্ন : আপনারা ফুটবল টিম স্পনসর করছেন ভাল কথা, কিন্তু একসঙ্গে ইস্টবেঙ্গল আর মোহনবাগান কেন? লোকে তো বলছে এটা কেলেঙ্কারির দিকে যাবে। আপনারা জবাব দেবেন না?

স্পনসর : আমরা জবাব দিই না, টাকা দিই। তবু যখন কষ্ট করে এসেছেন, দু-চারটে কথা বলি। আমরা লিগ চ্যাম্পিয়ন টিমের স্পনসর হতে চাই। এই দুটোর মধ্যে একটা চ্যাম্পিয়ন হবে। কুড়ি বছর আগে হলে মহমেডানকেও নিতাম। টাকাও দেব, টেনশনও নেব, তা হয় না। এখন আমরা লিগ শুরু হওয়ার আগেই জানি আমাদের টিম চ্যাম্পিয়ন। তবে একটা কথা জেনে রাখুন, আমরা বেশি নাক গলাব না। ছোটখাটো দু-একটা ব্যাপার শুধু নিজেরা দেখব।

- ছোটখাটো? কীরকম?

স্পনসর : এই যেমন এবার বললাম, কোন প্লেয়ার কত রেট পাবে, কে কোথায়

খেলবে। এরপর বলতে পারি, ফাইনাল টিমে কারা থাকবে, কে কবে খেলবে।

● কোচ থাকবেন না?

স্পনসর : নিশ্চয় থাকবেন। ধীরে ধীরে এগোচ্ছি, বেশি নাক গলাব না, তবে কোচও আমরা ঠিক করে দেব। কোচের জামার রঙ কী হবে, হেরে গেলে তাঁর অজুহাতের ভাষা কী হবে, সব ঠিক করে দেব।

● কোচের জামার রঙ... ইয়ে... ক্লাবের জার্সির রঙও পাল্টে দেবেন নাকি?

স্পনসর : বারবার তো বলছি, বেশি নাক গলাব না। লাল-হলুদ আর মেরুন-সবুজই থাকবে। তবে সামনের সিজনে হয়ত বলতে পারি, মোহনবাগান লাল-হলুদ পরে খেলুক, ইস্টবেঙ্গল মেরুন-সবুজ।

● হ্যাঁ, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে আপনারা বেশি নাক গলাবেন না। আরও দু-একটা ছোটখাটো ব্যাপারের কথা যদি বলেন।

স্পনসর : এই ধরুন, কারা ক'টা গোল দেবে, কে কে গোল করবে, কখন গোল করবে, কীভাবে গোল খাবে, এরকম ছোটখাটো ব্যাপার আমরা ঠিক করে দিতে পারি।

● ব্যাপারটা কিন্তু এত সহজ নয়। ধরুন কোনও টিমের এক গোলে হারার কথা। সাতান্ন মিনিটে গোল খাওয়ার কথা। স-ব হল। কিন্তু যাদের হারার কথা, তাদের কোনও ফরোয়ার্ড যদি ভুল করে গোল শোধ করে দেয়? হঠাৎ যদি বল গোলে ঢুকে যায়?

স্পনসর : এরকম গণ্ডগোল হওয়ার কোনও চান্স নেই। বাইরে মারতে গিয়ে গোলে ঢুকে যেতে পারে ভাবছেন? আমরা এসব ক্ষেত্রে ফরোয়ার্ডদের কড়া ইনস্ট্রাকশন দেব, বল গোলেই মারতে হবে তা হলে বাইরে যাবেই। এই ফরোয়ার্ডদের ওপর আমাদের কনফিডেন্স আছে।

● তবু, তবু যদি কোনওভাবে গোলে বল ঢুকে যায়?

স্পনসর : এত 'তবু তবু' করেন কেন? ঢুকে গেলেও রেফারি গোল দেবে না। আমরা এরপর রেফারি স্পনসর করার কথাও ভাবছি। তবে বেশি নাক গলাব না।

● জার্সি পাল্টাপাল্টির মতো আর কোনও ছোটখাটো ব্যাপার ভাবছেন?

স্পনসর : জার্সি নিয়েই আরও ভাবছি। ইউরোপে ফুলহাতা জার্সি পরে খেলে, এখানে হাফহাতা। কিন্তু এত গরম দেশে হাফই বা কেন? স্যান্ডো গেঞ্জি চললে, স্যান্ডো জার্সিই বা নয় কেন?

● তা হলে কি...

স্পনসর : না না, যা ভাবছেন তা নয়। আমরা স্যান্ডো প্যান্ট জাতীয় কিছুর কথা ভাবছি না।

● এই সব ছোটখাটো ব্যাপার করতে গেলেও তো আই এফ এ বা এ আই এফ এফ বাগড়া দিতে পারে?

স্পনসর : ভাবছি, ভাবছি। বেশি নাক গলাব না, তবে আই এফ এ আর এ আই এফ এফ-কে স্পনসর করার কথাও ভাবছি। ছোটখাটো ব্যাপারেও ওদের সাহায্য দরকার।

এই ধরুন, কোনও ম্যাচে ১২ গোল চাই, বার ৩০ ফুট উঁচু করে দিতে হবে, পোস্ট দুটো কর্নার ফ্ল্যাগের সঙ্গে পুঁততে হবে।

● ক্লাবের কর্মকর্তারা ঠিকঠাক কো-অপারেট করছেন?

স্পনসর : মোটামুটি। তবে আমরা আরও আশা করি। দুই ক্লাবের অফিসিয়ালদের ঝগড়া বাড়াতে হবে। গরম গরম স্টেটমেন্ট দিতে হবে। ফুটবলারদেরও গরম হতে হবে। বড় ম্যাচে অন্তত তিনটে রেড কার্ড দেখতে হবে। দুটো ক্লাবেরই স্পনসর আমরা বলে ঝগড়া থাকবে না, মারপিট থাকবে না, তা হয় না।

● ঝগড়া মারপিটও স্পনসর করবেন বলছেন?

স্পনসর : এইরকম সব ছোটখাটো ব্যাপার আর কী। ধরুন, বল নিয়েও ভাবনাচিন্তা চলছে। বলের শেপ গোল না রেখে, বোতলের মতো করে দিলে কেমন হয়? একটা টিম ম্যাকডাউয়েল-বল আরেকটি টিম কিং ফিশার-বল নিয়ে নামছে, ভাবতে ভাল লাগছে না?

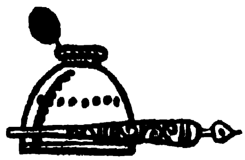
● দারুণ। কিন্তু এত সব দেখে, মানে এরকম সব ছোটখাটো চেঞ্জ দেখে পাবলিক যদি খেপে যায়?

স্পনসর : ভেবেছি। স্টেপ বাই স্টেপ। আমরা পাবলিককেও স্পনসর করব।

● আপনাদের কতটা লাভ হচ্ছে?

স্পনসর : সবসময় লাভক্ষতির কথা ভাবলে হয় না। সামাজিক দায়িত্ব বলে একটা কথা আছে। কলকাতার ফুটবলকে বাঁচাতে হবে। তার চেয়েও বড় কথা, কলকাতা ফুটবলের অসুখ সারাতে হবে। এই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল নিয়ে কত বছর ধরে কত গণ্ডগোল। আমরা ক্রমশ নাম দুটো পাল্টে দেব। একটা টিমের নাম হবে ম্যাকডাওয়েল, আরেকটার কিং ফিশার। আগে মস্তানরা বলত 'মেরে বাপের নাম ভুলিয়ে দেব'। আমরা মস্তান নই, আমরা ক্লাবের নাম ভুলিয়ে দেব। তাই বলে ভাববেন না যে কলকাতা ফুটবলে স্পিরিট থাকবে না। অফকোর্স থাকবে। মনে রাখবেন, আমাদের দুটো প্রোডাক্টেই স্পিরিট আছে, কম-বেশি পার্সেন্টেজ। দেখুন না, কলকাতা ফুটবলের চেহারাটাই পাল্টে দেব। তবে হ্যাঁ, বেশি নাক গলাব না।

যুদ্ধ

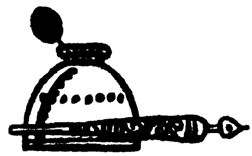


আজকালে কাজ করি বলে আজকালের সবই ভাল লাগবে এমন তো কোনও কথা নেই। তা হলে তো বলতে হয়, আহা, বর্ষাকালে আজকাল অফিসের সামনে কী চমৎকার জল জমে, রিকশ না পেলে কোমর জল ঠেলে ঢুকতে হয়। এত বড় একটা যুদ্ধ হচ্ছে সীমান্তে, এত দিন পর, অন্য কাগজে যুদ্ধের রানিং কমেন্টারি, স্ট্যাটিসটিক্স, এক্সপার্ট রিপোর্ট— কত কী বেরোচ্ছে, আজকাল ডুবে আছে ক্রিকেটের কাদায়। খেলায়, ছেলেখেলায়। আজকালেও অবশ্য গম্ভীর, সচেতন লোক কিছু আছে, নিউজ ডিপার্টমেন্টে এমনই একজনকে দেখে দুঃখ করে বললাম, 'যুদ্ধ নিয়ে কথা বলার লোক পাচ্ছি না, বুঝলেন। আপনার কি মনে হয় না যে, ইন্ডিয়া ওভারকনফিডেন্ট থাকায় ঝামেলায় পড়ে গেল? মনে হয় না যে, অ্যাকশন নিতে আমরা দেরি করে ফেললাম?' নিউজের সচেতন সহকর্মী বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে একশ ভাগ একমত। অস্ট্রেলিয়া যে কেনিয়া, শ্রীলঙ্কা বা ইংল্যান্ড নয়, ইন্ডিয়া জানত না? এত কনফিডেন্সই কাল হল। আর দেরি? সে তো হয়েছেই। ওয়ার্ল্ড কাপে যে অলরাউন্ডার দরকার, সিলেক্টররা বুঝল না কেন? ওয়েদারের কথা মনে রেখে উঠতি সিম বোলারদের আগের টুর্নামেন্টগুলোয় সুযোগ দিল না কেন?' রবিবাসর-এর বিশিষ্ট সহকর্মীর ওপর অবশ্য ভরসা রাখা যায়। ফালতু হইচইয়ের মধ্যে নেই। বললাম, 'বুঝলেন, আমাদের মধ্যে দেশাত্মবোধ বলে কিস্যু নেই। ওই বরফঠাণ্ডায় আমাদের বীররা লড়াই করছে, আমাদের কোনও ফিলিংসই নেই।' রবিবাসর-এর বিশিষ্ট বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমি একমত নই। কে বলল আমাদের ফিলিংস নেই? লন্ডনে ব্রিস্টলে হোভে আমাদের হিরোরা সোয়েটার পরেও যখন কাঁপছে, আমরা এখানে বসে ছত্রিশ সাঁইত্রিশ আটত্রিশ ডিগ্রিতে কাঁপছি। ম্যাকগ্রাথ বল করার সময় আমি তো চাদর পর্যন্ত গায়ে দিয়েছি। এর চেয়ে বেশি কী ফিলিংস আশা করেন?' গম্ভীর লাইব্রেরিয়ান মোটা ফ্রেমের চশমা-নাকে আরও মোটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। প্রথমে তো আমার কথা শুনতেই পেলেন না। গলাখাঁকারি দিয়ে বইয়ের ঘোর কাটিয়ে বললাম, 'আজকাল আর আজকালে সিরিয়াস কথা বলার লোক পাওয়া যায় না। আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় না যে, মাঝে মাঝে যুদ্ধ হওয়া ভাল?

তা হলে মানুষের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগে। দেশপ্রেমেরও তো প্র্যাকটিস দরকার?' গম্ভীর লাইব্রেরিয়ান আরও গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন। এই যে সৌরভ ১৮৩ করল, টনটনে কয়েক টন ওভারবাউন্ডারি মারল, দেশাত্মবোধ হইহই করে জেগে উঠল। এখন ঘন ঘন খেলা, তাই ঘন ঘন দেশপ্রেমের প্র্যাকটিস।' মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। কিছু মানুষ তো থাকেনই, যাঁদের ওপর গভীর বিশ্বাস রাখা যায়। ইন্ডিয়ার খেলা চলছে, তবু টিভি থেকে অনেক দূরে, মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন পলিটিক্যাল করেসপন্ডেন্ট। বললাম, 'দেশের কথা আমার বা আপনার মতো দু-চারজন ভাবলেই বা কী হবে? বেশিরভাগই তো হচ্ছে হুজুগে।' পলিটিক্যাল করেসপন্ডেন্ট বললেন, 'ঠিক বলছেন না। সবাই ভাবছে। আমার নার্ভ উইক। শচীন আউট হওয়ার পর আর সহ্য করতে পারলাম না। উঠে এলাম। যারা এখনও দেখছে, তারাও তো দেশের কথাই ভাবছে।' যুদ্ধের ওপিঠ হল শান্তি। সমান ইম্পর্ট্যান্ট। চিঠিপত্র বিভাগের ইন-চার্জ রীতিমত পিস অ্যাক্টিভিস্ট। তাঁকে সামনে পেয়ে বললাম, 'যুদ্ধ-যুদ্ধ করে উত্তেজনা তৈরি করা অবশ্যই ভাল নয়। আফটার অল, ভারত আর পাকিস্তান প্রতিবেশী দেশ, এখন বাসটাসও চলছে, উত্তেজনা কমানোর কথা আমাদের ভাবা উচিত।' চিঠির ইন-চার্জ বললেন, 'ভাবা তো হচ্ছে। আজহার আর আক্রাম— দুজনই বলেছে, মঙ্গলবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ যাতে শান্তিতে হতে পারে, সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে। সোজা কথা, দামি কথা, যুদ্ধের মধ্যেও শান্তি চাই।' চিফ রিপোর্টার তিনটে কাগজ একসঙ্গে পড়তে পড়তে কী যেন নোট করছিলেন। একটা কথা মাথায় ঘুরঘুর করছিল, ওঁকে বলাই ভাল, সিরিয়াস লোক। ওদিকে যুদ্ধ চলছে, এদিকে উল্টোপাল্টা কমেন্ট করছেন ডিফেন্স মিনিস্টার ফার্নান্ডেজ। বললাম, 'যাঁর হাতে যুদ্ধের আসল ভার, তিনিই এত উল্টোপাল্টা বকছেন। পাবলিক ক্ষেপে যাবে না?' চিফ রিপোর্টার চার নম্বর কাগজটা সামনে রেখে বললেন, 'পাবলিকের কথা বাদ দিন, সব সময় ক্ষেপেই আছে। কিন্তু উল্টোপাল্টা কথা তো আজ নতুন বলছে না আজহার। টেক ইট ইজি।' কালচারাল ডিপার্টমেন্টের নন-পলিটিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর রাজনীতি একদম পছন্দ করেন না। বললেন, 'কী ব্যাপার মিঃ সাপুড়ে, খুব চিন্তিত মনে হচ্ছে?' বললাম, 'ভাবছি। জানেন তো, সব যুদ্ধের মধ্যেই একটা পলিটিক্স থাকে। খারাপ পলিটিক্স। আর সত্যি বলতে, পলিটিক্স করে করেই সর্বনাশ হয়ে গেল আমাদের।' অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর বললেন, 'যা বলেছেন। সৌরভ বা জাদেজার বদলে আজহার ক্যাপ্টেন, পলিটিক্স ছাড়া কী? দেবাশিস মহান্তিকে বসিয়ে রেখে আগরকারকে খেলানো পলিটিক্স নয়? এভাবে যুদ্ধ জেতা যায়?' নাঃ, এরপর আর কারও সঙ্গে কথা বলার মানে হয় না। তবে, একজন বাকি আছে। আসল লোক। দু-চারদিন বাইরে ছিলেন। ফিরে এসেছেন। এডিটরের ঘরে ঢুকে বললাম, 'খেলা খেলা করে দেশটা উচ্ছন্নে গেল। এত বড় একটা যুদ্ধ হচ্ছে, তা নিয়ে চিন্তাই নেই। এবার আপনি এসে গেছেন, কিছু করুন। খেলার খবর নিয়ে পাগলামি বন্ধ করুন আজকালে। যুদ্ধ আনুন প্রথম পাতায়, পাঁচের পাতায়, পারলে সব পাতায়। উত্তেজনায় এক ঝোঁকে এতগুলো কথা বলে ফেললাম। ফাঁকা অ্যাশট্রেটা ঠোঁটে ঘষতে

ঘষতে (এখন আজকালে নো স্মোকিং) এডিটর সাহেব বললেন, 'আমি আপনাদের সঙ্গে দেড়শ ভাগ একমত। খুব ভাল বলেছেন। নিউজ এডিটর ঢুকলেন। যুদ্ধের লেটেস্ট খবর জানালেন। 'স-ব ভেতরের পাতায়'— বলে টিভিতে খেলার আওয়াজ বাড়িয়ে দিলেন এডিটর। বাড়ি ফিরে কিছু না খেয়েই শুয়ে পড়লাম। মাথায় হাত রেখে নিজেকেই বললাম, হায়, কী হবে এ দেশের। শুনতে পেয়ে ছেলে বলল, 'অত ভেবো না বাবা। বাকি দুটো ম্যাচ জিতে আমরা ঠিক সেমিফাইনালে চলে যাব।'

মহাবেটিং



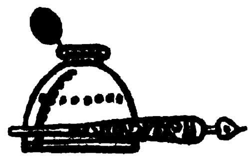
এডিটর সাহেব ওরফে সম্পাদক মহাশয় স্তম্ভিত হলেন। যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তিনি লিখতে বললেন এবং আমি 'না' বললাম। আমি নামকরা চাতক-লেখক, গলা-হাত শুকিয়ে কাঠ, কবে সম্পাদক মশাই লিখতে বলবেন। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা, একটাই মুখ, সেই মুখে 'না'! বলতে হল, কারণ আদেশ, ক্রিকেট-বেটিং নিয়ে লিখতে হবে। এডিটর সাহেব যথার্থই কিংকর্তব্যবিমূঢ়, সামনের পেপারওয়েটটা আমার নাকে ছুঁড়বেন, না নিজের গালে একটা থাপ্পড় কষাবেন। খরখরে গলা যথাসম্ভব খাদে নামিয়ে বললাম, ব্যাপারটা হয়েছে কী, এ বিষয়েই একটা বেটিং চলছে। নিউজ এডিটরের সঙ্গে জয়েন্ট নিউজ এডিটরের বেটিং, আমাকে আপনি বেটিং নিয়ে লিখতে বলবেন কিনা। ব্যাপারটায় আমিও জড়িয়ে আছি। দূরে থাকতে চাই। ভেতো এবং গেঁতো বাঙালি, সি বি আই এনকোয়ারির সামনে পড়লে স্ত্রী বিধবা হবে, মেয়ে অনাথ হবে, পাড়ার ক্লাব ভাইস প্রেসিডেন্ট হারাবে। পিরামিড পেপারওয়েট দিয়ে নাক চুলকোতে চুলকোতে এডিটর সাহেব বললেন, বলেন কী, এতদূর! কাগজেও বেটিং? আচ্ছা, খবরের কাগজ নিয়েও বেটিং হচ্ছে নাকি? বেশ নিরাপদ কাজে পেপারওয়েটের ব্যবহারে নিশ্চিন্ত হয়ে বললাম, হতেই পারে। ধরুন বেটিং হল, একটা খবরের কাগজে আগামী তিন মাসে কতবার রিটায়ার করবেন জ্যোতি বসু। দু'বার, না তার চেয়েও বেশি। ধরুন বেটিং হল, একটা খবরের কাগজে আগামী আড়াই মাসে কতবার ভাঙবে সি পি এম, তিনবার না চারবার। ধরুন...। 'থামুন, প্লিজ, থামুন, আর ধরতে পারছি না। এরপর তো শুনব গায়ক-গায়িকারাও বেটিংয়ে আছে।' ফ্লো এসে গেছে, বললাম, 'থাকতেই পারে। এই ধরুন, ধরে যান প্লিজ, বেটিং হল, রবিবার শরৎ সদনের জলসায় ইন্দ্রনীল সেন গাইতে গাইতে কেশে ফেলবেন কিনা। ঘনঘন হাসলেও কখনও কাশেননি, কাশলে তো বড় ব্যাপার, সুতরাং বেটিং। ধরুন, অক্লান্তভাবে ধরে যান, বেটিং, তিন মাসের মধ্যে এইচ এম ভি ঋত্বিক রোশনকে দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়াবে কিনা।' আধ কাপ কফি আর আধ গ্লাস জল খেয়ে এডিটর সাহেব বললেন, যা শুনছি, এরপর তো দেখব সাহিত্যিকরাও বেটিংয়ে আছেন। থাকতেই পারেন। ধরুন, ধরা প্র্যাকটিস করুন, বেটিং, বুদ্ধদেব গুহ এবার পুজোয় তিনটে

উপন্যাস লিখবেন, নাকি চারটে। অথবা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের পুজোর উপন্যাসে নায়িকা প্রথমে হলুদ শাড়ি পরবেন, না পরে।'

আদেশতান্ত্রিক গলায় নলেন গুড়ের সন্দেশ এনে এডিটর সাহেব বললেন, আপনি আমার চোখ-নাক খুলে দিলেন মশাই। চো রামস্বামী বলেছেন, এবার পার্লামেন্টের ভোটাভুটি নিয়েও বেটিং হবে। আমি অপ্রতিরোধ্য : হতেই পারে। রাজনীতিতে বেটিং খুব হতে পারে। এই ধরুন, হাত দিয়ে না পারলে জাল দিয়ে ধরুন, বেটিং, কলকাতায় মমতা ব্যানার্জির পরবর্তী সাংবাদিক সম্মেলনে পাশে কে থাকবেন? সুব্রত মুখার্জি, পঙ্কজ ব্যানার্জি, শোভনদেব চ্যাটার্জি, সুদীপ ব্যানার্জি, সোমেন মিত্র— এঁদের মধ্যে কে? অথবা, মমতার পরবর্তী রেলানুষ্ঠানে উদ্বোধনের দড়ি সোমেন বাঁ হাতে ধরবেন, না ডান? অথবা ধরুন, ধরা অতি উত্তম ব্যায়াম, বেটিং, সুভাষ চক্রবর্তী আগামী তিন মাসে কতবার মমতার প্রশংসা করে বলবেন— পার্টি তাড়ালে তাড়াক? চারবার, না তার চেয়ে বেশি? অথবা ধরুন, ধরেছেন যখন ছাড়বেন না, সুব্রত মুখার্জির পরবর্তী টার্গেট কে, সোনিয়া গান্ধী না মমতা ব্যানার্জি? অথবা, ধরুন, মুঠো আলগা করবেন না প্লিজ, আগামী পাঁচ মাসে জ্যোতিবাবু কতবার বলবেন— পার্টি কর্মীদের নম্র হতে হবে, মানুষের অভিযোগ শুনতে হবে, তিন না তার চেয়েও বেশিবার? নতুন দিগন্ত খুলে গেছে। আকাশে বেটিং, বাতাসে বেটিং, ট্যাঁড়সেও বেটিং। মানে, ট্যাঁড়সেও আমেরিকার পেটেন্ট এসে যাবে কিনা।

এডিটর সাহেব গোটা এক কাপ কফি খেলেন, গোটা এক গ্লাস জল খেলেন, গোটা এক পিস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, এবার আপনি ধরুন, বেটিং, আগামী সাড়ে তিন মাসে আরও ক'টা বাংলা টিভি চ্যানেল আসবে, এগার, না তার চেয়েও বেশি? এই প্রথম, জীবনে এই প্রথম এডিটর সাহেবের সঙ্গে একমত হলাম, যাকে বলে তাঁর বক্তব্য সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করলাম। ফাঁকা গ্লাসে এক চুমুক দিয়ে বললেন, জানি না, জানি না, কী যে হবে জানি না, এরপর তো শুনব কলকাতা ফুটবলেও বেটিং হচ্ছে। এডিটর সাহেবের জেনুইন সেকেন্ড লাভ ফুটবল (ফার্স্ট লাভ অবশ্যই নিজের প্রশংসা শোনা)। দেড় হাত তুলে আশ্বস্ত করলাম, 'চিন্তিত হবেন না, চিন্তিত হয়ে অন্যদের চিন্তিত করবেন না, এটা কখনই হবে না। কলকাতা ফুটবলের ফরোয়ার্ডদের ওপর ভরসা রাখুন। ওদের দিয়ে বেটিং হবে না। হারতে হবে, কিছুতেই গোল করা যাবে না— এই বেটিং ওরা ভেস্তে দেবে। ইচ্ছে করে বাইরে মারতে গেলে বল নিশ্চিতভাবে গোলে ঢুকে যাবে!'

রেডিসেডি গো-ওল



যাকে বলে নাচতে নাচতে এডিটর সাহেবের ঘরে গেলাম। ডেকে পাঠিয়েছেন। বকাঝকার জন্য ডাকার চান্স নেই, সম্প্রতি আমি কোনও ভুল করিনি, কারণ সম্প্রতি আমি কিছু-ই করিনি। এত বছর ধরে লাইন দিয়ে আছি, নিশ্চয় এবার ওয়ার্ল্ড কাপে দারুণ কাজ দেবেন। জাপান... কোরিয়া... না না, এত ভাল ভাবার মানে হয় না। আশ্চর্য দৃশ্য। জোরে জোরে কোনাকুনি হাঁটছেন এডিটর সাহেব, মাথায় হাত, মুখে হতাশা। নিজেই বললেন, হাঁটছি, ওয়ার্ম আপ করছি, ওয়ার্ল্ড কাপ আসছে কিনা। কিন্তু মাথায় হাত? মুখে হতাশা? এটাও নিজে থেকেই বললেন, হায় হায়, ২০০২ সালে এসে এক ধাক্কায় বাংলার ফুটবল ১০০২ সালে ফিরে গেল। আমরা বাড়ছিলাম। ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের জায়গা ১০৭ থেকে ১১৭, ১১৭ থেকে ১২০— বেশ বাড়ছিল। বাংলা এগোলে তবে না ভারত এগোবে। যখন ভাবছি লিস্টের নিচে সবচেয়ে বেশি নম্বরে পৌঁছে যাব, তখনই যাকে বলে বজ্রাঘাত, রাজ্য সরকার এবার ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলার টিম পাঠাচ্ছে না। গত কয়েকটা ওয়ার্ল্ড কাপে এক্স-প্লেয়ার, কারেন্ট পুলিস অফিসার, পার্মানেন্ট নাথিং— কতজনকে পাঠিয়েছেন। ওঁরা দিস্তে দিস্তে রিপোর্ট দিয়ে বাংলার ফুটবলকে এগিয়ে দিয়েছেন, বাংলার লেজ ধরে ভারত এগিয়েছে, স—ব বন্ধ হয়ে গেল।

এডিটর সাহেবকে সান্ত্বনা দেওয়ার নিয়ম নেই, শুধু 'হ্যাঁ' বলে যেতে হবে, 'না'-ও বলা যাবে যখন উনি 'না' শুনতে চাইবেন। জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতেই আস্তে আস্তে বললেন, 'আপনাকে কিছু কাজ দেব।' মাথাতেই হাত, ওই অবস্থাতেই একটা আঙুল আমার দিকে তাক করে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কাজ বলুন তো?' কী কাজ, কী কাজ। বললাম, 'ব্রাজিলে পাঠাতে পারেন। ফাটিয়ে দেব। ব্রাজিলে বিক্ষোভ।' হতাশার হাত মাথা থেকে রাগে গরগর করতে করতে কোমরে নেমে এল : 'আপনি? ব্রাজিল? বিক্ষোভ? কীসের বিক্ষোভ মশাই, রোমারিও নিজে ঠাণ্ডা হয়ে ব্রাজিল টিমকে উইশ করছে, সব পুরনো পচা খবর।' চোখ বন্ধ করে নির্ভয়ে বললাম, 'রোমারিও নয়। ব্যারেটো। ব্যারেটো বাদ, ব্রাজিলে বিক্ষোভ। কাতারে কাতারে লোক ফুটবল-কর্তাদের অফিসের সামনে বাড়ির সামনে বসে

পড়েছে, মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়াচ্ছে, ঢিল ছুঁড়ছে, তার চেয়েও বেশি গালি ছুঁড়ছে— নে। ব্যারেটো নো ওয়ার্ল্ড কাপ। ব্রাজিলের কাগজে কাগজে লেখা হচ্ছে, ইতালিতে রোনাল্ডো এবার তেমন কিছু করতে পারেনি, তবু টিমে। ইন্ডিয়ার ন্যাশনাল লিগে ব্যারেটো সেকেন্ড টপ স্কোরার, তবু ব্রাজিল টিমে নেই। ভিড়ের মধ্যে কেউ শিশুর মতো কাঁদছে, কেউ পশুর মতো হাসছে, অনেকেই মূর্ছা যাচ্ছে এবং তার পর আবার ঢিল ছুঁড়ছে। মূর্ছা যাওয়ার আগে এক তরুণ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ইন্ডিয়ার রিপোর্টার মনে হচ্ছে, লিখবেন, ফাটিয়ে লিখবেন...। চেঁচিয়ে বললাম, 'মূর্ছা যাওয়ার আগে এবং ফের ঢিল ছোঁড়ার আগে প্লিজ বলুন, নো ব্যারেটো নো ওয়ার্ল্ড কাপ, তার মানে ওয়ার্ল্ড কাপ টিভিতে দেখবেনই না?' মূর্ছায়মান বলে গেলেন, 'দেখব, দেখব। আমাদের দাবিতে ওয়ার্ল্ড কাপ বন্ধ হলে, দেখতাম না। হচ্ছে যখন, দেখব। নো ব্যারেটো...।' হাঁটা বন্ধ হয়ে গেছে। চেয়ারে দেহ রেখেছেন। এডিটর সাহেব বললেন, 'না গিয়েই তো ব্রাজিলের রিপোর্ট বানিয়ে ফেলেছেন!' হুঁ। কিন্তু না গেলে লেখা যাবে না। এই রিপোর্টটাই পেজ ওয়ানে ফেটে যাবে, যদি ছাপা থাকে— বাবুরাম সাপুড়ে, রিও ডি জেনিরো। পেপারওয়েটে অফস্পিন পাকাতে পাকাতে এডিটর সাহেব বললেন, 'আপনাকে অনেক বড় কাজ দেব। গোটা জুন মাস আপনাকে সব রকম দায়িত্ব নিতে হবে। পলিটিকাল, ক্রাইম, এডুকেশন— সব বিটের বড় রিপোর্টাররা এক মাস ওয়ার্ল্ড কাপ দেখায় ব্যস্ত থাকবেন। আপনাকে একাধারে পলিটিকাল, ক্রাইম, এডুকেশন, আরও নানা কিছুর একমাত্র রিপোর্টার হতে হবে। ওয়ার্ল্ড কাপ আসছে, আপনি ওয়ার্ল্ড কাপ ছাড়া অন্য সব কিছু নিয়ে লিখবেন। গেট রেডি।' ব্রাজিল থেকে আমহার্স্ট স্ট্রিটে ফিরে বললাম, 'কী-ই বা করার থাকবে। সব পাতাই তো ওয়ার্ল্ড কাপে ভরা থাকবে। ঠিক আছে। যা বলবেন করব। এখনই একটা খবর করতে পারি : এর মধ্যে মন্ত্রী হয়ে গেলে, না হলেও, মমতা জুন মাসে কোনও আন্দোলন করবেন না। পুজোর সময় করেন না, উৎসবের সময় করতে নেই। পরীক্ষার সময় করেন না, ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি করতে নেই। ওয়ার্ল্ড কাপের সময়ও করবেন না, ফুটবল-জ্বর সারাতে নেই। কিন্তু, কিন্তু পেজ ওয়ানে তো জায়গা পাব না। কিন্তু, কিন্তু, যদি গুজরাটে বড় বড় ঘটনা ঘটতেই থাকে, পেজ ওয়ানে না এনে পারবেন? চেয়ার আধ চক্কর ঘুরিয়ে এডিটর সাহেব বললেন, 'তেমন কিছু হবে না, হোপফুলি। খবর আছে। পুণ্যবান বজরং গুণ্ডাদের ফুটবল-রোগ নেই। কিন্তু জানা গেছে, পুলিসের কিছু লোকের এ রোগ আছে। পুলিসকর্তারা নরেন্দ্র মোদিকে ডেপুটেশন দিয়ে বলেছেন, জুন মাসটা ছেড়ে দিন, খেলা দেখব, গণহত্যায় হেল্প করতে পারব না।'

পুনশ্চ : এখনও ওয়ার্ল্ড কাপ শুরু হয়নি। এখনও অন্য সব রিপোর্টিং শুরু করিনি। একটা খবর জমা দিলাম। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ভেবে রেখেছেন, চ্যাম্পিয়ন দলকে ৫ লাখ টাকা দেবেন। নেতাজি ইনডোরে সংবর্ধনা জানানো হবে। জিদান বা ভেরন বা ফিগো বা রিভাল্ডো বা বেকহ্যাম বাংলায় বক্তৃতা দেবেন। খবরটা ছাপবেন কি না ভগবানই জানেন,

ইয়ে, এডিটরই জানেন। তবু জিজ্ঞেস করলেন, এক্সক্লুসিভ খবর করছেন, যদি ভুল হয়? বললাম, হতেই পারে, ধরে নিন হবেই ভুল। প্রথম এক্সক্লুসিভ— বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আসছেন। দ্বিতীয় এক্সক্লুসিভ— বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা আসছেন না। একটা নয়, দুটো বড় খবর। এবার আসুন— আঙুল তুলে দরজা দেখালেন এডিটর সাহেব। একটা নয়, দুটো আঙুল।

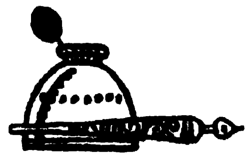
বিশ্বকাপ স্পেশাল

ফাজিল, ফাঁকিবাজ, ফালতু এবং একসঙ্গে তিনটেই। আজকালের ঘ্যামঘ্যাম সব রিপোর্টার, ইয়ে, প্রতিবেদক। এদেরই মাথায় তুলে রেখেছেন এডিটর সাহেব। মোটা বললে চাকরি থাকবে না, যথেষ্ট মজবুত ও নিরেট মাথা, এতজনকে মাথায় রেখেও দিব্যি চলাফেরা করছেন, বকাঝকা করছেন, এমনকী দু-পাঁচ মিনিট কাজকর্মও করছেন। রিপোর্টাররা সব স্পেশালিস্ট। পলিটিকাল রিপোর্টাব, এখন নাকি ঠাণ্ডা বাজার, ওয়ার্ল্ড কাপ দেখার জন্য রেডি হচ্ছেন। রাইটার্স রিপোর্টার, আগামী একমাস নাকি ভালমন্দ কিছুই হবে না, তাই নাকে সুড়সুড়ি দিচ্ছেন। ক্রাইম রিপোর্টার নিশ্চিত, এখন একমাস বড় কে.নও ক্রাইম হবে না, ওয়ার্ল্ড কাপের নামতা মুখস্থ করছেন। এডুকেশন রিপোর্টারের সোজা কথা, সব পরীক্ষা হয়ে গেছে, রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, এমনকী দু-বার করে সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়ে যাচ্ছে, এখন আবার কাজ কীসের। ওয়েদার রিপোর্টার হিসেবে একজন খুব নড়াচড়া করছিলেন, এক পশলা বৃষ্টি পড়তেই তিনি ঠাণ্ডা, কাজ নেই। বিশ্বকাপ, বিশ্বকাপ। আরে, ওয়ার্ল্ড কাপ নিয়েই কত কী হচ্ছে, রিপোর্ট করা যায় না? যায়, যদি পথে নামা যায়। এডিটর সাহেবের মাথায় চড়ে বসে আছেন, নামা অত সহজ নাকি?

বড় রাস্তায় বেরোলেই বড় বড় হোর্ডিং : সিওলে শিওর। জাপানে ঝাঁপান। রোমহর্ষক হাতছানি। কিস্যু করতে হবে না, শুধু চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে ওদের কোম্পানির একটা টিভি কিনুন। এ টিভি এমন টিভি, ঘরে বসেই মনে হবে কোরিয়ায় চলে গেছেন, জাপানে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। বিশ্বকাপের খেলা সরাসরিও দেখতে পারেন। আশা করা যায়, চোদ্দ হাজার টাকার স্পেশাল ওয়ার্ল্ড কাপ টিভি অন্তত চোদ্দ হাজার জন কিনবেন। ওঁদের মধ্যে একজনকে একটি ম্যাচের একটি টিকিট দেওয়া হবে লটারি করে। প্লেনের টিকিটটা অবশ্য লটারিজয়ীকে কিনতে হবে, থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করে নিতে হবে, লাখখানেক টাকা খরচ হবে, তবে হ্যাঁ, খেলার টিকিট ফ্রি, চোদ্দ হাজারে একজন। এত বড় একটা খবর স্রেফ হোর্ডিংয়ে হাসবে খেলবে, বড় রিপোর্ট হবে না? ছেলে বলল, বাবা, ওয়ার্ল্ড কাপ স্কেল বেরিয়েছে, আমার দুটো চাই। বলের মতো স্কেল। গোল স্কেল। এতে স্কেলের কাজে একটু অসুবিধে হবে না? ছেলে বলল, এই একমাস কেউই যখন কোনও কাজ

করবে না, স্কেলের কাজ নিয়ে এত কথা উঠছে কেন? ভাগ্নী বলল, মামা, ওয়ার্ল্ড কাপ রসগোল্লা খাব। সত্যি বানিয়েছে। চৌকো চৌকো সাদা আর কালোয় রসগোল্লা। সুপারহিট। খবর হবে না? বাজারে ঢোকার মুখে তিন ইঞ্চি বাই পাঁচ ইঞ্চি বিজ্ঞাপন : এখনই আসুন, ওয়ার্ল্ড কাপ সুচ কিনুন। কিনলাম। অপূর্ব। এমনিতে যেমন থাকে সেরকমই, ফুটোটা বিশাল, ফুটবলের সাইজ। কিন্তু, এত বড় ফুটবল কাপড়ে ঢুকবে কী করে, কী কাজে আসবে ভাই? আত্মবিশ্বাসী দোকানি বললেন, কাজে আসার কথা উঠছে কেন, এখন একমাস কোনও কাজ হবে নাকি? বিজ্ঞাপনের টান মশাই, বিজ্ঞাপনের টান। ওয়ার্ল্ড কাপ সুটকেস। বলের মতো সুটকেস? গোল সুটকেস? দোকানদার বললেন, তা-ও করা যেত, তবে এটা তা নয়। বলের মতো নয়, মাঠের মতো, চৌকোই। স্পেশালিটি হল, অনেক বড়, প্রায় মাঠের মতো। এবং চ্যাপ্টা, মাঠের মতো চ্যাপ্টা, এগার ফুট বাই সাত ফুট, ডেপথ এক ইঞ্চি। পার্ক স্ট্রিটের রেস্তোরাঁও ফাটিয়ে দিয়েছে। জিদান বিরিয়ানি, ফিগো কাবাব, নাকাতা স্যুপ, বেকহ্যাম হ্যামবার্গার, এ সব তো আছেই। টেবিলে থাকবে ওয়ার্ল্ড কাপ প্লেট। গোল প্লেট? সে তো থাকেই। না, একদম বলের মতো প্লেট। এই প্লেটে খাবার থাকবে কী করে? লোকে খাবে কী করে? রেস্তোরাঁ ম্যানেজার আশ্বস্ত করলেন, একদম চিন্তা করবেন না স্যার, খাবার থাকবে অন্য প্লেটে, বল-প্লেটটা পাশে থাকবে। ওয়ার্ল্ড কাপ ফ্লেভার। বড় বড় রেস্তোরাঁয় কতজন যেতে পারি, কিন্তু বাজার তো রোজ যাচ্ছি। একশ টাকার মাছ দেড়শ টাকার বলে ভালবেসে একশ পঁচিশ টাকায় দিয়ে প্রিয় মৎস্যবিক্রেতা বললেন, টেস্ট বেড়ে যাবে, এখানেই ওয়ার্ল্ড কাপ বঁটিতে কাটিয়ে নিন, মাছ টাকা এক্সট্রা। গোল বঁটি? না না। বারপোস্টকে উল্টে দিলে যেমন হয়। নিচে বার, দু-দিকে পোস্ট। এই দু-পোস্টে দু-দিক দিয়ে মাছ কাটতে হবে। একমাসে কী ওলটপালট হয়ে যাবে কে জানে, মেজোকাকুর সঙ্গে দেখা করতে শ্রীরামপুর গেলাম। ট্রেনে আওয়াজ : লজেন্স, লজেন্স, ওয়ার্ল্ড কাপ লজেন্স। ঠিক আছে, বলের শেপে লজেন্স হতেই পারে। না। ব্যাপার আছে। বিচক্ষণ লজেন্সবিক্রেতা ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বললেন, নব্বই মিনিটের ম্যাচ, পনের মিনিট হাফটাইম, মোট একশ পাঁচ মিনিট, এ লজেন্স এমন লজেন্স, এক পিস চুষে শেষ করতে একশ পাঁচ মিনিট লাগবে। একশ পাঁচ মিনিটেও শেষ না হতে পারে, হয়ত যেমন ছিল তেমনই থেকে যেতে পারে, তখন পরের ম্যাচে কাজে লাগবে। ছ'টা কিনে বললাম, অক্ষয় লজেন্স! বিক্রেতা ভ্রাতা বললেন, না না, মালিকের নাম অক্ষয় না, বেণীপ্রসাদ, সত্যি বলছি। এত কিছু হচ্ছে, কেউ রিপোর্ট করে না। খবর পেয়েছি, পেয়েছি মানে কুড়িয়ে পাইনি, খেটে জোগাড় করেছি, ওয়ার্ল্ড কাপ ট্যাবলেট আসছে। তাতে কী হবে? ওয়ার্ল্ড কাপ হজম। এক মাস ধরে এত ফুটবল এত ওয়ার্ল্ড কাপ খেয়ে যা তা হবে। এক ট্যাবলেটে সব হজম। একত্রিশটা বুক করে রেখেছি। চারটে বাড়ির জন্য। ওয়ার্ল্ড কাপ হজম করতে হবে তো। ভাবছি, একটা ছোট মইও ভাড়া করে রাখব, এডিটর সাহেবের মাথায়-চড়া রিপোর্টারদের বিশ্বকাপোত্তর ধরাধামে এবং কাজকর্মে নামাতে হবে তো। এটা বিশ্বকাপ মই কি না পরে জেনে বলব।

মডার্ন ফুটবল



বয়সে কী এসে যায়। চুলেই বা কী এসে যায়। একই পাড়ায় ছোট হয়েছি, মানে বড় হওয়ার চেষ্টা করেও পারিনি, প্রায় একই বয়স, কিন্তু আমার আর গুল্টুর মধ্যে কত তফাত। আমার এখনও সাড়ে তিন গাছা চুল, গুল্টুর দেড় গাছাও নেই। আমি এখনও দুমদাম রঙিন জামা পরি, গুল্টু অল হোয়াইট। গুল্টুর বাড়িতে তেত্রিশ কোটি দেবতার অন্তত তেত্রিশজনের ছবি আছে, আমার বাড়িতে শুধু রবি ঠাকুর। একটা ব্যাপারেই গুল্টু আল্ট্রা আধুনিক, আমি সাড়ে প্রাচীন। ফুটবল। গুল্টু শুধু নামকরা সেকেন্ড ডিভিশন টিমের কোচ নয়, পাড়ার এক নম্বর ফুটবল অ্যানালিস্ট, ওর বাড়িতে সাত-সাতখানা ডিকশনারি সাইজের ফুটবল বই, আমি নিজে দেখেছি, ও নিজে কিনেছে। শনিবার সকালে ওর বাড়ি গিয়ে দেখি, একসঙ্গে তিনটে বই পড়ছে, চারটে খাতায় নোট করছে। সেনেগালের কাছে ফ্রান্স, আমেরিকার কাছে পর্তুগাল, ইংল্যান্ডের কাছে আর্জেন্টিনা হেরে যাওয়ার পর চান্স পেয়েছি, আধ নিঃশ্বাসে বলে ফেললাম, এ সব বইখাতা তুই গুটিয়ে ফ্যাল গুল্টু। আমি তো ছোটবেলায় যা দেখেছি এখনও তাই দেখছি। একজন আরেকজনকে কাটাচ্ছে, মানে কাটাতে পারলে কাটাচ্ছে, একটু দৌড়চ্ছে, আরেকজনকে দিচ্ছে, জায়গা পেলে গোলে মারছে, ডানদিকে বাঁদিকে গেলে সেন্টার করছে, কেউ হেড করছে, গোল হচ্ছে অথবা হচ্ছে না। গোলকিপার পারলে ধরছে, দরকার হলে ফিস্ট করছে, কখনও কখনও ঝাঁপাচ্ছে। ডিফেন্ডাররা ট্যাকল করছে, দরকার হলে ছ্যাররা মারছে। এখন অবশ্য বল ধরে এগিয়ে পাস করছে বেশি, কিন্তু ঝামেলায় পড়লে গগনেও পাঠাচ্ছে। আগের চেয়ে জোরে দৌড়চ্ছে, সবাই খুব খাটাখাটি করছে, কিন্তু ছকফক নিয়ে তোদের কচকচির কী মানে হয়? গুল্টু তিনটে বই আর চারটে খাতা সরিয়ে বলল, এগুলো তোর জন্যে নয়। ফুটবল কোথায় চলে গেছে, তোর বোঝার কথা নয়। বুঝতে গেলে পড়তে হয়, নইলে পিছিয়ে পড়তে হয়। পিছড়ে বর্গের প্রতিনিধি হিসেবে জিজ্ঞেস করলাম, গুল্টু, আমাদের ছোটবেলাতেও তো ক্লাবের দাদারা মাঠের বাইরে থেকে চেঁচাত, খেটে খ্যাল, খেটে খ্যাল। এখন তোরা বলছিস— ওয়ার্কলোড। তফাত হল কিছু? গুল্টু বলল, সাতশ মাইল তফাত। ওয়ার্ক আর লোড, দুটো হেভি শব্দ মিলে ওয়ার্কলোড। হাওড়া স্টেশনের কুলির মতো লোড নিতে হবে। শুনলে অবাক হয়ে যাবি, আয়ারল্যান্ডের কোচ ম্যাকার্থি

রোজ প্র্যাকটিস শুরু করেন হোটেলে। সব প্লেয়ারকে নিজের নিজের ঢাউস সুটকেস মাথায় নিয়ে ষোল মিনিট হোটেলের বারান্দায় হাঁটতে হয়, দৌড়তেও হয়। মাঠে গিয়ে, ছবি দেখেছিস হয়ত, একজন প্লেয়ার আরেকজন প্লেয়ারকে ঘাড়ে তোলে, লোড। ওয়ার্ক সবচেয়ে ভারি জিনিস, সব শেষে এই লোডটা ঘাড়ে চাপানো হয়। আমাদের দেশে ওয়ার্ক কালচার নেই, তোদের অফিসে তো নেই-ই, তুই বুঝবি না। বুঝতে হবে, তাই জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু গুল্টু, ওয়ার্কলোড তো হল, উইদাউট বল খেলা মানে কী? বল ছাড়া ফুটবল কী জিনিস? পেছন থেকে অনেকটা দৌড়ে এসে জায়গা নিয়ে গোল করেছিল কার্লোস আলবার্টো, ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনালে, বত্রিশ বছর আগে। এখন 'উইদাউট বল' ব্যাপারটা এত বেশি শুনছি কেন? সাতটার মধ্যে দুটো বইয়ের মলাটে হাত বুলিয়ে গুল্টু বলল, বেশি শুনছিস, কারণ বেশি হচ্ছে। ভাবতে পারবি না, ডেনমার্কের কোচ অর্ধেক দিন বল ছাড়াই প্র্যাকটিস করায়। উইদাউট বল। সহজ শিক্ষা, এত বল বল করে মাথা খারাপ করা কেন? সে এক আশ্চর্য দৃশ্য। কেউ সোজা দৌড়চ্ছে, কেউ কোনাকাটি দৌড়চ্ছে, কেউ বারপোস্টের চারপাশে দৌড়চ্ছে, কেউ দৌড়ন্ত দুজনের মাঝখান দিয়ে দৌড়চ্ছে, কেউ গুটিগুটি প্রায় লুকিয়ে লুকিয়ে দৌড়ে এগোচ্ছে। বল নেই, কিন্তু আছে। প্লেয়ারদের ভেবে নিতে হবে। তারপর দুটো টিম করে খেলানো হচ্ছে, উইদাউট বল। কোচ খেলার পর রেজাল্ট বলে দেন, ৩-২। গুল্টুর কথায় কাজ হচ্ছে, আমিও একটু-একটু বুঝতে শুরু করেছি। জানতে চাইলাম, লোক বাড়ানো মানে কীরে? লোক তো সেই এগারজন। টু এগেইনস্ট ওয়ান মানে কী? দরকার হলে তো তিনজন মিলে আটকাতে হয়, হেল্প করার জন্য পাশে যেতে হয়, এ সব তো ছোটবেলা থেকেই দেখছি। গুল্টু বলল, ছোটবেলার ব্যাপারটা এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। বলের কাছে যাদের বেশি লোক, বল আলটিমেটলি তাদের, সোজা কথা। লোকবল মানেই ফুটবল। একজনই মাত্র গোলকিপার, তবু গোললাইনেই কতজন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখছিস? এমনকি, গোলকিপার একাই দুজন হয়ে যাচ্ছে। টু ইন ওয়ান। বার্থেজ দু-দুটো গোল পা দিয়ে সেভ করল দেখলি না? দেখেছি এবং ক্রমশ বুঝতে শুরু করেছি। জিজ্ঞেস করলাম, কিলার ইনস্টিংক্ট মানে কীরে? খুনি মনোভাব? গুল্টু বলল, একদম তাই। শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে যুদ্ধে জেতা যায় না। ফুটবল ইজ ওয়ার। পর্তুগালের কোচ তো রোজ সকালে জিজ্ঞেস করেন, কিলিং প্র্যাকটিস করেছ? লোক তো সবসময় পাওয়া যাচ্ছে না, তা ছাড়া পুলিসটুলিসের ঝামেলা আছে, রোজ অ্যাটলিস্ট একটা পিঁপড়ে মেরে প্র্যাকটিসে আসতে হবে। ফাইভ স্টার হোটেলে পিঁপড়ে পাওয়া কঠিন, সেক্ষেত্রে মাঠে এসে কিছু ঘাস মারতে হবে। কিছু না পারো, নিজের গালেই টেনে থাপ্পড় মারতে হবে। মারো, মারো। বুঝলি বাবু, মডার্ন ফুটবল। বুঝলাম গুল্টু। এখন এত দৌড়ের কথা বলা হচ্ছে কেন? যে টিম যত দৌড়বে সে টিম তত ভাল বলছে কেন? আগে কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলতে বলা হত? চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে এল গুল্টুর, বলল, এখন একটাই কথা— রান। রান, রান অ্যান্ড রান। শুধু দৌড়ে যাও। জার্মানির হামান ক্লাবম্যাচে একবার কী করেছিল জানিস? খেলা শুরুর আগে আধ ঘণ্টা দৌড়ল, দৌড় প্র্যাকটিস। তারপর একশ পাঁচ মিনিট টানা দৌড়ল, হাফটাইমে অবশ্য একটু

আস্তে দৌড়েছিল। ফাইনাল ম্যাচ, নব্বই মিনিটে ১-১, একস্ট্রা টাইমের তিরিশ মিনিটও টানা দৌড়ল হামান। গোল্ডেন গোল হল আরও পাঁচ মিনিট পরে, অন্য একজনের পাস থেকে অন্য একজন গোল করল, টিম জিতল, হামান দৌড়ে যাচ্ছে। কোচ বললেন, ম্যাচটা হামানই জিতিয়ে দিল। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট এসে বললেন, হামান কোথায়, ওকে কনগ্র্যাচুলেট করব, স্পেশাল প্রাইজ দেব। কোচ বললেন, একটু ওয়েট করুন স্যার, হামান এখনও দৌড়চ্ছে!